ভারতের সাধক

প্রথম খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়
(প্র-না-ভ)

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯



প্রথম সংস্করণ (সু)—১৩৯২

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স,
১৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী:
খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

৫০·০০ সাধারণ মূল্য
৩০·০০ গ্রাহক মূল্য

নিবেদন

কোনো লেখকের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজন সাধারণতঃ তখনি হয় যখন সেগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থেকে দুষ্প্রাপ্যের কোঠায় পড়ে; আবার দীর্ঘদিনের বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে পাঠকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের চেষ্টাও থাকে কখনো। শঙ্করনাথ রায়ের রচনাবলী প্রকাশের কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। দশবছরের ওপরে প্রয়াত এই লেখকের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সব রচনারই নতুন সংস্করণ হচ্ছে নিয়মিত। সাপ্তাহিক বেস্টসেলারের তামামীতেও তাঁর নাম প্রায়ই চোখে পড়ে। তবু আবার নতুন রূপে এই আয়োজন কেন—সংগতভাবেই এ প্রশ্ন জাগে। আর তার উত্তর পেতে গেলে অবহিত হতে হবে এই রচনাবলীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। শঙ্করনাথের রচনা তো শুধু এক সাহিত্যিক সৃষ্টি নয়, আজকের জীবনযন্ত্রণায় বিভ্রান্ত মানুষের সামনে তা এক ধ্রুব মূল্যবোধের আদর্শ। সেই আদর্শের আলোয় মুমুক্ষু হৃদয় চিনে নিতে পারে নিজের অস্তিত্বের স্বরূপটিকে, সংশয়ী পায় শান্তি, আর্ত লাভ করে সান্ত্বনা। মহৎ সাহিত্যের সেই তো ফলশ্রুতি। সেই মহাফল কামনা করেই শঙ্করনাথের সাধক সমগ্রকে আমরা এই সংস্করণের মাধ্যমে এনে দিতে চাই সকলের আয়ত্তের মধ্যে। সর্বপ্রকার দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পরাবিদ্যা দান করে গেছেন শঙ্করনাথ তাঁর গ্রন্থরাজিতে—তার সুফল যেন সর্বাধিক লোকে গ্রহণ করতে পারেন সেই প্রত্যাশাতেই এই সুলভ সংস্করণের পরিকল্পনা।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে এক অভিনব রসধারার উৎস মুক্ত করে দিয়েছেন শঙ্করনাথ। সে ধারার নাম আধ্যাত্মিক সাহিত্য। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে সে সাহিত্যধারার কথা-শরীর। কিন্তু সে রচনা তো শুধুই সাধুপুরুষদের 'জীবনী' নয়। কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জীবৎকালের ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই চরিত্রের পরিচয় প্রদানই সাধারণ জীবনীর লক্ষ্য। শঙ্করনাথের রচিত জীবনীসমূহ কিন্তু নির্দিষ্ট জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনাকে অবলম্বন করে এগিয়ে গেছে গভীরতর লক্ষ্যভেদে। ভারতবর্ষের সাধকসমাজের জীবনকাহিনীতে তিনি অন্বেষণ করেছেন তাঁদের শাশ্বত সাধনার মর্মকথা। সেই উদ্দেশ্যে নানা মত, নানা মুনির বিচিত্র শোভাযাত্রার পথে সন্ধানী পথিক শঙ্করনাথ। যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক দরবেশ—সকলেরই উদার আমন্ত্রণ সেখানে।

সাধারণতঃ সাধুপুরুষদের জীবনী তাঁদের শিষ্যবর্গের দ্বারাই রচিত হয়ে থাকে। ফলে ব্যক্তিগত আবেগের কুয়াশায় যথার্থ সত্যের স্বরূপটি যায় ম্লান হয়ে। শঙ্করনাথের নির্মোহ সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে সেই মোহ-আবরণ কখনো বাধা হয়নি। বৈজ্ঞানিকের সাগরসেচের শক্তিতে তিনি আমাদের জন্য অপাবৃত করে দিয়েছেন সেই দুর্লভের দর্শন দ্বার। এই শক্তি শঙ্করনাথ লাভ করেছিলেন এক যোগীশ্বর মহাত্মার কৃপায়। শঙ্করনাথের রচনার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে হলে সেই কৃপাসিক্ত জীবনের কিছু ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শঙ্করনাথ রায় লেখকের ছদ্মনাম, প্রকৃত নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ১৯১১ সালে অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা জেলার রায়রা গ্রামে মাতুলালয়ে প্রমথনাথের জন্ম। মাতামহী মধুমালাদেবী ছিলেন সেকালের ছাত্রবৃত্তি উত্তীর্ণা বিদুষী। তাঁর স্নেহমধুর ব্যক্তিত্ব শিশু প্রমথনাথের চরিত্রগঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরিণত বয়সেও দিদিমার স্নেহস্মৃতি স্মরণ করে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। শৈশবজীবনের এই স্নেহাতুরতার আতিশয্য প্রমথনাথের চরিত্রে কোনোরকম দুর্বলতা বা দুঃশীলতার পরিবর্তে এনেছিলো এক সর্বাঙ্গীণ পরিতৃপ্তিবোধসঞ্জাত সহৃদয়তা। স্বভাবের এই মধুর উপাদান আজীবন তাঁর চারপাশের পরিমণ্ডলকে স্নেহসুকুমার সামাজিকতায় ভরিয়ে রেখেছে।

প্রমথনাথের পিতা যোগেন্দ্রনাথ ঢাকা শহরে ওকালতী করতেন। তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্রয়ে জ্যাঠতুতো ও অনুজ ভাইয়েরা সকলেই ছাত্রবয়সে সক্রিয় বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই পরিবেশের প্রলোভন অনায়াসে এড়িয়ে গেছেন কিশোর প্রমথনাথ। সকলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েও তিনি একা ছিলেন এ দলের বাইরে। সেই অবিবেচক আবেগের বয়সেও তিনি চিন্তা করেছেন অন্য ধারায়। ভাঙার পথ নয়, গড়ে তোলার লক্ষ্যই বরাবর তাকে টেনেছে। পোগোজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমথনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে যোগদান করলেন। এ সময় হলের নানা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। হলের মুখ-পত্র 'বাসন্তিকা' সম্পাদনা করেছেন, লাভ করেছেন 'বিবেকানন্দ পদক'। হলের প্রোভোস্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে এইসময় তাঁর যে ঘনিষ্ঠ স্নেহসম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা অম্লান ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করে কলকাতায় এলেন প্রমথনাথ। আইনজ্ঞ পিতার ইচ্ছা ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজের জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু প্রমথনাথের রক্তে ছিল অন্যতর আকর্ষণের অস্থিরতা। ছাত্রবয়স থেকেই আর সকলের অনুসরণে গতানুগতিক জীবনে গা ভাসিয়ে শান্তি পাননি তিনি। পেশাগত ক্ষেত্রেও নতুনের সন্ধানে উন্মুখ হলেন। এমনি অস্থির সময়ে তাঁর পরিচয় হ'ল এক মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তবুও প্রমথনাথের পক্ষে কঠিন হয়নি এই মানুষটির মহত্ত্ব বোঝা—এখানেই তাঁর নিজের মহনীয়তা। জহুরী ছাড়া জহরতের আসল মূল্যায়ন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। অনায়াস আত্মসমর্পণের গুণে তিনি আকর্ষণ করে নিলেন এই মহাপুরুষের অপরিসীম কৃপা। জীবনপথের নিশ্চিত নির্দেশটি দিলেন তিনি—আর প্রমথনাথ সে নির্দেশ গ্রহণ করলেন সর্বান্তঃকরণে, সনিষ্ঠায়। যোগীশ্বর কালীপদ গুহরায় হলেন প্রমথনাথের friend, philosopher and guide—তাঁর সর্বকর্মের নিয়ন্তা, আলোকদিশারী অগ্রজ—দাদা, কালীদা।

শ্রীযুক্ত গুহরায় প্রথম জীবনে ছিলেন সক্রিয় বিপ্লবী কর্মী। কারাবাসকালে কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নানা দুর্বিপাকে উদ্‌ভ্রান্ত কবি এই মানুষটির মধ্যে খুঁজে পান শান্তির পরমাশ্রয়। ১৩৪২ সনে ১৭ই জ্যৈষ্ঠের নবযুগে 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে সেকথা তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন—"এমন সময় এলেন আমার এক না দেখা বন্ধু। তিনি তাঁর বন্ধু আমার এক বিদ্রোহী বন্ধুর মারফত আমায় অপরূপ চৈতন্য দিলেন।

... আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে যেতে লাগল। আমার অন্তস্থ ঘুচে গেল।" দ্বিতীয়বার 'নবযুগ' সম্পাদনার ভার নিয়ে এই 'বিদ্রোহী বন্ধু'কেও নজরুল সেখানে টেনে নিলেন তাঁর সহযোগী করে। এইসময় প্রমথনাথ প্রায় নিত্য যেতেন 'নবযুগ' অফিসে। কালীদা ও কাজীদার সঙ্গে এই বৈঠকে যোগ দিতেন সারাজীবনের আরেক বন্ধু, সাংবাদিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি আধ্যাত্মিকতা—চিন্তাজগতের সবগুলি জানলাই খোলা ছিল এ আসরে। শ্রীগুহরায়ের জীবনে রূপান্তরের পর্বটি তখনো চলেছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে একে একে উন্মীলিত হচ্ছে সেই অলৌকিক কাহিনীর পৃষ্ঠাগুলি। প্রমথনাথও তার সাক্ষী। এই অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁরও ছায়াসংশয়িত চেতনালোক। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে 'হিমাদ্রি' পূজাসংখ্যায় পরপর তিনবছর ধরে এ বিষয়ে অনেক কথাই লিখেছেন তিনি। এ রচনাগুলি তিনি লিখেছেন স্বনামে। 'শঙ্করনাথ' নামের ছদ্ম-আবরণ মোচন করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সত্য-অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মুখোমুখি বসে মেলে ধরেছেন এখানে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সেই রচনাগুলিও শেষখণ্ডে সংগ্রথিত হবে।

শঙ্করনাথের রচনার বিষয়বস্তু যে অধ্যাত্মলোক সেখানে লৌকিক অলৌকিকের সংমিশ্রণ অবাধ। সাধারণ পাঠকের কাছে এ ধরনের রচনায় যে অনেকখানি সংশয়ের অবকাশ থেকে যায় এ কথা প্রমথনাথ জানতেন।

১৯৫২ সালে 'হিমাদ্রি' পত্রিকা প্রকাশের পর সম্পাদকরূপে অনেকটা বাধ্য হয়েই যখন তিনি এই জীবনীগুলি লিখতে শুরু করেন, তখন এইসব অলৌকিক উপাদানের প্রকাশ্য উপস্থাপনে তাঁর অনেকটাই কুণ্ঠা ছিল। শ্রীগুহরায় সেসময়ে তাঁকে দিয়েছেন আশ্বাস আর অনুপ্রেরণা, সাধকজীবন ও সাধনার নানা কূটরহস্য উন্মোচন করে বহু জিজ্ঞাসার সমাধান করেছেন। 'সাধুসন্তের মহাসংগমে' গ্রন্থে প্রমথনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'সাধনা ও সিদ্ধির তত্ত্ব এবং ভারতীয় সাধু মহাত্মাদের কাহিনী ও মাহাত্ম্যের যা কিছু আমি জেনেছি, তা ঐ যোগীশ্বরজীর কৃপায়।' বস্তুত এই পর্ব থেকে শঙ্করনাথের জীবন নিবেদিত এক আত্মার ইতিহাস। কথায় বলে, 'গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য না মিলে এক।' এমনি একতম শিষ্য ছিলেন শঙ্করনাথ। গুরুর মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বকে সনিষ্ঠায় অনুধাবন করাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেয়তম কৃত্য। সাধুসন্তদের পুণ্যজীবনী আলোচনার মাধ্যমে ভারত-সাধনার প্রকৃত পরিচয় ফুটিয়ে সেই কৃত্যকেই সম্পন্ন করতে চেয়েছেন তিনি। তাই শুধু মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনী নয়, তাঁদের সাধনার কাহিনীও সমান তথ্যবহরূপে সন্ধান করেছেন প্রমথনাথ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সে অনুসন্ধানকে 'বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা'র অভিধা প্রদান করেছেন। বলেছেন, 'এই বই পড়া মানে, ভারতের অধ্যাত্মিক ভাব-গঙ্গায় অবগাহন স্নান করা।' সাপ্তাহিক 'হিমাদ্রি' পত্রিকায় যখন এই জীবনীগুলি প্রকাশিত হতে থাকে, জীবনী লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সেসময় এগুলি পড়ে অভিভূত হন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর মুখে রচনাগুলির কথা শুনে শ্রীমুখোপাধ্যায় এগিয়ে এলেন গ্রন্থাকারে এই রচনাবলীর প্রকাশে।

১৯৫৮ সালে 'ভারতের সাধকে'র প্রথম প্রকাশ। আর প্রথম প্রকাশ থেকেই জনচিত্তজয়ের এক আশ্চর্য ইতিহাস।

ভক্ত, জ্ঞানী ও ঔপন্যাসিক—এই তিন সত্তার সম্মিলনই প্রমথনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ভারতবর্ষের যে শাশ্বত ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি বাঙালী পাঠকরে সচেতন করতে চেয়েছেন, সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে বড় সুচারুভাবে। উপস্থাপনার নাটকীর ভঙ্গি, বর্ণনার কবিত্বপূর্ণ রীতি এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুর নিষ্ঠ জ্ঞান বাংলা জীবনী-সাহিত্যে শঙ্করনাথকে শ্রেষ্ঠতম আসনের অধিকারী করেছে। গুণীজনের জীবনী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যে হল তাঁর বিশেষ গুণটির পরিচয় প্রদান। এদিক থেকে দেখলে কত দুরূহ ছিল প্রমথনাথের কর্তব্য। অবাঙ্‌মানসগোচর যে রহস্য তাকেই রূপ দিতে বসেছেন তিনি। মহাপুরুষদের জীবনী সেই অরূপে পৌঁছবার রূপময় সোপান। ত্রয়োদশখণ্ড 'ভারতের সাধক', দুইখণ্ড 'ভারতের সাধিকা'র শেষে সেই আরোহণের শেষ সীমার উত্তীর্ণ হয়েছিলেন লেখক। তারপরের গ্রন্থ 'সাধুসন্তের মহাসংগমে।' সে গ্রন্থের 'প্রাক্ ভাষণের' সূচনায় তিনি লিখেছেন, 'আধ্যাত্মিক মহাসংগম বলতে তাত্ত্বিক সুধীজনেরা বোঝেন এমন একটি পবিত্র এবং বৃহৎ সংগমস্থলকে যেখানে নানা দিগ্‌দেশ থেকে এসে মিলিত হয়েছে বহু বিচিত্র সাধনার ধারা, আর তা বিলীন হয়েছে মুক্তি, মোক্ষ বা ব্রহ্মনির্বাণের মহাপারাবারে।' সেই মহাপারাবারের মহাতীর্থে পৌঁছেছেন লেখক, ঘটনাময় জীবনের তথা জীবনীর রূপলোকে তিনি আর আবদ্ধ থাকতে চান না। তাঁর চেতনায় এবার পরামুক্তির আহ্বানটি স্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীগুলির অন্তস্তলে উদ্বেলিত সেই আহ্বানের আকর্ষণ। ১৩৭৯ ও '৮০ সনের 'হিমাদ্রি' শারদীয়া সংখ্যায় তাই নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করলেন নিজের অধ্যাত্মজীবনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বলা বাহুল্য সেখানেও প্রমথনাথ নিজেকে স্থাপন করেছেন ইতিহাসের আধারমাত্ররূপে। এক আশ্চর্য সংঘটনের তিনি দ্রষ্টা—ব্যক্তিহিসেবে এটুকুই তাঁর নিরভিমান ভূমিকা।

পরাজ্ঞান যিনি উপদেশ করতে পারেন এমন লব্ধজ্ঞান বক্তা যেমন দুর্লভ, তেমনি সুদুর্লভ যিনি নিপুণরূপে অনুশিষ্ট হতে পারেন এমন তন্নিষ্ঠ শিষ্য—

'আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।'

এই উভয় ভূমিকাই প্রমথনাথ অনায়াসে পালন করতে পেরেছেন, আর তারই ফলে সম্ভব হয়েছে এই গ্রন্থরাজী রচনা। আর এই দুই ভূমিকাতেই তাঁর সার্থকতার মূলে রয়েছে গুরুর প্রতি অনিঃশেষ আনুগত্য। এ আনুগত্য সম্মূঢ় চিত্তের অবিবেকী আত্মসমর্পণ নয়। জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে, শাস্ত্রানুশাসন ও ঐতিহ্যপরম্পরার বিশ্লেষণে একে তিনি অর্জন করেছেন। আর একবার অর্জনের পর আর কোনো দ্বিধা জাগেনি, পিছু ফিরে দেখার প্রশ্ন ওঠেনি কোনোদিন। এজন্যই এই দুর্গম পথে তাঁর যাত্রা এত অনায়াস, গতি এত সাবলীল।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রমথনাথ ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় সামাজিক মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্বামী, স্নেহশীল স্বামী ও পিতা। তাঁর সুরসিক হাস্যালাপ, সহজ কথার ছলে গভীর

তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রতিভা এবং সর্বোপরি সকলের সঙ্গে সহমর্মিতাবোধের অ-সহজ ক্ষমতার অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। অসামান্য ধীশক্তি ও সহজাত বুদ্ধির প্রাখর্যে লৌকিক অথবা চিন্তাজগতের যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারতেন অনায়াসে। যে কোনোভাবে অপরের আর্তি অপনোদনে তিনি ছিলেন সদা উৎসুক। সর্বদা বলতেন, 'নিজের স্ত্রীপুত্রের আরামের আয়োজন ত কুকুর বিড়ালও করে থাকে। সকলের সুখের কথা যদি ভাবতে না পারি তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন।' বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন চিন্তাধারাকে সাধুবাদ দেওয়া যত সহজ, গ্রহণ করা তেমন কঠিন। প্রমথনাথের পক্ষে এ মনোভাব তো শুধু তাত্ত্বিক চিন্তার ফল নয়, এ তাঁর স্বভাবের প্রবণতা। এজন্য বাহ্যিক লাভ-ক্ষতি নিন্দা-প্রশংসাকে সমভাবে গ্রহণ করে নিজে যা কর্তব্য বুঝেছেন তা থেকে বিরত হননি কোনোদিন। সুকুমার সংবেদনশীল স্বভাবের মধ্যে আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার যে বজ্রাদপি কঠোরতা নিহিত ছিল, বাইরে থেকে অনেকসময়ই তার হদিস পাওয়া যেত না। দারুণতম বিপর্যয়ের দিনেও সদাপ্রসন্ন আননে একটি দুশ্চিন্তার রেখা কখনো প্রকট হয়নি। চিত্তের স্থৈর্য হয়নি বিপর্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে আসছে তারই সঙ্গে মেতে উঠেছেন হাস্যালাপে। আবার বিদায়ের পরমুহূর্তেই কলমটি খুলে ঠিক ছেড়ে দেওয়া পঙ্‌ক্তির অনুবৃত্তি করেছেন অতি অনায়াসে। চিত্তের এই শমতা সাধারণ দৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হলেও প্রমথনাথের পক্ষে ছিল স্বভাবসিদ্ধ। তাঁর সহজাত চিন্তাশীল ধীরস্বভাব আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি লাভ করে পরিণত হয়েছিল সুখে-দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন স্থিতধী চেতনায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের যে গুণাবলীর কথা শোনা যায়, ভক্তিতে ভদ্রতায়, স্নেহে, সখ্যে, কর্তব্যে—সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধে তার আদর্শ ছিলেন প্রমথনাথ। তাঁর তিরোধানের পরে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৮১ সনের শারদীয়া 'হিমাদ্রি'তে 'আধুনিক চিন্তাধারা' নিবন্ধে লিখেছেন—"আমার দুঃখ হয়—ভারতীয় ধারায় চিন্তা করিবার মানুষ ভারতবর্ষে নাই। পূজ্যপাদ প্রত্যাগাত্মা স্বামী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শিবরাত্রির সলিতা শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কেমন আছেন জানি না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় পাই। সদ্‌গৃহস্থ সাধু আমাদের চির আদরের প্রমথনাথ আমাদিগকে কাঁদাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। চোখের সম্মুখে তো গৃহীর একটা আদর্শ ছিল, একান্ত ভরসাস্থল সুহৃদ ছিল আমার প্রমথনাথ। কাহার মুখ চাহিয়া আমরা বুক বাঁধিব।"

বলা বাহুল্য, বর্ষীয়ান বৈষ্ণবের এই বেদনা, এই মূল্যবোধ আজকের সমাজে অতি বিরল। সেজন্য ব্যক্তি প্রমথনাথের চারিত্র্যশক্তির যথার্থ মূল্যায়নও সাধারণ্যে হওয়া কঠিন। প্রমথনাথ তাঁর আলোচিত সাধুসন্তদের আদর্শেই জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। এই লৌকিক সংসারে থেকেও দৃষ্টিভঙ্গির মহনীয়তায় অলৌকিক তাঁর জীবন। তাই হয়তো লোকোত্তর জীবনের ডাক তাঁর কাছে এত শীঘ্র এসেছিল। ১৯৭৩ সালের ৮ই নভেম্বর মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে প্রমথনাথ ইহলোকে ত্যাগ করেন। তবে মহৎ জীবনের সার্থকতা এই, তিনি নশ্বদেহ ত্যাগ করলেও নিত্যকালের জন্য গচ্ছিত রেখে গেছেন তাঁর চিন্ময়-চিন্তা। তাঁর অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের যে ফলশ্রুতি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন মহাকালের ভাণ্ডারে তা চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে। —জয়ন্তী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

শ্রীতৈলঙ্গস্বামী

বারাণসীর আকাশগাত্রে প্রভাতের আলোক-ছটা সবেমাত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। বিশ্বনাথ মন্দিরে মঙ্গলারতি শুরু হওয়ার আর বেশী দেরি নাই। শঙ্খ ঘণ্টার রবে সারা পথঘাট মুখরিত। দিকে দিকে শোনা যায় সুগম্ভীর স্তবধ্বনি—শিব-শম্ভো-শঙ্কর-হর-মহাদেও।

বেণীমাধবের ধ্বজার নিকটেই পঞ্চগঙ্গার প্রাচীন ঘাট। পাথরের সোপানগুলি ধাপে ধাপে নিচে বহুদূরে নামিয়া গিয়াছে। সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিতা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী।

ভক্ত মুমুক্ষু নরনারী রোজই দলে দলে স্নানান্তে এই ঘাটের উপরে উঠিয়া আসে। মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর চরণে তাহারা নিবেদন করে সশ্রদ্ধ প্রণতি। 'হর হর বম্‌ বম্‌' নিনাদে শিরে তাঁহার ঢালিয়া দেয় পুষ্পাঞ্জলি আর গঙ্গাবারি।

নির্বিকার ধ্যানগম্ভীর যোগীর কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভক্তের দল জানে তাঁহাকে সচল বিশ্বনাথরূপে। প্রতিদিন এমনি করিয়া এই মহাপুরুষকে তাহারা দর্শন করিতে আসে, সমাধি-মগ্ন নিস্পন্দ দেহে অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য, কৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

কাশীধামের আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এই মানব-বিগ্রহ তৈলঙ্গ মহারাজ নামে পরিচিত। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই শিবপুরীতে তিনি বিরাজমান। যোগেশ্বর মহাপুরুষ বলিয়া লোকে যেমন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে দেখে, তেমনি জানে পরম আত্মজনরূপে। আপদ বিপদ ও সংকটের দিনে এই মহাত্মারই পরমাশ্রয়ে তাহারা দিনের পর দিন ছুটিয়া আসে।

গঙ্গার ঘাটে যে-সব ভক্ত নরনারী একান্ত নিষ্ঠায় যোগিবরকে অর্ঘ্য দিতেছে, খোঁজ নিলে জানা যাইবে, তাহাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহও এমনিভাবে এই দেবদুর্লভ পুরুষের সান্নিধ্যলাভে হইয়াছে কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুইশত আশি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে, কঠোর তপশ্চর্যার ফলে তৈলঙ্গস্বামী অর্জন করেন অপরিমেয় যোগবিভূতি। কিন্তু এই পরম সম্পদের অধিকারী হইয়া জনসমাজ হইতে তিনি দূরে সরিয়া থাকেন নাই, মুক্তিকামী আর্ত মানবের কল্যাণে জীবন-পথের দুই পাশে এ সম্পদ অবলীলায় তিনি ছড়াইয়া দিয়া যান।

স্বামীজী ছিলেন যোগসাধনার প্রদীপ্ত ভাস্কর। এই জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া সাধক ও দর্শনার্থীর দল দিনের পর দিন আলোকস্নান করিয়াছে, জীবন তাহাদের সার্থক হইয়াছে। কিন্তু মহাযোগীর প্রকৃত স্বরূপ কি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে? কে-ই বা জানিয়াছে এই নিগূঢ় অধ্যাত্মভাবের পরম মহিমা? এই করুণাঘন 'সচল-বিশ্বনাথে'র দিব্য স্পর্শে কত জীব যে শিব হইয়া উঠিয়াছে, সে সন্ধানই বা কয়জন রাখে?

বারাণসীর মহাতীর্থে ভক্ত সাধকদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। প্রায় একশত ত্রিশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া স্বামীজীর উপদেশ ও আশীর্বাদ তাঁহাদের অনেকে লাভ করিয়াছেন, সাধনজীবনকে করিয়া তুলিয়াছেন উজ্জ্বলতর।

সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। অন্ধ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রাম অঞ্চলে হোলিয়া নামক এক বর্ধিষ্ণু জনপদ তখন বর্তমান ছিল। নরসিংহ রাও সেখানকার এক ভূম্যধিকারী। সৎ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার স্ত্রী, ভক্তিমতী সাধিকা বিদ্যাবতীরও সুনাম ছিল যথেষ্ট। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া দেবপূজা, ব্রাহ্মণসেবা ও ধর্মাচরণে সদাই রত থাকিতেন।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও রাও-দম্পতির কোনো সন্তান জন্মে নাই। বংশরক্ষার জন্য নরসিংহ তাই বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া আবার তাঁহাকে আর এক বিবাহ করিতে হয়।

গৃহে বহুদিন যাবৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এবার হইতে এই দেববিগ্রহের সেবা-পূজাতেই বিদ্যাবতী তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিতে থাকেন।

দেবাদিদেবের কৃপার ধারা অতঃপর একদিন নামিয়া আসে, ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক পুণ্যলগ্নে বিদ্যাবতী একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান লাভ করেন। নরসিংহের গৃহ মুখর হইয়া উঠে আনন্দ কলরবে।

শিবের করুণায় জন্ম, তাই শিশুর নামকরণ করা হয়—শিবরাম। এই শিবরামই উত্তরকালে ভারতের অধ্যাত্ম-গগনে আবির্ভূত হন মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীরূপে।

শিবরামের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে নরসিংহের অপর স্ত্রীর গর্ভেও এক পুত্র সন্তান জন্মে, তাহার নাম রাখা হয় শ্রীধর।

বিদ্যাবতী সেদিন শিবজীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। শিশু শিবরাম নিকটে বসিয়া আপন মনে খেলাধূলা করিতেছিল, তারপর শান্ত হইয়া কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মা তাহা লক্ষ্য করেন নাই। পূজা ধ্যান শেষ হইবার পর হঠাৎ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন, শিব-বিগ্রহ হইতে নির্গত হইতেছে অলৌকিক জ্যোতির ধারা, আর সারা গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই এই জ্যোতি ভূতলে শায়িত শিশুর দেহে বিলীন হইয়া গেল।

বড় অদ্ভুত কাণ্ড। বিদ্যাবতীর মনে জাগিল অজানা আশঙ্কা, ত্রস্তব্যস্তে পুত্রকে কোলে নিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

নরসিংহের নিকট এ ঘটনাটি বলা হইলে স্ত্রীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন, "ওগো, তুমি মিছে ভেবো না। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। এ সন্তান তুমি লাভ করেছো শিবজীর কৃপায়, এ তোমার দীর্ঘ আরাধনার ফল। প্রভু দেবাদিদেব আজ এ ইঙ্গিতটি এভাবে তোমায় দিয়ে গেলেন।"

বালক শিবরাম বড় স্বভাবগম্ভীর। সে যেন শিশুরাজ্যের এক ব্যতিক্রম। খেলা-

ধনের তাহার কোনো আসক্তি নাই। চঞ্চল আনন্দমুখর সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজেকে সে বড় বিব্রত বোধ করে। শুধু বাল্যকালে বা কিশোর বয়সেই নয়, যৌবনের উন্মেষেও এই উদাসীন মনোভাব তাহার বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

পুত্রের বৈরাগ্য ও বিষয়বিরক্তি ছিল সহজাত। তারপর সাধিকা জননীর উপদেশ ও সহায়তার গোড়ার দিকে সে তাহার বিধিনির্দিষ্ট জীবন-পথটি খুঁজিয়া পায়। এতদিনের শিবারাধনার ফলে সাধ্বী বিদ্যাবতী যাহা কিছু সাধনসম্পদ লাভ করিয়াছেন, পুত্রের জীবনে অকৃপণ করে তাহা ঢালিয়া দেন। অধ্যাত্মজীবনের প্রধান পদক্ষেপের কালে জননীই হন শিবরামের শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারই নির্দেশিত পথে তরুণ সাধক অগ্রসর হইয়া চলেন।

পুত্রের চালচলন, তাহার এই বৈরাগ্য, নরসিংহ রাওকে কিন্তু চঞ্চল করিয়া তোলে। শিবরাম এখন যুবক। তাছাড়া, বংশের সে জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা স্বভাবতই তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বিবাহ করাইবেন কাহাকে? তরুণ পুত্রের মানসপটে ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে সংসারের অনিত্যবোধ। চিরকুমার থাকিয়া, নিরুপদ্রবে, তিনি সাধন-ভজন করিতে চান। পিতার প্রস্তাবে তাই তাঁর অসম্মতি জানাইয়া বসিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, শিবরামের মাতা বিদ্যাবতী নিজেই ছেলের এ মতকে সমর্থন করিয়া বসেন। নরসিংহকে বুঝাইয়া বলেন, "আমার শিবরাম সংসার করতে চায় না। চিরকুমার থেকে সাধনভজন করবে, ভগবান্ লাভ করবে—এ সংকল্পই সে করেছে। বেশ তো। এ রকম সাধুসংকল্পে তাকে আর বাধা দেওয়া কেন? বরং বলছি কি, ঈশ্বর-দর্শন ক'রে সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। ঘর-সংসার করার জন্য তো শ্রীধরই রয়েছে।"

মহীয়সী জননীর এই কথায় সবাই সেদিন বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। অতঃপর নরসিংহ আর বড় ছেলের বিবাহের প্রস্তাব নিয়া পীড়াপীড়ি করেন নাই।

শিবরামের সাধনজীবনের প্রথম বাধাটি সেদিন মায়ের হস্তক্ষেপে এমনি করিয়া অপসারিত হয়।

বৃদ্ধ নরসিংহ রাও-এর জীবনের দ্বারে হঠাৎ একদিন পরলোকের ডাক আসিয়া গেল। শিবরামের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের বেশী নয়। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে বিদ্যাবতী-দেবীও একদিন আত্মপরিজনদের মায়া কাটাইয়া প্রস্থান করিলেন সাধনোচিত ধামে। পিতার প্রয়াণে শিবরামের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এবার জননীর তিরোধানে সে বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল।

গ্রামের শ্মশানের একপ্রান্তে একটি পর্ণকুটির তিনি বাঁধিলেন। নিমগ্ন হইলেন অধ্যাত্মসাধনায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধরের অনুরোধ, আকুতি ও বন্ধুবান্ধবের অনুনয়, কোন কিছুই সেদিন তাঁহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু শ্রীধরকে দান করিয়া সংসারের বন্ধন তিনি ছিন্ন করিলেন।

সাধনকুটিরের একদিকে রহিয়াছে চিতাভস্মপূর্ণ মহাশ্মশান, আর একদিকে কল্লোলিনী তটিনী। জীবন-মরণের এই পটভূমিকায় বসিয়া দুজ্ঞের্য় মহাসত্যকে শিবরাম উপলব্ধি করিতে চান। একান্তে, পরম নিষ্ঠায়, তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফল অবশেষে ফলিয়া যায়। কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শ্মশানের ঐ পর্ণকুটিরটিতে সেদিন পদার্পণ করেন স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাবের বাস্তুর গ্রামে ছিল এই শক্তিমান্ সাধকের পূর্বাশ্রমের গৃহ। ইনিই শিবরামের ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক—চিহ্নিত যোগীগুরু।

ভগীরথস্বামীর ইঙ্গিতে শিবরাম এবার চিরতরে হোলিয়া গ্রাম ত্যাগ করেন। তারপর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বহুতর তীর্থ পর্যটনের পর উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হন পুষ্করে। এই পবিত্র তীর্থে সাধক শিবরাম স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় আটাত্তর বৎসর। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তেলঙ্গ দেশ হইতে আগত সন্ন্যাসী বলিয়া উত্তরকালে কাশীর জনসাধারণ তাঁকে অভিহিত করিত তৈলঙ্গস্বামী নামে।

দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে শিবরাম সাধনার গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যান। গুরু ভগীরথস্বামীর নির্দেশে হঠযোগ ও রাজযোগের দুরূহ সোপানগুলি একে একে তিনি অতিক্রম করেন। দশ বৎসর কঠোর তপশ্চর্যার পর গুরুকৃপায় পরিণত হন এক যোগসিদ্ধ মহাশক্তিধর মহাপুরুষরূপে। গুরু পুষ্করতীর্থেই নরলীলা সংবরণ করেন। তারপর তৈলঙ্গস্বামীজী ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের পরিক্রমায় বহির্গত হন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল অষ্টাশি বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও জরাবার্ধক্যমুক্ত এই সিদ্ধযোগীর সুগঠিত দেহ লোকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত।

কয়েক বৎসর পরের কথা। স্বামীজী তাঁহার পর্যটনের পথে সেবার সেতুবন্ধ রামেশ্বরধামে উপনীত হইয়াছেন। মহাসমারোহে সেখানে এক বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণতনয় এ সময়ে এই তীর্থক্ষেত্রে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত, মৃতের আত্মপরিজনের বিলাপ ও আর্তনাদে অবতারণা হইয়াছে এক করুণ দৃশ্যের।

প্রশান্তবদন বিরাটকায় এক সন্ন্যাসী দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে ঐ স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। বিলাপ ও কান্নার করুণ ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্তরে জাগিল আলোড়ন। কমণ্ডলু হইতে কিছুটা জল নিয়া মহাপুরুষ অস্ফুটস্বরে কি এক মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

ঐ জল মৃতের দেহে ছড়াইয়া দিবামাত্র এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া যায়। সহস্র মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে যুবক ব্রাহ্মণটি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করে। দেখা যায় মহাত্মার যোগবিভূতির বলে শবদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যোগীপুরুষ কিন্তু জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

মেলার একদল সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে কিন্তু এই শক্তিধর সন্ন্যাসীর পরিচয় সেদিন গোপন ছিল না। তাঁহাদের কাছে শোনা গেল, ইনি মহাযোগী ভগীরথস্বামীর সার্থকনামা শিষ্য, গণপতিস্বামী। উত্তরকালে এই সন্ন্যাসীই প্রসিদ্ধি লাভ করেন তৈলঙ্গ মহারাজ নামে।

ইতিমধ্যে আরও বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ নানা দুর্গম তীর্থ পরিক্রম করিতে করিতে এক সময়ে নেপালে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানকার গভীর অরণ্যে এ সময়ে কিছুকালের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন।

নেপালের এক রানা সেদিন শিকারের উদ্দেশ্যে সদলবলে গহন বনের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল, কয়েকটি গুলিও তিনি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বার বারই হইল তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

রানার জেদ চাপিয়া গেল। সঙ্গীদের ফেলিয়া দ্রুতবেগে তিনি শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। খানিক পরেই যে দৃশ্য সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন বিরাটকায় এক যোগী অদূরে বৃক্ষমূলে সমাসীন রহিয়াছেন, আর পলায়মান সেই বাঘটি গর্জন করিতে করিতে তাঁহার আসনের সম্মুখে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। যোগীবর আদর করিয়া ঐ শরণাগত ব্যাঘ্রের দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহার কাছে এটি যেন এক পোষা মার্জার।

রানা ও তাঁহার অনুচরগণ তো বিস্ময়ে হতবাক্। দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা নির্নিমেষে এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন। এমন সময় হস্ত সঞ্চালন করিয়া যোগী রানাকে অভয় দিলেন, নিকটে ডাকিলেন।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সস্নেহে তিনি কহিলেন, "দেখো বেটা, ইঁহা কোই ডরকা কারণ নহী হ্যায়। তেরা মনসে হিংসা হটা দো, ইসে শের তুমকো কুছ বিগাড়নে নহী সকেগা। সবকোই জীব তো একহী ভগবানকা সৃষ্টি হ্যায়—উস্ কো প্রেম দো, উয়ো ভী জরুর তুমকো প্রেম দেগা। ইয়ে বাত্ ঠিকসে ইয়াদ্ রাখনা"—অর্থাৎ, দ্যাখো বাবা, আমার এখানে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। তোমার মন থেকে হিংসা দূর করে দাও, তাহলে বাঘ কখনো তোমার অনিষ্টসাধনে সক্ষম হবে না। সব জীবই তো তোমার ঈশ্বরের সৃষ্টি—সব জীবকেই তুমি সত্যকার প্রেম দাও, তারাও তোমাকে এ প্রেম ফিরিয়ে দেবে।

রানা সাহেব সেদিন কাঠমাণ্ডুতে ফিরিয়া গিয়া নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই অদ্ভুতকর্মা মহাযোগীর কাহিনী বিবৃত করেন। শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপে বহুতর ভেট নিয়া প্রধানমন্ত্রী তৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, আশীর্বাদ লাভে ধন্য হন।

যোগীবরের অলৌকিক কাহিনীর কথা লোকমুখে ক্রমে প্রচারিত হয়, অরণ্যমধ্যে প্রচুর জনসমাগম হইতে থাকে। অতঃপর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই স্থানটি ত্যাগ করিতে হয়।

স্বামীজীর বিভূতিলীলা এই সময় হইতে নানাস্থানে প্রকটিত হইতে থাকে। শোক তাপ ও ব্যাধি জর্জরিত মানবের দুঃখমোচনের জন্য আগাইয়া আসিত যোগবিভূতি

এই লীলা আত্মপ্রকাশ করে করুণালীলারূপে। আপনভোলা মহাশক্তিধর সন্ন্যাসীর মর্মকেন্দ্রে যাহারই আর্ত আবেদন কোনোমতে একবার পৌঁছিতে পারিয়াছে, কৃপার ধারায় তখনি সে হইয়াছে অভিষিক্ত।

নেপাল ত্যাগের পর তিব্বত ও মানস-সরোবর ঘুরিয়া স্বামীজী সেবার হিমালয় হইতে নিচে অবতরণ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন পথের একস্থানে গ্রামবাসীদের ভিড়। সেখানে, সাত বৎসর বয়স্ক একটি বালকের মৃতদেহ কোলে করিয়া নিয়া এক বিধবা স্ত্রীলোক উচ্চস্বরে কাঁদিতেছে। এই বালকই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, নয়নের মণি। তাহাকে হারাইয়া অভাগিনীর হৃদয়ে শোকসাগর উথলিয়া উঠিয়াছে, কোনো প্রবোধবাক্যই সে কানে তুলিতেছে না।

সঙ্গীরা শব সৎকারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী ধীর পদক্ষেপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই বিরাটকায় সন্ন্যাসী? তাঁহাকে দর্শন করামাত্র পুত্র-শোকাতুরা মাতার অধীরতা কেন যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। তবে কি তাহারই বিপদোদ্ধারের জন্য, এই মৃত শিশুকে বাঁচানোর জন্য, এ মহাপুরুষের আবির্ভাব? ইনি কি দৈব-প্রেরিত? শোকাকুলা জননী তখন মৃত বালকটিকে কোল হইতে নামাইয়া সন্ন্যাসীর পদতলে শোয়াইয়া দিল।

রমণীর ক্রন্দন ও মিনতিতে যোগীবরের দুই চোখ করুণায় ছলছল করিয়া উঠিল। প্রশান্ত বদনে অস্ফুট স্বরে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃতদেহটি তিনি স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শবদেহে দেখা গেল প্রাণের স্পন্দন। এ কি বিস্ময়কর কাণ্ড। জননী ও আত্মজনেরা বালকটিকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ বাদেই শক্তিধর সন্ন্যাসীর খোঁজ পড়িল। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহাকে তো পাওয়া যাইতেছে না। সবার দৃষ্টি এড়াইয়া খেয়ালী সন্ন্যাসী কোন্ গিরিকন্দরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

উত্তরাখণ্ড হইতে অবতরণ করার পর তৈলঙ্গস্বামী নর্মদাতীরে আসিয়া উপস্থিত হন। সর্বজনবন্দিতা এই স্রোতস্বিনীর তটে রহিয়াছে পুরাণ-বিশ্রুত মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম। কয়েকটি বিশিষ্ট সাধু মহাত্মা সে-সময়ে এই পবিত্রস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। এই আশ্রমের এক কোণে নিজের আসনটি স্থাপন করিয়া তৈলঙ্গ মহারাজ কিছুকালের জন্য ধ্যানধারণায় রত হইলেন।

খাকীবাবা নামে এক মহাপুরুষ দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহার যোগসিদ্ধির খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। একদিন শেষরাত্রে খাকীবাবা নর্মদার তীরে বসিয়া সাধনক্রিয়া করিতেছেন, হঠাৎ নর্মদার জলধারার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। অদূরে দেখিলেন এক বিচিত্র দৃশ্য।—নর্মদার জলস্রোত শুভ্র দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হইয়া কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আর স্রোতমধ্যে দণ্ডায়মান তৈলঙ্গস্বামী এই দুগ্ধধারা বার বার অঞ্জলি পুরিয়া পান করিতেছেন।

মহাপুরুষ খাকীবাবা মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন, নবাগত সন্ন্যাসী তৈলঙ্গস্বামীর শক্তিবলেই সংঘটিত হইয়াছে এমন বিস্ময়কর কাণ্ড। কোন্ এক আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে মহাযোগীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল নর্মদা-মাঈর স্তন্যধারা পান করার অভিলাষ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেই অভিলাষই হইয়াছে অমোঘ, পীযূষধারাকে আজ এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে।

বড় অভাবনীয় নর্মদার এই পরিবর্তন! অলৌকিক শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐ দুগ্ধধারা পানের জন্য খাকীবাবাও উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি উহা স্পর্শ করিবামাত্রই সেই মুহূর্তে নদীর জল পূর্বাবস্থা ধারণ করিয়া বসিল। বিস্ময়-বিহ্বল খাকীবাবা বহুক্ষণ নদীতীরে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মার্কণ্ডেয় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সকলেই তৈলঙ্গস্বামীজীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। এবার মহাত্মা খাকীবাবার মুখে এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন, সাধনার সুমেরুশিখরে আরোহিত এই নবাগত যোগীর শক্তি পরিমাপ করিতে অনেকেরই কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

নর্মদাতটের এ আশ্রমে আট বৎসর অবস্থানের পর তৈলঙ্গস্বামী প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হন।

সেদিন ত্রিবেণীসঙ্গমে স্বামীজী বসিয়া আছেন। গ্রীষ্মকাল। আকাশে হঠাৎ দেখা গেল মেঘের ঘনঘটা। কালো কালো মেঘের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় স্থানটি তখন প্রায় জনশূন্য।

রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত তৈলঙ্গস্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। নদীতীরে আসিয়া যোগীবরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বাবা এখানে বসিয়া? ঝড় বাদলে যে তাঁহার মহা কষ্ট হইবে।

নিকটে আসিয়া কহিলেন, "বাবা, এখনি ঝড় উঠছে। আপনি নদীতীরে বসে কেন কষ্ট পাবেন? কাছেই লোকালয় রয়েছে, সেখানে এসে বসুন।"

স্বামীজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "হমারে লিয়ে ফিকর্ মত্ করো, হমারা কোই কষ্ট নহীঁ হোগা। লেকিন্ উস্ নাওকে যাত্রীয়োঁকো তো বচানা পড়েগা।" অর্থাৎ আমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কোনো কিছুতেই আমার বিপদ হয় না, কষ্ট হয় না, কিন্তু ঐ নৌকার আরোহীদের তো বাঁচাতে হবে।

স্বামীজীর অঙ্গুলি-সংকেত অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত রামতারণ লক্ষ্য করিলেন, দূরে একটি নৌকা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর সহিত যুঝিতেছে। বহুজন আরোহী উহাতে দণ্ডায়মান। সংগমঘাট লক্ষ্য করিয়া নৌকাটি অতি কষ্টে তীরের দিকে আসিতেছে। কিন্তু একি দুর্দৈব! প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নায় হঠাৎ সে উহা নদীগর্ভে তলাইয়া গেল।

এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। রামতারণ আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশেই উপবিষ্ট, তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে গিয়া বিস্ময়ে তাঁহার চমক উঠিল।

আসনখানি শূন্য। মুহূর্তমধ্যে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। নদীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই রামতারণ পণ্ডিতকে একেবারে হতবুদ্ধি হইতে হইল। একি! নিমজ্জিত নৌকাটি আবার কোন্ ইন্দ্রজালবলে ভাসিয়া উঠিয়াছে!

আরোহীদের নিয়া নৌকাটি যখন এপারে পৌঁছিল পণ্ডিতের তখন আর বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছে না। দেখিলেন, স্বামীজীও অপর আরোহীদের সঙ্গে ঘাটে অবতরণ করিতেছেন।

কোথা হইতে, কখন যে উলঙ্গ সন্ন্যাসী নৌকায় চড়িয়া বসিলেন মাঝি-মাল্লা ও আরোহীরা তখন অবধি সে রহস্যভেদ করিতে পারে নাই।

ঝড়ের বেগ তখনও একেবারে প্রশমিত হয় নাই। স্নানের ঘাট প্রায় জনশূন্যই রহিয়াছে। রামতারণ স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, যে অপূর্ব বিভূতিলীলা আপনার কৃপায় আজ নিজের চোখে দেখলাম, তাতে থ বনে গিয়েছি। এ অলৌকিক শক্তি কি ক'রে মানুষ লাভ করে, তা আজ আমায় খুলে বলতে হবে।"

পথ চলিতে চলিতে স্বামীজী স্মিতহাস্যে বললেন, "রামতারণ, এতে কিন্তু অবাক্ হবার কিছুই নেই। ঐশী শক্তি সমস্ত মানবের মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে। বেটা, তাকে জাগ্রত ক'রে নিতে পারলেই তো সবকিছু সম্ভবপর হয়। এ মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েই মানুষ বরং আজ অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তাই যা তার অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে অলৌকিক ও অদ্ভুত মনে ক'রে সে চমকে ওঠে।"

এই ঘটনার পর তৈলঙ্গস্বামীজী বারাণসীধামে উপনীত হন। ১৮৪৪ সালের মাঘ মাস। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ চলিতেছে। এই সময়ে একদিন প্রত্যূষে অসিঘাটে এই মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। কাশীধামে জনজীবনে অচিরে এই আবির্ভাব এক আলোড়ন জাগাইয়া তোলে।

সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তৈলঙ্গস্বামীর যোগৈশ্বর্য-লীলা একটির পর একটি এই পুণ্যতীর্থে প্রকটিত হইতে থাকে। শিবপুরী কাশীধামে তিনি আখ্যাত হন 'সচল বিশ্বনাথ' নামে, এদেশের সাধকসমাজে লাভ করেন অভূতপূর্ব মর্যাদা।

ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে বৎসরের পর বৎসর অগণিত তীর্থকামী মানুষ বারাণসীতে উপস্থিত হয়। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা ঘাট দর্শনের পরই সকলে ছুটিয়া যায় তৈলঙ্গস্বামীজীর দর্শনে। এই বহুকীর্তিত মহাযোগীর আশীর্বাদ না নিয়া কেহ সহসা কাশীধাম ত্যাগ করিতে চায় না।

প্রথমে স্বামীজী অসিঘাটে তুলসীদাসের বাগানে বাস করিতে থাকেন। আপনভোলা মহাপুরুষ একদিন ধীর পদে হেলিতে দুলিতে লোলার্ককুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সামনেই এক দুর্ভাগা রাস্তার ধারে বসিয়া রোগযন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতেছে।

লোকটি জন্মবধির, তদুপরি কুষ্ঠরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। নাম তাহার ব্রহ্মসিংহ, বাড়ি আজমীর দেশ। এই বিকটদর্শন রোগী ও তাহার কাতর কণ্ঠ

তৈলঙ্গ মহারাজের অন্তরে করুণা জাগাইয়া তুলিল। ধীর পদক্ষেপে সর্বজনপরিত্যক্ত লোকটির সম্মুখে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

মহাযোগীর দর্শনমাত্র ব্রহ্মসিংহের রোগযন্ত্রণা নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিবপ্রতিম এই মহাপুরুষের স্তুতিতে তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল শিবারাধনার স্তোত্ররাশি।

অপূর্ব এ স্তববন্দনা আর্ত ভক্তের। মহাযোগীর আনন প্রসন্নমধুর হাসিতে উদ্ভাসিত উঠিল। তখনি সস্নেহে একটি বিল্বপত্র ব্রহ্মসিংহের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, তোমার চিন্তা নেই, লোলার্ককুণ্ডে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো। তারপর এই বেলপাতাটি তুমি শিরে ধারণ করো, অচিরে হবে রোগমুক্ত।"

ব্রহ্মসিংহের উৎকট ব্যাধি অতঃপর সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় এবং স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্তরূপে সে গণ্য হয়।

ইহার পর স্বামীজী কিছুকাল ব্যাস আশ্রমের অবস্থান করিতে থাকেন। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়াছেন। সম্মুখে জনতার মস্ত ভিড়। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন।

এই ভদ্রলোকের নাম সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া ভুগিয়া একেবারে অস্থিচর্মসার হইয়াছেন। আজ গঙ্গাস্নানে আসিয়া রোগযন্ত্রণায় হঠাৎ তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। স্নানার্থীদের কয়েকজন এ সময়ে তাহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া ঘাটের অনেকেই হায়-হায় করিতেছে।

তৈলঙ্গস্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি জানি কেন, মৃত্যুপথযাত্রী এই রোগী মহাযোগীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সম্মুখে আসিয়া কৃপাভরে অঙ্গুলিদ্বারা তিনি সীতানাথের বক্ষস্পর্শ করিলেন। নিস্পন্দ দেহে দেখা দিল প্রাণের লক্ষণ, লুপ্ত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এ যেন তাঁহার পুনর্জীবন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন বিরাটকায় যোগীরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আর্ত ব্রাহ্মণ করজোড়ে তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা নিবেদন করিতেছেন. অঝর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। স্বামীজী তাঁহাকে অভয় দিলেন আর দিলেন ঔষধরূপে কিঞ্চিৎ গঙ্গামৃত্তিকা। নির্দেশ রহিল—গঙ্গাস্নানের পর প্রতিদিন তাঁহাকে উহা সেবন করিতে হইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার ঐ রোগ হইতে মুক্ত হন। তৈলঙ্গ মহারাজের করুণালীলার এক প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে দীর্ঘদিন তিনি কাশীতে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজী হনুমানঘাটে বাস করার সময়ও এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এ অঞ্চলে একটি সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা রোজই বিশ্বনাথের চরণে পূজা দিতে যাইতেন। পূজা-উপচারাদি নিয়া সেদিন তিনি মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন, হঠাৎ নিপতিত পইতেন

অপরিসর রাস্তাটি জুড়িয়া বিপরীত দিক হইতে হেলিয়া দুলিয়া আসিতেছেন ভীমকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী, তৈলঙ্গস্বামী।

ভয়ে সংকোচে মহিলাটি একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া এ সময়ে নানা কটূক্তি করিতেও তিনি ছাড়েন না—সন্ন্যাসী হইয়া যদি উলঙ্গই থাকিবে তবে বনে-জঙ্গলে গেলেই তো হয়। জনাকীর্ণ তীর্থস্থানে পড়িয়া থাকার দরকার কি ? শ্লেষপূর্ণ তিরস্কার ও ধিক্কার বার বার বর্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহাকে কথাগুলি বলা হইতেছে তিনি একেবারে নির্বিকার। বীতরাগভয়ক্রোধ মহাযোগী প্রশান্তচিত্তে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

যথারীতি বিশ্বনাথজীর পূজা-ধ্যান সারিয়া মহিলাটি গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেইদিন রাত্রেই তিনি কিন্তু এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন দেখিলেন।—বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত। সক্রোধে প্রভু বলিতেছেন, "দ্যাখ, যে সংকল্প নিয়ে তুই রোজ আমার পূজো দিচ্ছিস তা তো আমাদ্বারা সিদ্ধ হবে না। উলঙ্গ মহাযোগীকে তুই আজ পথের মাঝে অপমান করেছিস। কিন্তু জেনে রাখিস, শুধু তাঁর কৃপারই তোর মনস্কামনা সফল হতে পারে, অন্য কোনো উপায় নেই।"

মহিলার স্বামীর উদরে হইয়াছে মারাত্মক ক্ষত। জীবন রক্ষার কোনো আশাই তাঁহার নাই। স্বামীর রোগমুক্তির সংকল্প নিয়াই যে তিনি এতদিন যাবৎ বিশ্বনাথের পূজা দিতেছিলেন।

আজিকার এই স্বপ্নদর্শনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। না জানিয়া কি কুক্ষণে শক্তিধর সন্ন্যাসীকে অপমান করিয়াছেন। মহাপুরুষ কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন ? স্বামীকে কি আর বাঁচানো যাইবে ? আবার ভাবিতে লাগিলেন—নির্বিকার যোগীবর তাঁহার তিরস্কারে তো কর্ণপাত করেন নাই। ভাবতন্ময় অবস্থায় আপন মনেই তিনি পথ চলিতেছিলেন। নিশ্চয় তাঁহার কৃপা মিলিবে।

পরের দিনই মহিলাটি ব্যাকুল হইয়া স্বামীজী মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন। বার বার মাগিলেন ক্ষমা, আর তাঁহার মৃতকল্প স্বামীর জন্য প্রাণভিক্ষা।

কৃপা মিলিতে কিন্তু দেরি হয় নাই। যোগীবর প্রসন্ন বদনে এক মুষ্টি ভস্ম তাঁহাকে প্রদান করেন, আর ইহা দেহে লেপন করিয়াই তাঁহার স্বামীর ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হন।

সেবার একজন দেশীয় নৃপতি সপরিবারে কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন ছিল এক মহা পুণ্যযোগ। দশাশ্বমেধ ঘাটে রানী ও পরিজনবর্গসহ তিনি স্নান করিবেন, তাহারই তোড়জোড় তখন চলিতেছে।

রাজপ্রাসাদ এই ঘাটেরই সন্নিকটে। পুরমহিলারা রক্ষণশীল, তাই তাঁহাদের স্নানের জন্য একটি বস্ত্রবেষ্টনী প্রস্তুত করা হইয়াছে—প্রাসাদ হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি তাহা প্রসারিত।

রাজা ও রানী এই বেষ্টনীর মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছেন। এমন সময়

সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সিপাই সান্ত্রীদের কড়া পাহারা এড়াইয়া কোন ফাঁকে এক মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রানী ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি একপাশে সরিয়া গেলেন। হাঁক-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা অনুচরগণ ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া ফেলিল।

রাজা বাহাদুর তো ক্রোধে অধীর। এ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন সন্ন্যাসী? উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া কিছুতেই তিনি ইহাকে ছাড়িবেন না। পাহারাধীনে সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল।

দশাশ্বমেধ ঘাটের জনতার নিকট এ সন্ন্যাসীর পরিচয় অজানা নয়। তখনি সর্বত্র সংবাদ রটিয়া গেল, তৈলঙ্গস্বামীকে রাজপ্রাসাদে ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছে।

তখনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত হন, স্বামীজীর মাহাত্ম্য ও পরিচয় তাহাকে জানাইয়া দেন।

তৈলঙ্গস্বামীকে মুক্তি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু রাজার কয়েকটি অত্যুৎসাহী অনুচর প্রাসাদের বাহিরে তাঁহাকে অপমানিত করে।

সেইদিনই রাত্রে রাজাবাহাদুর এক আতঙ্ককর স্বপ্ন দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। —জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক পুরুষ সক্রোধে ত্রিশূল আন্দোলিত করিতেছেন, আর রোষকষায়িত নেত্রে রাজার দিকে তাকাইয়া কহিতেছেন, "তোর এত বড় স্পর্ধা। তুই তৈলঙ্গস্বামীজীর পরিচয় জেনেছিস, তারপরও তোর অনুচররা তাঁকে অপমান করার সাহস পেলো। তোর মতো দুরাচার এ শিবধামে থাকবার উপযুক্ত নয়। আজই তুই এখান থেকে দূর হ।"

রাজার ভয়ার্ত চিৎকারে প্রাসাদের লোক-লশকর সবাই জাগিয়া উঠিল। সারাটা রাত কাটিয়া গেল আতঙ্ক ও উত্তেজনায়। পরদিন ভোর হইতে না হইতেই রাজা নগ্ন সন্ন্যাসীর চরণতলে গিয়া পতিত হইলেন। তৈলঙ্গস্বামী পরম কৃপালু, সদানন্দময় মহাযোগী—অনুতপ্ত রাজাকে ক্ষমা করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

স্বামীজী মহারাজ যেমনি এক মহাশক্তিধর যোগী, তেমনি তিনি পরম কারুণিক— কাশীর জনসাধারণের মধ্যে কাহারও একথা অজানা নাই। তাই রাস্তা ঘাটে বাহির হইলেই আধি-ব্যাধিক্লিষ্ট নরনারী তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে। মহাপুরুষের প্রধান আশ্রয়স্থল তাহার গঙ্গামাঈ। প্রায়ই পুণ্যতোয়া গঙ্গার একটি ঘাটে আসিয়া তিনি উপবেশন করেন, ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হন। আবার ভিড় জমিলেই গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া হন অদৃশ্য।

কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিকায় দেহটি নিয়া অবলীলায় তাঁহাকে জলবিহার করিতে দেখা যায়। ঘাটের সবাই নির্নিমেষ নয়নে এই দেবোপম মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া থাকে।

গঙ্গামাঈর প্রতি বরাবরই স্বামীজীর আকর্ষণ বড় প্রবল ছিল। সুযোগ পাইলেই পরম আনন্দে এই পুণ্যতোয়া তটিনীর বক্ষে তিনি বিচরণ করিতেন। অনেকে বলিত, গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই এ যুগে আবার মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছেন। স্বামীজীর শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় গুরুর গঙ্গাবিহারের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

'...উভয়ে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলাম। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ জলের উপর চিত হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর কোনো অঙ্গ সঞ্চালন না করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদূর যাইয়া জলে মগ্ন হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না। প্রায় দু ঘণ্টা পরে আবার আমার নিকটেই ভাসিয়া উঠিলেন। পরে জল হইতে সিঁড়ির উপর উপবেশন করিলে, আমি তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া দিলাম এবং উভয়ে আশ্রমে গমন করিলাম।"

গঙ্গার স্রোতে ভাসমান থাকার কালে স্বামীজী বালকবৎ নানা আচরণ করিতেন। দিগম্বর আত্মভোলা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের এই নদী-বিহারের সহিত কাশীর সকলেই সে সময়ে পরিচিত ছিল।

সেবার উজ্জয়িনীর মহারাজা কাশীধামে আসিয়াছেন। একদিন ব্যাসকাশী ও রামনগর দর্শন করিয়া তিনি নৌকাযোগে এপারে ফিরিতেছেন, সহসা দেখা গেল, জাহ্নবীর স্রোতে এক বিশালবপু সাধু ভাসমান। নৌকারোহীদের মধ্যে কেহ কেহ তৈলঙ্গস্বামীকে চিনিতেন। রাজার নিকট তাঁহারা এই মহাযোগীর পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

অল্পকাল পরেই দেখা গেল, স্বামীজী মনের আনন্দে সন্তরণ করিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছেন। নিকটে আসিলে সসম্ভ্রমে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় তোলা হইল।

মহারাজ ও তাঁহার পার্শ্বদেরা স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। মৌনী যোগীবরকে ঘিরিয়া সকলে কৌতূহলী হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তিনি এক খামখেয়ালী শিশুর ন্যায় আচরণ করিয়া বসিলেন। উজ্জয়িনীরাজের কটিদেশে ঝুলানো রহিয়াছে এক তরবারি, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

তরবারিটি চাহিয়া নিয়া, খানিকক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া স্বামীজী হঠাৎ উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলে কি হয় স্বামীজী কিন্তু খল্‌খল্‌ করিয়া বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—এ যেন নিতান্তই এক মজার খেলা।

এই তরবারিটি মহারাজা তাঁহার মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার হইতে পাইয়াছেন। তাঁহার কাছে এটি মহামূল্যবান, তাই তাঁহার ক্ষোভ ও ক্রোধের সীমা রহিল না। উন্মত্ত সন্ন্যাসীকে কঠোর শাস্তি দিবেন বলিয়া বার বার শাসাইতে লাগিলেন।

নৌকায় কয়েকজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা তৈলঙ্গস্বামীজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

তাঁহারা আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি মোটেই অধীর হবেন না, দক্ষ ডুবুরির সাহায্যে ঐ তরবারির উদ্ধার করা যাবে। স্বামীজী মহাব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। স্বেচ্ছাময় হলেও, কারুর কোনো ক্ষতি তাঁর দ্বারা কখনও হতে দেখি নি। আপনি শান্ত হোন।"

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। ক্রুদ্ধ মহারাজ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "এ নাঙ্গা সাধুকে তোমরা ছেড়ে দিও না। এর হঠকারিতার শাস্তি দিতেই হবে।"

স্বামীজী নীরবে নির্বিকারভাবে সব শুনিয়া গেলেন, তারপর মুচকি হাসিয়া হাতটি নিমজ্জিত করিলেন গঙ্গাগর্ভে।

একি অদ্ভুত ব্যাপার! সকলে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, জল হইতে তাঁহার হাতে উঠিয়া আসিয়াছে দুইটি উজ্জ্বল তরবারি। গঙ্গায় যেটি ফেলিয়াছেন ঠিক উহারই অনুরূপ।

যোগীবর রাজাকে কহিলেন, "এবার তোমার নিজস্ব তরবারিটি চিনে নাও। অবশ্য যদি চেনবার ক্ষমতা থাকে।"

রাজা তো একেবারে হতবুদ্ধি। কোনটি নিবেন? দুইটিই যে হুবহু এক রকমের।

স্বামীজী তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "মূর্খ! তুমি নিজের জিনিস বলে যে বস্তু দাবী করছো, তা নিজেই চিনে নিতে পারলে না? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ভেতরটা পূর্ণ রয়েছে শুধু মোহ, দম্ভ আর অজ্ঞানে। জেনে রেখো, ইহকাল পরকাল যা মানুষের নিত্যসঙ্গী, তাই শুধু তার নিজস্ব বস্তু। মৃত্যুর পর এ তলোয়ার নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাবে না। যা সঙ্গে যাবার নয়, যা এপারে ফেলে যেতে হবে, তা তোমার জিনিস কি করে হল বলতে পারো? যে বস্তু নিজের নয়, তার জন্যে কি এত দম্ভ, এত ক্রোধ করা সাজে?"

এবার ভীত বিস্মিত মহারাজের সম্মুখে তাঁহার নিজস্ব তরবারিটি ফেলিয়া রাখিয়া অপরটি স্বামীজী নিক্ষেপ করিলেন গঙ্গাগর্ভে।

আপন মূঢ়তা মহারাজা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। এবার স্বামীজীর চরণতলে পড়িয়া কাতর কণ্ঠে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরেই ক্ষমা মিলিল। এবার স্বেচ্ছাবিহারী যোগী ধীরে ধীরে গা ভাসাইয়া দিলেন গঙ্গাস্রোতে।

অসিঘাটের সম্মুখ দিয়া তৈলঙ্গস্বামী সেদিন পথ চলিতেছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়িল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মৃত পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া এক সদ্য-বিধবা উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করিতেছে।

পূর্বরাত্রে স্বামীটি সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সর্পদষ্ট মানুষের দেহ দাহ করা হয় না, প্রচলিত প্রথামতো জলে ভাসানো হয়। মৃতের আত্মীয়স্বজনরা তাই উহা গঙ্গায় ফেলিতে আসিয়াছে।

কিন্তু তরুণীর অবস্থা দেখিয়া কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না।

স্বামীজী এ সময় সেখান দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। আপনভোলা তপস্বীর অন্তর দুয়ার এক মুহূর্তে হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং পতিবিয়োগবিধুরা তরুণীর করুণ ক্রন্দন তাঁহার মর্মতলে গিয়া বিঁধে। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বর মহাপুরুষের হৃদয় গলিয়া যায়, ঐশী কৃপার ধারা নামিয়া আসে মর্ত্যের ধূলিতে। পরম দয়াল স্বামীজী নদীতীর হইতে খানিকটা গঙ্গামৃত্তিকা নিয়া মৃতের দংশস্থানে লেপন করেন, তারপর গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন [illegible]

অল্পকাল পরেই মৃত ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করে, দেহে চেতনা আবার ফিরিয়া আসে। নিজের এ বন্ধনদশা দেখিয়া সে তো অবাক। ইতিমধ্যে ঘাটে এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছে। এতক্ষণ সবাই উৎসুক স্বামীজীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল, এবার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হৈচৈ ও আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল।

দুই-চারজন ইংরেজ রাজকার্য উপলক্ষে বারাণসীতে বাস করেন। মাঝে মাঝে কৌতূহলী দর্শক ও ভ্রমণকারী হিসাবেও সাহেব-মেমদের এখানে দেখা যায়। যোগীবর তৈলঙ্গ মহারাজ প্রায়ই থাকেন আপন খেয়ালখুশিতে, নগ্ন অবস্থায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান। ইউরোপীয়দের চোখে কিন্তু এ দৃশ্য বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। বিশেষত মেমসাহেবেরা এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করেন। কাশীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসব কথা গেল। সন্ন্যাসীর এই রুচিবিগর্হিত আচরণের প্রতিবিধান করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

স্বামীজী সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন। হঠাৎ একটি পুলিশ অফিসার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজীকে তখন সে আদেশ দিল তাহার সঙ্গে থানায় যাইতে। ধ্যানাবিষ্ট মহাপুরুষের কানে তাঁহার একটি কথাও পৌঁছিল না। অফিসারটি তো মহাখাপ্পা। বেয়াড়া লোকেদের কি করিয়া কথা বলাইতে হয়, সে উপায় তাহার ভালই জানা আছে। স্বামীজীকে সে প্রহার করা শুরু করিবেন, এমন সময়ে ভক্তেরা আসিয়া বাধা দিলেন।

অতঃপর অফিসারটি থানায় ছুটিয়া গিয়া আরও লোকজন নিয়া আসে। এবং মৌনী স্বামীজীকে একটি দোলায় উঠাইয়া নিয়া সরাসরি হাজির করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে।

সাহেব কড়া মেজাজের লোক। রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সাধু, তুমি অসভ্যের মতো উলঙ্গ থাকো কেন, এভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও-ইবা কেন?"

একটি শব্দও স্বামীজীর কানে প্রবেশ করিল না। কথায় বা ইঙ্গিতে কোনো উত্তরও তিনি দিলেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, আদেশ দিলেন, "এখনই একে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে নিয়ে যাও।"

মুহূর্তমধ্যে সেখানে ঘটিয়া গেল এক অলৌকিক কাণ্ড। প্রহরী-বেষ্টিত কামরা হইতে, ম্যাজিস্ট্রেট ও সমবেত লোকজনের দৃষ্টি এড়াইয়া সন্ন্যাসী কোথায় হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অথচ সাহেবের কাছেই তো তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন।

এজলাস কক্ষের ভিতরে বাহিরে অনেক খুঁজিয়াও কেহ বন্দীর সন্ধান পাইল না। পুলিশ কর্মচারীরা যখন একেবারে গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, স্বামীজী তাঁহার পূর্ব স্থানটিতেই নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে বালকসুলভ কৌতুকের হাসি।

ব্যাপার দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে তাঁহার ধারণা হইয়াছে, এই সন্ন্যাসী সাধারণ মনুষ্য নহেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এক উকিল সঙ্গে নিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহারা বুঝাইলেন, ইনি একজন বিখ্যাত সাধু—সমস্ত জাগতিক লোভ-মোহ দ্বন্দ্ব-সংকোচের অতীত। চন্দন এবং বিষ্ঠায় এই নির্বিকার পুরুষের সমজ্ঞান। তাই বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা ইনি কিছুমাত্র বোধ করেন না। একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও একথা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু যদি এ লোকটির সর্ব বস্তুতে সমজ্ঞানই হয়ে থাকে, তবে তাকে আমার খানা খেতে হবে আর এখানে দাঁড়িয়েই তা খাওয়া চাই।"

নিষিদ্ধ আমিষযুক্ত খানা এই সন্ন্যাসী কি করিয়া গ্রহণ করে তাহাই তিনি দেখিতে চান।

স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হইল, সাহেবের খানা খাইতে তাঁহার কোনো আপত্তি আছে কিনা? এতক্ষণে মৌনী মহাপুরুষের বাক্‌স্ফূর্তি হইল। প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সাহেব, তুমকো খানা ম্যায় খা সক্‌তা লেকিন ইস্‌কে পহলে মেরে খানা তুমকো খানে হোগা।" অর্থাৎ সাহেব, তোমার খানা আমি নিশ্চয়ই খাবো, কিন্তু তার আগে আমার খাদ্য তোমায় গ্রহণ করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট তখনি স্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন, এ আর এমন কি শক্ত কথা? হিন্দু সন্ন্যাসীরা তো প্রধানত ফলমূলই খাইয়া থাকে। তাহা খাইতে আর বাধা কোথায়? কিন্তু সন্ন্যাসীকে তো নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য করা যাইবে।

এজলাস-ভরা জনতার সম্মুখে স্বামীজী এবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তখনি আপন হস্তের উপর কিছুটা মলত্যাগ করিয়া সাহেবের দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিলেন। কহিলেন, "সাহেব এই হচ্ছে আমার আজকের খানা।"

চন্দন ও বিষ্ঠায় ব্রহ্মবিদ্ মহাযোগীর সমজ্ঞান। এই অদ্ভুত বস্তু সর্বসমক্ষে নির্বিকার-ভাবে তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন।

অসামান্য যোগবিভূতির প্রভাবে এই ঘৃণ্য বস্তু তখন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে এক সুস্বাদু খাদ্যে। শুধু তাহাই নয়, সারা আদালত কক্ষ ভরিয়া উঠিয়াছে ইহার সৌগন্ধে।

এ সন্ন্যাসীর যোগশক্তি যে অপরিমেয় এবং ইহার ক্রিয়াকলাপ যে মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নয়, সাহেব ইতিমধ্যে এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছেন। অবিলম্বে তিনি আদেশ প্রচার করিলেন, "তৈলঙ্গস্বামীজী উলঙ্গ অবস্থায় স্বেচ্ছামতো এ শহরে বিচরণ করতে পারবেন এতে কখনো কোনোরূপ বাধা দেওয়া হবে না।"

এই ম্যাজিস্ট্রেট কাশী হইতে বদলী হন। ইহার পর যে সাহেব কার্যভার নিয়া আসেন তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। স্বামীজী সেদিন তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাসমতো উলঙ্গ হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে ঘুরিতেছেন। নূতন ম্যাজিস্ট্রেট তো ইহা দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা।

সন্ন্যাসীকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনিয়া হাজতে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইল। ভক্তজন ও বিশিষ্ট নাগরিকদের কোনো যুক্তি বা প্রার্থনায় জেলাশাসক কর্ণপাত করিলেন না।

পরদিন ভোরবেলায় সাহেব হাজতগৃহে তাঁহার নূতন কয়েদীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে গিয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তো তিনি অবাক্। একি! সন্ন্যাসী যে পরম নিশ্চিন্ত মনে হাজতের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কি করিয়া যে সে কারাকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ক্রুদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট তখনি হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও রক্ষীদের ডাকাইলেন। তৈলঙ্গস্বামীকে যে কক্ষে রাখা হইয়াছিল তাহার দ্বার তখনও পূর্ববৎ রহিয়াছে তালাবন্ধ। অনুচরদের সঙ্গে নিয়া সাহেব লৌহদ্বার, তালা, চাবি ও কক্ষের দেয়ালগুলি বার বার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু কয়েদীর কারাকক্ষের বাহিরে আসার কোনো সূত্রই আবিষ্কার করা গেল না।

গম্ভীরস্বরে তৈলঙ্গস্বামীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "সাধু, সত্য কথা বল, কি ক'রে তুমি হাজতের বাইরে এলে ?"

স্বামীজীর উত্তর অতি সহজ ও সরল। কহিলেন, "প্রত্যূষে আমার বাইরে আসবার ইচ্ছে হয়েছিল। সে ইচ্ছা হবার পরমূহূর্তেই বাইরে এসে পড়লাম, কোনো বাধা কোথাও পেলাম না।"

কারাকক্ষটি জলে জলময় হইয়া রহিয়াছে। সেদিকে তৈলঙ্গস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে অবলীলায় উত্তর দিলেন, "রাতে আমার প্রস্রাবের বেগ হইয়াছিল, দেখলাম দ্বার তালাবন্ধ। ঘরের বাইরে যেতে তখন ইচ্ছে হয় নি, তাই শায়িত অবস্থায়ই খানিকটা মূত্রত্যাগ করেছি। তারপর রাত শেষ হয়ে এলে, অন্ধকার ঘরটা তেমন আমার ভাল লাগছিল না, তাই মুক্ত হাওয়ায় এ বারান্দায় একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। বন্দীকে আবার হাজতকক্ষে পুরিয়া স্বহস্তে ডবল তালা লাগাইয়া তিনি এজলাসে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরেই আবার একি অদ্ভুত কাণ্ড উলঙ্গ সন্ন্যাসীর। দেখিলেন কারাগৃহ তো দূরের কথা, এবার তাহার আদালত কক্ষেরই এক কোণে বন্দী দাঁড়াইয়া আছে। চোখে-মুখে দুষ্টু বালকের কৌতুক-চপল মৃদু হাসি। নিতান্ত অবিশ্বাস্য এ দৃশ্য। ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন।

যোগীবর তৈলঙ্গস্বামী এবার ধীর পদক্ষেপে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "সাহেব, তুমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত শুধু জড় ও জড়ের শক্তিই বোঝ। এই জগতের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে এক মহাচৈতন্যলোক,—তার খবর তোমার মোটেই জানা নেই। সেই চৈতন্যলোকের সঙ্গে যার যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, কোনো বন্ধন বা কোনো বাধাই আর তার স্বেচ্ছাবিহারকে আটকাতে পারে না। ভারতের যোগীপুরুষদের শক্তির কাছে পৃথিবীর কোনো কার্যই কখনো অসাধ্য বলে গণ্য হয় না। বেটা, তাহলে বল দেখি, আমার মতো সাধু-সন্ন্যাসীকে বিব্রত ক'রে লাভ কি ? তাছাড়া, সে শক্তিই বা তোমার আছে কই ?

এবার সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তৈলঙ্গস্বামী এখন হইতে স্বেচ্ছামতো কাশী শহরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে কেহ যেন এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উপর কোনো উপদ্রব না করে—এ মর্মেও এক বিশেষ আদেশ তিনি এই সময়ে জারী করিলেন।

শেষের দিকে তৈলঙ্গ মহারাজ পঞ্চগঙ্গার ঘাটে বসিয়াই দিন অতিবাহিত করিতেন। নিকটেই ছিল মঙ্গলভট্ট নামক মারাঠী ভক্ত ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র আবাস। প্রায় সাত বৎসর সাধ্য-সাধনার পরে ভট্টজী এই গৃহে মহাযোগীকে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বামীজীর এবার একটা বাসস্থান ও ঠিকানা হইল, সত্য—কিন্তু স্বেচ্ছাবিহারী শক্তিধর মহাপুরুষকে এক স্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া পাইবার জো কোথায়? মনের আনন্দে কখনো দশাশ্বমেধ ঘাটে, কখনো বা মণিকর্ণিকার শ্মশানে তিনি বেড়াইয়া বেড়ান। কখনও দেখা যায়, তিনি জাহ্নবীর খরস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আনন্দে বিচরণ করিতেছেন।

ইতিপূর্বে প্রায়ই মৌনী থাকিলেও তৈলঙ্গ মহারাজ কথাবার্তা একেবারে কখনো বন্ধ করেন নাই। মঙ্গলভট্টের গৃহে আসিবার পর হইতে তাঁহার চারিদিকে জনসমাগম আরও বাড়িতে থাকে। ব্যাধি-ক্লিষ্ট আর্ত জনগণ এবং অধ্যাত্মনির্দেশ প্রার্থী, সাধকদের আনাগোনায় তিনি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাই আত্মরক্ষার জন্য এখন হইতে প্রায়ই তাঁহাকে মৌনী থাকিতে হয়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ সময়ে তিনি কথাবার্তা বলিতেন না।

গঙ্গাজলে বিহার ও ইতস্তত ভ্রমণের পর স্বামীজী মঙ্গলভট্টের আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। এ সময়ে দর্শনার্থী ও শিষ্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা চালাইতেন ইঙ্গিতের মাধ্যমে। এ কাজে একান্ত সেবক মঙ্গলভট্টজী ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক। কুটির প্রাঙ্গণে, মুক্ত উদার আকাশের তলে, উচ্চ একটি পাথরের বেদীতে স্বামীজী মহারাজ শয়ন করিয়া থাকিতেন, আর উহার নিচেকার দেয়ালে লিখিত থাকিত শাস্ত্রগ্রন্থের বহুতর শ্লোক ও উপদেশ। সত্যকার ভক্ত সাধক বা মুমুক্ষু কেহ আসিলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী শুধু অঙ্গুলি সংকেত করিতেন। আর মঙ্গলভট্টকে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসু আগন্তুকদের নানা কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে হইত।

স্বামীজী মহারাজের আবাসের এক প্রান্তে ছিল প্রস্তর নির্মিত বিশাল শিবলিঙ্গ, আর উহার এক পার্শ্বে নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালীর পাষাণ প্রতিমা শক্তিধর মহাসাধকের অধ্যাত্মজীবনের দুই মুখ্য প্রতীক। শিব শক্তির এই যুগ্ম আরাধনার পথে, যোগ ও তন্ত্রসাধনার সমাহারের মধ্য দিয়াই, মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীর বিরাট অধ্যাত্মসত্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। বিশ্বনাথ দর্শনের পরই ঠাকুর 'সচল শিব' তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিতে চলিলেন।

এই দর্শন সম্পর্কে উত্তরকালে ঠাকুর তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদদের বলিয়াছিলেন,

"দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোনো হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য? তিনি সেই বালির উপরেই শুয়ে আছেন।"

স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকা ঘাটেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। ভাগিনের হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু শ্মশানচারী 'সচল শিবের সামাজিক বুদ্ধি বোধহয় তখনো একেবারে লোপ পায় নাই। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ, আসন্ন এক অধ্যাত্ম-লীলার যিনি চিহ্নিত নায়ক। তৈলঙ্গ মহারাজ সেদিন পরম প্রসন্ন। স্মিতহাস্যে ঠাকুরের সম্মুখে একটি নস্যদানি তুলিয়া ধরিলেন।

প্রবীণ ব্রহ্মবিদ্ স্বীকৃতি দিলেন নবীন ব্রহ্মবিদ্‌কে।

শ্রীরামকৃষ্ণও প্রথম দর্শনের দিনই খুঁটিয়া খুঁটিয়া স্বামীজীর দেহের যোগীচিহ্ন সকল দেখিয়া নিলেন। তারপর ঘরে ফেরার পথে হৃদয়ের কাছে সোৎসাহে কহিলেন, "ওরে, বুঝলি, এঁতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণ সব বর্তমান। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।"

একাদিক্রমে কয়েকদিনই ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রদ্ধাভরে তৈলঙ্গস্বামীজীর সমীপে গমন করেন। দুই বিরাট মহাপুরুষের অন্তর্লোকে সেদিন যে দেওয়া-নেওয়ার পালা চলিয়াছিল, তাহার সন্ধান অবশ্য কাহারো জানা নাই, জানিবার কথাও নয়।

সহজ সমাধিতে সদা নিমজ্জিত, মৈনাক-সদৃশ এই মহাযোগীর সহিত ইঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কিছু তত্ত্বপ্রসঙ্গও আলোচনা করেন। এসম্পর্কে উত্তরকালে বলিয়াছেন, "তখন তিনি কথা কন না, মৌনী। ইশারায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ঈশ্বর এক, না অনেক? তাতে ইশারা ক'রেই বুঝিয়ে দিলেন—সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো—এক, নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ—অনেক।"

একদিন পরমহংসদেবের মনে অভিলাষ জাগে, স্বামীজীকে তিনি ক্ষীর ভোজন করাইবেন। মথুরবাবুকে বলিয়া তাঁহার জন্য আধ মণ ক্ষীর প্রস্তুত করানো হইল। সহস্তে যোগীবরকে ইহার সবটা খাওয়াইয়া ঠাকুর লাভ করিলেন পরম তৃপ্তি।

তৈলঙ্গস্বামীজী দীর্ঘকাল অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন। নিজের আহার সম্পর্কে বরাবরই তিনি ছিলেন একেবারে নির্বিকার। খাদ্যবস্তু সংগ্রহের কোনো চেষ্টা যেমন তাঁহার ছিল না, তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনও তেমনি তিনি বোধ করেন নাই। নিজহস্তে কখনো তাঁহাকে কোনা আহার্য গ্রহণ করিতে দেখা যাইত না। আবার কেহ এসব সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেই মহাযোগী অবলীলায় তাহা মুখবিবরে গ্রহণ করিতেন।

খাদ্যাখাদ্যে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, তাই একবার একদল দুষ্ট লোক তাঁহাকে জব্দ করিতে আসে। এক বালতি চুনগোলা জল সম্মুখে ধরিয়া স্বামীজীকে তাঁহারা উহা পান করাইতে শুরু করে। ইহাদের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে স্বামীজীর মোটেই দেরি হয় নাই। কিন্তু দ্বন্দ্বাতীতলোকে যাঁহার সদা বিচরণ, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার

কই? সমস্তটা-চুন-গোলাই তিনি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

পরম গম্ভীর যোগীর এই নির্বিকার ভাব দেখিয়া, কি জানি কেন দুষ্টদের মনে বড় অনুতাপ শুরু হয়, পদতলে পড়িয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকে। এবার তৈলঙ্গ মহারাজের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। তখনি অবলীলায় তিনি সকলের সম্মুখে মূত্রদ্বার পথে সমস্তটা চুনগোলা জল নিঃসারিত করিয়া দেন।

বহু ধনবান্ শেঠ ও রাজরাজড়া বারাণসীতে তীর্থ করিতে আসে। ইহাদের অনেকে শ্রদ্ধাভরে স্বামীজীকে স্বর্ণালংকারে সাজাইয়া দিয়া ধন্য হয়। এই ভক্তেরা চলিয়া গেলেই দুর্বৃত্ত চোরেরা ছুটিয়া আসে—স্বামীজীর অঙ্গ হইতে ঐসব অলংকার খুলিয়া নিয়া যায়। লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞান মহাযোগীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, চিত্তে নাই বিন্দুমাত্র আলোড়ন। পরম প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি নিয়া তিনি শুধু অপরাধীদের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

সে-বার যোগীবর তৈলঙ্গস্বামী ভিজিয়ানাগ্রাম মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মহারাজা পাত্রমিত্রসহ ছুটিয়া বাহির হইলেন। সযত্নে স্বামীজীকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। সকলে মিলিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে পট্টবস্ত্রে সাজাইয়া দিলেন। কোমরে, বাহুতে ও গলায় পরানো হইল সোনার অলংকার।

স্বামীজীর কিন্তু পরিচ্ছদ ও আভরণের দিকে কোনো লক্ষ্যই নাই। সবেমাত্র রাজবাড়ির বাহিরে কিছুটা দূর আসিয়াছেন, এমন সময় কয়েকটি দুর্বৃত্ত আগাইয়া আসে, তাঁহার শরীর হইতে এগুলি খুলিয়া নেয়। স্বামীজী কিন্তু চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছেন, তস্করদের কাজ শেষ করার সুযোগ দিতে চান। এমন সময় রাজপ্রহরীরা দূর হইতে ব্যাপারটি টের পায়, ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের ধরিয়া ফেলে।

চারদিকে হৈচৈ পড়িয়া গেল। মহারাজা দুষ্কৃতদের বাঁধিয়া আনিয়া স্বামীজীর পদতলে ফেলিলেন। কহিলেন, "বাবা, আপনি বলুন, এ দুষ্টদের কি সাজা দেবো?"

এতকিছু উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যে তৈলঙ্গ মহারাজ কিন্তু আপন মৌন মহিমা নিয়া নির্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গুলি সংকেতে নিজ দেহটি দেখাইয়া আকারে প্রকারে যাহা বলিতে চাহিলেন তাহার মর্ম—'ওরা অলংকারগুলো নিয়েছে তো কার কি ক্ষতি হয়েছে? আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনি রয়েছি, আমার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? নির্বোধগুলিকে এবারকার মতো ছেড়ে দাও।'

এক্ষেত্রে আর কি করা যায়? সকলে নিতান্ত অনিচ্ছায় দুর্বৃত্তদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

এক সময়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপরও বর্ষিত হয় যোগীবরের আশীর্বাদ। গোস্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনের রূপান্তর সাধনে এই আশীর্বাদ পরম সহায়ক হইয়া উঠে।

তৈলঙ্গ মহারাজের সহিত যখন বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজেই রহিয়াছেন। হৃদয়ে তাঁহার মুমুক্ষার তীব্র আকুতি তাই অস্থির হইয়া নানা স্থানে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সে-বার কাশীতে আসার পর যোগীবরের দর্শন মিলিল, অল্পদিনের মধ্যে ধন্য হইলেন তাঁহার স্নেহসান্নিধ্য ও কৃপালাভে।

গোস্বামীজী নিজে এ সাক্ষাতের এক মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। উলঙ্গ স্বামীজী গঙ্গার স্রোতে এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, আর তিনি তটপথে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

স্থির হইয়া একস্থানে বসিলেই স্বামীজী গোঁসাইজীর আহারের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। ভক্তেরা তাঁহার আদেশে মিষ্ট দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিত, আর তিনিও সস্নেহ ভঙ্গিতে নানা ইঙ্গিত করিয়া বিজয়কৃষ্ণকে এগুলি ভোজন করাইতেন।

উত্তরকালে বিজয়কৃষ্ণ সোল্লাসে যোগীবরের পুণ্যস্মৃতি আলোচনা করিতেন। এই স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়া তৈলঙ্গ মহারাজের এই সময়কার এক চিত্তাকর্ষক চিত্র ফুটিয়া উঠে।

"কোনো সময়ে হয়তো স্বামীজী গঙ্গায় ডুবিয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন ও মণি-কর্ণিকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন। আমি তখন গঙ্গার পাড় দিয়া দৌড়াইয়া যাইতাম।…

"একদিন এক কালীমন্দিরে গিয়া স্বামীজী প্রস্রাব করিয়া তাহা ছিটাইয়া কালীর অঙ্গে দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "একি ব্যাপার। বিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব দেন কেন? তিনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন, 'গঙ্গোদকং'।

"আমি বললাম, 'কালীর গায়ে ইহা ছিটাইয়া দিলেন কেন?' তিনি অবলীলাক্রমে উত্তরে বলিলেন, 'পূজা'।"

ঘটনাটি ঘটিবার সময় ঐ দেবালয় জনশূন্য ছিল। কিছুকাল পরে মন্দিরের লোকজন ফিরিয়া আসিলে গোস্বামী প্রভু তাঁহাদের নিকট তৈলঙ্গস্বামীজীর এই অদ্ভুত আচরণের কথা বলিলেন। মন্দিরের পূজারী ও অন্যান্য লোক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিলেন, "ইনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। এঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে নেই। এঁর প্রস্রাব যে গঙ্গোদক, তা ঠিকই।"

স্বামীজীর প্রতি কাশীর অধিবাসীদের এই প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তৈলঙ্গ মহারাজ গোঁসাইজীকে জানাইয়া দিলেন, এবার তিনি তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

গোঁসাইজী তো একথা শুনিয়া অবাক্।

ইতিমধ্যেই এক বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা তাঁহাকে অনেকটা দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছে। সহজ কণ্ঠে স্বামীজীকে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেবো কেন? আপনি দেবীবিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলেন—গঙ্গোদকং। আমি অমন অনাচারী লোকের দ্বারা দীক্ষিত হব না। তাছাড়া, আমি তো ব্রাহ্ম, আমাকে আপনি কি ক'রে দীক্ষা দেবেন?'

তৈলঙ্গ মহারাজ সহাস্যে কহিলেন, "বেটা, তোমায় দীক্ষা দেবার ব্যাপারে একটা গূঢ় কারণ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত দীক্ষা আমি দিচ্ছিনে। গুরু গ্রহণ না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না, তাই গুরুকরণ প্রয়োজন। কিন্তু তোমার আসল গুরু আমি নই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "এরপর তিনি আমায় মন্ত্র প্রদান ক'রে বললেন, 'অব যাও। মেরে পর ভগওয়ানকা যো হুকুম থা উহ ম্যায় তামিল কিয়া।' অর্থাৎ, আমার উপর ঈশ্বরের যা আদেশ ছিল তাই আমি পালন করলাম, এবার তুমি যথায় ইচ্ছা যেতে পারো।"

উত্তরকালে গোস্বামীজী সন্ন্যাস ও যোগসাধন গ্রহণ করার পর আর একবার কাশীধামে উপনীত হন। যোগীবরের সঙ্গে সে-সময় আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে সেই পুরাতন ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করেন, "ক্যা, তুমকো ইয়াদ হ্যায়?"—কি হে, আগেকার কথা কি তোমার স্মরণ আছে?

গোস্বামীপ্রভু করজোড়ে ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, মহারাজ।"

যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীও একবার তৈলঙ্গস্বামীর চরণোপান্তে উপনীত হন। লাহিড়ী মহাশয়কে দূর হইতে দর্শন করিয়াই স্বামীজী পরম স্নেহে তাঁহাকে জানান সংবর্ধনা।

কয়েকটি ভক্ত সাধক তখন সেখানে উপস্থিত। স্বামীজীর এমনতর ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহারা বড় একটা দেখেন নাই। তাই অনেকেই সবিস্ময়ে এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে স্বামীজী ভক্তদের বলিলেন, "যোগমার্গের যে উচ্চাবস্থায় পৌঁছে সাধকদের লেঙোটি পর্যন্ত ছাড়তে হয়, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত এ মহাপুরুষ অনেক আগেই সে অবস্থা লাভ করেছেন।"

তৈলঙ্গ স্বামীজীর সেদিনকার এই সস্নেহ আচরণ ও স্বীকৃতি কাশীর সাধকসমাজে অতি সহজে এই নবাগত প্রচ্ছন্ন যোগীকে পরিচিত করিয়া তোলে।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কাছে নানা স্থানে ও মঙ্গলভট্টের আবাসে স্বামীজী প্রায় আশী বৎসরকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কখনো কোনো মঠ, আশ্রম বা মণ্ডলী স্থাপনের ইচ্ছা এই শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তরে স্থান লাভ করে নাই।

সচ্চিদানন্দ সাগরে উদার বক্ষে স্বেচ্ছাবিহারী মীনের মতো ছিলেন এই মহাযোগী। ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধ্যাত্মলীলাটি উদ্‌যাপন করিয়াছেন তিনি একান্ত নিঃসঙ্গতায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া চিহ্নিত সাধকদের জীবনে বহাইয়া দিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃতপ্রবাহ।

লোকোত্তর মহাপুরুষের নরলীলা এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ একদিন গঙ্গাবিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজেই আসন্ন তিরোধানের সংবাদটি প্রকাশ করিলেন।

মঙ্গলভট্টের পৌত্র, গোবিন্দভট্ট আমাদিগকে তৈলঙ্গস্বামীজীর সেদিনকার কথোপকথনের এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন—

ভট্টজী এবং আরো কয়টি বিশিষ্ট ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত। হাতছানি দিয়া স্বামীজী তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "বেটা সব, এবার তোরা আমায় বিদায় দে। আমি স্থির করেছি, আজই সমাধিযোগে এ দেহ ত্যাগ করবো।"

এ সংবাদ যেমনি মর্মান্তিক তেমন অপ্রত্যাশিত। ভক্তদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। করুণ কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন, "সে কি বাবা। হঠাৎ আপনি এবার অলক্ষুনে কথা বলছেন? আপনি চলে গেলে আমরা বাঁচবো কি নিয়ে।"

"আরে, আমি কি তোদের একেবারে ছেড়ে যাচ্ছি? দেহের এই খোলস্‌টা বড় পুরানো, বড় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর না বদলালে চলে না। তাই এটিকে এবার ছেড়ে দেবো।"

মঙ্গলভট্ট আবদারের সুরে কহিলেন, "না বাবা, সে হয় না। আগে থেকে বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ এমনি একদিন চলে গেলেই হলো? তবে এটাও বুঝতে পারছি, সিদ্ধান্ত যখন আপনি স্থির ক'রেই ফেলেছেন তখন এটা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু আমাদের একটু সময় তো দেবেন। মনটাকে তো প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। তা ছাড়া আপনার একটা পাথরের মূর্তি গড়িয়ে রাখব বলে ভাবছি।"

"হ্যাঁরে ভট্ট, এই রক্তমাংসের দেহ, এই পাথরের মূর্তি, এসব নশ্বর জিনিসের কি কোনো মূল্য আছে? এতদিন আমার সঙ্গ ক'রে এসে আজ তোদের এসব কি কথা?"

"বাবা, আমরা বদ্ধজীব, আপনাকে বুঝতে পারলুম কই? কিন্তু বাবা, আপনি যাই বলুন, আমরা একান্তভাবে চাই—একটা পাথরের মূর্তি অন্তত আপনার এই সাধনক্ষেত্রে থাক। আপনার তিরোধানের পর রোজ আমরা বিগ্রহের শিরে ঢালতে পারবো গঙ্গাবারি, দিতে পারবো ভক্তির অর্ঘ্য—পুষ্পাঞ্জলি।"

করুণাময় মহাযোগীর আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্নমধুর হাসি। কহিলেন, "আচ্ছা বেশ। বেটা, তাহলে আমার যাবার দিন একমাস পিছিয়ে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি তোরা মূর্তি তৈরির যোগাড় কর্।"

চঞ্চল বালক যেমন স্বেচ্ছামতো তাহার খেলনাটি নিয়া খেলিয়া বেড়ায় আবার ছুঁড়িয়া ফেলে, তেমনি তৈলঙ্গ মহারাজও অবলীলায় দূরে ঠেলিয়া দিলেন তাঁহার মৃত্যুর নির্দিষ্ট লগ্নটিকে।

হাতে সময় বেশী নাই। ভক্তেরা তোড়জোড় শুরু করিয়া দিলেন। সেই দিনই স্থানীয় এক ভাস্করকে ডাকিয়া আনা হইল, মাসখানেকের মধ্যে গড়িয়া উঠিল স্বামীজীর এক বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি।[১]

মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন ভক্তদের প্রার্থনায় কিছু কিছু সাধন-উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী একটি সুবৃহৎ চন্দন কাঠের সিন্দুক প্রস্তুত করানো হইল।

১ কাশীধামের তৈলঙ্গস্বামী মঠের পরিচালক গোবিন্দভট্টজী আজো পরম শ্রদ্ধাভরে এই প্রস্তর বিগ্রহটি এবং তৈলঙ্গ স্বামীজীর ব্যবহৃত জলপাত্র, পাদুকা ইত্যাদি দর্শনার্থীদের প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খেয়ালী স্বামীজী একদিন গঙ্গাতীর হইতে স্বহস্তে এমন একটি বিরাট প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ অনায়াসে তুলিয়া আনেন তাহা বহন করা দশবারোজন বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এই শিবলিঙ্গটিও স্বামীজীর লীলার এক স্মারকচিহ্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পর তাঁহার মরদেহ এটিতে পুরিয়া সমাহিত করিতে হইবে গঙ্গাগর্ভে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পৌষ মাস। শুক্লা একাদশীর পুণ্যতিথিটি তৈলঙ্গ মহারাজ শেষ যাত্রার জন্য বাছিয়া নিলেন। এই তিথিতেই ব্রহ্মরন্ধ্র পথে উৎক্রমণ ঘটিল মহাযোগীর অমরাত্মার।

কাষ্ঠসম্পুটস্থিত মরদেহখানি গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তোলা হয়। ইতিমধ্যে তৈলঙ্গ স্বামীজীর তিরোধানের সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয়। সর্বজনবন্দিত মহাপুরুষের গঙ্গাসমাধির অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে গঙ্গাতট সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে।

অসি হইতে বরুণা অবধি স্বামীজীর পূত দেহবাহী কাষ্ঠাধারটিকে ভ্রমণ করানো হয়, তারপর দেওয়া হয় গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন।

শিবধাম বারাণসীতে শিবকল্প মহাযোগী প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অপরূপ লীলানাট্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। শত সহস্র লোকের নয়নসমক্ষে এ নাট্যের দৃশ্যপট একের পর এক হইয়াছে উন্মোচিত। সেদিনকার সায়ংসন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই লীলা সংবরণের পালাটিই সকলে সাশ্রুনয়নে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিল।

যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হিমালয়ের রানীক্ষেত অঞ্চলে এক সেনা-নিবাস নির্মাণের আয়োজন চলিতেছে। সামরিক পূর্তবিভাগের এক তরুণ বাঙালী কর্মচারী দানাপুর হইতে সেদিন এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। প্রাথমিক কাজকর্ম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। সামান্য যাহা কিছু হাতে থাকে তাঁবুতে বসিয়া প্রাতেই তিনি তাহা শেষ করিয়া ফেলেন। তারপর সারাদিন ব্যাপিয়া অখণ্ড অবসর। এ সময় প্রায়ই পিয়ন ও পাহাড়ী কুলিদের নিয়া নানা গল্পগুজবে তাঁহার সময় কাটিয়া যায়।

সম্মুখে নগাধিরাজ হিমালয়। কন্দরে কন্দরে ইহার কত যোগী, কত সিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যায় রত। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে কোনো কোনো ভাগ্যবানের জীবনে ঘটে তাঁহাদের আবির্ভাব, প্রকাশিত হয় দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ।

পূর্তবিভাগের এই কর্মচারীটি স্থানীয় লোকদের মুখে নানা অলৌকিক কাহিনী, নানা জনশ্রুতি শুনিয়াছেন। আরও জানিয়াছেন অদূরস্থ দ্রোণগিরি শিবকল্প তাপসদের এক বিচরণভূমি। এখানে তাঁহাদের নানা কৃপালীলা নাকি অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন তাঁহার অন্তরে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। পাহাড়টিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি? বিকালবেলায়ই এ উদ্দেশ্যে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রানীক্ষেত হইতে দ্রোণগিরি প্রায় পনের মাইল পথ। চারিদিকে দেবদারু ও চীরগাছের ঘন বন। অদূরে দুর্গম পাহাড়ের সারি পর পর উঁচু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে ঊর্ধ্বে নীলাকাশের মহাশূন্যে।

পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখেই চোখে পড়ে নন্দাদেবীর গিরি-চূড়ায় অস্তরাগের অপরূপ সমারোহ। দূরে দিক্‌চক্রবালে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের তরঙ্গমালায় ছড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণচ্ছটা। দেবাদিদেব ধূর্জটির তাম্রাভ জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে।

আত্মবিস্মৃত তরুণ এ মহিমময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

অকস্মাৎ নির্জন দ্রোণগিরি কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—"শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ লাহিড়ী!"

একি! কে এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? সরকারী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্যামাচরণ হঠাৎ দানাপুর হইতে পাঁচশত মাইল দূরে এই রানীক্ষেতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অঞ্চলের কোনো লোকই তো তাঁহার পরিচিত নয়। অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হইল, আবার কৌতূহলও জাগিল।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। দেখিলেন, অদূরে পর্বত গুহার দ্বারে তেজঃপুঞ্জকলেবর, জটাজুটসমন্বিত এক যোগী সন্ন্যাসী একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি যেন শ্যামাচরণের জন্যই অপেক্ষমাণ।

আয়ত নয়ন দুটিতে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। যোগীবর নিকটে আসিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "শ্যামাচরণ, অব্ তুম আগয়া। ব্যয়ঠ্ যাও, বিশ্রাম কর্ লো।

ম্যায়হী তুমহে পুকার রাহা থা।" অর্থাৎ—শ্যামাচরণ, তুমি তাহলে এসে গিয়েছ। এবার বিশ্রাম করো। আমিই তোমায় এতক্ষণ ডাকছিলাম।

শঙ্কা ও সন্দেহ শ্যামাচরণের মনে ভিড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি কোনোমতে একটি শুষ্ক প্রণাম জানাইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন।

যোগী সাদরে আহ্বান জানাইলে কি হইবে, শ্যামাচরণের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহজে যাইতে চায় না। মনে মনে কেবলি ভাবিতেছেন, তাই তো, এ সাধু আমার নাম কি ক'রে জানলো? হয়তো কোনো পিয়ন বা পাহারাদারের কাছে জেনে নিয়েছে।

পরম আশ্চর্যের কথা, মনে এই চিন্তা খেলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যোগী অবলীলায় শ্যামাচরণের পিতৃপুরুষের নাম, ধাম, পরিচয়, সব কিছু একনিশ্বাসে বলিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, ঘনিষ্ঠ লোকের মতো তাঁহার দিকে তাকাইয়া কেবলি তিনি মধুর হাসি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরে কহিলেন, "বেটা, মন তোমার বৃথা সন্দেহে আলোড়িত হচ্ছে। জেনে রেখো, আমি তোমার নিতান্ত আপন জন—তোমারই প্রতীক্ষায় এ দুর্গম গিরিশিখরে বসে আছি। একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, এ পাহাড়ে আগে তুমি আর কখনো এসেছিলে কিনা।"

সস্নেহে হাতটি ধরিয়া শ্যামাচরণকে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। স্বল্পালোকে দেখা গেল, এক কোণে পড়িয়া আছে একটা বাঘছাল, ধুনি, দণ্ড ও কমণ্ডলু।

রহস্যময় মহাপুরুষ শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতো, এগুলো চিনতে পারছো কিনা? এসব যে তোমারই পরিত্যক্ত জিনিস। এসব কথা কি একটুও তোমার স্মরণে আসছে না?"

বিস্ময়বিমূঢ় শ্যামাচরণ বার বার স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, কিন্তু কোনো কিছুই মনে করিতে পারিতেছেন না।

যোগীবর স্মিতহাস্যে আরো কাছে আসিলেন, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন শ্যামাচরণের মেরুদণ্ড। এ কি ইন্দ্রজাল। শ্যামাচরণের মনোলোকের যবনিকাটি মুহূর্তমধ্যে কোথায় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। তড়িৎসঞ্চালিত তন্ত্রীর মতো সারা দেহটি তাহার বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দেহে জাগিতেছে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ।

পূর্বজন্মের অধ্যাত্ম-জীবনের চিত্রপট শ্যামাচরণের নয়নসমক্ষে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। জন্মান্তরের ব্যবধান শক্তিধর মহাযোগীর পুণ্যকরস্পর্শে এক নিমেষে আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি চিনিলেন—এই দণ্ড, কমণ্ডলু, বাঘছাল ও পবিত্র ধুনি এসব তাহারই পূর্বজন্মের ব্যবহৃত বস্তু, সম্মুখে দণ্ডায়মান এ যোগী তাঁহার পূর্বজন্মের গুরু—আর ইনিই তাঁহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্যামাচরণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান রহিলেন। যোগী সহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব জিনিস তোমারই আগেকার ব্যবহার করা। তুমি পূর্বজন্মে আমার চেলা ছিলে। সাধনার উচ্চ মার্গে অবস্থান করার কালে তোমার দেহপাত হয়।

এ জন্মে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্যে আবার তোমায় জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। তোমার সেই সাধনসম্পদকে গচ্ছিত বস্তুরূপে রক্ষা ক'রে আমি এ যাবৎ অপেক্ষা করছি। তোমায় দীক্ষা দেবার জন্যই আজ আমার এখানে আগমন।"

যোগীবরের নিকট শ্যামাচরণ আরও যে সব তথ্য শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যোগী বলিলেন, "বাবা, তোমায় এখানে আসতে আদেশ ক'রে যে টেলিগ্রাম তোমার কার্যস্থল দানাপুরে পাঠানো হয়, তা ঘটেছে ওপরওয়ালা সাহেবের ভ্রান্তির ফলে। একস্থানের নাম করতে গিয়ে সে আর একস্থানের উল্লেখ করেছে। এ ভ্রান্তি আমিই ঘটিয়েছি জেনে রেখো, আবার সাতদিন পরেই তোমার কাছে আদেশ আসছে দানাপুরে ফিরে যাবার জন্য। ততদিনে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।"

সাধারণ সংসারী মানুষ শ্যামাচরণের জীবনে একি অলৌকিক কাণ্ড! অসামান্য যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষ তাঁহার গুরু? আর তাঁহারই প্রতীক্ষায় গুরু এমনি-ভাবে দিন গণিতেছেন।

অস্তরাগরঞ্জিত দ্রোণগিরির বক্ষে, রহস্যময় এই গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণের মনে হইল, জন্ম-জন্মান্তরে এই গুরু অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর জন, আত্মার পরমাত্মীয় জন, আর তাঁহার কেহই নাই। আত্মীয়, সুহৃদ ও বিশ্বসংসার সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব যেন অন্তর হইতে আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে, সকাতরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "বাবা, আর আমায় সংসারে ফিরে যেতে বলবেন না, আপনার চরণসেবা ক'রেই আমি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। হারানো অধ্যাত্ম-সম্পদের পুনরুদ্ধার করাই আজ থেকে হবে আমার জীবনের ব্রত।"

"না বাবা, সংসার তোমার এখনি ত্যাগ করতে হবে না। সংসারে থেকেই আপন সাধন-বলে তুমি লাভ করবে যোগী জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এই ঐশ বিধানই তোমার জন্য রয়েছে। যোগসাধন প্রচারের তুমি হবে এক চিহ্নিত আচার্য। পরম গোপ্য এই সাধনকে উপযুক্ত পাত্র বুঝে বিতরণ করবার দায়িত্ব তোমায় গ্রহণ করতে হবে।"

বিদায় বেলায় যোগী বলিয়া দিলেন, "শ্যামাচরণ, স্মরণ রেখো, অফিস-ই তোমার জন্য আজ রানীক্ষেতে এসেছে—তুমি অফিসের জন্য এখানে আসোনি। পরমাত্মার ইচ্ছে অনুসারে এসব ঘটেছে। যে ক'দিন তুমি এই অঞ্চলে থাকবে, রোজই আমার সাথে সাক্ষাৎ করো।"

শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জীবনে সেদিন এক পটপরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এ পরিবর্তন যেমনই নাটকীয় তেমনই বিস্ময়কর। নদীয়ার এক অখ্যাত গ্রামে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জীবন-পথের বাঁকে বাঁকে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই এতদিন তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। তারপর কার্যব্যপদেশে রানীক্ষেতে আসিবার পর সমস্ত কিছু আজ ওলট-পালট হইয়া গেল—শিবকল্প মহাযোগীর আশ্রয় তিনি লাভ করিলেন। এ অপ্রত্যাশিত কৃপা তাঁহার জীবনে সূচনা করিল এক বিরল সৌভাগ্যের।

শ্যামাচরণের পিতা গৌরমোহন (সরকার) লাহিড়ীর বাস ছিল কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণী নামক গ্রামে। এখানকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গৌরমোহন ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ এবং যোগসাধনপরায়ণ। স্বগ্রামে মহাসমারোহে একটি শিবমন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার এ মন্দির নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরবর্তীকালে শিবের প্রত্যাদেশ অনুসারে বিগ্রহটিকে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হয়, নূতন একটি মন্দির নির্মিত হয়। আজিও সে স্থানটি ঘূর্ণীর শিবতলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই শিবপূজায় গৌরমোহনের পত্নী মুক্তকেশী দেবীর খুব উৎসাহ ছিল।

ধর্মনিষ্ঠ দম্পতির গৃহ আলো করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে শ্যামাচরণ আবির্ভূত হন। শৈশবে শিশুর মাতৃবিয়োগ ঘটিবার পর হইতে পিতা গৌরমোহন তাঁহাকে নিয়া স্থায়িভাবে কাশীতে বসবাস করিতে থাকেন।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবংশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা শ্যামাচরণের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই বহমান ছিল। তরুণ বয়সে মহাতীর্থ কাশীতে বসবাসের ফলে এ ধারা আরও বেগবতী হইয়া উঠে। অগণিত মন্দির এবং ভজনস্থল এ শহরের চারিদিকে সাধু-মহাত্মাদের আনাগোনাও যথেষ্ট। এই পরিবেশে মানুষ হওয়ায় শ্যামাচরণের মনে জাগিতে থাকে অধ্যাত্ম-জীবনের এক বিশেষ মূল্যবোধ।

পিতা গৌরমোহন শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মসাধনায় চির-বিশ্বাসী, নিষ্ঠাভরে ঋগ্বেদ পাঠ করা ছিল তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস। কাশীতে তখন নাগভট্ট নামে এক বেদবিদ্ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের খুব প্রতিষ্ঠা, ইঁহারই কাছে বালক শ্যামাচরণকে কিছুদিনের জন্য বেদশিক্ষার্থীরূপে রাখা হইল।

গৌরমোহন প্রাচীন ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির ভক্ত হইলেও পুত্রকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আধুনিক ভাবধারাকে কখনো অগ্রাহ্য করেন নাই। পুত্রের জন্য তিনি উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তাছাড়া রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং সরকারী সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া শ্যামাচরণ বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজী আয়ত্ত করেন। স্কুল ও কলেজের সহপাঠীরা এই গৌরকান্তি, সুদর্শন মেধাবী তরুণের প্রতি অতি সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

আঠারো বৎসর বয়সে শ্যামাচরণকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, নববধূ কাশীমণির বয়স তখন ছিল মাত্র আট বৎসর। শালিখার এক পণ্ডিত-বংশে কাশীমণির জন্ম। ছোটবেলা হইতেই তিনি ছিলেন নানা সদ্‌গুণের আকর। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণীরূপেই তাঁহাকে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। যোগাচার্যরূপে শ্যাম্যচরণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহা সার্থক করিয়া তুলিতে এই পত্নীর সহায়তা কম কার্যকরী হয় নাই।

তেইশ বৎসর বয়সে সরকারী পূর্ত দপ্তরের এক সাধারণ কর্মচারী হিসাবে শ্যামাচরণ কর্ম আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতার লোকান্তর ঘটে এবং সংসারের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়াই তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা হয়।

উত্তরকালে অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী হইয়াও শ্যামাচরণ লাহিড়ী পরম

নির্লিপ্তিব সহিত সংসাবাশ্রমেব অনেক কিছু দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে পালন কবিযা গিযাছেন। বহিবঙ্গ জীবনেব হাসিকান্না ও কর্মচাঞ্চল্যেব মধ্যে যোগীজীবনেব প্রশান্তিকে তিনি ধাবণ কবিয়া গিযাছেন অবলীলায।

উত্তব ভাবতেব নানা স্থানে কাজ কবিতে কবিতে শ্যামাচবণ সেবাব দানাপুবে বদলী হন। তখন তাঁহাব বযস তেত্রিশ বৎসবেব বেশি নয। এই সময়েই হঠাৎ বানীক্ষেতে কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে আসিতে হয, আব ভগবৎ-কৃপাব অমৃতভাণ্ডখানি হাতে নিয়া জন্মজন্মান্তবেব গুরু আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হন তাঁহাব সম্মুখে।

লাহিড়ী মহাশয তাঁহাব গুরুজীকে 'বাবাজী' বলিযা অভিহিত কবিতেন। অপাবিমেয় সাধনশক্তি ও যোগবিভূতিব অধিকাবীরূপে এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেব খ্যাতি ছিল। কোনো কোনো সাধক ইহাকে 'ত্র্যম্বক বাবা', কেহ বা 'শিব বাবা' বলিযাও সম্বোধন কবিতেন। এই মহাযোগীকে কেন্দ্র কবিযা হিমাচল অঞ্চলে ও সমগ্র উত্তব ভাবতে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বযস শত বৎসব অতিক্রান্ত হইলেও যোগবলে এই মহাত্মা স্থিব-যৌবন মূর্তি বক্ষা কবিতে সমর্থ ছিলেন, যোগেশ্বব মহাপুরুষরূপে উচ্চকোটিব সাধকসমাজে ছিল তাঁহাব অসামান্য প্রতিষ্ঠা।

লাহিড়ী মহাশযেব গুরুকৃপা লাভেব মূলে প্রধানত ছিল তাঁহাব পূর্বজন্মেব সঞ্চিত সাধনা ও জন্মান্তবেব অর্জিত মহাসম্পদ। শিষ্যেব পূর্বস্মৃতি উদ্বোধনেব জন্য গুরুজী তাই বাব বাবই বলিতে লাগিলেন, "শ্যামাচবণ, ইযে তো তুমহাবি আপনে চীজ হ্যায়" —অর্থাৎ, এ যে তোমাবই নিজস্ব সম্পদ।

প্রথম সাক্ষাতেব পবদিনই লাহিড়ী মহাশয যোগীবেব পাহাড়েব কাছে তাঁবু ফেলিলেন। অফিসেব সামান্য যাহা কিছু কাজ থাকিত এখান হইতে তাহা সাবিতেন। তাবপব বোজ উপস্থিত হইতেন বাবাজীব গুহায। সাবাদিন তাঁহাব পবিত্র সঙ্গলাভেব পব দিনান্তে তাঁহাবই দেওযা যৎসামান্য আহার্য সেখানে বসিয়া গ্রহণ কবিতেন।

গুরু একদিন কহিলেন, "শ্যামাচবণ, দীক্ষাবীজ বোপণ না কবলে পবম প্রাপ্তি ঘটে না। এবাব সেই দীক্ষা আমি তোমায দেবো। লগ্ন এসে গিযেছে।"

দিন ক্ষণ স্থিব কবা হইল। তাব আগেব দিন লাহিড়ী মহাশয দেখিলেন, গুহাব এক-প্রান্তে একটি মাটিব পাত্র ঢাকা অবস্থায বহিযাছে। যোগীবব কহিলেন, "বাবা, এব ভেতব যা আছে সবটা গলাধঃকবণ ক'বে ফেল।"

পাত্রটি খুলিযা দেখা গেল, কোনো তৈলজাতীয পদার্থে উহা পূর্ণ। লাহিড়ী মহাশয ভাবিলেন, হযত ভুলবশত এই পাত্রে কেহ তেল বাখিযা থাকিবে। তাঁহাকে ইতস্তত কবিতে দেখিযা বাবাজী হুকুম দিলেন, "আবে ক্যা দেখতে হো, সব পি ডালো।"

আব বিলম্ব না কবিযা লাহিড়ী মহাশয সবটাই একেবাবে উদরস্থ কবিযা ফেলিলেন। পাহাড়েব নিকটেই গগাস্ নদী। যোগীবব আদেশ দিলেন, "বাবা, এবাবে তোমায় নদী সৈকতে গিযে পড়ে থাকতে হবে।"

আদেশ পালিত হইল। নদী তীবে পৌঁছিবাব সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল অবিবাম ভেদ ও বমন। লাহিড়ী মহাশয অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন।

নদীতট কঙ্কর ও বালুকায় আচ্ছন্ন। এখানে শুইয়া থাকিয়াও নিস্তার নাই, হঠাৎ খরস্রোতা গিরি-নদীতে নামিয়া আসিল তীব্র প্লাবন। অসুস্থ শরীরে স্রোতের টানে তিনি অনেক দূর ভাসিয়া গেলেন এবং স্রোতের সহিত অবিরত যুঝিয়া হইলেন মৃতকল্প।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানি অতিকষ্টে টানিয়া নিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি বাবাজীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। বাবাজী তাঁহাকে দেখিয়াই পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "শ্যামাচরণ, ভালই হয়েছে। যত কিছু ময়লা ছিল সব এবার দূর হয়ে গেল।"

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়কে প্রচুর পরিমাণে গরম গরম পুরি হালুয়া ভোজন করানো হইল। ভোজন শেষে বাবাজী জানাইয়া দিলেন, "শ্যামাচরণ, আজ সন্ধ্যাকালে পবিত্র ও শুভলগ্ন রয়েছে। আজই তোমায় আমি দীক্ষা দেবো।"

যথাসময়ে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। একদিকে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য, অপরদিকে কৃপাবর্ষণে উন্মুখ মহাশক্তিধর সদ্‌গুরু—এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত লাহিড়ী মহাশয় যোগসাধনার পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিলেন। নবীন সাধক গুরুশক্তিতে উদ্দীপিত—তাই গুরু কৃপায় একের পর এক লাভ করিলেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্যের দুর্লভ অনুভূতি।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন গত হইয়াছে। বাবাজী মহারাজ সেদিন শিষ্যকে স্নেহালিঙ্গন দিয়া কহিলেন, বেটা, তোমায় আরো বেশ কিছুকাল সংসারাশ্রমে বাস করতে হবে। মানব-কল্যাণের জন্য যোগসাধনার প্রচার আবশ্যক, আর এ কাজে বিশিষ্ট আচার্যরূপে তোমার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বেটা, এবার যে তোমার রানীক্ষেতে থাকা আর চলবে না, পূর্বেকার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে।"

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের দুই চোখে নামিয়া আসিল অশ্রুধারা। গুরু আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "শ্যামাচরণ, তুমি দুঃখ ক'রো না। প্রয়োজনমতো যখনি তুমি আমায় স্মরণ করবে, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাবে—একথা নিশ্চয় জেনো।"

নবীন যোগী সেদিন সদ্‌গুরুর চরণে নিবেদন করিলেন এক বিশেষ প্রার্থনা। আপন মোক্ষের স্বপ্নের সাথে জাগিল জগতের হিতের কথা। যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, আমার একান্ত অনুরোধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট স্বল্পায়ু মানবের কাছে আপনার এই দুর্লভ যোগসাধনাকে সহজলভ্য ক'রে দিন। দিব্য করুণার ধারাকে ছড়িয়ে দিন আমাদের জীবনমরুতে।"

উত্তরে বাবাজী কহিলেন, "বেটা, ঐশী কৃপা ধারণ করার জন্য চাই ক্ষেত্রের প্রস্তুতি। বেশ তো, সমাজের ভেতরে থেকে এ প্রস্তুতিতে তুমি সাহায্য করো।"

উত্তরকালে যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীর মাধ্যমে এই কৃপার ধারা বহু ভাগ্যবানের জীবনে বিস্তারিত হইয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, 'শ্যামাচরণ, সময় হয়েছে, প্রস্তুত হও। এবার তোমার বদলীর নির্দেশ আসছে। তোমায় রানীক্ষেত ত্যাগ করতে হবে।"

বড় মর্মান্তিক এই কথা। গুরুদেবের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সারা অস্তিত্ব আজ তাঁহারই চরণে হইয়াছে কেন্দ্রীভূত। কোন্ প্রাণে আজ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন? তাছাড়া, সাধন-সম্পদই বা এমন কি ইতিমধ্যে লাভ করিয়াছেন? তেমন কিছু তো তিনি পান নাই। সম্মুখে রহিয়াছে মাত্র গুটিকয়েক দিন। ইহারই মধ্যে নতুন জীবনের পাথেয়টুকু সঞ্চয় করিয়া নেওয়া চাই।

শক্তিধর গুরু যোগসিদ্ধির অনেক কিছু ঐশ্বর্য এ সময়ে অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, আর আত্মনিবেদিত শ্যামাচরণ তাহা গ্রহণ করেন অপূর্ব নিষ্ঠায়।

রোজকার সাধনা ও যোগক্রিয়া শেষ হইলে লাহিড়ী মহাশয় গুরুর সান্নিধ্যে আসিয়া বসেন, যোগ-রাজ্যের নানা সাধনরহস্য শ্রবণ করেন। যোগীজীবনের বিচিত্র কাহিনী এক একদিন তাঁহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। সিদ্ধযোগী মহাত্মাদের লীলা-ভূমি এই পবিত্র হিমালয়। প্রতি শৃঙ্গে প্রতি কন্দরে ইহার অধ্যাত্মলোকের কত নিগূঢ় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার পরিমাপ কে করিবে!

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে শ্যামাচরণ এ সময়ে স্থানীয় এক মহাযোগীর কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন—

দ্রোণগিরির এই জনমানবহীন গুহা হইতে মাইল পাঁচেক দূরে দেখা যায় এক সুপ্রাচীন জীর্ণ দেবালয়। স্থানটি এক সিদ্ধ মহাপুরুষের বিচরণক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতে, এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের বয়সের নাকি কোনো হিসাব নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে—এই মহাত্মা দ্রোণগিরির অভিভাবক, পৌরাণিক আমলের অমর মানুষ 'অশ্বত্থামা' নামেও অনেকে এ রহস্যময় মহাপুরুষকে অভিহিত করে।

কাঠের খড়ম পায়ে, গভীর রাতে খট্‌খট্ শব্দ ইনি একবার করিয়া পুরোহিত ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করেন, দিব্য দেহ-জ্যোতিতে চতুর্দিক তখন আলোকিত হইয়া উঠে।

যোগসাধন-পথের নূতন পথিক, লাহিড়ী মহাশয় কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে গুরুজী এক নিশীথে দূর হইতে তাঁহাকে এই মহাত্মার দেহজ্যোতি দর্শন করান।

বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "ওখানকার অনেকে মৃতকল্প রোগীদের এই মহাত্মার কৃপার উপর নির্ভর করে পাহাড়ে ফেলে রেখে যায়। তাঁর কৃপা-দৃষ্টিপাতে তারা বেঁচে ওঠে।"

লাহিড়ী মহাশয় নিজেও একদিন ইহার কিছু পরিচয় পান—।

একদিন দুই তিনজন সাধুর সহিত তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথ চলিতে চলিতে একজন সঙ্গী হঠাৎ অরণ্যের এক বিষাক্ত ফল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রবল ভেদবমি দেখা দেয়। এদিকে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে থাকে। এই আকস্মিক বিপদে সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সম্মুখেই মহাত্মা 'অশ্বত্থামা'র ভগ্ন দেউলের চূড়া। অপর কোনো উপায় না দেখিয়া তাঁহারা দ্রোণগিরির ঐ রহস্যময় মহাপুরুষের আশ্রয়েই সাধুটিকে রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। সে তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। সকলে ধরাধরি করিয়া আনিয়া জরাজীর্ণ দেউলের একপাশে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

সাধুটি কিন্তু পরদিনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। তাহার মুখে পর্বতশীর্ষচারী মহাত্মার কৃপা কাহিনী শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মৃতকল্প সাধুটি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময় রহস্যময় পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হন, রোষকষায়িত নেত্রে গর্জন করিয়া বলেন, "এখানে কে রে তুই?"

সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রচণ্ড পদাঘাত। এ আঘাতের ফলে রোগী গড়াইতে গড়াইতে সন্নিহিত নিম্নভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, কিছুকাল পরেই তাহার দেহে নব বলের সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর পায়ে হাঁটিয়া সে নিচে চলিয়া আসে।

দ্রোণগিরি অঞ্চলের এইসব সিদ্ধ-যোগীদের লীলাকাহিনী নবীন সাধক লাহিড়ী মহাশয়ের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানা কাহিনী নানা অলৌকিক তথ্য শুনিয়া তিনি আরও উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন।

এ সময়ে চমকপ্রদ যোগবিভূতি দেখাইয়া দু-একজন গুরুভ্রাতা তাঁহাকে কম বিস্মিত করেন নাই।

একদিন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার এক গুরুভ্রাতা ও কয়েকটি সাধুসহ খরস্রোতা পার্বত্য নদী গগাস্-এর অপর পারে শৌচাদির জন্য গিয়াছেন। ফিরিতে সেদিন তাঁহাদের বেশ দেরি হইয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রবলবেগে নদীতে হড়কা বান আসিয়া পড়ে, দুই কূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়। তরুণ সাধকেরা তো প্রমাদ গণিলেন, তাই তো এ জলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করা যে অসম্ভব।

গুরুভ্রাতাদের একজন ছিলেন অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী। মস্তক হইতে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটি খুলিয়া নিয়া তিনি এ সময়ে এক অলৌকিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। পাগড়ীটি জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গীদের কহিলেন, "তোমরা এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে, এর ওপর হাত রেখে একে একে অপর পারে চলে যাও।"

সঙ্গীরা অগোণে জলে নামিয়া পড়িলেন। শক্তি সঞ্চারিত এই ভাসমান বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াই সেদিন সকলে নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

উত্তরকালে লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে সেদিনকার এ ঘটনাটির চমকপ্রদ বর্ণনা মাঝে মাঝে শোনা যাইত।

ঐ অলৌকিক বস্ত্রসেতুর রহস্য সম্বন্ধে তিনি গুরুদেবকে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বেটা, এতে বিস্ময়ের কিছু তো নেই। অষ্টসিদ্ধি পেয়েছে বলেই তোমার ঐ গুরুভাই এ যোগসামর্থ্য অর্জন করেছে। আমার নির্দেশিত সাধন-পন্থা অনুসরণ করলে তুমিও অতি সহজে এ ধরনের যোগবিভূতি লাভ করতে পারবে। লাহিড়ী মহাশয় পরে বুঝিয়াছিলেন, গুরুভ্রাতার চমকপ্রদ বিভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়া গুরুদেব সেদিন তাঁহারই অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন।

গুরুভ্রাতাদের কাছে বসিয়া নবীন যোগী এই সময়ে বাবাজী মহারাজের যোগ-

বিভূতির নানা কাহিনী শুনিতেন। দ্রোণগিরিতে থাকিতে তিনি নিজেও ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।

রানীক্ষেতের সন্নিহিত অঞ্চলের এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন বাবাজী মহারাজের ভক্ত। একদিন তিনি বাবাজী ও অন্যান্য বহু সংখ্যক সাধুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানান। এই শেঠজী বাবাজী মহারাজের স্নেহভাজন। কিন্তু তাঁহার ধনাভিমান বড় প্রবল ছিল। বাবাজী মহারাজ মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, সেদিন তাঁহার গর্ব চূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি জানাইয়া দিলেন, নূতন শিষ্য লাহিড়ী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন। কথা রহিল অন্যান্য অতিথিদের পূর্বেই তিনি সশিষ্য উপস্থিত হইবেন, এবং পেঁছানো মাত্রই তাঁহাদের ভোজনে বসাইতে হইবে। বিলম্ব করা চলিবে না।

যথাসময়ে গুরু ও শিষ্য নিমন্ত্রণকারী শেঠের গৃহে পেঁছিলেন। ভোজনে বসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের তো চক্ষুস্থির। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন, গুরুদেব খুবই মিতাহারী। কিন্তু আজ যেন তাঁহার জাগিয়াছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। চাঙাড়ি ভর্তি পুরি মালপোয়া, হালুয়া আসিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিতেছেন। সোৎসাহে বলিতেছেন, "আওর কুছ ?"

ক্রমে শেঠজীর মুখ শুকাইয়া উঠিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত সাধুসন্ত সবাই ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সেবা কি দিয়া চলিবে ? ভোজ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণেই প্রস্তুত করা হইয়াছে কিন্তু তাহার সবটাই যে প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

শেঠজী কাতরভাবে এবার বাবাজী মহারাজের শরণ নিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ও বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী, আপনি কি লোকটার সর্বনাশ করতে চান ? এখন দয়া ক'রে উঠে পড়ুন তো।"

ভোজন শেষ হইলে, পাত্র ত্যাগ করিতে গিয়া বাবাজী বলিলেন, "ক্ষমতা তো এতটুকু, অথচ লোকটার দেমাক কম নয়। কি পরিমাণ খাবার সে যোগাড় করতে পারে, তা পরখ্ ক'রে দেখবার আজ আমার ইচ্ছে হয়েছিল।"

আশ্রিত শিষ্যদের শিক্ষা ও শাসনের ব্যাপারে বাবাজী মহারাজের সতর্কতার সীমা ছিল না। অনেক সময় অত্যন্ত কঠোরভাবে তাহাদের সাধন-জীবনকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য শিষ্যদের ধুনির জ্বলন্ত কাঠ দিয়া প্রহার করিতেও তাঁহার দ্বিধা ছিল না। দ্রোণগিরিতে থাকাকালে লাহিড়ী মহাশয় স্বচক্ষে গুরুজীর এই ধরনের রুদ্ররোষ দু-একবার দেখিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সামরিক পূর্তবিভাগ হইতে সংবাদ আসিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ভ্রম সংশোধন করিয়া তার পাঠাইয়াছেন, শ্যামাচরণ লাহিড়ীর আর রানীক্ষেতে অবস্থানের প্রয়োজন নাই—অগোণে তাঁহাকে দানাপুর অফিসে ফিরিতে হইবে।

গুরুর পদবন্দনা করিয়া শিষ্য এবার সাশ্রুনয়নে দ্রোণগিরি ত্যাগ করিলেন।

ফিরিবার পথে লাহিড়ী মহাশয় মোরাদাবাদ শহরে দুই-তিনদিন অতিবাহিত করেন।

এই সময়ে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। তিনি তাঁহার কয়েকটি বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা যাই বল, এযুগে কিন্তু আগের দিনের মতো অলৌকিক যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধুর দর্শন মেলে না।"

শ্যামাচরণ দৃঢ়স্বরে তখনি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "এ আপনি কি বলছেন! এমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ আজকের দিনেও মোটেই অসম্ভব নয়। ইচ্ছে করলে, ধ্যানবলে আকর্ষণ ক'রে আমিই এখানে এমন একজনকে এনে দেখাতে পারি।"

বন্ধুদের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা রহিল না। তাঁহারা লাহিড়ীমহাশয়কে চাপিয়া ধরিলেন। অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন, তাছাড়া নিজের যোগবল ও গুরুদেবের করুণার কথা, তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিজেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাপুরুষের মর্যাদারক্ষার প্রশ্নটিও যে এখানে জড়িত।

অগত্যা বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, তোমরা আমায় একটা নির্জন ঘর দাও। এর দরজা-জানালা সব বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে। ধ্যানের ফলে আমার শ্রীগুরুদেব অবশ্য আবির্ভূত হবেন।"

দ্রোণগিরিতে বাবাজী মহারাজের নিকট শ্যামাচরণ দীর্ঘদিন থাকিতে পারেন নাই। গুরুজীর বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তাই আসিবার সময় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। এসময়ে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "বেটা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। যেখানেই থাকো তুমি স্মরণ করলেই আমি তোমার কাছে আবির্ভূত হবো।"

গুরুজীর সেদিনকার এই প্রতিশ্রুতিই ছিল নবীন যোগী শ্যামাচরণের একমাত্র ভরসা।

নির্জন প্রকোষ্ঠে যোগাসনে বসিয়া সদ্‌গুরুকে তিনি জানাইলেন অন্তরের আকুল আহ্বান।

অচিরে ধ্যানযোগে আকর্ষিত হইয়া সেখানে আবির্ভূত হইল শুভ্র একটি জ্যোতির পুঞ্জ। তারপর ধীরে ধীরে উহা আকারিত হইল বাবাজী মহারাজের স্থূল দেহরূপে।

এবার আসন গ্রহণ করিয়া মহাযোগী প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "শ্যামাচরণ, তোমার ডাক শুনে আমি এসে পড়েছি। কিন্তু বেটা, সামান্য তর্কচ্ছলে, বন্ধুদের সাধু দেখাবার উৎসাহে তুমি আমায় এতদূর থেকে আহ্বান ক'রে আনলে? তামাশা দেখাবার জন্যই কি দীক্ষাদান ক'রে তোমাতে আমি শক্তি সঞ্চারিত করেছি, তোমায় যোগবিভূতির অধিকারী ক'রে তুলেছি?"

সাষ্টাঙ্গে শ্রীগুরুর চরণে প্রণিপাত করিয়া লাহিড়ীমহাশয় ভীতভাবে উপবেশন করিলেন। তিরস্কার শোনার পর মুখে তাঁহার কথা সরিতেছে না, নতমস্তকে সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। বুঝিলেন মহাযোগীর কৃপাদত্ত শক্তির এই অপব্যবহার নিতান্ত অমার্জনীয়। একান্ত বড়ই গর্হিত। তাছাড়া আরও বুঝিলেন, সদ্‌গুরুর সদাজাগ্রত দূরসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিবার সাধ্য তাঁহার নাই।

বাবাজী মহারাজ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "শোন শ্যামাচরণ, আমার নিজের প্রতিশ্রুতি

রাখতে ও তোমার সম্মান রাখতে আজ আমি উপস্থিত হলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি নিজে স্মরণ করলে আমার সাক্ষাৎ পাবে না—আমিই প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হব।"

গুরুজীর চরণতলে পতিত হইয়া শ্যামাচরণ বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজের কৌতূহল মেটাবার জন্য নয়, অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই এ কাজ তিনি করিয়াছেন।

মিনতি করিয়া বাবাজী মহারাজকে কহিলেন, "গুরুদেব, আমার আহ্বানে কৃপা ক'রে যদি এসেই পড়েছেন তো সকলকে একবার দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

বাবাজী মহারাজের ইঙ্গিতে কক্ষের দ্বার এবার উন্মুক্ত করা হইল। বন্ধুরা বাহিরে তখনো অপেক্ষমাণ আছেন। যোগীবরের অলৌকিক আবির্ভাব দর্শনে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই তখন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন—এ আবির্ভাব যে ইন্দ্রজাল নয়, কোনো মায়িক দেহের উপস্থিতি নয়, এই সত্যটিও তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন।

এবার গুরু মহারাজকে ভোগ নিবেদন করিতে হইবে। শ্যামাচরণ শুদ্ধভাবে তখনি লুচি হালুয়া তৈয়ার করিয়া আনিলেন। বাবাজী মহারাজের ভোজনের পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল।

দানাপুরে ফিরিয়া আসিয়া লাহিড়ীমহাশয় অফিসের কাজে যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু গুরুর প্রদত্ত যোগসাধনই এখন হইতে হইয়া উঠিল জীবনে প্রধান অবলম্বন। মহাযোগীর কৃপাস্পর্শে আজ জীবনে তাঁহার দেখা দিয়াছে নূতনতর আনন্দ, নূতনতর আলোকের সন্ধান। অধ্যাত্মজীবনের শতদলখানি এবার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া উঠিতেছে।

অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম শেষ হইলেই নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি সরিয়া পড়েন, যোগসাধনায় নিমজ্জিত হন। সহকর্মীদের অনেকেই সেদিন তাঁহার এই সাধনোজ্জ্বল জীবনের প্রকৃত পরিচয় পান নাই, তাঁহার রূপান্তরের স্বরূপও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে একজন প্রচ্ছন্ন সাধক, এ কথাটি তাহাদের অজানা ছিল না।

অফিসের উপরওয়ালা সাহেব তাঁহার এই উদাসীন প্রকৃতির কর্মচারীটিকে বলিতেন, —'পাগলাবাবু'।

সেবার একটি ঘটনায় শ্যামাচরণের অলৌকিক যোগবিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অফিসের সাহেবকে কয়েকদিন যাবৎ বড় বিমর্ষ দেখা যাইতেছিল। শ্যামাচরণ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানিলেন, মেমসাহেব ইংলণ্ডে খুব গুরুতর রোগে পীড়িতা, প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন। তাছাড়া, কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার কোনো সংবাদ নাই, এজন্য সাহেব বড়ই চিন্তায় পড়িয়াছেন।

লাহিড়ীমহাশয়ের অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। আশ্বাস দিলেন সেইদিনই তিনি মেমসাহেবের সংবাদ আনিয়া দিবেন।

অধীনস্থ কর্মচারীটি একি অদ্ভুত কথা বলিতেছে? সাহেব সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তবুও তাহার সমবেদনার সুরটুকু কি জানি কেন অন্তর স্পর্শ করিল। উদাস নেত্রে লাহিড়ীমহাশয়ের দিকে একবার তাকাইয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

তখনি অফিসের এক নির্জন কক্ষে শ্যামাচরণ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে সাহেবকে কহিলেন, "স্যার, আমি জেনেছি, মেমসাহেব রোগমুক্ত হয়েছেন। কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি কয়েকদিনের ভিতরেই নিজের হাতে আপনাকে চিঠি লিখছেন।" শুধু তাহাই নয়, তিনি এই পত্রের ভাষা ও বিষয়-বস্তুও বলিয়া দিলেন।

ভারতীয় যোগীদের নানা অলৌকিক বিভূতির কথা সাহেব শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অফিসের 'পাগলাবাবু'ই যে সেই শক্তির অধিকারী তাহা সহজে মানিয়া নিতে মন সায় দিবে কেন? তবুও শ্যামাচরণের আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তায় তাঁহার মনের চাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরেই মেমসাহেবের চিঠি আসিয়া উপস্থিত। লাহিড়ীমহাশয়ের বর্ণিত ভাষার সহিত ইহার আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। সাহেবের মন বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

কয়েক মাস পরের কথা। পূর্বোক্ত অফিসারের স্ত্রী ইংলণ্ড হইতে দানাপুরে আসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন লাহিড়ীমহাশয়কে দেখিয়া এই ইংরেজ মহিলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্বামীকে কহিলেন, "ওগো, এ মহাত্মাকেই যে ইংলণ্ডে থাকতে আমি দর্শন করেছি, আমার রোগশয্যার পার্শ্বে ইনি দাঁড়িয়েছিলেন। জীবনের যখন কোনো আশাই ছিল না, তখন এঁরই কৃপায় অলৌকিকভাবে আমার রোগমুক্তি ঘটেছে—আমার জীবন আবার ফিরে পেয়েছি।"

'পাগলাবাবু'র এ অপূর্ব যোগবিভূতির কথা শুনিয়া সাহেব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

একের পর এক নিগূঢ় যোগসাধনার স্তরগুলি ভেদ করিয়া লাহিড়ীমহাশয় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। গুরুর কৃপায় উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রচুর যোগৈশ্বর্যও তিনি লাভ করিতেছেন। গুরুশক্তিতে শক্তিমান্ সাধকের ঘটিতেছে দ্রুত রূপান্তর।

কিছুদিনের মধ্যে শীঘ্রই একবার প্রিয় শিষ্যের প্রয়োজনে বাবাজী মহারাজকে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইতে হইল।

নিজগৃহের সম্মুখে লাহিড়ীমহাশয় সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, নিকটেই এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া এক সাধু গঞ্জিকা সেবন করিতেছে। চেহারাটি তাহার মোটেই আকর্ষণীয় নয়, বহির্বাস ছিন্ন ও অপরিষ্কৃত। দেখিলে সহসা ভক্তির উদ্রেক তো হয়ই না, বরং মনে নানাপ্রকার সন্দেহই জাগিয়া উঠে। আগেকার দিনে এ শ্রেণীর সাধু চোখে পড়িলে লাহিড়ীমহাশয় তাহাকে প্রবঞ্চক অথবা চোর বদমায়েস বলিয়াই মনে করিতেন।

নিকটে গিয়া দেখিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য ! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড ! তিনি কি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছেন ! তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবই যে স্বয়ং সেখানে বসিয়া নিষ্ঠার সহিত ঐ কুদর্শন গঞ্জিকাসেবী সাধুটির লোটা মাজিতেছেন ।

বাবাজী মহারাজ এখানে ? দানাপুরে তিনি কবে, কি উপলক্ষে আসিলেন ? এ শোচনীয় অবস্থাই বা তাঁহার কেন ? নিকটে গিয়া শ্যামাচরণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন ।

সখেদে বাবাজীকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, এ কি কাণ্ড ! আপনি কেন এমনতর হীন কাজে লিপ্ত হয়েছেন ? এ গঞ্জিকাসেবী সাধুটিই বা কে ?"

হাতের লোটা ঘষিতে ঘষিতে গুরুজী প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "শ্যামাচরণ, আমি যে এখানে সাধু সেবা করছি । সকল ঘটেই আমার নারায়ণ বিরাজমান । তুমি তাঁর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যময় রূপটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছো না কেন, বলতো ?"

সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ীমহাশয় উপলব্ধি করিলেন, সর্বজীবে ও সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন পরমাত্মা । তাঁহার পরম অস্তিত্বটি শিষ্যের চেতনায় জাগাইয়া তুলিতেই সদ্‌গুরুর এই অপরূপ লীলা । যোগীশিষ্যকে মহাপ্রেমিকরূপে রূপান্তরিত করিতে তিনি চাহিতেছেন । শ্যামাচরণের চেতনার গভীরে এবং আরও গভীরে, অবচেতন মনের সংগোপন স্তরে ভেদ-জ্ঞানটি যে এখনো সূক্ষ্মরূপে রহিয়া গিয়াছে । বাবাজী মহারাজ আজ তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান । লাহিড়ীমহাশয়ের সর্বসত্তায়, সর্বচৈতন্যে সেদিন তাই বিরাট আলোড়ন জাগিয়া উঠিল । ভাস্বর হইয়া উঠিল এক সর্বাতিশায়ী পরম বোধ ।

বাবাজী মহারাজকে তখনি স্বগৃহে নিয়া তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা ও সেবা পরিচর্যা করিলেন । প্রয়োজনীয় সাধন নির্দেশাদি দিবার পর গুরুদেব সেই দিনই করিলেন অন্তর্ধান ।

ইহার পর হইতেই লাহিড়ীমহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বদলাইয়া যায় । এখন হইতে সর্বজীবে, সর্বভূতে তিনি নারায়ণ দর্শন করিতে থাকেন । দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ লোকেদেরও ঈশ্বরজ্ঞানে মনে মনে নমস্কার জানাইতে কখনো তিনি ভুলিতেন না । দর্শনার্থী ও ভক্তেরা প্রণাম করিলে অমনি তিনি জানাইতেন প্রত্যভিবাদন ।

দানাপুরে থাকিতেই ধীরে ধীরে তিনি যোগাচার্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন । দুই-চারিটি করিয়া মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকে । ইহাদের মধ্যে বৃন্দা ভকত নামক এক সিপাহীই তাঁহার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য । যোগসাধনায় লাহিড়ীমহাশয়ের এই নিরক্ষর শিষ্যটির কৃতিত্ব এ সময়ে অনেকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল ।

সেবার বাঁকিপুরের এক জমিদারগৃহে বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছে । বৃন্দা ভকতও সেদিন তাহার কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখানে শ্রোতারূপে উপস্থিত । পণ্ডিতদের দু'একটি ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদে বৃন্দা ভকত উঠিয়া দাঁড়ায় এবং পরম উৎসাহে ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে থাকে । তাহার এ

ব্যাখ্যা ছিল সাধনালব্ধ অনুভূতিতে পূর্ণ, আর উপলব্ধ সত্যের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। নিরক্ষর সিপাহীর সেদিনকার এই প্রেরণা-দীপ্ত ভাষণ শুনিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী নির্বাক হইয়া যান।

লাহিড়ীমহাশয়ের আশ্রমে থাকিয়া বৃন্দা ভকত পরবর্তীকালে এক সার্থকনামা যোগীরূপে পরিচিত হইয়া উঠে। যোগীগুরুকে সে সময়ে প্রায়ই এই শিষ্য সম্বন্ধে সস্নেহে বলিতে শুনা যাইত, "বৃন্দার সাধনা সার্থক হয়েছে, সদাই সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভাসছে।"

রানীক্ষেতে যোগদীক্ষা গ্রহণের পর, গুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রায় পঁচিশ বৎসর-কাল লাহিড়ীমহাশয়কে চাকুরীতে থাকিতে হয়। কর্মোপলক্ষে যখন সেখানে তিনি থাকিতেন, দুই-চারিজন প্রকৃত অধিকারী পুরুষকে গূঢ় যোগসাধন প্রদান করিতেন। এই সময়ে বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর, এবং বাংলার বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একদল সাধনকামী শিষ্য তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন।

কাশীধামে তখন তৈলঙ্গস্বামীজীর যোগৈশ্বর্যের বিপুল খ্যাতি। স্থানীয় জনসাধারণ ও তীর্থচারীরা দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে, শিবকল্প মহাপুরুষ-জ্ঞানে জ্ঞাপন করে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

স্নান শেষে স্বভাবগম্ভীর স্বামীজী মহারাজ সেদিন গঙ্গার ঘাটে শয়ন করিয়া আছেন, একদল ভক্ত নীরবে সেখানে উপবিষ্ট। এই সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক বাঙালী ভদ্রলোক দুইজন সঙ্গীসহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন।

আগন্তুকের চোখ-মুখ এক দিব্য আনন্দের আভায় ঝলমল। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তৈলঙ্গস্বামীজী সহর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগ-সাধনার মূর্ত মৈনাক পাহাড়টি যেন কোন্ ইন্দ্রজাল বলে হঠাৎ সচল হইয়া উঠিল।

দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আগন্তুককে তিনি জড়াইয়া ধরিলেন তাঁহার বিশাল বক্ষে। মহাযোগীর চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে স্বর্গীয় আনন্দের আভা।

আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোকটি নীরবে করজোড়ে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া সদলবলে বিদায় নিলেন।

তৈলঙ্গস্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এতক্ষণ বিস্মিত হইয়া এই অপূর্ব মিলন দৃশ্যটি দেখিতেছিলেন। এই গৃহী ভদ্রলোকটির অভ্যর্থনায় স্বামীজীর যেন উল্লাসের সীমা নাই, এমন আবেগভরে তো তাঁহাকে কখনও কাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিতে দেখা যায় নাই।

আগন্তুকেরা চলিয়া গেলে সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ইনি এমন কি বড় সাধক যে, আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন?"

স্বামীজী প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যোগ সাধনা কী জিস্ উন্নতি করনেকে লিয়ে সাধকোঁকো লঙোটিতক্ ছোড়নী পড়তী হ্যায় গৃহস্থীমে রহতে হুবেভী ইস্ পুরুষনে উস্ পদবীকো প্রাপ্ত কর লিয়া।"—অর্থাৎ যে যোগসিদ্ধির জন্য সাধকদের লেঙটিখানাও ত্যাগ করতে হয়, এ সাধক গৃহস্থাশ্রমে থেকেই তা আয়ত্ত করেছেন।

ভক্তেরা অতঃপর জানিতে পারিলেন, অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী এই সাধক, নাম, শ্যামাচরণ লাহিড়ী। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী। দ্রোণাগিরির মনোহারী বাবা, বাবাজী মহারাজ নামে যিনি সর্বত্র খ্যাত তিনিই ইহার গুরু। গুরুকৃপায় অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী এই মহাসাধক। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রধানত গৃহস্থদের মধ্যে যোগসাধনার প্রচারই ইহার প্রধান ব্রত।

কাশীর অধ্যাত্ম-চক্রে সেদিন লাহিড়ীমহাশয়ের সম্বন্ধে গুঞ্জনধ্বনি উঠে এবং যোগী-শ্রেষ্ঠ তৈলঙ্গস্বামীজীর এ স্বীকৃতি তাঁহাকে সাধকসমাজে অচিরে পরিচিত করাইয়া দেয়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লাহিড়ীমহাশয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই মহাসাধকদের চরণোপান্তে দলে দলে বহু মুমুক্ষুর সমাগম হইতে থাকে। সিদ্ধযোগীর আচার্য জীবনের বৃহত্তর ভূমিকাটি এ সময় হইতে শুরু হয়।

প্রধানত সাধনেচ্ছু গৃহস্থদের মধ্যেই লাহিড়ীমহাশয় তাঁহার গুরুপ্রদত্ত যোগসাধনা বিস্তারিত করিতে থাকেন। বাবাজী মহারাজের নির্দেশ ছিল, "শ্যামাচরণ, তুমি সংসারে ফিরে যাও। সেখান থেকে যোগযুক্ত সাধু-গৃহস্থদের প্রতিষ্ঠিত করো, প্রাচীন যোগসাধনার নিগূঢ় ধারাটিকে উজ্জীবিত ক'রে তোল।" এ আদেশ লাহিড়ীমহাশয় পালন করিয়াছিলেন।

তিনি চাহিতেন, আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি সাধন করিয়া শিষ্যেরা প্রধানত যেন গৃহা-শ্রমেই বাস করে। সন্ন্যাস নিতে সাধনার্থীদের প্রায়ই তিনি বারণ করিতেন, সতর্ক করিয়া কহিতেন, "সন্ন্যাসজীবন বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। তোমরা মনে রেখো, সংসারাশ্রমীর ভুল-ভ্রান্তির কিছুটা হয়তো ক্ষমা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভুলের কোনো ক্ষমা নেই।"

এই সব গৃহী ভক্ত ও শিষ্য ছাড়া লাহিড়ীমহাশয়ের সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যও কম ছিল না।

'কাশীর বাবা' বা 'যোগীরাজ' রূপে অতঃপর তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন। উচ্চ ও নীচ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মুমুক্ষু মানুষের জন্যই তাঁহার কৃপার দুয়ার থাকিত সদা উন্মুক্ত।

নিরক্ষর সিপাহী বৃন্দা ভকত যেমন তাঁহার পরমাশ্রয়ে আসিয়া যোগসিদ্ধ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়, তেমনই আবদুল গফুর খাঁ নামক এক দরিদ্র মুসলমান ভক্তও তাঁহার সাধন পাইয়া উন্নত অবস্থা লাভ করেন। দীন দরিদ্র কাশীবাসীরা যেমন সাধনকামী হইয়া তাঁহার কাছে আশ্রয় নিত, তেমনি দেখা যাইত কাশীর নৃপতি ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও দীনভাবে হইতেন তাঁহার শরণাগত।

গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সাধকদের আনাগোনাও তাঁহার নিকট কম ছিল না। ত্যাগী সাধকদের যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দেওঘরের শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বহু ধরনের শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া লাহিড়ীমহাশয় কাশীধামে বসবাস করিতে থাকেন এবং দুই মহাজীবনের শেষ দশটি বৎসর ভরিয়া উঠে বিস্ময়কর যোগবিভূতি ও করুণার অপরূপ মাধুর্যে। ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মকেন্দ্র

কাশীধামের পটভূমিকায় যোগীরাজের বহুতর অলৌকিক লীলা দিকে দিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। এ লীলার কাহিনী আজিও জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে।

লাহিড়ীমহাশয় তখন কাশীর গরুড়েশ্বর মহল্লায় বাস করিতেছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্য যুক্তেশ্বর প্রায় প্রত্যহই গুরুদেবকে দর্শন করিতে যান। রাম তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিও প্রায়ই সঙ্গী হন। যোগীরাজের সঙ্গলাভে ও উপদেশাদি শ্রবণে পরম আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটে।

হঠাৎ একদিন রাম কলেরায় আক্রান্ত হন। রোগের ধরনটি বড় মারাত্মক—একেবারে এশিয়াটিক কলেরা। ভীত সন্ত্রস্ত যুক্তেশ্বর গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। স্বাভাবিক ও সাংসারিক রীতি অনুযায়ী লাহিড়ীমহাশয় রোগের চিকিৎসায় সুদক্ষ ডাক্তারদেরই ডাকিতে বলিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই বলিলেন।

শহরের দুইজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত, কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল হইতেছে না। ডাক্তারেরা শেষটায় হতাশ হইয়া জানাইয়া দিলেন, এ রোগী আর বড় জোর দুই ঘণ্টা বাঁচিতে পারে।

যুক্তেশ্বর আবার গুরুদেবের উদ্দেশে ছুটিলেন। রামের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল। কিন্তু আসনে উপবিষ্ট যোগীর প্রশান্ত আননে কোনো ভাবান্তরই দেখা গেল না।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যুক্তেশ্বর তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। কিন্তু লাহিড়ীমহাশয় শুধু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "যাও, ভয় কি? ডাক্তারেরা তো দেখছেন।"

গৃহে ফিরিয়া যুক্তেশ্বর শুনিলেন, রোগীর আর কোনো আশা নাই, একথা বলিয়া ডাক্তারেরা বিদায় নিয়াছেন।

মৃত্যু আসন্ন। ভক্তপ্রবর রাম একবার ক্ষীণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ভাই, গুরু-দেবকে বোলো—আমি চললুম। একটা প্রার্থনা আমার। দাহ করবার আগে আমার এ স্থূল শরীরকে তিনি যেন পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করেন।"

মুহূর্তমধ্যে রামের শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। এবার নিষ্প্রাণ দেহটি ঘরের মেজেতে ফেলিয়া রাখিয়া যুক্তেশ্বর আবার গুরু সন্নিধানে ছুটিয়া গেলেন।

লাহিড়ীমহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, কি খবর? রাম এখন কেমন আছে বলতো?"

শোকাতুর যুক্তেশ্বর এইবার একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। ক্রন্দনের বেগ আর বাঁধ মানিতে চায় না। ফোঁপাইয়া কহিলেন, "গুরুদেব। এবার স্বচক্ষে দেখবেন আসুন, সে কেমন আছে। তাকে শ্মশানে নেবার উদ্যোগ চলছে।"

"শান্ত হও।" প্রশান্ত কণ্ঠে একথা বলিয়া যোগীবর নয়ন নিমীলিত করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট মূর্তিটি বহুক্ষণ আসনের উপর নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তারপর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে একটি শিশিতে নিকটস্থ প্রদীপের কিছুটা রেড়ীর তেল ঢালিয়া নিলেন। এটুকু যুক্তেশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, এখনি রামকে পান করিয়ে দাও?"

যজ্ঞেশ্বরের মুখে কোনো কথা সরিতেছে না। কাহাকে ইহা পান করাইবেন? রামের মৃত্যু যে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানসপটে ফুটিয়া উঠিল —গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, তাঁহার তো কখনো কোনো ভুল হয় না। তবে?

নির্দেশমতো কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। তখনি পাগলের মতো ঘরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু রামের দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। তবুও কোনোমতে মুখটি ফাঁক করিয়া কয়েক ফোঁটা তেল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তাহাতে উপস্থিত সকলে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলেন।

সর্বসমক্ষে রামের নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহটি ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিল, ক্রমে তিনি চেতনা লাভ করিলেন।

সুস্থ হইবার পর রাম এদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। —সে সময়ে তিনি দেখিতেছিলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে লাহিড়ীমহাশয় তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান। আননে স্নিগ্ধ মধুর হাসি ছড়াইয়া শান্ত স্বরে সস্নেহে যোগীবাজ বলিতেছেন, "রাম, আর কত ঘুমোবে? জেগে ওঠো, তারপর যত শিগ্‌গির পারো আমার কাছে এসে উপস্থিত হও।"

যজ্ঞেশ্বর বলিয়াছেন, পুনর্জীবন লাভের এ ঘটনাটি স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা তাঁহার নিকট নিতান্তই এক আষাঢ়ে গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি সবিস্ময়ে সেদিন আরো দেখিলেন, রাম ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়াছেন, শুধু তাহাই নয় জামা-কাপড় পরিয়া নিয়া গুরুদেবের নিকট যাইতেও তিনি উদ্যত।

উভয় বন্ধু অতঃপর একযোগে গাড়ি করিয়া লাহিড়ীমহাশয়ের নিকট উপনীত হন।

কৌতুকোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়া যোগীবাজ বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বর, এখন থেকে মৃতদেহ দেখলেই তাড়াতাড়ি এক বোতল রেড়ীর তেল তুমি সংগ্রহ ক'রে ফেলবে। স্বচক্ষে দেখলে তো, এর কয়েক ফোঁটা যমকেও পরাস্ত করতে পারে।"

লাহিড়ীমহাশয়ের এই পরিহাস শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হাস্য করিতেছেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের তখন আসল ব্যাপারটি বুঝিতে বাকি নাই। যোগীবাজ লৌকিক রীতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যাঘাত জন্মাইতে চাহেন নাই ডাক্তারদেরও যথেষ্ট সুযোগ তিনি দিয়াছেন। আর একথাও সত্য যে, তাঁহার ঐ রেড়ীর তেলের গুরুত্ব কিছু নাই, উহা একটি উপলক্ষ মাত্র।

যজ্ঞেশ্বরের অন্তরে ছিল রোগনাশক ঔষধ পাইবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গুরুদেব সেদিন তাঁহাকে ঐ তৈলটুকু প্রদান করেন। হাতের কাছে এ বস্তুই তাড়াতাড়ি তখন পাওয়া গিয়াছিল, এবং অবলীলায় তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে তাঁহার অসামান্য যোগবিভূতির বলে।

আশ্রিত শিষ্যদের জন্য যোগীবাজের করুণা ছিল অপরিসীম। সর্বদা তাহাদের রক্ষার জন্য তিনি সজাগ ও সক্রিয় থাকিতেন। অভয়া নামে তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যা

ছিলেন। তাঁহার স্বামী কলিকাতার এক বিশিষ্ট উকিল। এই দম্পতির আটটি সন্তান একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অভয়া একদিন গুরুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতে থাকেন, নবম সন্তানটির যেন জীবন রক্ষা হয়—এ কৃপা বাবাকে করিতেই হইবে।

আশ্রিত-বৎসল লাহিড়ীমহাশয় কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা—তাই হবে। এবার তোমার একটি মেয়ে হবে এবং সে ভালভাবে বেঁচেও থাকবে। কিন্তু আমার একটা বিশেষ নির্দেশ পালন করতে তোমাদের যেন ভুল না হয়। শিশুটির জন্ম হবে রাত্রির প্রথম ভাগে। তখন থেকে সূর্যোদয় অবধি ঘরের ভিতর একটি তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু সাবধান! সূতিকাগারে কেউ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে, বাতিটি কখনো যেন নিভে না যায়।"

বৎসরখানেক পরে এই শিষ্যার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। গুরুদেবের কথাটি কেউ ভুলেন নাই, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইল। কিন্তু শেষ রাত্রে প্রসূতি ও ধাত্রী উভয়েই কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। দীপাধারে তেল ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে। শিখাটি নির্বাণোন্মুখ।

হঠাৎ এসময়ে সূতিকাগারে ঘটে এক অলৌকিক কান্ড। হাওয়ার ঝাট্কায় বন্ধ দ্বারটি খুলিয়া যায় এবং নিদ্রোত্থিতা অভয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখেন, গুরুদেব লাহিড়ীমহাশয় স্বয়ং কক্ষের সম্মুখে দন্ডায়মান।

স্তিমিত দীপশিখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যোগীরাজ বলিতেছেন, "অভয়া করছো কি? তাড়াতাড়ি ঐ দিকে চেয়ে দ্যাখো, বাতি কিন্তু নিভে যাচ্ছে।"

ত্রস্তব্যস্তে উঠিয়া শিষ্যা দীপাধারে তেল ঢালিয়া দিলেন। ততক্ষণে গুরুদেবের করুণাঘন মূর্তি অদৃশ্য হইয়াছে।

এই মহিলাটি একবার লাহিড়ীমহাশয়কে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছেন। হাওড়া স্টেশনে পেঁছিতে না পেঁছিতেই বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়িয়া দিল, গাড়িতে ওঠা আর সম্ভব হইল না। শিষ্যার অন্তর বেদনায় গুমরিয়া উঠিল, যোগীরাজের পবিত্র মূর্তিখানি স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের অনতিদূরে ট্রেনটি কেন যেন থামিয়া গিয়াছে, চালক এবং ইঞ্জিনীয়ার যান্ত্রিক গোলযোগের কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইতেছে না। অভয়া তখনি ছুটিয়া গিয়া মালপত্রসহ কামরায় উঠিয়া বসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি স্থির হইয়া বসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটি চলিতে আরম্ভ করিল।

কাশীধামে পেঁছিয়া লাহিড়ীমহাশয়কে প্রণাম করা মাত্র তিনি স্মিত হাস্যে শিষ্যাকে বলিলেন, "দ্যাখো আর একটু আগে রওনা হয়ে গাড়ি ধরতে হয়। কত ঝঞ্ঝাটেই যে তোমরা আমায় ফেলতে পার! বলো দেখি, পরের ট্রেনে কাশীতে পেঁছুলে তোমাদের কি এমন ক্ষতি হত? আর এত কাঁদতেও তোমরা পারো।"

স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ীমহাশয়ের এক দীক্ষিত শিষ্য, প্রায়ই তিনি ভাস্করানন্দ

সরস্বতীর কাছে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। ভাস্করানন্দজী কি রূপে যোগীরাজ শ্যামাচরণের নিকট হইতে কয়েকটি বিশেষ যোগসাধন প্রাপ্ত হন, কেবলানন্দ তাহার বিবরণ দিয়াছেন। শ্যামাচরণ মহাযোগী বাবাজী মহারাজের শিষ্য, তাঁহার নিগূঢ় সাধনের তিনি অধিকারী—এ কথাটি ভাস্করানন্দজীর জানা ছিল। তাঁহার নিকট হইতে উচ্চতর কয়েকটি যোগক্রিয়া শিক্ষা করার জন্য এ সময়ে তিনি উদ্‌গ্রীব হন। তাঁহার আশ্রমে আসিবার জন্য যোগীরাজকে একদিন আমন্ত্রণও জানান।

কেবলানন্দজীর কাছে এ আমন্ত্রণের কথা শুনিয়া লাহিড়ীমহাশয় রহস্যভরে বলেন, "দ্যাখো হে, পিপাসা পেলে তৃষ্ণার্ত লোকই তো কুয়োর কাছে ছুটে যায়। কুয়ো কি কখনো এজন্য তার স্থান থেকে এগিয়ে আসে?"

কিছুদিন পরে এক নির্জন বাগানে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কৃপালু লাহিড়ীমহাশয় এসময়ে ভাস্করানন্দ স্বামীকে আলিঙ্গন দেন, কয়েকটি নিগূঢ় যোগসাধনও তাঁহাকে প্রদান করেন।

যোগীরাজের পত্নী কাশীমণি দেবীর নিকট তাঁহার স্বামীর অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতি সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনা যাইত। উত্তরকালে আচার্য যোগানন্দ মহারাজ এগুলি সংকলন করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহার কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে কাশীমণি দেবীর ঘুম ভাঙিয়া যায়। চাহিয়া দেখেন সমস্ত কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, আর গৃহের এক কোণে পদ্মাসনযুক্ত যোগীরাজ ভূমি হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যে অবস্থান করিতেছেন।

কাশীমণি তো বিস্ময়ে হতবাক্। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন না তো।

যোগীরাজ এবার পত্নীকে আরও বিস্মিত করিয়া মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না গো না। এ তোমার ভ্রম নয়, আর স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্য নয়। অনেকদিন তো কেটে গেল। এবার তোমার এ তামস নিদ্রা থেকে জেগে ওঠো—চিরকালের জন্য তুমি জাগো।"

লাহিড়ীমহাশয়ের দেহটি অতঃপর ধীরে ধীরে শূন্য হইতে নিম্নস্থ আসনে অবতরণ করে। স্বামীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাশীমণি সেদিন সাধন প্রার্থিনী হন এবং যোগীরাজও সানন্দে তাঁহাকে দান করেন দীক্ষা ও যোগসাধনা।

কোনো এক ভক্তিমতী শিষ্যা সেবার লাহিড়ীমহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার একখানি ফটো চাহিয়া নেন। এটি তাঁহাকে দিবার সময় লাহিড়ীমহাশয় বলিলেন, "যদি সত্যই ভক্তি-বিশ্বাস করো ও মানো তো এটাই হবে এক পরমাশ্রয়, আর না মানো তো নেহাত সাধারণ ছবি মাত্র।"

কিছুদিন পরের কথা। একদিন সন্ধ্যায় মহিলাটি অপর এক গুরুভগ্নীর সহিত বসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। সম্মুখের টেবিলে লাহিড়ীমহাশয়ের ছবিটি

স্থাপিত রহিয়াছে। হঠাৎ এসময়ে সেদিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় এবং ঐ গৃহে বজ্রপাত ঘটে।

যে গ্রন্থটি পাঠ করা হইতেছিল তাহা বিদ্যুৎ-এর আগুনে দগ্ধ হয়, কিন্তু মহিলা দুইটি অদ্ভুতভাবে গুরুকৃপায় বাঁচিয়া যান। দুর্ঘটনার সময়ে বিচিত্র এক অনুভূতি তাহাদের হয়। গুরুদেবের কল্যাণশক্তি যেন তাঁহার ফটো হতে নির্গত হয় এবং ররফের একটি প্রাচীর তুলিয়া তড়িৎ-বজ্রের আঘাত হইতে তাঁহাদের রক্ষা করে।

লাহিড়ীমহাশয়ের শিষ্য কালীকুমার রায় মহাশয় তাঁহার গুরু সম্বন্ধে নানা মনোজ্ঞ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঠাকুরের কাশীধামস্থ গৃহে গিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাইয়া আসিতাম। তখন দেখিতাম—বহু সাধু-সন্ত, দণ্ডী সন্ন্যাসী গভীর রজনীতে নিঃশব্দে তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইতেন। উচ্চতম জ্ঞানতত্ত্ব ও দুরূহ যোগসাধনের নানাপ্রণালী তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত গুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন, ইহাও দেখিতাম। এই আগন্তুকের দল আবার প্রত্যুষ হইলেই গোপনে কোথায় সরিয়া পড়িতেন। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিদ্রিত হইতে আমরা দেখি নাই।

এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির উৎসরূপে যোগীরাজ লাহিড়ীমহাশয় তখন অধিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম-সাধন ও যোগশক্তির অমৃতভাণ্ডখানি তিনি জনকল্যাণের জন্য ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত, মুমুক্ষু ও যোগসাধনপ্রাপ্ত সাধকদের যে কেহ এ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিত, অপার্থিব পুণ্যধারায় হইত সে অভিসিঞ্চিত। শুধু তাহাই নয় তাঁহার দর্শন ও স্পর্শন তৎকালে অগণিত নরনারীর আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিয়া দিত।

এইসব দর্শনার্থীর মধ্যে অবিশ্বাসী লোকও হয়তো কিছু কিছু আসিত। কিন্তু তাহাতে লাহিড়ীমহাশয়ের ব্যবহারে প্রায়ই কোনো তারতম্য ঘটিত না। তবে মাঝে মাঝে দুষ্টপ্রকৃতির অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের তিনি শাস্তি দিতে ছাড়িতেন না। যোগপন্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সদা নির্লিপ্ত, ধ্যানতন্ময়, যোগীবরকে মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাঁহার শিষ্য কালীকুমার রায় ইহার এক কাহিনী শুনাইয়াছেন :

কালীকুমারবাবু অল্প কিছুদিন হয় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং গুরু-নির্দেশিত সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার অফিসের মনিবটি কিন্তু এসব তেমন পছন্দ করেন না। তাই লাহিড়ীমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ তিনি করিতেন।

কালীকুমারবাবুর পিছনে পিছনে ভদ্রলোকটি একদিন লাহিড়ীমহাশয়ের গরুড়েশ্বর মহল্লার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। আগমনের উদ্দেশ্য, যোগীরাজের সাধনপ্রণালীকে অসার প্রতিপন্ন করা এবং তাঁহাকে কিছুটা অপমান করিয়া যাওয়া।

লাহিড়ীমহাশয়কে ঘিরিয়া কক্ষমধ্যে দশ-বারজন ভক্ত বসিয়া আছেন। আগন্তুক তাঁহাদের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করা মাত্রই যোগীরাজ নয়ন উন্মীলন করিলেন, ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি আজ একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে চাও?"

প্রস্তাব শুনিয়া সবাই মহা উৎসাহী। ঘরটি তখনই অন্ধকার করা হইল এবং

লাহিড়ীমহাশয়ের যোগশক্তির বলে ভদ্রের নয়নসমক্ষে এবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল একটি অলৌকিক দৃশ্য।

সকলে দেখিতে লাগিলেন—একটি সুন্দরী তরুণী লালপাড় শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবাদুলালবাবুর গানিককে ডাকিয়া লাহিড়ীমহাশয় এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন তো মশাই, এই রমণীকে আপনি চিনতে পারছেন কিনা?"

আগন্তুকের যত কিছু দম্ভ ও বিদ্রূপের উৎসাহ তৎক্ষণে নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। ভীত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এটি আমার পরিচিত।" সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি অন্তর্হিত হইল।

ভয়ে, লজ্জায় ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সকলের সমক্ষে এবার তিনি সব কিছু অকপটে স্বীকার করিলেন। তরুণীটি তাঁহার উপপত্নী। নিজের স্ত্রী-পুত্র রহিয়াছে, অথচ এই নারীর পিছনে মূর্খের মতো তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন।

যোগিরাজের অধ্যাত্মপ্রভাব এবং যোগবিভূতির এই বিচিত্র প্রকাশ তাঁহার অন্তরে তুলিয়া দিয়াছে তীব্র আলোড়ন। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের জ্বালাও কম হয় নাই। জোড়হস্তে, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, এ পাপমোহ থেকে আমায় রক্ষা করুন। দয়া ক'রে দীক্ষা দিয়ে শ্রীচরণে আমায় চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিন।"

অন্তর্যামী যোগীবর কিন্তু বুঝিয়াছেন, ভদ্রলোকটির এই আর্তি ও অনুশোচনা সাময়িক মাত্র। দীক্ষার প্রস্তুতি ও অধিকার যাঁহার নাই তাঁহাকে কি করিয়া তিনি গ্রহণ করিবেন।

উত্তরে শুধু কহিলেন, "বেশ তো, আগামী ছয় মাস কাল যদি আপনি সংযত হয়ে থাকতে পারেন, তবে আপনার আশা পূর্ণ হবে, আপনাকে আমি সাধন দেবো।"

উচ্ছৃঙ্খল লোকটির সে সৌভাগ্য আর হয় নাই। কোনোক্রমে প্রায় তিন মাস কাল সংযত জীবনযাপন করার পর ঐ রমণীটির সহিত আবার তিনি মিলিত হন এবং ইহার দুই মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যোগিরাজ কেন সেদিন তাঁহার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়া ছয় মাস পরে তাঁহাকে দীক্ষা দানের কথা বলিয়াছিলেন সে কথার তাৎপর্য তখন বুঝা গেল।

বিপুল যোগবিভূতির ঐশ্বর্য লাহিড়ীমহাশয় লাভ করেন, কিন্তু এ ঐশ্বর্য তিনি বহন করিয়া চলিতেন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সচরাচর তাঁহাকে ইহা প্রকাশ করিতে দেখা যাইত না। কখনো দুষ্টের দমনে, আবার কখনো বা নিতান্ত লীলাচ্ছলে তাঁহার যোগসামর্থ্য লোকলোচনের সম্মুখে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। মুমুক্ষু ভক্তের প্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্যও অনেক সময় বিভূতিলীলা তিনি প্রদর্শন করিতেন।

লাহিড়ীমহাশয়ের প্রতিবেশী এক যুবক সেদিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।

ইঁহার নাম চন্দ্রমোহন দে, সবেমাত্র ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হইয়াছেন। যোগীরাজ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আলোচনায় বসিয়া নূতন ডাক্তার চন্দ্রমোহনের উৎসাহের অন্ত নাই— আধুনিক দেহ-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব তিনি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

যোগীবর কহিলেন, "আচ্ছা চন্দ্রমোহন, তোমাদের এই ডাক্তারী শাস্ত্রমতে মৃতের কি সংজ্ঞা রয়েছে, বলতো ?" তারপর কৌতুকভরে বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমায় পরীক্ষা ক'রে বল দেখি, আমি সত্য সত্যই মৃত—না জীবিত ?"

চন্দ্রমোহন তো তাঁহার দেহটি পরীক্ষা করিয়া একেবারে হতবাক্। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার কোনো লক্ষণই নাই, হৃৎপিণ্ড নিঃশব্দ নিশ্চল! সারা দেহে তাঁহার কোথাও প্রাণের কোনো চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

কিছুক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া লাহিড়ীমহাশয় তরুণ ডাক্তারকে বলিলেন, "দ্যাখো চন্দ্রমোহন, একটা কথা স্মরণ রাখবে। দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানের বাইরে, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যই আমাদের জানবার রয়েছে। তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞান তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না, ভারতীয় সাধকদের যোগ-শক্তি কিন্তু অবলীলায় সেখানে পৌঁছাতে পারে।"

চন্দ্রমোহনের সেদিনকার এ বিস্ময় চিরদিনের শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। উত্তরকালে তিনি এক যশস্বী চিকিৎসকরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন আর লাহিড়ীমহাশয়ের সেদিনকার এই লীলার সূত্রটি ধরিয়া তাঁহার জীবন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-সাধনার পথে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

যোগীরাজ কখনো নিজের প্রতিচ্ছবি উঠাইতে সম্মত হইতেন না। একবার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী গুরুদেবের ফটো উঠাইতে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাশীর সুদক্ষ ফটোগ্রাফার গঙ্গাধরবাবুকে আহ্বান করা হয় এবং বহু অনুনয়ে যোগীরাজকে সম্মত করানো যায়।

ক্যামেরার সম্মুখে গিয়াই লাহিড়ীমহাশয় বালকের মতো যন্ত্রটির নির্মাণ-কৌশল ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ফটোগ্রাফারও মহা উৎসাহী, তাঁহাকে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝাইতে লাগিলেন।

ছবি গ্রহণের সময় ফটোগ্রাফার কিন্তু মহাবিপদে পড়িলেন। যোগীরাজের ছবিটি কি জানি কেন, তাঁহার ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে এতটুকুও প্রতিফলিত হইতেছে না। বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের চিহ্নমাত্র নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয়—অপর কোনো লোক ক্যামেরার সম্মুখে বসামাত্র তাঁহার ছবি ঠিকমতোই প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু যোগীরাজের প্রতিরূপ কেন দেখা যাইতেছে না ?

সম্ভাব্য কোনো কারণের সন্ধান না পাইয়া ফটোগ্রাফার একেবারে মুষড়িয়া পড়িয়াছেন।

কৌতুকী লাহিড়ীমহাশয় এতক্ষণ নীরবে বসিয়া চতুর হাসি হাসিতেছিলেন। এবার প্রশ্ন করিলেন, "কিগো, এ বিষয়ে তোমাদের বিজ্ঞানের কি বক্তব্য আছে, বল দেখি ?"

সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছেন। কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দূর হোক আমাদের বিজ্ঞান। আমি এবার আপনার চরণেই শরণ নিচ্ছি। আপনি ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন, আর ছবিটা তুলে নিয়ে আমিও আমার মান বাঁচাই। আপনি একবার দয়া করুন।"

লাহিড়ীমহাশয় মুচকি হাসিয়া আবার ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। অমনি দেখা গেল, তাঁহার ছবি ক্যামারের ভিউ-ফাইণ্ডার-এ নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে ছবিটি সেদিন গৃহীত হয়, সেটি হইতেই লাহিড়ী মহাশয়ের বহুল প্রচারিত তৈল চিত্রখানি অংকিত হইয়াছিল।

সাধনহীন লোকদের শূন্যগর্ভ ধর্মালোচনায় যোগীরাজ কোনোদিন উৎসাহ প্রদান করিতেন না। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ধ্যান-ধারণার নিগূঢ় যৌগিক ক্রিয়াদির উপরই তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশী।

"ধ্যান-লোকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আস্বাদন করো ও পরমাত্মার দর্শন লাভে উদ্বুদ্ধ হও"—দর্শনার্থীদের কাছে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশের মূল কথা।

যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তিনি নিজে বিচরণ করিতেন, শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে তাহারই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। যোগীরাজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বর্ণন ছিল জীবন্ত। তাই অতি সহজে ইহা অন্তরঙ্গ ভক্তদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাইয়া তুলিত।

লাহিড়ীমহাশয় সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতার দুই চারিটি শ্লোক তিনি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কেন যেন তিনি থামিয়া গেলেন। তারপর বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সকলে একটু চুপ ক'রে বসো। আমি অনুভব করছি, বহুসংখ্যক নর-নারীর জীবন ও চেতনার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমি নিজে জাপানের এক সমুদ্রাঞ্চলে ডুবে মরছি।"

কক্ষস্থ সকলে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে দেখা গেল, লাহিড়ীমহাশয় ধীরে ধীরে পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরদিন শিষ্যগণ সংবাদপত্রে পড়িলেন, জাপানগামী যাত্রীবাহী একটি জাহাজ উপকূলের নিকটে আসিয়া নিমজ্জিত হয়। এই দুর্ঘটনায় বহু আরোহীর প্রাণনাশ ঘটে।

সকলেই বুঝিলেন, ঐ নিমজ্জমান সমুদ্রযাত্রীদের মর্মবিদারী আর্তনাদই গতকাল যোগীরাজের অন্তর-সত্তায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। সর্বজীব ও সর্বভূতের অস্তিত্ব যে মহাচৈতন্যে বিধৃত, তাহারই সহিত যে যোগীরাজের অন্বয় সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া লাহিড়ীমহাশয় শিষ্যদের মধ্যে এ সত্যকেই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন।

লাহিড়ীমহাশয়ের প্রচারিত যোগসাধনা কোনোদিনই মানুষকে সংসারের কর্ম হইতে

বিচ্যুত করিতে চাহে নাই। তাঁহার গুরুদেব বিশেষ করিয়া গৃহস্থ-জীবনের ক্ষেত্রেই যোগসাধনার বীজ বপনের নির্দেশ দেন। তাই দেখা যাইত, লাহিড়ীমহাশয়ের নিকটে আসিয়া গৃহস্থ শিষ্যগণ সাধন-পথের বাধাবিঘ্নের কথা বলিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। অবসরের অভাব, জীবনযুদ্ধের তীব্রতা—কোনো কিছু অসুবিধার কথাই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইত না। সংসারাশ্রমে বাস করিয়া, দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি নিজেই তাঁহার এ আদর্শটি দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্যে তিনি যেমন কর্ম করিতেন তেমনি বারাণসীতে লোক-কল্যাণকর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্যও তাঁহার তৎপরতা কম ছিল না। এ ধরনের ব্যক্তিগত বা সমাজগত দায়িত্বও তিনি কোনোদিন এড়াইয়া যান নাই।

বর্তমান যুগের পরিবেশে, গার্হস্থ্য জীবনকে অব্যাহত রাখিয়া, গোপনভাবে যোগসাধন করিতেই তিনি নির্দেশ দিতেন। তাঁহার নির্দেশিত পন্থায় অগ্রসর হইয়া বহুতর সাধক অপূর্ব যোগসামর্থ্য লাভ করিয়াছে, সমাজের স্তরে স্তরে অগণিত নীরব সাধনকামী মানুষের জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে সার্থকতায়।

যোগীরাজের সাধন-পন্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি কাহাকেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে দিতেন না। যে-কোনো ধর্মের, যে-কোনো শ্রেণীর সাধক তাঁহার সাধন ও আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ ছিলেন। এজন্য কাহাকেও নিজের আচরিত ধর্ম বা সামাজিক আচার-আচরণ ত্যাগ করিতে হইত না। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত পথিপ্রদর্শকের ভূমিকাটিই তিনি গ্রহণ করিতেন।

ঐশী করুণা ও লোক-কল্যাণের দীপশিখাটি দীর্ঘদিন জ্বালাইয়া রাখিবার পর আচার্য-জীবনের শেষ অঙ্কটি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। মহাপ্রয়াণের নির্ধারিত লগ্ন নিজে তিনি জানিয়াছেন, এবার সবাইকে প্রস্তুত করিতে হইবে। পত্নী কাশীমণিকে সেদিন বলিলেন, "ওগো দ্যাখো, আমার দেহত্যাগের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে। কিন্তু তোমরা কেউ যেন আমার জন্যে শোক ক'রো না।"

কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটও তিন মাস পূর্বে তিনি তাঁহার আসন্ন বিদায়ের কথা প্রকাশ করেন। এক ধরনের বিষাক্ত পৃষ্ঠব্রণ দ্বারা অতঃপর তিনি আক্রান্ত হন, আর এই রোগ উপলক্ষ করিয়াই মরদেহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠেন।

যোগীরাজের দেহরক্ষার পূর্বে তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য, স্বামী প্রণবানন্দজী কাশীধামের বাইরে অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুদেবের অন্তিম অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। ব্রস্তব্যস্তে তিনি কাশী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় লাহিড়ীমহাশয় এক অলৌকিক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

কহিলেন, "প্রণবানন্দ, এত হুড়োহুড়ি ক'রে কাশীতে ছুটে যাবার কি প্রয়োজন? সেখানে আমার সঙ্গে তো তোমার সাক্ষাৎ হবে না। তুমি পৌঁছিবার পূর্বেই যে আমি এ দেহ ত্যাগ করবো।"

প্রণবানন্দজী শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতেছিলেন, যোগীরাজ তাঁহাকে অভয় দিয়া

কহিতে লাগিলেন, "একি? ভয় কি? কাঁদছো কেন। আমি যে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। দেহ বিসর্জিত হলেও সদ্‌গুরুসত্তাকে তোমরা পাবে—প্রয়োজন মতোই পাবে।"

লাহিড়ীমহাশয়ের আর এক শিষ্য, স্বামী কেশবানন্দজীও এই সময়কার একটি অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—গুরুদেবের তিরোধানের কয়েকদিন পূর্বে একদিন তিনি হরিদ্বারের এক কুটিরে বসিয়া আছেন। হঠাৎ এ সময়ে লাহিড়ীমহাশয়ের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

দিব্যমূর্তি তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, "বৎস, তুমি অবিলম্বে কাশীতে চলে এসো।" কথা কয়টি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যায়।

কেশবানন্দ অবিলম্বে কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। দেখিলেন, গুরুদেবের লীলা সংবরণের আর বেশী আর দেরি নাই, সেবানিষ্ঠ ভক্ত শিষ্যগণ দিবারাত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন।

১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। লাহিড়ীমহাশয়ের কক্ষে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত উপবিষ্ট। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, এ অবস্থায়ও ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি প্রিয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মৃদু স্বরে তিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাইতো, আমাকে যে এবার স্বস্থানে ফিরতে হবে!"

শোকাভিভূত শিষ্য ও ভক্তদের অশ্রুসজল দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে উঠিয়া, পদ্মাসনে যোগীরাজ উপবিষ্ট হইলেন। এই আসনেই সমাধিমগ্ন অবস্থায় ঘটিল তাঁহার মহাপ্রয়াণ।

সমারোহের সহিত মরদেহটি গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে আনিয়া সৎকার করা হইল। গুরুবিয়োগবিধুর শত শত ভক্ত শিষ্যের নয়নে বহিয়া গেল শোকাশ্রুর ধারা।

মরলোকের পরপারে অমৃতময় জ্যোতির্লোকে চলিয়া গিয়াছেন যোগীরাজ। সেই পরমধাম হইতেই এ সময়ে বিস্তারিত হয় তাঁহার অলৌকিক লীলা। একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট শিষ্য গুরুদেবের দিব্যদেহের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। জীবন ও মৃত্যুর দুরতিক্রম্য ব্যবধানকে ঘুচাইয়া দিয়া, শক্তিধর মহাযোগী এমনি করিয়াই অমৃতলোকের পরম তত্ত্বটি সেদিন উদ্‌ঘাটন করেন তাঁহার আত্মজনদের কাছে।

দ্রোণগিরির পর্বত কন্দরে, অলৌকিক কৃপার মধ্য দিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই চিহ্নিত শিষ্যের সাধনজীবনে রোপণ করেন নিগূঢ় যোগসাধনার বীজ। শিবকল্প মহাপুরুষের উত্তর-সাধকরূপে মহাযোগী লাহিড়ীমহাশয়ও সমাজ ও গার্হস্থ্য-জীবনের স্তরে স্তরে ঐ বীজ ছড়াইয়া দিয়া যান। উদ্‌যাপন করেন, ঈশ্বরনির্দিষ্ট এক সুমহান ব্রত।

যোগীবর গম্ভীরনাথজী

নর্মদার বালুতট ধরিয়া সন্ন্যাসী হাঁটিয়া চলিয়াছেন। শিরে দীর্ঘ জটার ভার নামিয়া আসিলেও বয়সে তিনি তরুণ। দেহখানি সুঠাম সমুন্নত, অঙ্গকান্তি স্বর্ণাভ, আননে অপূর্ব মহিমার ব্যঞ্জনা। নয়ন দুইটি আনন্দের দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। সহস্র সহস্র সাধু-সন্তের ভিড়ের মধ্যেও দিব্যশ্রীমণ্ডিত এ সাধককে হারানোর উপায় নাই।

প্রায় চার বৎসর পূর্বে এ পাদ-পরিক্রমার ব্রত তিনি গ্রহণ করেন। নর্মদার উৎসমুখে বিরাজিত অমরকণ্টকের মহাতীর্থ, সেখান হইতে যে যাত্রা শুরু হইয়াছে, সমুদ্রসঙ্গম ঘুরিয়া আবার সেই পুণ্যস্থলীতেই ঘটিবে তাহার পরিসমাপ্তি।

এ পথে তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তের চলার যেন বিরাম নাই। কখনো সাধু জমায়েতের মধ্যে, কখনো বা একাকী তরুণ সাধক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। আপন আনন্দে নিরন্তর তিনি ভরপুর।

পুণ্যতোয়া তটিনীর নানা তীর্থে, নানা ঘাটে তাঁহাকে অবগাহন করিতে হয়। কখনো বা নদীতীরের বালুকা-গোফায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন ধ্যান ভজনে। মাঝে মাঝে পথে পড়ে দুর্গম সুদীর্ঘ অরণ্য। কোনো বিশেষ স্থানটি হঠাৎ কখনো ভাল লাগিলে সাধক সেখানে ঝুপড়ি বাঁধিয়া ফেলেন, আত্মসমাহিত হইয়া দু-দশদিন হয়তো কাটাইয়া দেন।

বেলা সেদিন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, সায়ংসন্ধ্যার আর বেশী দেরি নাই। তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে পড়িল অনতিদূরে নদীতীরের কাছাকাছি এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। নিতান্ত নির্জন পরিবেশ, নিকটে জনমানব কোথাও নাই। কোনো সাধু তপস্বী হয়তো এখানে সাধন-ভজনের জন্য কুটির বাঁধিয়া আছেন, আপাতত কার্যান্তরে গিয়া থাকিবেন।

কুটির অঙ্গনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর তাঁহার ভরিয়া উঠে এক অজ্ঞাত আনন্দে। এ কি স্থান-মাহাত্ম্য? না, তাঁহার নিজেরই সাধনজীবনের কোনো বিশেষ ধরনের অনুভূতি? কারণ যাহাই হোক, স্থির করিলেন, দু-চারদিন এখানে কাটাইয়া যাইবেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর কুটিরের এক কোণে আসন বিছাইয়া সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ঘটিল এক বিস্ময়কর কাণ্ড। হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখিলেন, এক বৃহদাকার সর্প, রাজ-গোখুরা ফণা বিস্তার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সর্পটির পরবর্তী আচরণও বড় অদ্ভুত। নিস্পন্দ দেহে, স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তরুণ সাধককে তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিল। তার পরেই ঘন অরণ্যের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল।

কোন্ দিব্যলোকের বার্তাবহ এই নাগরাজ? তাহার আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অনুভূতির তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া উঠে সন্ন্যাসীর সর্বসত্তা।

উপর্যুপরি তিন দিন এখানে তিনি ধ্যান ও ভজনে অতিবাহিত করিতে থাকেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনই আসনে বসিবার সময় সর্পরাজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তারপর উহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

কুটিরের অধিকারী এবার কার্যান্তর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইঁনি এক দুশ্চর তপস্যারত ব্রহ্মচারী, দীর্ঘদিন নর্মদাতীরে আপন সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।

অতিথি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সোৎসাহে জানাইলেন তিনি অভ্যর্থনা। কুশল প্রশ্নাদির শেষে, কথাপ্রসঙ্গে ঐ সর্পটির আচরণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নির্বাকভাবে কিছুক্ষণ তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "ভাই, সাধক হিসাবে সত্যই আপনার ভাগ্যের সীমা নেই। গত বারো বৎসর যাবৎ এই নাগপ্রবরের দর্শনের আশায় আমি বসে রয়েছি, কুটির বেঁধে এখানে তাঁর জন্য দিন গুণছি। হয়তো পূর্বজন্মের তেমন সুকৃতি নেই, তাই এ দুর্লভ বস্তুর দর্শন আজ অবধি ঘটে ওঠে নি। আসলে ইনি হচ্ছেন এক অসামান্য মহাপুরুষ, স্বেচ্ছায় সর্পাকৃতি ধরে বিচরণ করছেন সাধকদের কৃপা করার জন্য। আপনি তিন দিনের ভিতর কি ক'রে এঁর কৃপালাভ করলেন, আমার কাছে তা সত্যিই এক দুজ্ঞেয় রহস্য।"

নাগরূপী এই ছদ্মবেশী মহাপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য তরুণ সন্ন্যাসীটিই উত্তর-কালের গম্ভীরনাথ বাবা। শুধু নাথ-যোগপন্থীদের নায়করূপেই নয়, সর্ব ভারতের এক সার্থকনামা যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরূপেও এই মহাত্মার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

নাথযোগী সম্প্রদায় এ দেশে এক সুপ্রাচীন যোগসাধনার ধারাকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। মহাযোগী গোরখনাথ হইতে এই বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীর সূচনা। উত্তরকালে পরম্পরাক্রমে এই সম্প্রদায়টিতে বহু স্বনামধন্য যোগীর অভ্যুদয় ঘটে এবং এইসব শক্তিধর মহাপুরুষদের মাধ্যমে যোগসাধনার ধারাটি দিকে দিকে বিস্তারিত হয়। আজিও ভারতের দূর-দূরান্তে নাথপন্থী সাধকদের স্থাপিত মঠ, আশ্রম এবং যোগগুহা কম দেখা যায় না।

গোরখপুরের প্রসিদ্ধ গোরখনাথ মঠ এই সাধনকেন্দ্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টতম। বিশেষ করিয়া শিবকল্প যোগীবর গোরখনাথজীর স্মৃতিবিজড়িত থাকায় ইহার মাহাত্ম্য অপরিসীম।

সুদূর অতীতে এক সময়ে গোরখনাথজী এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। সে সময়ে এ স্থান ছিল গহন অরণ্য। উত্তরকালে তাঁহার তপঃক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়াই মঠ ও মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। আজিকার দিনের গোরখপুর নগরী সেই পবিত্র সাধনস্থলীর চারিদিকেই ছড়াইয়া আছে।

গোরখপুর মঠের পূর্বেকার সে প্রসিদ্ধি আজ আর তেমন নাই। তপোনিষ্ঠ যোগপন্থী সাধকদের উপযোগী পবিত্র নির্জন পরিবেশও সেখানে আর পাওয়া যাই

না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গোরখনাথ মঠ গুরুপরম্পরাক্রমে তাহার পূর্বতন গৌরব ও সাধন-ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। বৎসরের সব সময়েই তাই এখানে তীর্থকামী যাত্রী ও সাধুসন্তদের আনাগোনা। নাথযোগীদের কেন্দ্রস্থলরূপেও গোরখপুর মঠ সারা ভারতে সুপরিচিত।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কথা। ভারতীয় যোগীসমাজ গোরখপুর মঠের প্রবীণ মোহান্ত বাবা গোপালনাথজীর তখন খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। দূর-দূরান্ত হইতে আগত কত ভক্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া যোগসাধন করিয়া চলিয়াছেন।

আশ্রমের চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে নির্জন বাগবাগিচা ও অরণ্য। মধ্যস্থলে বিরাজিত সুপ্রসিদ্ধ নাথজীর মন্দির। এই মন্দিরটি ঘিরিয়া কতকগুলি ছোট ছোট সাধনকুটির। যোগসাধনব্রতী সন্ন্যাসীরা এখানে আসন স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন।

সেদিন এক সৌম্য সুদর্শন যুবক মঠের চত্বরে আসিয়া উপস্থিত। পরিধানে তাহার মূল্যবান সিল্কের শেরওয়ানি ও পায়জামা, চোখে মুখে অনন্যসুলভ মর্যাদার ছাপ। একবার দেখার পর চারুদর্শন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই তরুণকে কোনোমতে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। আশ্রমে অনেকেরই উৎসুক দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল।

প্রথমে ভক্তেরা ভাবিয়াছিলেন, যুবক কোনো ধনী গৃহের সন্তান, পুণ্যকামী বা কৌতূহলী দর্শকরূপে এই মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। দর্শনাদি শেষ হইলেই আবার স্বস্থানে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গী ও আচরণে তেমন কিছু বুঝা গেল না। নীরবে তিনি মোহান্ত নিবাসে ঢুকিলেন, ভাবতন্ময় হইয়া বহুক্ষণ বাবা গোপালনাথজীর-চরণোপান্তে রহিলেন উপবিষ্ট। তারপর যখন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন, জানা গেল, যোগীগুরুর চরণে চিরতরে তিনি করিয়াছেন আত্মসমর্পণ।

মুক্তির হাতছানি এই তরুণকে ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছে, আর সেখানে ফিরিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার ধনজনে পূর্ণ, অভাব-অনটন এবং অশান্তি কিছুই নাই। অথচ চরম বৈরাগ্যময় জীবনকে তিনি আজ গ্রহণ করিয়া বসিলেন। প্রবীণ সাধকদের সতর্কবাণী কৃচ্ছ্রব্রত ও যোগসাধনার দুর্গম পথের কথা—সব কিছুই তাঁহার কানে পৌঁছিল, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করিল না।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই তরুণ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাকেই বুঝিয়াছেন জীবনের চরম সার্থকতারূপে। এ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার কোনো প্রশ্নই তাঁহার কাছে নাই।

অতি অল্পকালের সান্নিধ্য ও কথাবার্তা, কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া বাবা গোপালনাথ সেদিন যুবকদের অন্তর্লোকে কোন মহাবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন তাহা কে বলিবে? কার্যত দেখা গেল, মুমুক্ষু তরুণের আত্মসমর্পণে যেমন বিলম্ব হয় নাই, যোগী গোপালনাথও তেমনি দ্বিধা করেন নাই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে।

নাথ-যোগসাধনায় দীক্ষাদানের পর গুরু এই সৌম্যদর্শন সাধকের নামকরণ

করিলেন—গম্ভীরনাথ। নাম ও নামীর একার্থ-বাচকতা খুব কম সাধকের জীবনেই এমন সার্থকভাবে, এমন অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে।

কাশ্মীর-জম্মুর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গম্ভীরনাথজী আবির্ভূত হন। বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি লালিত। ঐ দূর পল্লী অঞ্চলে তখনও শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই, তাই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

বালক কিন্তু বড় প্রতিভাবান্। মোটামুটি লেখাপড়া ও খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যার চর্চাও তিনি কিছু কিছু করিতে থাকেন। ভজন গান ও সেতার বাদনে তাঁহার বেশ দক্ষতা ফুটিয়া উঠে। দেহখানিও তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের আধার—সুঠাম ও সুদৃঢ়। প্রিয়দর্শিতা ও পারদর্শিতার এক বিচিত্র সমাহার তাঁহার মধ্যে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ভালবাসা তাঁহার উপর বর্ধিত হইত, তেমনই তিনি নিজেও এক অনাবিল প্রেমের সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া নিয়াছিলেন। গ্রামের দুঃখী ও বিপন্নদের জন্য তাঁহার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তাহাদের সেবায় ও সাহায্যদানে কোনো দিনই তাঁহার তৎপরতার অভাব দেখা যায় নাই।

গম্ভীরনাথের সংসারে প্রাচুর্য যথেষ্ট, তাই জীবনের সুখসম্ভোগের নানা দ্বারই ছিল তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত। কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন কোনো আকর্ষণই নাই। এক স্বাভাবিক বৈরাগ্যের স্রোত ফল্গুধারার মতো নীরবে জীবনের অন্তস্তলে বহিয়া যাইতেছে। সহজাত অনাসক্তি এই বালক বয়স হইতেই যেন পরিপার্শ্ব হইতে তাঁহাকে একেবারে পৃথক করিয়া দিয়াছে। সমবয়স্ক বিদ্যার্থী ও খেলার সাথীরা তাই তাঁহাকে দেখে সম্ভ্রমের চোখে।

গ্রামের অদূরে এক মহাশ্মশান। কিশোর গম্ভীরনাথের বৈরাগ্যপ্রবণ মন প্রায়ই তাঁহাকে সেখানে টানিয়া আনে। চিতাধূমসমাচ্ছন্ন শ্মশানক্ষেত্রের এক প্রান্তে আত্মভোলা হইয়া তিনি নীরবে প্রহরের পর প্রহর বসিয়া থাকেন।

জটাজূটমণ্ডিত, ত্রিশূল-করোটিধারী সন্ন্যাসীর [illegible] প্রায়ই শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হন। গম্ভীরনাথ পরম আনন্দে তাঁহাদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন। আটা, ঘি ও ধুনির কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না। অবসর পাইলেই সাধকদের পদপ্রান্তে ভাবতন্ময় হইয়া বসিয়া পড়েন। মন তাঁহার কোন্ অজানা লোকের সন্ধানে উধাও হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে একবার গিয়া বসিলে ভাবগম্ভীর গম্ভীরনাথের কোনো হুঁশই থাকে না। এক-একদিন সমস্ত রাতই নানা ধর্ম প্রসঙ্গে কাটিয়া যায়। বাড়ির লোকের তিরস্কার ও গঞ্জনা এজন্য কম সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু তবুও অভ্যাসের পরিবর্তন হয় কই?

এই ভয়াল নির্জন শ্মশানে মন তাঁহার কি এক অজানা আকর্ষণে ছুটিয়া আসে। শ্মশানচারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরিবার ফলে জীবনের মূল্যবোধটি বদলাইয়া যায়—বৈরাগ্যময় জীবনের সহিত ধীরে ধীরে স্থাপিত হয় যোগাযোগ। সমর্থ সাধকপুরুষ

দেখিলেই শ্রদ্ধাভরে তিনি তাঁহার পরিচর্যায় রত হন, সাধনরহস্য শেখার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

মুক্তির নেশা ক্রমে তাঁহার কিশোর জীবনকে চঞ্চল, অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। মনে মনে স্থির করেন, যোগসাধনার মধ্য দিয়াই পরমসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কিশোর মনে কেবলই প্রশ্ন জাগে, তপস্যার দুর্গম পথে কৃপাময় গুরুর আবির্ভাব তাঁহার জীবনে কবে হইবে? কোথায় পাইবেন তাঁহার সন্ধান?

তীব্র ব্যাকুলতা ও ঐশী কৃপা সদ্গুরুর সন্ধান অচিরেই আনিয়া দিল। গ্রামের ঐ শ্মশানে মাঝে মাঝে এক বৃদ্ধ যোগীর আগমন ঘটিত, গম্ভীরনাথও আন্তরিকভাবে ইঁহার সেবায় লাগিয়া যাইতেন। এই সর্বত্যাগী, সদা অন্তর্মুখীন সাধকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। মহাত্মাটিও কৃপাপরবশ হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিছু কিছু সাধন-উপদেশ দান করিতেন।

গম্ভীরনাথ অবশেষে একদিন ইঁহার নিকটে দীক্ষা চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বেটা, আমা হতে তোর দীক্ষা লাভ হবে না। তোর গুরু হচ্ছেন গোরখ্নাথ মঠের মোহান্ত, বাবা গোপালনাথ। সেই সিদ্ধ যোগীবরের চরণে তুই আশ্রয় গ্রহণ কর।"

মুক্তিসন্ধানী গম্ভীরনাথের জীবনের পরম লগ্নটি সেদিন নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তাই বুঝি ঈশ্বর-প্রেরিত দূতরূপে যোগী সেদিন সেই ইঙ্গিতটি দিয়া গেলেন।

হৃদয়মধ্যে এক অব্যক্ত বেদনা কেবলই গুমরিয়া মরিতেছে। এই বেদনা সেদিন উদাসী গম্ভীরনাথকে সংসার হইতে টানিয়া বাহির করিল। গৃহের স্নেহনীড়, পল্লী-জীবনের আনন্দময় পরিবেশ, সবকিছু তাঁহার কাছে সেদিন শুধু তুচ্ছ নয়, দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবা গোপালনাথ উত্তর ভারতের এক মহাসমর্থ যোগী। অসামান্য ঋদ্ধি ও সিদ্ধিরই শুধু অধিকারী তিনি নন, বহু মুমুক্ষুরও তিনি পরমাশ্রয়। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণের জন্য গম্ভীরনাথ সেদিন চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আসেন।

মহাযোগী গোপালনাথের কৃপা তাঁহার তরুণ জীবনে নূতনতর অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দিল। নাথপন্থের নিগূঢ় যোগসাধনাকে আশ্রয় করিয়া গম্ভীরনাথজী অগ্রসর হইয়া পড়িলেন তাঁহার পরম প্রাপ্তির পথে।

কিশোর সাধনার্থী যে একজন উত্তম অধিকারী, প্রথম সাক্ষাতেই তাহা বুঝিয়া নিতে বাবা গোপালনাথের ভুল হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, দেহ ও মনের প্রস্তুতির দিক দিয়া এই তরুণ সাধক যে অনন্যসাধারণ ইহাও তাঁহার দিব্যদৃষ্টির অগোচর রহে নাই। এবার যোগপন্থার সাধন ও সিদ্ধির ক্রমগুলি একের পর এক সযত্নে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। নবীন শিষ্যের সাধননিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ, এই নিষ্ঠার সহিত মিলিত হয় গুরুকৃপার সঞ্জীবনীধারা। প্রাক্তন যোগ-সংস্কারটি সাধকের অন্তরসত্তায় অতিসত্বর উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

দীক্ষা গ্রহণের পর গম্ভীরনাথজী সোৎসাহে গুরু-প্রদত্ত যোগসাধন আরম্ভ করিতে

থাকেন। কিছুদিন পরেই বাবা গোপালনাথজী তাঁহার শিষ্যের চুটিবাটা বা শিখা ছেদনের পবিত্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। নাথযোগীদের রীতি অনুযায়ী নবীন সাধককে 'অওঘর' শ্রেণীভুক্ত করিয়া নেওয়া হয়। 'নাদ, সেলি ও কৌপীন' পরিধান করিয়া তিনি গ্রহণ করেন পূর্ণ সন্ন্যাসাশ্রম। নিষ্ঠাবান্ তরুণ সাধকের জীবনে এ সন্ন্যাস এক নূতনতর তাৎপর্য নিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

প্রিয়দর্শন, তপোনিষ্ঠ গম্ভীরনাথজীকে এ সময়ে যে দেখিত সে-ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহার পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে অনেকেরই কৌতূহলের সীমা ছিল না। কিন্তু সব কিছু প্রশ্নের উত্তরে নবীন যোগীকে স্মিতহাস্যে শুধু বলিতে শুনা যাইত— "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা ?" অর্থাৎ, মায়াময় সংসারের কথা জানবার কি প্রয়োজন ?

সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবার সর্বময়কে পাইতে হইবে—এই সংকল্পের দীপশিখাটিই গম্ভীরনাথজীর অন্তরে জ্বলিতেছে অহরহ।

কিন্তু সাধনভজন ও ধ্যানের গভীরে একান্তভাবে তিনি নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিলে কি হইবে, গুরুজী তাঁহাকে কিছুকালের জন্য সেবাধর্মের কাজেই নিয়োজিত করিলেন। আশ্রমের নাথজীর অর্চনা, গুরু মহারাজের সেবাশুশ্রূষা ও অতিথি সাধু-সন্তদের আপ্যায়ন তাঁহাকে করিতে হয়। গো-মহিষের তত্ত্বাবধান ও আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশের ভারও তাঁহার উপর। মঠের নানা বৈষয়িক কাজকর্মেও এ সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত। স্বল্পবাক্, গম্ভীরমূর্তি এ তরুণ সাধককে এতটুকু সময়ের অপব্যয় করিতে কেহ কখনো দেখে নাই। দৈনন্দিন কাজগুলি নীরবে ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করার পর গুরু-উপদিষ্ট সাধনায় তিনি নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন।

মঠ-মন্দিরের জনবহুল পরিবেশে, সেবা-পরিচর্যা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে জড়িত এই তরুণ যোগী কিন্তু সদাই থাকিতেন অন্তর্মুখীন। বহিরঙ্গ জীবনের নানা চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ও প্রশান্তি তিনি লাভ করিবেন—ইহাই ছিল গুরু গোপালনাথের কাম্য।

গম্ভীরনাথের এ সময়কার সাধননিষ্ঠা ও অগ্রগতি গোরখপুর মঠের নবীন প্রবীণ সব সাধুকেই বিস্মিত করিত।

নাথযোগীদের সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি অনুযায়ী সাধকদের শেষ আনুষ্ঠানিক কাজ হইতেছে 'কর্ণবেধ'। যোগীশ্বর মহাদেব প্রতীক-রূপে গুরু মহারাজ এই সময়ে শিষ্যের কর্ণে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া দেন। এই ধরনের কুণ্ডলকে বলা হয় 'দর্শনী'। নাথ সন্ন্যাসীদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া এটি প্রবেশ করানো হয় বলিয়া তাঁহাদের 'দর্শন-যোগী'ও বলা হয়। তবে পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ লোকের কাছে ইহারা 'কানফাট্টা যোগী' নামেই বেশী পরিচিত।

গুরু গোপালনাথ এবার গম্ভীরনাথজীর কর্ণবেধ দীক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার ব্যবস্থাক্রমে প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ নাথযোগী বাবা শিবনাথজী কর্তৃক এ দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হইল।

সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠানাদি সবই তো ক্রমে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু গম্ভীরনাথজীর অন্তরের দুর্নিবার সাধন-পিপাসা নিবৃত্ত হয় কই? নিগূঢ় যোগের যে উচ্চতম স্তরে উঠিতে তিনি অভিলাষী, যে চরম অধ্যাত্ম-অনুভূতির আস্বাদ তিনি পাইতে চান, তাহা কোথায়? এই জনবহুল মঠে, এত কর্মব্যস্ততার মধ্যে বসিয়া, এ বস্তু কি করিয়া তিনি লাভ করিবেন?

শিবকল্প গোরখনাথজীর সাধনজীবনটি ছিল গম্ভীরনাথের আদর্শ। সংসার-আবেষ্টনীর বাহিরে, গহন অরণ্যে বসিয়া মহাযোগী গোরখনাথ দীর্ঘকাল রহিয়াছেন তপস্যায় মগ্ন, লাভ করিয়াছেন অসামান্য যোগৈশ্চর্য ও ব্রহ্মজ্ঞান। সেই পরম প্রাপ্তির আশায় তরুণ সাধক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তীব্রতর তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইতে আর তাঁহার বিলম্ব সহিল না।

উচ্চতর অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারগুলি একটির পর একটি খুলিয়া যাইতেছে, সাধক তাই সুদূর নির্জন স্থানে গিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় ব্রতী হইতে চাহিতেছেন। গুরু গোপালনাথজী এবার তাঁহাকে আর বাধা দেন নাই। তিন বৎসর নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিবার পর স্নেহভাজন শিষ্যকে তিনি আশ্রম ত্যাগের অনুমতি দিলেন।

অতঃপর গোরখপুর হইতে দক্ষিণ দিকে গম্ভীরনাথজী অগ্রসর হন, বিশ্বনাথধাম বারাণসী হয় তাঁহার প্রথম গন্তব্যস্থল। যুগ-যুগান্তের সাধকদের চির অভিলষিত এই তপঃক্ষেত্র। কিছুদিন এখানে থাকিয়া সাধনভজন করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ।

নিষ্কিঞ্চন যোগী শুধু একখানি কৌপীন ও কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া পথ হাঁটিতেছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা ও আশ্রয়ের জন্য তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, গ্রহণ করিয়াছেন চরম বৈরাগ্য অযাচক বৃত্তি।

পথ চলিতে চলিতে একদিন গম্ভীরনাথ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও তিনি অত্যন্ত কাতর। এমন সময় দেখা গেল, এক পূর্বপরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছেন।

নিকটে আসিয়া. গম্ভীরনাথকে তিনি অতি যত্নে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসাইলেন। তারপর সবিনয়ে কহিলেন, গত রাত্রে শ্রীনাথজী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন, 'এ স্থানে এক শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত পরিব্রাজকের আগমন হবে, তুমি তাঁর ভোজন ও সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থা করো।'

ব্রাহ্মণ তাই এমন ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিয়াছেন। বড় অযাচিতভাবে পাওয়া গেল এই আহার্য। ভোজনপর্ব শেষ হইলে গম্ভীরনাথ আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাশীতে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। এই পরম পবিত্র ভূমি, তাঁহার মতে, সর্বতীর্থের রাজা। গঙ্গাস্নান ও প্রভু বিশ্বনাথজীর অর্চনার পর দূরে নদীতীরে একটি নির্জন স্থান তিনি বাছিয়া নেন এবং ক্রমান্বয়ে তিন বৎসরকাল এখানে কঠোর যোগ সাধনায় ব্রতী হন। এ-সময়ে নানা উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি অর্জন করিতে থাকেন, শক্তিমান সাধক বলিয়াও এ অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া যায়।

ইহাব পব কৌতূহলী মানুষেব ভিড়কে আব বাধা দেওষা গেল না। যোগসাধনেব নির্জন পাবিবেশটি এভাবে নষ্ট হওযায গম্ভীবনাথজী কাশীধাম ত্যাগ কবিলেন।

এবাব তাঁহাব সাধনস্থল হয পবিত্র প্রযাগধাম। নদীব অপব তীবে, ঝূঁসিব চড়ায, জনবিবল স্থানে, এক বালুকা-গুম্ফায বসিযা শুবু হয তাঁহাব কঠোব তপশ্চর্যা।

দৈবানুগ্রহে এ সমযে মুকুটনাথ নামক এক তবুণ সাধু যেন কোথা হইতে এখানে আসিযা উপনীত হন। অধ্যাত্মসাধনাব দিক দিযা নাথপন্থেবই তিনি অনুবর্তী। সাধক গম্ভীবনাথ তখন নিববচ্ছিন্ন ধ্যান-জপ ও যোগসাধনায ডুবিযা বহিযাছেন। শীতাতপ তাঁহাব মাথাব উপব দিযা চলিযাছে, দেহেব কোনো প্রযোজনেব দিকেই দৃষ্টি দিবাব তাঁহাব অবসব নাই। কি জানি কেন, তবুণ সাধক মুকুটনাথ এই ত্যাগ-তিতিক্ষামষ যোগীব প্রতি আকৃষ্ট হইযা পড়িলেন। এখন হইতে গম্ভীবনাথজীব সমস্ত পবিচর্যাব ভাব তিনি সাগ্রহে গ্রহণ কবিলেন।

গম্ভীবনাথ ধীবে ধীবে এবাব তাঁহাব যোগসাধনাব গভীবতব স্তবে ডুবিযা যাইতেছেন। অন্তবে এখন তাঁহাব তীব্র ব্যাকুলতা ও দুর্বাব সংকল্প—যোগসিদ্ধি কবাযত্ত তাঁহাকে কবিতেই হইবে। সাধন গুহাব বাহিবে এ সমযে তিনি কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ কবিতেন। বাহিবেব লোকেব সঙ্গে বাক্যালাপ দূবেব কথা, একান্ত সেবক মুকুটনাথেব সহিতও দিনান্তে তাঁহাব খুব কম কথাবার্তা হইত। যে দৃঢ় সংকল্প ও একাগ্রতা নিযা তিনি সাধনায ব্রতী হইযাছিলেন, এই সমযে তাহা অনেকাংশে সফল হইযা উঠে। একনিষ্ঠ তপস্যাব ফলে সাধনসত্তায দেখা দেয অসামান্য যোগশক্তিব বিকাশ।

প্রয়াগেব ঝূঁসি-সৈকতেব এই বালুকা-গুহায তবুণ সাধক গম্ভীবনাথ একাদিক্রমে তিন বৎসব সাধনা কবিযাছিলেন। তাবপব এ অঞ্চল তিনি ত্যাগ কবেন ও নর্মদা পবিক্রমায ব্রতী হন।

কঠোব তপস্যাব ফলে গম্ভীবনাথজী সাধনাব স্থিবভূমি লাভ কবিযাছেন। এবাব সাধকজীবনে শুবু হয ব্যাপক পর্যটনেব পালা। ভাবতেব সমতল ও পার্বত্য প্রদেশেব সর্বত্র সহজগম্য ও দুর্লভ যা কিছু তীর্থ আছে, কোনোটিব দর্শনই তিনি বাদ দেন নাই।

উত্তবকালে, পবিব্রাজক-জীবনেব বিচিত্র অভিজ্ঞতাব কথা বলিতে গিযা তিনি ইহাব কল্যাণকাবিতাব উপব জোব দিতেন। শিষ্যদেব বলিতেন—"মনে বেখো, প্রাত্যহিক জীবনেব অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখেব স্পর্শে এসে পবিব্রাজনবত সাধকেব ভ্রম ও সংশয ছুটে যায—বৈবাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবাব ফলে তাঁব দেহাত্মবুদ্ধিও ক্রমে নষ্ট হয। এইটেই হচ্ছে পর্যটনেব সব চাইতে বড় লাভ।"

পবিব্রাজনবত গম্ভীবনাথজী এবাব কিছু সমযেব জন্য গুবুধাম গোবখপুবে প্রত্যাবর্তন কবেন। ইতিপূর্বেই সিদ্ধ পুবুষ বলিযা জন-সমাজে তাঁহাব বেশ খ্যাতি বটিয়া গিযাছে, তাঁহাব ত্যাগ তিতিক্ষাব কথা সাধুসন্তদেব মধ্যেও আলোচিত হইতেছে।

প্রিয শিষ্যকে আবাব কাছে পাইযা মোহান্ত গোপালনাথজী যেমন অপাব সন্তোষ লাভ কবিলেন, আশ্রমিকদেবও তেমনি আনন্দেব অবধি বহিল না। কিন্তু জনবহুল মঠের আবেষ্টনী গম্ভীবনাথজীকে বেশীদিন ধবিযা বাখিতে পাবে নাই। পবম প্রাপ্তিব

আকাঙ্ক্ষা আজিও তাঁহার জীবনে পূর্ণ হয় নাই, নিভৃত তপস্যার জন্য তাই আবার তিনি ব্যগ্রভাবে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গয়ার নিকটেই ব্রহ্মযোনি পাহাড়। এ পাহাড়ের সানুদেশে রহিয়াছে কপিলধারা নামে এক মনোরম জনবিরল স্থান। পরিব্রাজক সেদিন এখানে আসিয়া থামিয়া পড়িলেন।

এই স্থানই কি তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধির চিহ্নিত ভূমি? হঠাৎ তাঁহার মর্মমূলে কে যেন এ স্থানের ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধনটির কথা জানাইয়া দিয়া গেল। এক অপূর্ব প্রেরণায় তিনি তখন উদ্বুদ্ধ। স্থির করিলেন, সিদ্ধির জন্য এখানেই আসন পাতিবেন।

যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যার আগে কি যেন ওতপ্রোত রহিয়াছে এখানকার ধূলিকণায় ও আকাশে বাতাসে। তিন দিকে তরুলতামণ্ডিত সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে লোকালয়মুখী সর্পিল অরণ্যপথ। নিম্নে অদূরে জঙ্গলাকীর্ণ কপিলেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান। সমগ্র অঞ্চলটিতে এক বিস্ময়কর নৈঃশব্দ্য ও নিভৃতি। দু-একটি সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণত এ অঞ্চলে স্থায়িভাবে কেহ বসবাস করিতে আসে না।

এ অঞ্চলের সাধন-ঐতিহ্য নিতান্ত কম নয়। বিষ্ণুপাদপূত গয়ার অবস্থিতি অতি নিকটে। সেখানেই সাধিত হইয়াছিল বুদ্ধ ও চৈতন্যের পরম রূপান্তর। এই পুণ্যময় পরিবেশেই গম্ভীরনাথ তাঁহার পূর্ণতর সিদ্ধির জন্য তৎপর হইলেন।

কপিলধারার এই পবিত্র পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার তপস্যার ধারাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলে। কখনো উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে, কখনো ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের গহ্বরে থাকেন তিনি আত্ম-সমাহিত। শীত বর্ষা গ্রীষ্ম—ঋতুর পর ঋতুর আবর্তন মাথার উপর দিয়া কখন চলিয়া যায়, কোনো দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অবিচল নিষ্ঠায় অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতর অধ্যায়গুলি একের পর এক তিনি উন্মোচন করিয়া যাইতেছেন।

বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু গম্ভীরনাথজী এ সময়ে বর্জন করিয়া চলিতেন। কৃচ্ছ্রব্রতী কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীর সম্বলের মধ্যে মাত্র একখানি কম্বল, নারিকেলের খর্পর ও ঝোরী বা যোগদণ্ড। সাহায্যকারী সঙ্গী বা সেবক কেহ কোথাও নাই। অন্তর্মুখী হইয়া দিনের পর দিন কেবলই ধ্যানের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন।

যোগক্ষেম বহনের ব্যবস্থাটিও যেন এ সময়ে ভগবানের অদৃশ্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইয়া গেল। আক্কু কুরমী গয়ার উপকণ্ঠবাসী এক দরিদ্র ব্যক্তি, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জন করে। এজন্য মাঝে মাঝে তাহাকে কপিলধারার অরণ্যে যাইতে হয়। হঠাৎ সেদিন সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে ধ্যানমগ্ন যোগী গম্ভীরনাথের দিব্যমূর্তি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া গেল।

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আক্কুর জীবনে এক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, নবীন তপস্বীর চরণে সে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর মধ্যে রহিয়াছে, তাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার সে তাঁহার চরণতলে আসিয়া উপবেশন করে।

ধুনির কাঠ ও আগুন সংগ্রহের ভার আক্কু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করে। প্রতিদিন সাধুবাবার জন্য কিছু ফলমূল ও দুধ না আনিলেও মন তাহার তৃপ্ত হয় না।

কে এই কাঁঠালতলবর্তী সাধক, কি তাঁহার স্বরূপ, আক্কু তাহা জানে না, কিন্তু তাহার সেবা-পরিচর্যার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। পরে তাহার ভাই মঙ্গিও গম্ভীরনাথজীর অনুরক্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে সারা কুর্মী পরিবারটিই এই সাধুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

সরল হৃদয় আক্কু ও তাহার পরিবারবর্গ, সাধুবাবাকেই তাহাদের অভিভাবক ও সুহৃদরূপে সেদিন হইতে গ্রহণ করে। দুঃখ দুর্দৈবে কোনোক্রমে বাবার নিকট অন্তরের আবেদনটি পৌঁছাইয়া দিলেই যেন তাহাদের হৃদয়ের ভার মুহূর্তে লাঘব হইয়া যাইত।

আক্কুর পরিবারের এই নিবিড় সৌহার্দ্য ও নির্ভরতা, এই সেবা ও আত্মত্যাগ গম্ভীরনাথজীকে এক নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল। শুধু এ সময়েই নয়, উত্তরকালেও দেখা যাইত, মহাযোগীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি এই দুঃস্থ অন্ত্যজ পরিবারটিকে সতত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার মনোভাবে ও আচরণে সকলের মনে হইত, এই দরিদ্র কুর্মী পরিবারের কাছে তিনি যেন চিরঋণে আবদ্ধ হইয়া আছেন।

ইহার পর গম্ভীরনাথজীর একান্ত-সেবকরূপে পর পর দেখা দেন নবীন সাধকদ্বয়—নৃপৎনাথ ও সিদ্ধনাথ। গৃহত্যাগ করার পর নৃপৎনাথ সদ্‌গুরুর সন্ধানে নানা স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন গয়ার কপিলধারায় তিনি গম্ভীরনাথজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সৌম্যদর্শন যোগীর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে হন কৃতসংকল্প।

গম্ভীরনাথজী সহসা কাহাকেও দীক্ষা দিতে রাজী হইতেন না। নৃপৎনাথকে সেদিন তাই প্রত্যাখ্যানই করিলেন। তৎসত্ত্বেও নৃপৎনাথ তাঁহাকেই গুরুজ্ঞানে একান্ত নিষ্ঠার তাঁহার সেবা-পরিচর্যা করিয়া যাইতে থাকেন। ধ্যানসমাহিত যোগীর দৈনন্দিন পরিচর্যার ভার এখন হইতে প্রধানত তাঁহার উপরই ন্যস্ত হয়।

শুধু গম্ভীরনাথের দেহের রক্ষণাবেক্ষণই নয়, তাঁহার সাধনার পথে যাহাতে কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন না আসে, সেদিকেও তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন নৃপৎনাথ। যোগীবরের সাধনভজনের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কিছু ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, রাত্রি জাগিয়া রোজ তাঁহার চতুর্দিকে তিনি পাহারাও দিতেন।

ভস্মধর ভৈরবের বেশে সজ্জিত, সেবক নৃপৎনাথের ত্রিশূল হস্তে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তু তাড়াইতে দেখা যাইত। তাছাড়া, কৌতূহলী আগন্তুকেরা যাহাতে গম্ভীরনাথজীর কাছে ভিড় না জমায় সেদিকেও তাঁহার সতর্কতার অন্ত ছিল না। অনেকেই সে সময়ে ভৈরববেশী নৃপৎনাথের ভয়ে ধ্যানমগ্ন যোগীর সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইতে সাহসী হইতো না।

গম্ভীরনাথের সাধনক্ষেত্রের নিকটে নিম্নভূমিতে খর্পর-ভৈরব নামক স্থানে নৃপৎনাথ ও সিদ্ধনাথ বাস করিতেন। যোগীবরের সেবা পরিচর্যার শেষে উভয়ে কপিলধারা

হইতে নামিয়া আসিতেন এবং নিজেদের পর্ণকুটিরে বিশ্রাম নিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে গম্ভীরনাথজীর কঠোর তপস্যা একান্ত নিভৃতে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়।

ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের স্থানে স্থানে জনবিরল গুহায় দুই-একটি করিয়া তপস্বীর আস্তানা। ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্যে গম্ভীরনাথজীর তপঃপ্রভাবের কথা প্রচারিত হইয়া যায়। এই উচ্চকোটি যোগীবরের আসনের সম্মুখে তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া জুটিতেন। বাবা গম্ভীরনাথের সান্নিধ্যে বসিয়া সাধনরত হইলে তাঁহারা নাকি অতি সহজে ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া যাইতেন।

শুধু ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের চারিপাশেই নয়, গয়া অঞ্চলেও এই সময়ে ধীরে ধীরে এই সিদ্ধ সাধকের যোগৈশ্বর্যের খ্যাতি রটিয়া যায়। কপিলধারার দিব্যদর্শন শক্তিমান্ মহাত্মার কথা তখন সাধু মহাত্মা ও ভক্ত নরনারী সবাইর মধ্যে প্রচারিত হয়।

গয়ার মাধোলাল পাণ্ডা এক ধনী ও প্রতাপশালী লোক। হঠাৎ একটি জটিল, বিপজ্জনক মামলায় তিনি একবার জড়াইয়া পড়েন। এ মামলায় হারিলে পথের ভিখারী হওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর নাই। অথচ মোকদ্দমার যে অবস্থা তাহাতে জয়ী হইবার ক্ষীণতম আশাও দেখা যাইতেছে না। আসন্ন সংকটের সম্মুখে দুই চোখে তিনি সেদিন অন্ধকার দেখিতেছেন।

মাধোলাল অবশেষে নিরুপায় হইয়া গম্ভীরনাথজীর চরণে আশ্রয় নেন, সাশ্রুনয়নে যোগীবরের কাছে আপন দুঃখের কথা নিবেদন করিতে থাকেন।

আর্তের নয়নাশ্রু বাবা গম্ভীরনাথের অন্তর স্পর্শ করিল। সান্ত্বনা দিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেটা, চিন্তা মত করো। তুমহারা ভালাই হোগা।"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মাধোলাল এ মামলায় জয়ী হন, ভরাডুবি হইতে তিনি রক্ষা পান। আর্ত ভক্তরূপে গম্ভীরনাথজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি এক প্রকৃত ভক্তে রূপান্তরিত হন। এখন হইতে যোগীবরের সেবায় তাঁহাকেই আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। এই একনিষ্ঠ ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে গম্ভীরনাথজী তাঁহাকে কপিলধারার সাধনস্থলীতে একটি যোগগুহা ও বেদী নির্মাণে অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রায় বার বৎসরের উপর যোগীবর একাদিক্রমে সেইখানেই সাধনভজন করিয়া গিয়াছেন।

যোগগুহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে গম্ভীরনাথ দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন ও সমাধিস্থ থাকিতেন। সেবকগণ এই কক্ষের বাহিরে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার জন্য রাখিয়া আসিত। ধ্যানাবেশ কাটিবার পর, প্রয়োজন বোধ করিলে গম্ভীরনাথজী উহা পান করিতেন। এভাবে অবস্থান করার সময় মহাসাধক তাঁহার গুহ্য যোগসাধনার উচ্চতর স্তরগুলি পর পর অতিক্রম করিয়া যান।

প্রথম প্রথম সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে যোগীবর তাঁহার যোগগুহার বাহিরে আসিতেন। দূর-দূরান্ত হইতে ভক্ত, মুমুক্ষু আর্তের দল সেখানে উপস্থিত হইত, দর্শনের নির্দিষ্ট সময়টির জন্য অপেক্ষা করিত। গম্ভীরনাথজী তখন প্রায়ই থাকিত অন্তর্মুখীন।

সমাধি ভাঙিলে নীরবে সমাগত জনমণ্ডলীকে আশীর্বাদ জানাইয়া আবার তিনি ঢুকিয়া পড়িতেন যোগ-প্রকোষ্ঠে।

মৌনী হইয়া একবার তিনি এ যোগগুহার মধ্যে একাদিক্রমে তিনমাস অবস্থান করেন। এ সময়কার অত্যুগ্র সাধনার ফলে অভীপ্সিত পরম বস্তু তিনি প্রাপ্ত হন, এক শক্তিমান ব্রহ্মজ্ঞপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

গম্ভীরনাথজীর সাধনসত্তায় দেখা যাইত যোগৈশ্বর্য, জ্ঞান ও প্রেমমাধুর্যের এক অপরূপ সমাহার। বিপুল সাধন-ঐশ্বর্যকে তিনি এমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে, এমন মধুর ভঙ্গিমায় বহন করিয়া চলিতেন যে, অসামান্য যোগীরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া সাধারণের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হইত না।

কিন্তু সাময়িক কালের বিশিষ্ট সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কাছে গম্ভীরনাথ-বাবার লোকোত্তর সত্তার এই বিশেষ পরিচয়টি অজানা ছিল না। বরাবর পাহাড়ের প্রবীণ নাথযোগীদ্বয়, ধনিয়া পাহাড়ের নানকপন্থী মহাপুরুষ ঠাকুরদাস-বাবা প্রভৃতি গম্ভীর-নাথজীকে অসামান্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের স্বনামধন্য ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবার মুখেও এই মহাযোগীর সাধনৈশ্বর্যের সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যাইত।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গম্ভীরনাথজীকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। যোগীবরের নিকট নানা নিগূঢ় সাধন লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলিতে গেলে গোস্বামীজীর উৎসাহের অন্ত থাকিত না। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিকট প্রায়ই তিনি বলিতেন, "বাবা গম্ভীরনাথজী পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ। ঐশ্বর্য-ভাবে সিদ্ধিলাভ করবার পর এখন তিনি মাধুর্যে ডুবে গিয়েছেন।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় যোগীবর গম্ভীরনাথ ও গোস্বামীজী সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন,—"আকাশগঙ্গার আশ্রমে আমরা শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত নিস্তব্ধ নীরব—জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। মাঝে মাঝে আমরা শুনিতে পাইতাম, কে পাহাড়ের শৃঙ্গে একটা দুইটার সময় সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেছেন। গোঁসাইজী আমাদিগকে বলিতেন, 'ঐ শুনুন, বাবা গম্ভীরনাথজী কি মিষ্ট ভজন করিতেছেন।' কোনো কোনোদিন ঐ ভজন শুনিয়া তিনি একাকী নিশীথ সময়ে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন। দুই এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঠাকুর বলিলেন, "বাবা বড় প্রেমিক এবং শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা। হিমালয়ের নিচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্র জন্তু রয়েছে, কিন্তু বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কেউ তাঁর অনিষ্ট করে না।"

বাবা গম্ভীরনাথ ও গোস্বামীজীর মিলনের মধুর আলেখ্য আঁকিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা লিখিয়াছেন,- "শ্বাপদসংকুল গয়ার পাহাড়ে নির্জন কপিলধারার শৃঙ্গে বসিয়া গম্ভীরনাথজী গভীর রাতে সেতার বাজাইয়া ভজন গান করিতেন, আর আকাশগঙ্গার পাহাড় হইতে গোঁসাইজী সঙ্গিগণকে ফেলিয়া বন জঙ্গল কাঁটাকাঁকর অগ্রাহ্য

করিয়া উন্মত্ত মনে ছুটিয়া আসিতেন। এ কিসের প্রেম! কিসের টান। কোন্ প্রেমে ইহারা বাঁধা পড়িয়াছেন? এ বন্ধনের সূত্র কোথায়? কোন্ মালাকার মাঝখানে আসিয়া দুইটি হৃদয় এমন করিয়া বাঁধিয়াছেন? এ পুণ্য কাহিনী শুনিলেও জীবের ধর্ম হয়, পলকের জন্য হৃদয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়।"

উত্তর ভারতের বহু মহাত্মা ও সার্থকনামা যোগী গম্ভীরনাথজীর সঙ্গ এবং সৌহার্দ্য কামনা করিতেন। গঙ্গোত্রীর বাবা সুন্দরনাথ ইঁহাদের অন্যতম। এই শক্তিমান্ মহাপুরুষ যোগবলে একই সময়ে বিভিন্নস্থানে সশরীরে উপস্থিত হইতে পারিতেন। বাবা গম্ভীরনাথের সহিত ইহার নিবিড় সখ্য ছিল, তাঁহাকে দর্শনের জন্য এই মহাপুরুষ মাঝে মাঝে গোরখ্পুরেও উপনীত হইতেন।

আপন যোগৈশ্বর্যকে গম্ভীরনাথজী সচরাচর প্রকাশ করিতেন না। তত্ত্বদর্শী মহাযোগী এ সকল শক্তি-বিভূতিকে বলিতেন—প্রপঞ্চ। কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন যোগীবরের যোগবিভূতি লীলা-স্থানবিশেষে মাঝে মাঝে প্রকট হইয়া পড়িত। সূর্যালোকের মতোই নিতান্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে যোগৈশ্বর্যের এ দীপ্তি ঝলমল করিয়া তুলিত মহাপুরুষের সমগ্র পারিপার্শ্বকে।

কুরমী ভ্রাতৃদ্বয়, আক্কু ও মুন্নি দীর্ঘদিন বাবা গম্ভীরনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তাহাদের সমগ্র পরিবারটিই প্রাপ্ত হয় এই কৃপালু মহাপুরুষের চরণাশ্রয়।

একবার বাবার প্রিয় ভক্ত আক্কু কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, বাঁচিবার কোনো আশাই থাকে না। অবশেষে একদিন দেখা যায়, রোগীর দেহে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজনেরা এবার সৎকারের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়া পড়িল। আক্কুর ছোট ভাই মুন্নি কিন্তু শোকার্ত হইয়া আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না, উন্মাদের মতো ছুটিতে ছুটিতে সে গম্ভীরনাথজীর আসনের সম্মুখে গিয়া পতিত হইল।

মহাপুরুষের চরণ দুইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "বাবা, তোমার একান্ত সেবক আক্কু মারা গিয়েছে। বাবা, তুমি কি তাঁকে আর ভালোবাসো না? আমরা তো জানি তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। কৃপা ক'রে তুমি তাকে আবার বাঁচিয়ে তোল?"

ধ্যানমগ্ন মহাযোগী এবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। আর্তের আকুল ক্রন্দনে মুহূর্ত মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এক করুণাঘন মূর্তি। শব সৎকার থামাইতে আদেশ দিয়া মুন্নিকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চলিয়া গেলেন আক্কুর শয্যাপার্শ্বে।

ভক্তের দেহটি স্পর্শ করিবার পর গম্ভীরনাথজী কমণ্ডলু হইতে কয়েক ফোঁটা জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল আক্কুর প্রাণস্পন্দন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। অতঃপর ধীরে ধীরে সে চক্ষু মেলিয়া শয্যার পাশ ফিরিল।

সেদিনের এ চিকিৎসাটির মতো পথ্যদানের ব্যবস্থাও বড় বিচিত্র। আক্কুর জন্য তখনই খিচুড়ি পথ্যের নির্দেশ দিয়া যোগীবর গম্ভীরনাথ কপিলধারার আসনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই কৃপালীলার পর আফু আরও বহুদিন বাঁচিয়াছিল।

কপিলধারায় গম্ভীরনাথজীর আসনের সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে মহাযোগীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া উহা যে কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সাধারণত এটির আগমন ঘটে একান্ত নিভৃতে।

একদিন কিন্তু এই ব্যাঘ্রপুঙ্গব বহুজন সমক্ষেই আসিয়া হাজির। গম্ভীরনাথজী সেদিন ভক্ত ও সাধুজন পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এই হিংস্র বাঘের আগমন সকলকে ভীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিল। বাবা তৎক্ষণাৎ সকলকে আশ্বাস দিয়া শান্তস্বরে কহিলেন, "আপনারা শঙ্কিত হইবেন না। স্থানত্যাগের জন্য ব্যস্ত হবারও কোনো প্রয়োজন নেই। ইনি ব্যাঘ্ররূপী এক মহাপুরুষ। সকলে কিছুক্ষণ একটু চুপ করে বসে থাকুন।"

নিজ নিজ আসনে বসিয়া সবাই ভীত বিস্ময়মিশ্রিত নয়নে এই ভয়ংকর জীবটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর ব্যাঘ্রটি একদৃষ্টিতে কিছুকাল যোগিবরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অরণ্যের ব্যাঘ্রের সহিত গম্ভীরনাথজীর বরাবরই এ ধরনের সখ্য অন্তরঙ্গতা ছিল। এ ঘটনার পরও মাঝে মাঝে তাহার সান্নিধ্যে এক একটি ব্যাঘ্র আসিয়া জুটিত, উহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তখন বুঝা যাইত না যে, নরখাদক পশুর হিংস্র প্রবৃত্তি একটুও অবশিষ্ট রহিয়াছে। মনে হইত উহারা বাবার পোষা জীব।

উত্তরকালেও গোরখপুর মঠের পিঞ্জরে গম্ভীরনাথজীর এক পোষা ও অনুগত বাঘকে দেখা যাইত। উহার সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থা সম্পর্কে মহাপুরুষের সতর্কতার অন্ত ছিল না। পরিচারকদের অসাবধানতার জন্য এক একদিন উহা পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পড়িত। গম্ভীরনাথজীর সঙ্গে এই বাঘটির গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল, ছুটিয়া আসিয়া তিনি কহিতেন, "ওরে, তোর ভয়ে যে আশ্রমে সাধুরা চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে! এবার তুই শান্ত হয়ে খাঁচার ভেতর ঢুকে পড়তো দেখি।"

অতঃপর সস্নেহে ব্যাঘ্রের কানটি ধরিয়া তিনি উহাকে লৌহ পিঞ্জরের দিকে টানিয়া নিতেন। আনন্দে লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে সে তখন প্রবিষ্ট হইত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে।

মন্নুলাল ধার্ডাওয়ালা নামক এক গোয়ালার পাগলামিতে সকলে একবার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে সাধুদের উপরও সে অত্যাচার করিতে ছাড়িত না।

একদিন সে কপিলধারায় আসিয়া সাধু মহাত্মাদের উপর উপদ্রব করিতেছে, এ সময়ে বাবার কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। হঠাৎ মন্নুলালের গালে সজোরে তিনি দুইটি চপেটাঘাত করিলেন। ইহার ফলে পাগলের সেদিনকার অত্যাচারই শুধু নিবারিত হইল না, চিরতরেই সে একেবারে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। অতঃপর বহু বৎসর ব্যাপিয়া স্বাভাবিকভাবে সংসারের কাজকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য চালাইয়া যাইতে মন্নুলালের কোনো অসুবিধা হয় নাই।

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় একবার দাঙ্গা বাধিয়া যায়। কি এক কারণে উত্তেজিত হইয়া বৈষ্ণব নাগা সাধু দল যোগী এবং সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ শুরু করে।

মেলাক্ষেত্রে সেদিন এক রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়, যোগীদের অনেকে আহত হইতে থাকেন।

যোগী সম্প্রাদায়ের অন্যতম নেতা বাবা গম্ভীরনাথজী তখন সেই অঞ্চলেই ছাউনি করিয়া আছেন। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষের কানে এই উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কোনো সংবাদই প্রবেশ করে নাই। লাঠি ও চিমটাধারী নাগার দল যখন একেবারে তাঁহার ছাউনির ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখনও তিনি নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন।

এ সময়ে একজন ভক্ত তাঁহার আসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারাজ, চেয়ে দেখুন কি বিপদ। ওরা সবাই মারমুখী হয়ে ছাউনিতে ঢুকেছে।"

গম্ভীরনাথজীর ধ্যান এবার ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস। শান্তি করো শান্তি করো।"

মুহূর্তে কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আক্রমণকারী নাগাদের উপর কে যেন হঠাৎ এক অঞ্জলি অলৌকিক শান্তিবারি ছিটাইয়া দিয়াছে। গম্ভীরনাথজীর কথা কয়টি শোনা মাত্র তাহাদের উত্তেজনা একেবারে অন্তর্হিত হয়। লাঠি, চিমটা প্রভৃতি নামাইয়া নত মস্তকে ধীরে ধীরে তাহারা স্থান ত্যাগ করে।

যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির যতটুকু প্রকাশ গম্ভীরনাথজীর জীবনে দেখা গিয়াছে তাহা একান্তভাবে কৃপারূপেই তাঁহার আশেপাশে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সাধারণত এসব কিন্তু তিনি নিতান্ত সতর্কতার সহিতই আবরিত করিয়া রাখিতেন। অলৌকিক শক্তির পরিচয় লাভেচ্ছু ভক্তদের কাছে যোগীবর নিজের সহজ ও লৌকিক পরিচয়টিই বেশী করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিতেন।

একটি গৃহস্থ শিষ্য ত্যাগ ও সেবানিষ্ঠার দিক দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গুরু গম্ভীরনাথজীর জন্য অকাতরে তিনি পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য অর্থব্যয়ও তাঁহাকে কম করিতে হয় নাই। এই দীর্ঘ সেবা-পরিচর্যার মধ্যে একদিনের জন্যও ঐশ্বর্যগোপনপ্রয়াসী গম্ভীরনাথজীর অলৌকিকত্ব তাঁহার চোখে পড়ে নাই। এ জন্য শিষ্যটির মনে বড় খেদ ছিল।

একদিন তিনি বাবার যোগবিভূতির লীলা দর্শনের জন্য তাঁহাকে খুব ধরিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস আছে, ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়া এতদিন যেভাবে বাবার সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহাতে কখনও তাহার এ অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না। গম্ভীরনাথজী দেখিলেন, শিষ্যের মধ্যে সেবার অভিমান দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সংশোধন দরকার। তাই ইচ্ছা করিয়াই সেদিন তিনি নাথসম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন কাহিনী তাঁহার কাছে বর্ণনা করিতে থাকেন। কাহিনীটি এইরূপ

মহাযোগী গোরক্ষনাথজী একবার দীর্ঘকাল তপস্যারত ছিলেন। এ সময়ে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তাঁহাকে রোজ পায়সান্ন রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। বহুদিন পরিচর্যার পর এই সেবক ব্রাহ্মণটির কৌতূহল জন্মে, তিনি যোগীবরের যোগ

বিভূতিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহার ধারণা একনিষ্ঠ সেবাদ্বারা গোরখনাথজীর তিনি প্রীতিভাজন হইয়াছেন, তাই তাঁহার এ অনুরোধ তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

গোরখনাথ দেখিলেন, ভক্তের মনের মধ্যে সেবার 'অহং' জাগ্রত হইয়াছে, অবিলম্বে ইহা উৎপাটন করা দরকার। তখনই তিনি বিপুল পরিমাণ দুগ্ধ, চাল ও চিনি উদ্‌গিরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এত বৎসর ধরে যে পায়সান্ন তুমি আমায় ভোজন করিয়েছো—দ্যাখো, তার সমস্ত কিছু উপকরণই পৃথক পৃথক এখানে উঠে এসেছে।"

বলা বাহুল্য এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণটি ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। সেবানিষ্ঠার যে অহমিকা তাঁর মধ্যে উদগ্র হইয়াছিল সেদিন তাহা চূর্ণ হয়।

নিজের শিষ্য ও ভক্তদের কল্যাণের জন্য গম্ভীরনাথজীর উপরোক্ত আখ্যায়িকাটি অনেক সময় বিবৃত করিতেন। গুরুজীর যোগবিভূতি দর্শনের কৌতূহল যাহাদের মধ্যে দেখা দিত অতঃপর আর তাঁহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেন না।

কপিলধারার শান্ত সমাহিত জীবন ছাড়িয়া গম্ভীরনাথজী মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতেন। যত দূর, দুর্গম বা বিপদসংকুলই হোক না কেন, ভারতের কোনো তীর্থই তাঁহার অজানা ছিল না। এক এক বারের পর্যটন সাঙ্গ করিয়া আবার তিনি গয়া অঞ্চলেই প্রত্যাবর্তন করিতেন।

তাঁহার আশ্রমটিতে অতঃপর নানা কারণে ভক্তজনের সমাগম বৃদ্ধি পায়। নিভৃত তপস্যাস্থলীতে ক্রমে মন্দির ও বাসভবন প্রভৃতি নির্মিত হইতে থাকে। এ সময়ে কপিলধারার পরিবেশটিকে তিনি আর তেমন নির্জনবাসের উপযুক্ত মনে করিতেন না। ভক্ত মাধোলাল তাই যোগীবরের জন্যে রামশীঘাটে একটি নির্জন বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়া দেন। তীর্থাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগীবর, বেশীর ভাগ সময় এই উদ্যানেই আসন বিছাইতেন।

নিতান্ত সাধারণভাবে সাধু ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চলাফেরা করিলে কি হয়, গম্ভীরনাথজীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে প্রকট হইয়া পড়িত। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কোন্ ফাঁকে সহসা জনতার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তাহার ঠিক ছিল না।

একবার গম্ভীরনাথজী আট-দশজন সঙ্গী সন্ন্যাসীসহ উদয়পুরে গিয়াছেন। একটি জনবিরল মাঠের প্রান্তে পৌঁছিয়া সকলে ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিলেন।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা আকাশ জুড়িয়া ঝড়ের মাতামাতি শুরু হইয়া যায়। প্রবল বর্ষণের ফলে চারিদিক একেবারে জলে জলময় হইয়া গেল। কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, বাবা গম্ভীরনাথ ময়দানের যে অঞ্চলে উপবিষ্ট সেখানে এক বিন্দু বারিও পড়িতে দেখা যায় নাই। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা গম্ভীরনাথজীর মাহাত্ম্য জানিতেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, এ অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটিয়াছে এই শক্তিধর মহাপুরুষেরই যোগশক্তির প্রভাবে।

এ ঘটনার পর যোগীবরের খ্যাতি সে অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং জনসমাগমের ফলে সন্ন্যাসীদের সেখানে তিষ্ঠানো দায় হয়।

ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত। উদয়পুরের মহারানার কানে এই যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের কথাটি পৌঁছিয়াছে। নিজ প্রাসাদে গম্ভীরনাথজীকে লইয়া যাইবার জন্য বার বার তিনি লোক পাঠাইতেছেন। রাজদূতকে যোগীবর জানাইয়া দিলেন, কোনো গৃহস্থের আবাসে আজকাল আর তিনি পদার্পণ করেন না।

আক্কু কুরমীর গৃহে একবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা করিতে হইয়াছিল ভক্তের প্রাণদানের তাগিদে।

মহারাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াও বিপদ এড়ানো গেল না, শোনা গেল, তিনি নিজেই যোগীবরের নিকটে আসিতেছেন। এ সংবাদ শুনিবামাত্র বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ উদয়পুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যেও গম্ভীরনাথকে পৃথক করিয়া না দেখিয়া উপায় ছিল না। যে-কোনো সাধুসন্তের মেলা ও পঙ্গতে তিনি উপস্থিত হইতেন, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন তাঁহার নেতৃত্বটি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত।

প্রসিদ্ধ সাধক, বাবা গোকুলনাথজী তাঁহার জীবনের স্মৃতিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমার পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে সারঙ্গকোটের যোগীদের শিষ্য ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমার পিতার সঙ্গে সারঙ্গকোটের পীর এলাচীনাথের ভাণ্ডারায় গিয়া শুনিলাম যে, একজন 'রাজা যোগী' অমরনাথ হইতে আসিয়াছেন। আমিও পিতার সঙ্গে এই রাজা যোগীকে দেখিতে গেলাম। সেই ভাণ্ডারায় বারো শত জন সাধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গম্ভীরনাথ বাবাকে এক রাজা যোগীর মতোই সেদিন আমার মনে হইতেছিল।"

গৃহস্থ, তীর্থযাত্রী অথবা সাধু-সন্ন্যাসী যাঁহার কাছেই যোগীবর যাইতেন, তাঁহারই অন্তস্তলে প্রবাহিত হইত এক দিব্য আনন্দের স্রোত। তাঁহার সদা প্রসন্ন, দিব্য মূর্তিটি হইতে সতত ঝরিতে থাকিত অপার মাধুর্য ও শান্তির ধারা।

একবার পুরীধামে জটিয়া বাবার আশ্রমে বাবা গম্ভীরনাথ কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যগণ বাবার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণেই তিনি উপস্থিত হন এবং তাহাদের সেবায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।

এ সময়ে গম্ভীরনাথজীর সান্নিধ্য আশ্রমিকদের মধ্যে যে কল্যাণ-ধারা উৎসারিত করে তাহা সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"তখন যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি ইহা তাঁহারই কৃপায় চিরদিনের তরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আশ্রমের সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া মাঝে মাঝে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তাহার নিকট বসিলেই অনুভব হইত, আমার গুরুদত্ত 'নাম' আপনা-আপনি স্রোতোবেগে চলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিতেন—যাও, এখন সেবার কার্যে যাও।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রয়াগের কুম্ভমেলার (১৮৯৩) কথাপ্রসঙ্গে মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর এক মনোজ্ঞ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যেরূপ তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ ভিজাইয়া দেন,

তাহার বর্ণনা সম্ভব হয় না। ইনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী। সাধুরা ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানেন। ইনি বহু শিষ্য সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একদিন একজন ধনী ইঁহার আসনের নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। বাবা গম্ভীরনাথ তখন ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, রাশীকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলি ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন—যাহাদের দরকার আছে, তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও। তখনই সমস্ত বিতরণ করা হইয়া গেল।"

শক্তিধর মহাযোগী হইয়াও গম্ভীরনাথজী ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন এক সহজ সুন্দর প্রেমিক পুরুষ। জাগতিক জীবনের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের মধ্যে তাঁহার করুণাঘন রূপটিকেই সর্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যাইত।

এক সময়ে গয়ার পাহাড়ে তাঁহার ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লোকসমাগমের ফলে এখানে মাঝে মাঝে তস্করের উপদ্রবও দেখা দেয়। একদিন নিশীথ রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত ঢিল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ভক্তেরা সকলেই বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বাবা গম্ভীরনাথের কানে এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। নির্বিকার মহাপুরুষ ধীর পদক্ষেপে দুর্বৃত্তদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা এমন ক'রে ঢিল ছুঁড়ছো কেন? এসো, তোমাদের যা খুশী তা-ই আশ্রম থেকে নিয়ে যাও। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।"

সেবক-শিষ্য নৃপেন্দ্রনাথ গুরুজীর আদেশে ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তস্করের দল ব্যাপার দেখিয়া ততক্ষণে কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লোভ তাহাদের প্রবল—অপহরণের এমন সুযোগই বা হঠাৎ কি করিয়া ছাড়ে? ধীরে ধীরে তাহারা আশ্রমে প্রবেশ করিল। অতিথিদের সেবার জন্য যাহা কিছু তৈজসপত্র, ঘি-আটা ফলমূল ও কম্বল প্রভৃতি ছিল তাহা তড়িতগতিতে সংগ্রহ করিয়া তাহারা ফিরিয়া চলিল। সদলবলে প্রস্থানের পূর্বে বহুলখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা গম্ভীরনাথজীকে প্রণাম করিতে এবং তাঁহার আশীর্বাদ নিতে কিন্তু তাহাদের ভুল হয় নাই।"

তস্করদের প্রতি করুণা ও সমবেদনায় মহাপুরুষের অন্তর তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। স্নেহরুদ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "বেটা, তোমরা সত্যই অভাবগ্রস্ত, দুঃখে পড়েই এসব দুষ্কর্ম করছো, সবই বুঝতে পারছি। আবার দশ-পনের দিন পরে এসো, আজকের মতোই কিছু কিছু জিনিসপত্র সেদিনও মিলবে। কিন্তু লোকের ওপর অযথা দৌরাত্ম্য কখনো করো না।"

দিব্য করুণার এই স্পর্শ দুর্বৃত্তদের অভিভূত করে এবং সেস্থান হইতে নত শিরে ধীরে ধীরে তাহারা প্রস্থান করে।

ভক্ত মাধোলাল বাবার আশ্রমের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাইয়া থাকেন। পরদিনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি নূতন তৈজসপত্র এবং চাল-ডাল-ঘি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবার হইতে ঐ চোরের দল কিন্তু অভাবে পড়িলেই মাঝে মাঝে বাবা গম্ভীরনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। যোগীবর যেমনি তাহাদের প্রয়োজনীয়

দ্রব্যাদি বিতরণ করিতেন, ভক্তপ্রবর মাধোলালেরও তেমনি আশ্রম ভাণ্ডারের ক্ষতি পূরণ করিতে দেরি হইত না।

মাধোলালকে বার বারই এরূপ অনাবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। একদিন গম্ভীরনাথজীর এ বিষয়ে হুঁশ হইল। কহিলেন, তিনি নিজে স্থানান্তরে না গেলে তো এ ব্যয়বাহুল্য কমানো কখনো সম্ভব হইবে না—তাই এবার গয়া অঞ্চল ত্যাগেরই সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়াছেন।

ভক্ত মাধোলালের নয়ন দুটি এবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। যুক্তকরে যোগীবরকে বলিলেন, "বাবা, শুধু এজন্যই আপনি আসন ত্যাগ করে অন্যত্র যাবেন! তাও কি কখনো হয়? তাছাড়া, চোরের দল আর কতই বা নেবে? আপনি এ নিয়ে মোটেই ভাববেন না।"

আর একদল তস্কর সেবার আশ্রমে উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয় সেদিন তাহাদের দিবার মতো কোনো কিছু জিনিসপত্র সাধুদের কাছে একেবারেই ছিল না। অগত্যা নিজের ব্যবহারের কম্বলটি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গম্ভীরনাথ মহারাজ কহিলেন, "দ্যাখো, আজ তো এদের দেবার মতো বিশেষ কিছুই নেই, তোমরা বরং আমার এই কম্বলটিই নিয়ে যাও।"

তস্করের দল কি জানি কেন, মহাপুরুষের ব্যবহৃত কম্বলটি গ্রহণ করিতে তেমন উৎসাহ দেখায় নাই, নীরবে তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিয়া যায়।

সবেমাত্র কিছুটা দূরে তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় একটি নূতন সাধু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাক, ভাগ্য খুব ভালো। আমাদের কাছে যে কয়টা টাকা রয়েছে, তার সন্ধান ওরা পায় নি। বেঁচে গিয়েছি বাবা।"

এ সাধুটি ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী নবাগত অতিথি, তাঁহারা গম্ভীরনাথের আশ্রিত বা ভক্তদের মধ্যে কেহ নহেন। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বাহির হইয়া কয়েক দিনের জন্য এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। গম্ভীরনাথজী কিন্তু এই অতিথিদেরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। কথা কয়টি শোনামাত্র দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "যাও এখনি ছুটে যাও। সব কয়টা টাকা ওদের দিয়ে এসো।"

এ আদেশ অমান্য করিবার সাহস সাধুদের নাই। ইঁহাদের একজন তখনই ছুটিয়া গিয়া ঐ তস্করদের হাতে টাকা পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

গুরু গোপালনাথজীর মহাপ্রয়াণের পর গম্ভীরনাথজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বলভদ্রনাথজীর আশ্রমের মোহান্তের পদে বৃত হন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুই শিষ্য দিলবরনাথজী ও সুন্দরনাথজী গদিতে আরোহণ করেন।

ইতিমধ্যে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে বাবা গম্ভীরনাথের খ্যাতি সাধুসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। কুম্ভমেলায় সমাগত প্রবীণ যোগী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তিনি কম স্বীকৃতি লাভ করেন নাই। তাই নাথযোগীদের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছিলেন, মোহান্ত পদ গ্রহণে তাঁহাকে কোনোক্রমে সম্মত করাইতে পারিলে ভাল হয়। ইহার ফলে শুধু

সম্প্রদায়ের মর্যাদাই বাড়িবে না, গোরখনাথজীর সাধনপীঠের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

কিন্তু এই বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীকে গদি আরোহণে সম্মত করাইবে কে? বিশিষ্ট নাথপন্থী সাধকেরা প্রায়ই তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব নিয়া উপস্থিত হইতেন, নানা যুক্তি দেখাইয়া মিনতিও করিতেন।

কিন্তু সব কিছু শুনিবার পর যোগীবর গম্ভীর বদনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন—“নহী।”

ক্ষুণ্ণমনে সবাইকে নিরস্ত হইতে হইত।

গম্ভীরনাথের আশ্রয়লাভের জন্য প্রায়ই ভারতের দূর দূরান্ত হইতে বহু সাধকের আগমন ঘটিত। কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে দীক্ষা পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কখনো কেহ বেশী অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকিলে ভর্ৎসনার সুরে তিনি বলিয়া উঠিতেন, “ক্যা, মৈঁ এক পল্টন বনায়েঙ্গে?”—অর্থাৎ, তোমাদের কি ইচ্ছা যে এবার আমি একটা ফৌজ গঠন শুরু করি।

কিন্তু ঈশ্বরীয় বিধান উত্তরকালে তাঁহাকে এই ‘পল্টন’ গঠনে কিছুটা নিয়োজিত করে। কপিলধারার অরণ্য পরিবেশে সাধন-সমাহিত না থাকিয়া গম্ভীরনাথজী গোরখপুর মঠে স্থায়িভাবে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া বহু লোক তখন কৃতার্থ হয়।

গোরখপুর মঠের মোহান্ত সুন্দরনাথ ছিলেন তরুণ ও অব্যবস্থিতচিত্ত। সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে, মন্দিরের পূজা ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি দায়িত্বভার সবই ন্যস্ত ছিল তাঁহার উপর। কিন্তু এ দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মঠের সম্পত্তি পরিচালনায়ও নানা বিশৃঙ্খলা তখন ঘটিতেছিল। সকলে মিলিয়া এ দূরবস্থার কথা বার বার তাঁহারা গম্ভীরনাথের কানে তুলিতে লাগিলেন।

গুরুধামের এই সংকেটর কথা শুনিয়া আর তাঁহার দূরে থাকা চলিল না। সুন্দরনাথ-জীকে মোহান্ত পদে রাখিয়া তিনিই তাঁহার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মঠের কাজ এখন হইতে তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৯০৬ সাল হইতে স্থায়িভাবে গম্ভীরনাথজী গোরখপুর মঠে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং গোরখনাথজীর মন্দিরেই তাঁহার সাধন আসনটি স্থাপিত হয়। ফলে, উত্তর ভারতের বহু সাধক ও মুমুক্ষুর জীবনে তাঁহার কৃপা ধারা বিস্তারিত হইবার সুযোগ পায়।

মোহান্ত না হইয়াও বাবা গম্ভীরনাথ মঠের অধ্যক্ষরূপে সমস্ত কিছু কাজকর্ম নির্বাহ করিতেন। মঠের দৈনন্দিন পরিচালনায় চাঞ্চল্য ও বৈষয়িক জটিলতার অবধি নাই, অথচ নির্বিকার মহাপুরুষ নিতান্ত অবলীলায় সমস্ত কিছু দেখাশোনা ও পরিচালনা করিতেন। সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব, গৃহস্থদের উপদেশ দান, সাধু-মহাত্মাদের সেবা প্রভৃতি কর্তব্য যেমন অনায়াসে করিতেন, তেমনই প্রজাদের দুঃখকষ্ট ও নানা-প্রকার খুঁটিনাটি অভিযোগের সমাধানেও তাঁহাকে কম তৎপর দেখা যাইত না। এত

কিছু কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও তাঁহার নির্বিকার সদাপ্রসন্ন রূপটি ফুটিয়া উঠিত এক অপরূপ মহিমায়।

মহাযোগীর দ্বৈতসত্তার এই রূপটি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "যাহার নেতৃত্বাধীনে এতবড় একটা বিরাট সংসার এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল, তাঁহার দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করা যাইত তখনই দেখা যাইত তিনি আত্মস্থ, তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে মোটেই নাই। তিনি যেন একটি নির্বিকার শান্তির এবং তরঙ্গবিহীন পরিপূর্ণ আনন্দের এক প্রতিমূর্তিরূপে এই বিকারময় সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কর্মচারিগণ বৈষয়িক কাজকর্মের নিবেদন করিতেছে—মনে হইত যেন ভক্ত নিজ মনে দেবপ্রতিমার নিকটে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেছে। বলা শেষ হইল, তিনি সব কথা শুনিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন। তিনি শুধু একটি 'হাঁ' 'নহী' কিংবা 'আচ্ছা' অথবা প্রয়োজনানুরূপ দু-একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলেন।

"এইরূপ—কখনও ভৃত্য আসিয়া হয়তো আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোনো কোনো দরিদ্র ভিক্ষুক সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোনো আগন্তুক আশ্রমে অতিথি হইয়াছে, কখনও সাধুগণ বাদবিসংবাদ করিয়া মীমাংসার জন্য তাঁহার শরণ লইয়াছে, একই সময়ে হয়তো বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার দরবার লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি কিন্তু অর্ধবাহ্য অবস্থাতেই মৃদুভাবে দু-একটি কথায়—যাহাকে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া, যাহাকে যাহা দেয় তাহা দিয়া, অতিথি-অভ্যাগতদিগের যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিয়া, আবার আত্মস্থ হইতেন। অথচ ইহাতেই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত। তাঁহার প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না, সকলের প্রতি, সকল কর্তব্যের প্রতি তাঁহার চক্ষু যেন অনবরত ধাবিত হইতেছে—অথচ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায় সর্বদাই দেখা যাইত যে সে চক্ষু নিমীলিত বা অর্ধনিমীলিত।"

মঠাধ্যক্ষরূপে গম্ভীরনাথজীর জীবন ছিল নিতান্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। পরিধানে তাঁহার থাকিত কৌপীন ও তাহার উপর একখণ্ড শুভ্রবস্ত্র। গায়ে শুধু আর একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো। পাদুকারূপে সর্বদা তিনি একজোড়া কাঠের খড়মই ব্যবহার করিতেন।

বর্ণ ছিল তাঁহার চম্পকের মতো, সারাদেহে অপূর্ব লাবণ্যের শ্রী। সুঠাম, সমুন্নত যোগীদেহে এক অপূর্ব ঋজুতা। স্কন্ধ বাহিয়া গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার নামিয়া আসিয়াছে। প্রশান্ত, দিব্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজিতে শোভিত। হঠাৎ দেখিয়া কে বলিবে, ইনিই মহাশক্তিধর যোগীবর বাবা গম্ভীরনাথ? নূতন দর্শনার্থীদের মনে হইত, ইনি হয়তো সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঘরের এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক।

তরুণ মোহান্ত যে দোতলা ভবনটিতে অবস্থান করেন, তাহারই নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাবা গম্ভীরনাথের বাস। সম্মুখের তক্তাপোশের উপর বিস্তারিত রহিয়াছে শুধু একটি কম্বলের শয্যা। ঐ প্রকোষ্ঠটিতে তিনি সমাধিস্থ অথবা অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করেন। আবার এটিই এক এক সময় হইয়া দাঁড়ায়

তাঁহার মঠ পরিচালনার অফিস। এখানেই নানা দিগ্‌দেশাগত ভক্তবৃন্দকে যোগীবর দর্শন ও উপদেশ দান করেন।

নিজের ভোজনব্যবস্থার মধ্যে কোনোপ্রকার পার্থক্য বা বিশিষ্টতা রাখিতে গম্ভীরনাথ সম্মত হইতেন না। নাথজীর ভাণ্ডারা প্রস্তুতের পর সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য যে আহার্য তৈরি হইত, তাহাই তিনি প্রতিদিন গ্রহণ করিতেন।

সন্ধ্যারতির শেষে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি গুরু গোপালনাথজীর সমাধি-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিতেন। ভক্ত, মুমুক্ষু এবং অভ্যাগতেরা প্রধানত এই সময়েই লাভ করিত তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্য। সারা দেহ মন তাঁহাদের অভিসিঞ্চিত হইত মহাপুরুষের কৃপাপ্রসাদ ও কল্যাণধারায়।

মঠের অতিথিসেবার দিক দিয়া গম্ভীরনাথজীর ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ধরিবার উপায় ছিল না। সাধু ও গৃহী নানাশ্রেণীর অভ্যাগতই সর্বদা মঠে আগমন করিতেন, ইহাদের ভোজন ও শয়নের যে-কোনো খুঁটিনাটি ব্যাপারের তত্ত্বাবধানে কোনোদিন তাঁহার ভুল হইতে দেখা যায় নাই। আশ্রমের এক কোণে কোনো নবাগত ভক্ত বা অতিথি হয়তো দুখানি শুষ্ক কাষ্ঠের অভাবে রন্ধন করিতে পারিতেছে না, সর্বজ্ঞ বাবার দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই। দেখা গেল, সেবক শিষ্যকে দিয়া অবিলম্বে তিনি জ্বালানি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অতিথি বা আশ্রিতদের যখন যে-কোনো বস্তুর প্রয়োজন হইত অর্ধবাহ্য জ্ঞানের অবস্থায়ও সে সব বুঝিয়া নিতে তাঁহার অসুবিধা হইত না। এমনই ছিল তাঁহার সর্বাত্মক দৃষ্টি।

অতিথিসেবার ব্যাপারে মাঝে মাঝে গম্ভীরনাথজীকে অলৌকিক শক্তির ব্যবহারও করিতে দেখা যাইত। বিভিন্ন ঋতুতে এবং মঠের নানা উৎসবে সাধুসন্ত ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর রীতি ছিল। এ সময়ে নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকিত না।

একবার মন্দিরে বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ভোজনের সময় কিন্তু দেখা গেল, প্রায় দ্বিগুণ লোক আসিয়া উপস্থিত। আশ্রম কর্মীদের তো চক্ষুস্থির। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া বাবার শরণাপন্ন হইলেন।

পবিত্র গুরুধাম গোরখনাথজীর মঠের মর্যাদার প্রশ্নটি এক্ষেত্রে জড়িত। গম্ভীর-নাথজীর ধ্যানস্তিমিত নয়ন তাই তৎক্ষণাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। প্রশান্ত ভঙ্গিতে নিজস্ব আসনটি ছাড়িয়া ধীর পদক্ষেপে তিনি তাঁহার পেটিকার নিকটে গেলেন।

একখানি নূতন চাদর বাহির করিয়া সেবকের হস্তে দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "ভোজনের সব কিছু সামগ্রী এ চাদরটি দিয়ে ঢেকে ফেল। তারপর এক এক প্রান্ত থেকে পরিবেশন করতে থাকো। কোনো ভয় নেই, নাথজীর কৃপায় কোনো কিছুরই অনটন হবে না।"

বাবার নির্দেশ অনুযায়ী আহার্য পরিবেশিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, দ্বিগুণ সংখ্যক লোক তৃপ্তি সহকারে আহার করার পরও যথেষ্ট খাদ্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে আশ্রমের বাগানগুলিতে আম পাকিতে শুরু করিলেই গম্ভীরনাথজী প্রতি বৎসর সাধুদের এক ভোজের আয়োজন করিতেন। অতিথিদের এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আম এবং পুরি মালপোয়া পরিবেশন করা হইত। একবারকার নিমন্ত্রণে অপ্রত্যাশিতরূপে বহু অভ্যাগতের সমাগম হয়। হঠাৎ এত লোকের আগমনে আশ্রমিকেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বাজার হইতে আম কিনিয়া আনিবারও তখন আর সময় নাই। কর্মকর্তারা বাবার নিকটে গিয়া তাঁহাদের এ সংকটের কথা নিবেদন করিলেন।

তিনি কহিলেন, "কোনো ভয় নেই। সবগুলি আমের ঝুড়ি এখনি আমার তক্তপোশের নিচে রেখে দাও। তারপর ঝুড়িগুলিকে একখণ্ড শুভ্র চাদর দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখো।"

অতঃপর সেবকেরা বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা-দেওয়া ঝুড়িগুলির একদিক হইতে আম তুলিয়া নিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মহাপুরুষের যোগবিভূতির প্রভাবে ফলগুলি নিঃশেষিত হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। অজস্র লোককে সেদিন ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইল।

গোরখনাথজীর দোহাই দিয়াও কোনো কোনো সময়ে আর্ত ভক্তেরা বাবা গম্ভীরনাথের যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম হইতেন। অতুলবিহারী গুপ্ত তাঁহার "মৃত্যুর পরে ও পুনর্জন্মবাদ" নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়াছেন।

অতুলবাবু গোরখপুরে গভর্নমেণ্ট স্কুলের একজন শিক্ষক। সেদিন, এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, গম্ভীরনাথজীর অন্যতম ভক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি গোরখনাথ মঠে গিয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তাঁহারা এক করুণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শহরের এক বিশিষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের বৃদ্ধা মহিলা গম্ভীরনাথজীর পা দুটি ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছেন। মহিলাটির পুত্র ব্যারিস্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছেন, গত চার মাস যাবৎ নাকি তাঁহার কোনো পত্রাদি পাওয়া যায় নাই। বিলাতস্থিত তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পত্র লেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও কোনো খোঁজখবর দিতে পারেন নাই। পুত্রটি বর্তমানে একরকম নিখোঁজ। ঝামেলা এড়ানোর উদ্দেশ্যে বাবা গম্ভীরনাথ শান্তস্বরে কহিতে লাগিলেন, "মাঈ, আমি গরীব সংসারত্যাগী লোক। বিলাতের খবর আমি কি ক'রে জানবো বল?"

পুত্রবিরহবিধুরা মাতা ছাড়িবার পাত্র নন। নানা অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমি ভালো ক'রেই জানি, আপনি ইচ্ছে করলেই আমার ছেলের সংবাদ এনে দিতে পারেন। ভগবান্ গোরখনাথের দোহাই, আমাকে আপনি দয়া করুন, এ মহাসংকট থেকে এবার উদ্ধার করুন।"

সৌম্যদর্শন যোগীবরের আননে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাস্যের রেখা। কহিলেন, 'আচ্ছা মাঈ, তুমি শান্ত হও। দেখছি এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি।'

তখনি নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়া গম্ভীরনাথজী দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল।

এবার মহিলাটিকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "মাঈ, সামনের সোমবার তোমার পুত্র গোরখপুরে ঠিক হাজির হবে। এখন সে জাহাজে রয়েছে। তুমি তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা ক'রো না।"

যোগীবরের উপর বৃদ্ধা মহিলার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রচুর। পুত্রের আগমনের সংবাদ ও তাঁহার মুখের আশ্বাস পাইয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

সেদিনকার এ ঘটনা সম্বন্ধে অতুল গুপ্তমহাশয় লিখিয়াছেন, "পরের বুধবার অপরাহ্ণ প্রায় চারটের সময়, অঘোরবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাংলোতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একজন সাহেবী পোশাক পরিহিত হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অঘোরবাবু বাংলা ভাষায় বলিলেন, ইনিই সেই বৃদ্ধার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র। বাবার কথামতোই পরশু, সোমবার এখানে আসিয়াছেন। বাবার সহিত ইহার মায়ের সাক্ষাতের কথা ইনি এখনও কিছু জানেন না। আমি ইহাকে ও তোমাকে এখনই বাবার নিকট লইয়া যাইব। বাবাকে আমি মহামানব বলে মনে করি।...আজ তোমার বহু দিনকার একটা কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হইবে।

"বাবা একা পূর্বমতো তাঁহার কুটিরের সম্মুখে দালানে বসিয়া আছেন। তরুণ ব্যারিস্টার বাবাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন—'হ্যালো বাবা। ইউ আর হীয়ার।' অঘোরবাবু এবার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বাবা ইংরেজী জানেন না।' আমরা সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যারিস্টার সাহেব এবার হিন্দিতে বলিলেন, 'আপনি এখানে কবে আসিলেন? আমি আজ জাহাজ হইতে নামিয়া ইম্পিরিয়াল মেল ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে গাড়িতে আপনি ছিলেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না।'

"অঘোরবাবু ব্যারিস্টার সাহেবকে বলিলেন, তোমার কথায় মনে হইতেছে, তুমি বাবাকে যেন ইহার আগে অন্য কোনো স্থানে দেখিয়াছ। সত্য কি?"

"ব্যারিস্টার—'খুব সত্য। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে এক দিনের পথ, তখন আমি বাবাকে আমার ক্যাবিনের ঠিক বাহিরে দেখিতে পাই। একজন সাধুকে প্রথম শ্রেণীর নিকটে ঘুরিতে দেখিয়া আমি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত প্রায় পাঁচ মিনিট কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাহার পর বাবা কিন্তু অন্যদিকে চলিয়া যান।'

"আমি কহিলাম, 'আপনার কি মনে পড়ে, কবে কোন্ সময় আপনি জাহাজে বাবার সহিত কথা কহিয়াছিলেন?"

"পাঠক জানেন, ঐ বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে বাবা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৪০ মিনিট উহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ ব্যারিস্টার সাহেব বলিলেন যে, ঐ সময় তিনি বাবাকে জাহাজের উপর দেখিতে পান। এ সমস্যার উত্তর এই যে, সূক্ষ্ম দেহে ঐ জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

মহাযোগীর এরূপ যোগবিভূতির প্রকাশ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও দেখা যাইত। তাছাড়া, একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে স্থূলদেহে তাঁহার আবির্ভাবের তথ্যও একদল ঘনিষ্ঠ শিষ্যের জানা ছিল।

গম্ভীরনাথজী তখন যোগসিদ্ধির উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। সমাধি ও ব্রহ্মধ্যানেই তাঁহার দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। কিন্তু এই সূক্ষ্মলোকচারী মহাপুরুষের দৃষ্টি হইতে স্থূল জগতের মানুষের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছা বা অভাব-অভিযোগটুকু কখনো এড়াইয়া যাইতে পারিত না। গম্ভীরনাথজীর শিষ্য বিনোদবিহারী দাশগুপ্ত তাঁহার স্মৃতিলিপিতে ইহার কিছুটা উল্লেখ করিয়াছেন।

মঠে রামেশ্বর নামে এক কিশোর বয়স্ক ভৃত্য ছিল, সে বাবা মহারাজের সেবা-পরিচর্যা করিত। একদিন দ্বিপ্রহরে নাথজীর প্রসাদ পাইবার পর গম্ভীরনাথ তাঁহার প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। এ সময়ে বিনোদবাবু চুপি চুপি ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীর সেবার কোনো সুযোগই তিনি এ যাবৎ পাইতেছেন না। আজ তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, রামেশ্বরের হাত হইতে টানা পাখার দড়িটি নিয়া নিজে কিছুক্ষণ নিদ্রারত বাবাকে ব্যজন করিবেন।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই বিনোদবাবু কিন্তু থমকিয়া গেলেন। গম্ভীরনাথজী খাটে উপবিষ্ট আর বালক ভৃত্যটি তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবা সকালবেলায় বেদানা, আপেল প্রভৃতি ফলের অজস্র ভেট পান। উহারই দুই তিনটি হাতে নিয়া তিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন। উদ্দেশ্য—নিরিবিলিতে বসিয়া খাওয়ার জন্য বালক ভৃত্যটিকে দুই চারটি ফল দিবেন। দীনদুঃখী বালককে আদর করিয়া কিছু খাইতে দিবে এমন আপনজন কেহ নাই। তাই নিজেই গোপনে তাহাকে এগুলি বাহির করিয়া দিতেছেন। ঠিক এ সময়ে অপর একজনের আকস্মিক আগমনে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

বিনোদবাবু বুঝিয়া নিলেন, এ সময়ে সেখানে তাঁহার অবস্থান মোটেই সমীচীন নয়। তাই তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মঠ-এস্টেটের কর্মচারীদের কেহ কোনো অপরাধমূলক কাজ করিলে গম্ভীরনাথজী তাহাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিতেন। কখনো কখনো তাহাকে অপর কাজে বদলী করাও হইত। কিন্তু কোনো অপরাধীকে বরখাস্ত করার জন্য শিষ্যেরা চাপ দিলে তিনি রাজী হইতেন না। ব্যস্ত হইয়া বলিতেন, "বেচারা না খেয়ে মরবে? তোমরা কি ওকে আরো অভাব ও পাপের ভেতরে ঠেলে দিতে চাও?"

দীন দরিদ্র প্রতিবেশী এবং প্রজাদের তিনি ছিলেন পিতা এবং প্রতিপালক। কোনো প্রকার সাহায্য বা আশ্রয় একবার কেহ চাহিয়া বসিলে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। উত্তরকালে গম্ভীরনাথজীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে তাই অনেক দুঃস্থ প্রজাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখা যাইত। তাহারা খেদোক্তি করিত 'বুড়ো মহারাজ! আপনি আজ কোথায় লুকিয়ে আছেন? যেখানেই থাকুন—আমাদের ওপর আপনার কৃপাদৃষ্টি যেন থাকে। আমাদের দুঃখের কথা শোনবার, অভাব মোচন করবার যে আর কেউ নেই।"

শুধু মানুষই নয়, ইতর প্রাণীর দলও মহাযোগীর স্নেহস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বারান্দায় অথবা মঠপ্রাঙ্গণে উপবেশন করিলেই কুকুরের দল আসিয়া তাঁহার পা ঘেঁষিয়া

শুইয়া পড়িত। যত ধূলিমলিনই উহারা থাকুক, বাবার সান্নিধ্য হইতে উহাদের নড়ানো যাইত না। কুকুরদের উত্ত্যক্ত করিতে গেলে তিনি নিজেই ভক্তদের নিষেধ করিতেন।

বিনোদবাবুর লেখায় এক রাত্রির একটি চমৎকার দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—"একদিন শেষরাত্রে বাবার ঘরে খুট্‌খুট্‌ শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা তাঁহার খাটের নিচ হইতে রুটি ছিঁড়িয়া ইঁদুরগুলিকে বাঁটিয়া দিতেছেন। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জা পাইয়া তিনি খাটে গিয়া বসিলেন এবং আমার চিন্তাকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার জন্য আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। বাবার চক্ষে কেহ কখনও এক ফোঁটা জল দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটি যে অত্যন্ত কোমল ছিল, তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারের প্রতি পদে ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি।"

রেশমী বস্ত্র গম্ভীরনাথজী কখনো পরিতে চাহিতেন না। কোনো ভক্ত বা শিষ্য এরূপ পরিচ্ছদ ভেট দিলে তিনি উহা সরাসরিভাবে ফিরাইয়া না দিয়া নিকটস্থ সেবক-শিষ্যকে কোথাও উঠাইয়া রাখিতে বলিতেন।

একবার একটি রেশমী বস্ত্র পরার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইলে আসল কথাটি প্রকাশ পায়। তিনি শান্তস্বরে বলিতে থাকেন, "যারা রেশম সুতো উৎপন্ন করে, তারা পোকার সঙ্গে গুটিগুলো ফুটন্ত গরম জলে ফেলে দেয়। জীবন্ত পোকাগুলো যাতে রেশম না কেটে ফেলে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু এর ফলে বহু পোকার মৃত্যু ঘটে।"

সকলেই বুঝিলেন, এজন্যই রেশমী বস্ত্রের প্রতি বাবার এমন বিতৃষ্ণা।

১৯০০ সাল হইতে গম্ভীরনাথজী লোকগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যোগী-জীবনের এক করুণাঘন অধ্যায় এ সময়ে উন্মোচিত হইতে দেখা যায়। বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে, ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়। এ ভাগ্যবানদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই ছিল বেশী।

মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর প্রতি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে যেমন যোগীবরের নিকট হইতে সাধনার নির্দেশাদি নিতেন, তেমনি মুমুক্ষু ও ভক্তদের মধ্যেও এই শক্তিধর মহাপুরুষের গুণকীর্তনে তাঁহার বিরাম ছিল না। ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে গোস্বামীজী সদ্‌গুরু লাভের উপর অত্যধিক জোর দিতেন এবং এ সময় অনেককে তিনি বাবার আশ্রয় গ্রহণে উৎসাহিত করিতেন। তৎকালীন বাংলার শিক্ষিতসমাজে বাবা গম্ভীরনাথের কথা গোঁসাইজীর উৎসাহেই বেশী প্রচারিত হয় এবং এই মহাযোগীর চারিদিকে ক্রমে ক্রমে আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় জমিতে থাকে।

লোকমুখে গম্ভীরনাথজীর লোকোত্তর জীবনের মহিমা শুনিয়া বহু ভক্ত দর্শনার্থী আসিয়া জুটিতে থাকে। আবার অলৌকিকভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াও কম সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই।

কুমিল্লার এক ডাক্তার বড় ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, একটি অপরিচিত স্থানে তিনি উপনীত হইয়াছেন। সেখানে এক সৌম্য, দিব্যদর্শন যোগী

তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এ অদ্ভুত স্বপ্নের নিহিতার্থ কি ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ সম্পর্কে তাহার ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তাঁহার এক বন্ধু গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। হঠাৎ একদিন ইহার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অন্তরের আলোড়নের কথাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বন্ধুটির সব কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমার স্বপ্নে দেখা এ মহাত্মা বোধহয় গোরখপুরের গম্ভীরনাথজী। তুমি অবিলম্বে তাঁরই কাছে শরণ নাও।"

কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তার আকস্মিকভাবে তাঁহার যাতায়াত ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত হন। ইহার পর গোরখপুরের মঠে পৌঁছিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন—স্বপ্নের এই পবিত্র স্থানটির দৃশ্যই তিনি দেখিয়াছেন, আর বাবা গম্ভীরনাথই তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট গুরুদেব।

দীক্ষাদানের পর গম্ভীরনাথজীকে তিনি তাঁহার স্বপ্ন-সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বলেন, "বেটা, তোমার সংস্কার ছিল, আর তোমার সঙ্গে আমার পূর্বের সম্বন্ধও ছিল।"

নোয়াখালি জেলার সুদূর অঞ্চলের এক বালকও এরূপ স্বপ্নযোগে একবার গম্ভীর নাথজীর দিব্য মূর্তিটি দর্শন করে। এ মহাত্মাটি কে—বালকের তাহা জানা নাই। অথচ ইহার চরণোপান্তে পৌঁছিবার জন্য সে উৎকুণ্ঠিত হইয়া উঠে। একদিন ফেণীতে আসিয়া কোনো পরিচিত ব্যক্তির গৃহে সে গম্ভীরনাথজীর আলোকচিত্র দর্শন করে। এটিই যে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বালক ভক্তটির ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং পাথেয় সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই সে সুদূর গোরখপুরে উপনীত হয়। রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। এ সময়ে মঠে উপস্থিত হইয়া সে দেখে বাবা গম্ভীরনাথ বারান্দায় একটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া রাখিয়া খাটিয়ার উপর নীরবে বসিয়া আছেন, দূরদেশাগত বালক ভক্তটির জন্যই তিনি যেন প্রতীক্ষমাণ। প্রণাম করামাত্রই যোগীবর স্নেহভরে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। জানাইলেন, তাহার বিশ্রামের জন্য শয্যার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই ঠিক করা রহিয়াছে।

ময়মনসিংহের একটি ভক্ত বালকের অভিজ্ঞতাও কম বিচিত্র নয়। অল্প বয়সেই সে এক যোগসাধকের নির্দেশে ধ্যানাভ্যাস শুরু করে। একদিন আসনে উপবিষ্ট থাকাকালে বাবা গম্ভীরনাথজীর দিব্য মূর্তিটি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠে। বিস্ময়ে আনন্দে বালক অধীর হয়, এরূপ কোনো মহাপুরুষের চিত্র ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই, তাঁহার কথাও কখনো শুনে নাই। কিছুদিন পরে বাবা গম্ভীরনাথের এক শিষ্যের সহিত বালকটির যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যে সে যোগীবরের আশ্রয় লাভ করে।

অলৌকিক উপায়ে যে ভক্তদের সহিত গম্ভীরনাথজী যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ সম্পর্কিত কার্যকারণের ধরন দেখিয়া মনে হয়, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো বিধান অনুযায়ীই যোগীবর তাঁহার সম্ভাব্য শিষ্যদের

অন্তরসত্তায় নিজেকে প্রতিফলিত করিতেন। অমোঘ-আকর্ষণের ফলে তাহারা একের পর এক ছুটিয়া আসিত।

যোগীবরের বিশিষ্ট শিষ্য, অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "স্বভাবতই মনে হয় যে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আপনার কৃপায় তাহাদের কোলে টানিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের জীবন সার্থক করিয়া দিয়াছেন। অথচ সাক্ষাৎ দর্শন কালে কখনো তিনি ইহার কোনো পরিচয় প্রদান করিতেন না। অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে কেহ সাহস করিয়া কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়শই বলিতেন—'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, সেদিকে তোমাদের এত মনোযোগ দেবার দরকার কি?' দু-একজন ভক্ত নিতান্ত আকুল হইয়া কখনো জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাহাদের তিনি সান্ত্বনা দানের সুরে বলিতেন, 'তোমাদের সাথে সম্বন্ধ ছিল' অথবা বলিতেন 'তোমার সংস্কার ছিল'।"

যোগীবর গম্ভীরনাথজীর অলৌকিক শক্তি দূর-দূরান্তের কত মুমুক্ষুকে টানিয়া আনিয়াছে, তাঁহার করুণার স্পর্শমণি কত মানুষকে রূপান্তরিত করিয়াছে! এইসব জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে অশরীরী আত্মাও কখনো কখনো মহাপুরুষের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

একবার একটি ভক্ত গম্ভীরনাথজীর নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীরও ব্যাকুলতা কম ছিল না। কিন্তু মহিলাটির দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। অল্পদিন মধ্যে আকস্মিকভাবে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

কিছুদিন পর ভক্ত স্বামীটির দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ঠিক হইল। গম্ভীরনাথজীকে তিনি করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, আমার স্ত্রীর বড় অভিলাষ ছিল, আমার সঙ্গে একত্রে দীক্ষা নেবেন। আজকের শুভ অনুষ্ঠানে তাঁর অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ হোক, তাঁর ওপর গুরুকৃপা বর্ষিত হোক—এ আমার একান্ত মিনতি।"

গম্ভীরনাথজীর কাছে বার বারই সকাতরে তিনি এ প্রার্থনাটি নিবেদন করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়বাবু এ ঘটনার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন—"যোগীরাজ প্রথমে ধীরভাবে উত্তর দেন, প্রেতাত্মাকে দীক্ষা দেওয়া কিরূপে সম্ভব? যোগীরাজের পক্ষে যে ইহা অসম্ভব নয়, সে বিশ্বাস দীক্ষার্থীর ছিল। স্বামীটির ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় যোগীরাজ দুইখানি আসন স্থাপন করিতেই নির্দেশ দেন। দীক্ষার্থী স্বামীটি গুরুদেবের সম্মুখে একখানি আসনে উপবেশন করিলে তিনি তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে আদেশ করেন।

"দীক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের অনুভব হইল যে, তাঁহার পত্নীও দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। গুরুদেবের অসাধারণ করুণায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। অনুভূতির উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত তিনি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—'তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষালাভ হইয়াছে কিনা?' গুরুদেব মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন

—'হ্যাঁ'। অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব কৃপা করিয়া মৃতের আত্মাকেও আকর্ষণ-পূর্বক আপনার চরণপ্রান্তে আনিয়া দীক্ষাদান করিলেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে, ভক্তিতে এবং কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া পড়িল ''

শিষ্যদের কাছে যোগীবর গম্ভীরনাথের প্রধান উপদেশ ছিল—'বিশ্বাস রাখনা'—'বিচার করনা।' গুরু এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার প্রথম-বাক্যের মূল কথা। দ্বিতীয়টি জ্ঞাপন করিত—সতত পরিবর্তনশীল মায়াচ্ছন্ন সংসার সম্বন্ধে বিচারের কথা। এই বিচারের মধ্য দিয়া জ্ঞান লাভের নির্দেশ তিনি দিতেন।

কিন্তু এ সমস্ত উপদেশ ছিল যোগীগুরু গম্ভীরনাথজীর বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রদত্ত দীক্ষা ও সাধন বহুতর সাধু সন্ন্যাসী ও শিষ্যের জীবনকে চরম সার্থকতায় ভরিয়া তুলিত। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যদের যেসব অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা শোনা যায়, তাহা কম বিস্ময়কর নয়।

শিষ্য ও ভক্তদের দৈনন্দিন জীবনের উপর যোগীবরের সদাসতর্ক দৃষ্টিটি প্রসারিত থাকিত। তাহাদের মনোলোকের সামান্যতম তরঙ্গটিও তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইত।

শক্তিধর যোগীবর দিনের পর দিন সারা সত্তাটি দিয়া আশ্রিতদের জীবনকে ঘিরিয়া রাখিতেন। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক যে-কোনো প্রয়োজনে 'বাবার' উপর তাহারা নির্ভর করিতে পারিত।

দর্শনার্থী পরিবৃত যোগীবরের সম্মুখে এক নবাগত ভক্ত সেদিন বসিয়া আছেন। চা পানে তাঁহার আসক্তি যথেষ্ট, কিন্তু সংকোচবশত সেকথা এতক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। গম্ভীরনাথজী হঠাৎ অর্ধবাহ্য অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে যাও যাও, চল্‌দি চা তো পী লো।"

মঠের উদ্যান-গৃহে বহিরাগত শিষ্যগণ কখনো কখনো সপরিবারে আসিয়া বাস করেন। মহিলা ভক্তদের কেহ কেহ হয়তো গহনাপত্র সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, বাগানটি নির্জন, তাই সবাই কিছুটা ভয়ে ভয়ে আছেন। অন্তর্যামী গম্ভীরনাথজী ঐ শিষ্যদের অবস্থা বুঝিয়া নিলেন। সতর্ক সংসারী অভিভাবকের মতো তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, গহনার বাক্স যেন তাঁহার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিয়া সকলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়।

গম্ভীরনাথ একদিন ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার নিজের আসনটিতে বসিয়া আছেন। চতুর্দিকে দর্শনার্থী, ভক্ত ও শিষ্যদের ভিড়। ধ্যান স্তিমিত নেত্রটি উন্মীলন করিয়া যোগীবর অকস্মাৎ কক্ষের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। দেখা গেল, সেখানে একটি ঘৃতের টিন রহিয়াছে। উহা তখনই রৌদ্রে দিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া আবার তিনি পূর্ববৎ ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই থামিল না। কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি নয়ন মেলিলেন। একবার ঘৃতের ভাণ্ডটি দেখাইয়া যোগীবর নির্দেশ দিলেন, উহা হইতে কিছুটা অংশ একটি ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া যেন অবিলম্বে হাতিশালার দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

একটু পরেই ঘৃত সম্পর্কিত রহস্যের সন্ধান মিলিল। ঐ দোতলার প্রকোষ্ঠে একজন ভক্ত তখন সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী যোগীবরের বড়ই অনুরক্ত। একনিষ্ঠভাবে যোগীবরের সেবা-পরিচর্যা করা ছিল তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত। নানাবিধ ঘৃতপক্ক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন তাঁহারা বাবার ভোজনের জন্য পাঠাইতেন। আজ ঐ ঘৃতটুকু প্রেরণ করিয়া গম্ভীরনাথজী তাঁহাদের সেবানিষ্ঠাকে দিলেন সস্নেহ স্বীকৃতি।

উপস্থিত সকলে দেখিয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, আত্মসমাহিত মহাযোগীর কাছে ভক্ত-হৃদয়ের ক্ষীণতম ভাবতরঙ্গটির মূল্য এতটুকুও তুচ্ছ নয়।

কান্তিচন্দ্র সেন গোরখপুরের শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। বাবার প্রতি তাঁহার ভক্তি অপরিসীম। পরের চিকিৎসার নাম করিলে কি হয়, নিজের পরিবারের কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে ডাক্তার সেন সর্বদাই গম্ভীরনাথজীর শরণাপন্ন হইতেন। বাবার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধুনির বিভূতি অথবা 'আশাবরী ধূপ' লইয়া পরম নির্ভরতার সহিত তিনি রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতেন। অগৌণে সে আরোগ্য লাভও করিত।

ডাক্তার সেনের পুত্র একবার মরণাপন্ন কাতর হয়। বাঁচিবার যখন কোনো আশাটি নাই, তখন তিনি যোগীবর গম্ভীরনাথের 'শরণ গ্রহণ করেন'। তাঁহার প্রদত্ত আশাবরী ধূপের ধোঁয়া নাসিকায় কয়েকবার দিবার পর বালকের রোগের উপশম ঘটে, শীঘ্রই সে সুস্থ হয়।

শিষ্যগণসহ গম্ভীরনাথজী সেবার হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে তখন কলেরার প্রাদুর্ভাব, ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মারাও গিয়াছে। ভক্ত উমেশবাবুর সহিত তাহার মুহুরীর একটি অল্পবয়স্ক পুত্রও বেড়াইতে আসিয়াছে। হঠাৎ এই ছেলেটি কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। পরের ছেলেকে লইয়া এ এক মহা সংকট, উমেশবাবু মহাপুরুষের চরণতলে পড়িয়া বার বার এ বালকটির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও মনে জাগে—এ বালক যে তাহার গরীব পিতার একমাত্র পুত্র, একমাত্র অবলম্বন—উমেশবাবু পরিবারের কাহারো জীবনের পরিবর্তে কি এর প্রাণরক্ষা সম্ভব নয়?

গম্ভীরনাথজী এতক্ষণ মৌনী হইয়াই ছিলেন। মনে উমেশবাবুর ঐ চিন্তা উদ্গত হইতে দেখিয়াই তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

উমেশবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যোগীবর তাহার মনোভঙ্গীর মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতার বীজ লুকাইত দেখিতে পাইয়াছেন। ভর্ৎসনাসূচক হুঙ্কার এই কারণেই। ইহার মর্মার্থ—'হ্যাঁ, তুমি এরই মধ্যে এমন মহাপুরুষ এবং বীর ব'নে গিয়েছো যে নিজের ছেলের পরিবর্তে পরের ছেলের জীবন রক্ষায় অগ্রসর হতে চাও।'

অতঃপর ভক্তের কাতর ক্রন্দনে কৃপালু যোগীবরকে সেদিন কিন্তু বলিতে হয়—

"আচ্ছা, বাঁচেগা।" বালকটির সংকট সেই দিনই কাটিয়া যায় এবং অচিরে সে রোগমুক্ত হয়।

ভক্ত ও শিষ্যেরা যতদূরেই অবস্থান করুক না কেন, যোগীবরের কল্যাণহস্তখানি সতত তাহাদের জন্য প্রসারিত থাকিত। বাবা মহারাজ একদিন গোরখপুর মঠে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া আছেন। সম্মুখে বসিয়া আছেন কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শিষ্য উমেশবাবুর সংবাদ তাহারা কেহ পাইয়াছে কিনা? তিনি কেমন আছেন?

উমেশবাবু তখন সপরিবারে হরিদ্বারে গিয়াছেন। সকলেই ভাবিলেন, নিশ্চয় তাঁহার কোনো বিপদ উপস্থিত। টেলিগ্রামে তাঁহার সংবাদ আনানো হইবে কিনা প্রশ্ন করিলে গম্ভীরনাথজী অর্ধনিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন, "হ্যাঁ, কাল দেখা যায়গা।" পরদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে বলিতে গেলে "সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—"ফিকির মৎ করো।" অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা ক'রো না।

কয়েকদিন পরে উমেশবাবুর চিঠিতেই বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। যোগীবর গম্ভীরনাথ যে সময়ে তাঁহার খোঁজখবর নিবার জন্য ব্যস্ত হন, ঠিক সেই সময়েই উমেশবাবু ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গাড়িতে খুব ভিড়। চলন্ত গাড়ির হাতল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে হঠাৎ তাঁহার জীবননাশের উপক্রম হয় এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রেরা গাড়ির ভিতর থাকিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। এ আর্ত রব প্রবেশ করে দূরে অবস্থিত বাবা গম্ভীরনাথের কর্ণে। মুহূর্তে বিগলিত হয় যোগীবরের হৃদয়, প্রাণ-রক্ষা করেন উমেশবাবুর।

আর একদিনের কথা। গম্ভীরনাথজী অর্ধবাহ্য অবস্থায় তাঁহার নিজের আসনটিতে বসিয়া আছেন। হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার ধ্যানাবেশ টুটিয়া গেল। নয়ন মেলিয়া ব্যস্তভাবে তিনি ভক্ত শিষ্যদের কহিলেন, "মাস্টারবাবু কি আজ মঠে ফিরে এসেছে?"

এই মাস্টারবাবু তাঁহার অন্যতম শিষ্য, নাম প্রসন্নকুমার ঘোষ। শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গুরুর সেবার জন্য সে-সময়ে তিনি গোরখপুর মঠে বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন রাত্রে প্রসন্নবাবু গাড়ি করিয়া মঠে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে হঠাৎ ঘোড়াটি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং গাড়িটি ভাঙিয়া ফেলিয়া ছুটিতে থাকে। এভাবে তাঁহার জীবন সংশয় হইলেও প্রসন্নবাবু বিস্ময়করভাবে সামান্য আঘাতের মধ্য দিয়া সেদিন বাঁচিয়া যান।

গম্ভীরনাথজী একবার কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে শহরে এক শক্তিমান্ সাধকের আগমন ঘটে। ইনি নাকি যোগশক্তি সহায়ে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারিতেন এবং ইঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী শুনা যাইতে থাকে। যোগবলে ইনি পরদেহে প্রবেশ করিতে পারেন বলিয়াও যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়া যায়। এজন্য তৎকালে অনেকে তাঁহাকে 'পরদেহপ্রবেশী' মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত

করিতেন। কেহ কেহ বলিত, ইঁহাকে ভক্তিভরে স্মরণ বা আহ্বান করিলে সূক্ষ্ম দেহে ইনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বাবা গম্ভীরনাথের এক শিষ্য মাঝে মাঝে ইঁহার নিকট যাইতেন। একদিন এই শিষ্যটি স্বগৃহে আসিয়া ঐ মহাপুরুষের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করেন এবং মনে মনে আহ্বান জানান। অগৌণে শক্তিধর মহাপুরুষটি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন।

ঐ শিষ্যটির নিকট তাঁহার সেদিনকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়া মনীষী অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে চাহিলেন, ভদ্রলোকটি তাহাতে ভীত হইলেন। তিনি এক মহাপুরুষের শিষ্য হইয়া কেন অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন? কিন্তু এই মহাত্মাকেও বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করা অন্যায় হইয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। 'পরদেহ-প্রবেশী' তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পূর্বলব্ধ মন্ত্রের শক্তি নষ্ট করিয়া তিনি তাহাকে দীক্ষা দান করিবেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে পশ্চাৎ দিক হইতে বাবাজীর জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্তি পরদেহ-প্রবেশীর দিকে সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সেই দৃষ্টি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইয়া পরদেহ-প্রবেশীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি সেই তেজে বিহ্বল হইয়া ভীতচকিত-ভাবে নমস্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বাবাজীর মূর্তিও অন্তর্হিত হইল।"

গম্ভীরনাথ বাবার শিষ্যটি তৎক্ষণে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বাবাজী মহারাজের স্নেহময় দৃষ্টি যে বর্মের মতোই তাঁহাকে সতত আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, এ সত্যটি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় সেদিন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। অনুতপ্ত শিষ্য অতঃপর গুরুজীর নিকট গিয়া আপন ত্রুটির জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। অতঃপর বাবার স্নেহমধুর আশ্বাসবাণীতে তাঁহার বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত হয়।

গম্ভীরনাথজীর যোগবিভূতি ছিল অপরিমেয়। কখনো বাহিরের সংঘাতে, কখনো বা কৃপার প্রয়োজনে তাঁহার এই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটিত—সাধারণ মানুষ ইহা দর্শনে হইত বিস্ময়বিমূঢ়।

কিন্তু নিজস্ব আচার আচরণে অথবা ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মহাযোগীর লৌকিক ও সহজ মূর্তিটির দর্শন সর্বদাই মিলিত। মন্দির সংক্রান্ত মামলায় গম্ভীরনাথজী প্রধানত উকিলের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিতেন। তাছাড়া, নিজে কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসকের নির্দেশমতো ঔষধপথ্য গ্রহণে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না, এসময় তাঁহাকে যেন অসহায় বালকের মতোই দেখা যাইত। রোগের যন্ত্রণাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করিতেন, এবং অসুস্থ অবস্থায় চিরদিনই সেবক ও ডাক্তারদের পরামর্শ তাঁহাকে নির্বিচারে পালন করিতে দেখা যাইত।

একবারকার পীড়ায় তাঁহাকে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহার এ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন।

একনিষ্ঠ, বাঙালী সেবক-শিষ্য, কালীনাথ ব্রহ্মচারীর উপর তখন তাঁহার সেবা-

পরিচর্যার ভাব। ব্রহ্মচারী একদিন সোজাসুজি বলিয়া বসিলেন, "বাবা, আপনি ইচ্ছে ক'রেই এত কষ্টে ভুগছেন, আর আপনার যন্ত্রণা দেখে আমাদের প্রাণেও এত দুঃখ হচ্ছে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে আপনি এখনই এ রোগটা ঝেড়ে ফেলুন।"

বাবাজী কিন্তু নিরুত্তর। বার বার তাঁহাকে এই মিনতি করা হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ক্যা, ম্যঁয় ভগবান্‌কী করনী পলট দেঙ্গে?" —কেন, আমি কি ভগবানের বিধানকে উল্টে দেব?

১৯১৪ সালের শেষের দিকে গম্ভীরনাথজীর একটি চোখ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। স্থির হয়, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল সার্জন দ্বারা অস্ত্রোপচার করা হইবে। নিতান্ত সুবোধ বালকের মতোই যোগীবর এ ব্যবস্থা মানিয়া নিলেন।

পরে কিন্তু বুঝা গেল, এই রোগ প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষের এক ছলনা মাত্র। নিজের নেত্র-চিকিৎসার অজুহাতে বহু মুমুক্ষুর নেত্র-উন্মীলনের ব্যবস্থাই সে সময়ে তিনি করিতে চাহেন। কলিকাতা প্রবাসের অবসরে বাংলার একদল ভাগ্যবান্ সাধনার্থীকে কৃপা বিতরণই মহাযোগীর আসল উদ্দেশ্য।

দীক্ষাদান বা শিষ্যগ্রহণে প্রথম জীবনে গম্ভীরনাথজীর বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত না। ১৯১৫ সাল অবধি খুব কম সংখ্যক লোককেই তিনি আশ্রয়দান করেন। বোধহয় সে অবধি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা একশতকেরও বেশী ছিল না।

তাঁহার এবারকার কলিকাতায় অবস্থিতি উন্মোচিত করে তাঁহার লোকগুরু জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। বহু মুক্তিকামী নরনারীকে তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে শিষ্য-রূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর অনেকে গোরখপুরে গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়লাভে ধন্য হয়। মরদেহ ত্যাগের পূর্বে গম্ভীরনাথজীর বাঙালী শিষ্যদের সংখ্যা হয় প্রায় ছয় শত।

দীক্ষাদান সম্পর্কে বাবা মহারাজের এই সময়কার ঔদার্য দেখিয়া তাঁহার পুরাতন শিষ্যেরা বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাঁহারা সহর্ষে বলিতেন, "বাবা যেন বাংলায় এসে কল্পতরু হয়ে বসেছেন।"

বাবা কলিকাতায় থাকাকালে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী একদিন কয়েকজন শিষ্যসহ তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আসেন। যোগীবর তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর প্রতি বরাবরই গম্ভীরনাথজীর নিবিড় স্নেহ ছিল। তাই তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য কুলদানন্দজীর আগমনে তিনি খুব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বিশ্রাম ভঙ্গ করিয়া তখনি সাগ্রহে সবাইকে নিজ কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কুলদানন্দজী জোড়হস্তে কহিলেন "বাবা, গোঁসাইজীর প্রতি আপনার যেরূপ কৃপা ছিল, এ অধীনের প্রতিও যেন সেরূপ কৃপা থাকে।"

গম্ভীরনাথজীর চোখ দুইটি তখন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সস্নেহে গোঁসাইজীর শিষ্যদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বার বার তিনি আশ্বাস দিতে লাগিলেন —"হাঁ, হাঁ।"

অস্ত্রোপচারের পর চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় এবং গম্ভীরনাথজী গোরখপুরে ফিরে

ফিরিয়া যান। কিছুদিন এখানে থাকিবার পর শেষ বারের মতো তিনি হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মেলায় যোগদান করেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে নাথজীর দালিচা। এ স্থানটি তখন নাথপন্থী সাধুসন্তদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে বহুতর ভক্ত শিষ্য রহিয়াছেন, তাহাদের নিয়া তিনি এই ভাড়াটে বাড়িতে থাকিবেন, ইহাই সকলের ইচ্ছা।

বাবা গম্ভীরনাথ কিন্তু সকল ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিলেন। প্রথমে উপস্থিত হইলেন নাথজীর দালিচায়। তাঁহার উপস্থিতিতে সমাগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। কিন্তু এই জনাকীর্ণ দালিচায় গুরুদেবের কষ্ট হইবে ভাবিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ভাড়া বাড়িতেই স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক।

দালিচার তরুণ প্রবীণ সমস্ত সাধুরা কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরোধী। সোৎসাহে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "না—না, বাবা আমাদের এখানেই থাকবেন। তিনি যে আমাদেরই একান্ত নিজস্ব ধন। আমরা কখনই তাঁকে ছেড়ে দেবো না।"

ইহাদের অনুরোধ বাবা এড়াইতে পারিলেন না, গুটিকয়েক শিষ্যসহ এই দালিচাতেই রহিয়া গেলেন। অপর শিষ্যেরা অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নাথজীর দালিচায় অবস্থান করার কালে সহস্র সহস্র লোক বাবা গম্ভীরনাথকে দর্শন করিতে আসিত। শুধু নাথপন্থী সাধু এবং মোহান্তেরাই নয় সর্বশ্রেণীর নরনারীই এই মহাশক্তিধর যোগীকে দর্শন করিতে তখন আগ্রহব্যাকুল। অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া তাহারা কৃতকৃতার্থ হইত।

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ হইতে ফিরিবার পর যোগীবর মাত্র দুই বৎসর স্থূল শরীরে বর্তমান ছিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে তাঁহাকে যাঁহারা এ সময়ে লক্ষ্য করিতেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সমক্ষে ফুটিয়া উঠিত মহাপুরুষের নূতনতর দিব্যরূপ। তাছাড়া, দেখা যাইত, একদিকে যেমন জাগতিক বস্তুনিচয়ের উপর তাঁহার ঔদাসীন্য বাড়িয়া যাইতেছে, তেমনই ধীরে ধীরে তিনি ডুবিয়া যাইতেছেন রহস্যঘন অন্তর্মুখীনতার গভীরে।

উদ্বিগ্ন শিষ্যেরা দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, "আচ্ছা হ্যায়।"

গোরখপুরের সন্নিকটে যোগীচৌক। জাগ্রত শিবলিঙ্গের এটি এক মহাসিদ্ধপীঠ। সে-বার শিবরাত্রির সময় গম্ভীরনাথজী সেখানে যাইয়া তিনদিন অতিবাহিত করিয়া আসিলেন। লক্ষ্য করা গেল, শরীর তাঁহার বড়ই দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পরে যোগীবর সকলকে জানাইয়া দিলেন, শীঘ্রই তিনি এবার মফঃস্বলে যাইবেন।

কথাটি শুনিয়া সকলে ভাবিলেন, বাবা হয়তো মঠের জমিদারীর কোনো বিশেষ স্থানে গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম নিতে চান। উৎকণ্ঠিত শিষ্যেরা প্রশ্ন তুলিলেন, তাঁহার এই দুর্বল শরীরে অন্য কোথাও নড়াচড়া করা কি ভাল হইবে?

যোগীবর সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ নেই। স্থানটি পরম নির্জন রমণীয়। সেখানে স্বাস্থ্য ভাল হবারই তো সম্ভাবনা।"

মফঃস্বলে যাবার দিন স্থির করিতে হইবে। পঞ্জিকা দেখার পর শুভ সময় ঠিক হইল ৮ই চৈত্র, বারুণী ত্রয়োদশীর দিন। এ মফঃস্বল যাত্রার বিশেষ উদ্দেশ্য কি গন্তব্য স্থানটিই বা কোথায় সে রহস্য উদ্‌ঘাটনে কেহ সেদিন সমর্থ হয় নাই।

বাবার শরীর কিন্তু ক্রমে আরও খারাপ হইতেছে। এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি মফঃস্বলে যাইবেন? শিষ্যদের মিনতিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীরনাথজী যাহা বলিলেন, তাহা আরও বিভ্রান্তিকর, আরও গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আবরিত।

উদাসভাবে তিনি কহিলেন, "সেখানে তো বিপদের কোনো কারণ নেই। সেখানে একবার গেলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই,—সে যে সকল কিছু ভালমন্দের অতীত—চিরশান্তিধাম?"

সেই পূর্ব নির্দিষ্ট মহাবারুণী তিথিতেই, ১৯১৭ সালের ২১শে মার্চ তারিখে, মহাযোগী তাঁহার নরদেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কথিত রহস্যময় 'মফঃস্বলের' গূঢ় অর্থ এবার সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

কানপুর জেলার মৈথেলালপুর এক সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত কবিদের জন্ম-স্থানরূপে খ্যাতি অর্জন করে। পণ্ডিত মিশ্রীলাল মিশ্র এই গ্রামেরই এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উদারচেতা ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপেও আবালবৃদ্ধবনিতার তিনি সম্মানভাজন। সেদিন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, হঠাৎ কোথা হইতে তাঁহার গৃহে তিনটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। প্রণাম সমাপনের পর পণ্ডিত মিশ্রীলাল যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় প্রাচীনতম সাধুটি তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "মিশ্রীলাল, আজ রাত্রে তোমার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কালে সে হবে মুমুক্ষু, মানবকে দেবে পথের সন্ধান। কিন্তু একটা কথা। এ শিশু জন্মের পর কাউকে তার মুখ দর্শন করতে দেবে না, আর ভূমিষ্ঠ হবার পরই আমাদের তুমি অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে যেয়ো।"

মিশ্রীলালের পত্নী আসন্নপ্রসবা। সেই রাত্রেই—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি সর্বলক্ষণযুক্ত এক সন্তান প্রসব করেন। সন্ন্যাসীদল শিশুকে দর্শন করার পর সেদিন গৃহের অঙ্গনে হোম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই কিন্তু তাঁহাদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

পণ্ডিতের নবজাত সন্তানকে দেখিবার জন্য ভোর হইতেই ভিড় জমিতে থাকে। তাছাড়া, অপরিচিত সন্ন্যাসীদের আগমন ও হোমের কাহিনী শুনিয়াও লোকে সেদিন অতিমাত্রায় কৌতূহলী হইয়া পড়ে। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া তাহারা মিশ্রীলালের গৃহে জড়ো হইতে থাকে। শিশু মোতিরামকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিতের অঙ্গনে সেদিন অপূর্ব আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার পর আঠারো বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই গৃহেই আবার ঘটিল আর একটি নবজাতকের আবির্ভাব। বৃদ্ধ পণ্ডিত মিশ্রীলাল আজিকার দিনে আরও বেশী আনন্দোচ্ছল। তাঁহার প্রাণপ্রিয় মোতিরামের যে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বার বার তিনি পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চঞ্চল হইতেছেন, মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছেন সুখ-স্বপ্নের প্রাসাদ। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই সেদিন সব কিছু হঠাৎ হয় বিপর্যস্ত। পণ্ডিতের গৃহে ক্রন্দনের রোল শোনা যায়, গ্রামবাসীরা উচ্চকিত হইয়া উঠে। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হয়, মিশ্রীলালের পুত্র, প্রতিভাবান যুবক মোতিরাম, চিরতরে গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মোতিরাম প্রমাদ গণিয়াছেন। সংসার জীবনের এই নূতনতর বন্ধনকে মানিয়া নিতে তাঁহার মন কোনোমতেই সেদিন সায় দেয় নাই। জীবনের চরম সিদ্ধান্তটি তখন তিনি গ্রহণ করেন। তরুণী ভার্যা ও নবজাত সন্তানের মায়াপাশ চিরতরে ছিন্ন করিয়া বহির্গত হন তিনি মুক্তির সন্ধানে।

আঠারো বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মিশ্রীলালের গৃহে নবজাত পুত্রের আবির্ভাব যে আনন্দধারা উৎসারিত করে, আজিকার দিনে তাহারই অন্তর্ধান সেই স্রোতধারাকে খণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল।

বিষয়বিরক্ত মোতিরামের এই গৃহত্যাগ সূচনা করে এক সার্থক যোগীজীবনের। ভাস্করানন্দ সরস্বতীরূপে ভারতের অধ্যাত্মগগনে উত্তরকালে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিতে আমরা দেখি।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগৃহের সন্তান মোতিরাম। কিশোর বয়স হইতেই সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়নে ছিল তাঁহার প্রবল আসক্তি। মেধা ও প্রতিভা ছিল তাঁহার প্রচুর, তাই সমস্ত কিছু পাঠ তিনি অতি সহজেই আয়ত্ত করিতেন। সতীর্থ ও শিক্ষকগণ ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।

তীক্ষ্ণধী বালকের অন্তর্লোকে কিন্তু সদাই বহিয়া চলে বৈরাগ্যের এক অন্তঃসলিলা ধারা। মাঝে মাঝে ইহার বহিঃপ্রকাশ সকলকে সচকিত করিয়া তোলে। পুত্রের ভাবান্তর দর্শনে মিশ্রীলাল মাঝে মাঝে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তাইতো! সংসারের মায়া বন্ধনে তাঁহাকে না জড়াইতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন কই। আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত এক রূপলাবণ্যবতী কন্যার সহিত মোতিরামের বিবাহ দিলেন।

শাস্ত্রপারঙ্গম না হইলে ব্রাহ্মণ-সন্তানের চলিবে কেন? তাই বিবাহের পর অধ্যয়নের জন্য মোতিরাম কাশীধামে প্রেরিত হন।

প্রতিভাবান্ তরুণ সতেরো বৎসর বয়সে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ করিয়া মৈথেলালপুরে আসিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের যে আগুন এতদিন তাঁহার অন্তস্তলে আত্মগোপন করিয়াছিল, কাশী হইতে ফিরিবার পর তাহা আরো তীব্র হইয়া উঠে। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও সম্মান, পরিবারের স্নেহবন্ধন ভোগবাসনা, কোনো কিছুই সেদিন তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

অজানা অমৃতলোকের হাতছানিটি পৌঁছিয়া গিয়াছে তাঁহার হৃদয়ে। উদাসীন মোতিরাম তাই ক্রমেই গভীর ও অন্তর্মুখীন হইয়া উঠেন। এমনই সময়ে পুত্রের এই জন্মসংবাদ।

মোতিরামকে সেদিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। মধ্যরাত্রিতে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

মুমুক্ষু পরিব্রাজকরূপে অতঃপর তিনি উজ্জয়িনীতে উপনীত হন। মহাকালেশ্বর শিবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র এই পুণ্যভূমি। কলনাদিনী শিপ্রার তটপ্রান্তে সারি সারি মন্দির ও স্নানের ঘাট। অসংখ্য তীর্থযাত্রী আর ভক্ত সাধকের পূজা ও স্তবগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। পথঘাটে দণ্ডী সন্ন্যাসী ও পরমহংসের ভিড়। মোতিরাম স্থির করিলেন, এই পবিত্র তীর্থে কিছুকাল অবস্থান করিবেন।

একবস্ত্রে কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি বাহির হইয়াছেন—তাই আকাশবৃত্তি ছাড়া

আর গত্যন্তরই বা কি? প্রত্যুষে পুণ্যতোয়া শিপ্রায় অবগাহন করিয়া মহাকালেশ্বর মন্দিরে ধ্যানরত থাকেন, কখনো বা উজ্জয়িনীর তীরে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকেন।

উজ্জয়িনীর শ্মশানে মোতিরাম কিছুকাল অতিবাহিত করেন। বহু যোগী, তান্ত্রিক ও বৈদান্তিক বহু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যেও তিনি আসেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা নিবারিত হয় কই? কে দিবে তাঁহাকে মুক্তিপথের সন্ধান? অভীষ্ট সিদ্ধির চাবি-কাঠিটিই বা রহিয়াছে কাহার হাতে?

মোতিরাম আবার পরিব্রাজনে বাহির হইয়া পড়েন। ইহার পর তিন-চার বৎসরকাল তিনি দ্বারকায় কাটান, এক প্রসিদ্ধ জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিয়া মোতিরাম কৃতসংকল্প হন সন্ন্যাস গ্রহণে। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে সে সময় দাক্ষিণাত্যে শ্রীমৎপূর্ণানন্দ সরস্বতীর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। মোতিরাম তাঁহার কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহার দ্বারাই দীক্ষিত হন সন্ন্যাসধর্মে।

পূর্বাশ্রমের সমস্ত পরিচয় এইবার নিঃশেষে মুছিয়া গেল, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

ইহার পর রেবানদীর তটস্থিত এক শ্মশানে থাকিয়া কিছুকালের জন্য তিনি কঠোর সাধনায় রত হন।

সন্ন্যাসজীবনের প্রথা অনুযায়ী স্বামী ভাস্করানন্দ একবার তাঁহার জন্মস্থান মৈথেলালপুর দর্শন করিতে আসিলেন। যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া ইতিমধ্যে সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে।

আত্মপরিজনেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মিনতি ও অশ্রুজল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মোতিরামকে ধরিয়া রাখি'তে পারিল না।

ইহার পর শুরু হয় ভাস্করানন্দের তীর্থ পরিক্রমা। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া ভারত ভ্রমণের পর তিনি হরিদ্বারে উপস্থিত হন। এই সময়ে সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত বৈদান্তিক অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। এই স্বনামধন্য আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তিনি ছাড়িলেন না। তাঁহার সাহায্যে বেদান্তশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

অতঃপর শিবপুরী কাশীধামের আহ্বান আসিয়া যায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তটে পৌঁছিয়া ভাস্করানন্দ এবার যে কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করেন, তাহা তাঁহার সাধনজীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। আহার বিহার সমস্ত কিছু তখন পরিত্যাগ করিয়াছেন। গঙ্গার বালুতটে শীত ও গ্রীষ্মে সমভাবে অবস্থিত থাকিয়া বিশ্বনাথজীর আরাধনায় তিনি নিমগ্ন। একনিষ্ঠ সাধকের অন্তরে অহোরাত্র চলিতেছে ইষ্ট ধ্যান। মুক্তির সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য তখন তিনি জীবন পণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন।

'বেদব্যাস' পত্রিকার সম্পাদক ভূধরবাবু তাঁহার এ সময়কার তপশ্চর্যার কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বামীজী তীব্র শীতের সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপর ঠিক একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড় আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ কোনোরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোনো আহার্য সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন, তিনি দ্রব্যগুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতহাস্যে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রায়ই সমাধিস্থ থাকিতেন।"

কঠোরতপা স্বামীজীর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং যোগবিভূতির কথা তৎকালে কাশীধামের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ফলে ভক্ত ও কৌতূহলী জনতার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। দর্শনার্থীদের ভিড় তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, তাই স্বামীজী মাঝে মাঝে সাঁতরাইয়া গঙ্গার অপর পারে রামনগরে গিয়াও আশ্রয় নিতেন। সেখানে তাঁহার ধ্যান-ধারণার মিলিত প্রচুর অবকাশ। আবার স্বেচ্ছামতো তিনি কাশীতে ফিরিয়া আসিতেন।

ইহার পর দুর্গাবাড়ির নিকটে আনন্দবাগে স্বামীজী তাঁহার আসন স্থাপন করিলেন। এ উদ্যানের মালিক আমেঠির রাজা। তাঁহারই সকাতর মিনতিতে এখানে আসেন—কিন্তু স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ থাকে যে, এখানে কোনো দর্শনার্থীকেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং কয়েকজন প্রহরী এজন্য নিযুক্ত থাকিবে।

প্রহরার ব্যবস্থা ঠিক মতোই হইল। কিন্তু জনতা এড়ানো নিতান্ত সহজ হইল না। ভাস্করানন্দের যোগৈশ্বর্যের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুমুক্ষু কৌতূহলী আগন্তুকদের কোলাহলে এবার নিস্তব্ধ আনন্দবাগ দিনের পর দিন মুখরিত হইতে থাকে। স্বামীজী অবশেষে তাঁহার কৃপার দুয়ারটি উন্মুক্ত করিলেন। সারাদিন ভূগর্ভস্থ গৃহে সাধন-ভজন করার পর তিনি যখন উপরে উঠিয়া আসিতেন, তখন সকলে তাঁহার দর্শন ও উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইত।

এ সময়ে একদিন এক কৌতূহলী রাজা ভাস্করানন্দজীকে পরীক্ষা করিতে উৎসুক হন। এজন্য কয়েকজন রূপসী গণিকাকে তিনি নিযুক্ত করেন। তাহাদের প্রতি নির্দেশ থাকে, যে-কোনো প্রকারে স্বামীজীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইলে তাহাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গভীর নিশীথে এই নারীদের আনন্দবাগে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। আর রাজাবাহাদুর নিকটস্থ এক ঝোপের আড়ালে নীরবে লুকাইয়া রহিলেন।

স্বামীজী তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ভূগর্ভগৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বারাঙ্গনাগণ কিন্তু দ্বারের কাছে আসিয়া বার বারই ফিরিয়া যাইতেছে। মহাপুরুষের প্রশান্ত মহিমময় মূর্তির মধ্যে কি তাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়

কোন্ এক অজানা শঙ্কায় কম্পিত হইতেছে। রাজাবাহাদুরের প্রলোভন আর তাহাদের উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না।

রাত্রির শেষ যাম। হঠাৎ এসময়ে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। দ্বারে সমাগত নারীদের উচ্চস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া থাকে, এ মুহূর্তে তোমরা স্থান ত্যাগ ক'রে যাও।"

রমণীদের মধ্যে শুধু একজন কিছুটা সাহস সঞ্চয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অপরেরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আনন্দবাগের প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল।

স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়ানো নারীটি হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার শুরু করিয়া দেয়। অতর্কিতে কোথা হইতে একটি বৃহদাকার সর্প তড়িৎবেগে আসিয়া তাহার পা দুইটি বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে।

গণিকাটিকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নির্বিকারভাবে স্বামীজী তাঁহার ভূগর্ভ-গৃহ হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজাবাহাদুরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সর্পবেষ্টিতা রমণীকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ার্ত হৃদয়ে সদলবলে তিনি পলায়ন করিলেন।

সূর্যোদয়ের পর ঐ নারীর নাগপাশ মোচন হয়—সাপটি কোন্ এক অলৌকিক শক্তির নির্দেশে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে।

ভ্রষ্টা নারীটি এবার লুটাইয়া পড়ে স্বামীজীর চরণতলে, বার বার তাঁহার মার্জনা ভিক্ষা করিতে থাকে। উত্তরকালে বিত্ত বিষয় বর্জন করিয়া এই নারী সংসার ত্যাগ করে এবং স্বামীজীর কৃপায় পরিণত হয় এক বিশিষ্টা সাধিকায়।

স্বামীজীকে ক্রমে তাঁহার কৌপীনটি পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অন্তর বাহিরের সমস্ত ভেদাভেদ যাহার ঘুচিয়া গিয়াছে, সংসারের সমস্ত কিছু সংস্কার, সমস্ত কিছু প্রয়োজন, আজ তাঁহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাই দেখা যায় বারাণসীর আনন্দবাগ উদ্যানের এক প্রান্তে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন, আর সভ্যজগতের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিতেছেন অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এক এক সময়ে অলৌকিক আচরণ ও সমাজের প্রয়োজনে তিনি নিজেই নিজের স্বাধীনতা সাময়িকভাবে খর্ব করিয়া নিতেন। দর্শনার্থী মহিলা ভক্তগণ আসিলে অল্প সময়ের জন্য কাহারো নিকট হইতে এক টুকরা বস্ত্র চাহিয়া নিয়া কটিদেশ আবৃত করিয়া বসিতেন। তাহার পরই আবার তাঁহাকে নগ্ন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকিতে বা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেখা যাইত।

অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারীরূপে ভাস্করানন্দ তখন খ্যাত, চারিদিকে ভক্ত ও আশ্রয়ার্থীর ভিড়ের অন্ত নাই। মহাযোগীকে এসময়ে যাঁহারাই দেখিতে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন, তাঁহার যোগসামর্থ্য ও করুণাঘন রূপ দর্শনে।

ভারত ও বহির্ভারতের রাজরাজড়ার দল, গভর্নর-জেনারেল ও কমান্ডার-ইন-চীফ,

প্রভৃতি যাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, নিরন্ন ভিখারীও তেমন পাইতেছে তাঁহার স্নেহদৃষ্টির স্পর্শ।

যোগিবরের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনধারাটি কিন্তু বড় অদ্ভুত ছিল। নিদারুণ শীতের নিশীথেও এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে আনন্দবাগের শিশিরসিক্ত দূর্বাদলের মধ্যে পরম আনন্দে শায়িত থাকিতে দেখা যাইত।

'বেদব্যাস' পত্রিকার সম্পাদক ভূধরবাবু তাঁহার দিনচর্যা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "স্বামীজী চত্বারিংশ বৎসর বয়সে আনন্দবাগে আগমন করিয়া, যেমন অনাবৃত দেহে বামহস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদারুণ পৌষমাসের শীতেও ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্যন্তও তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্বেও যেরূপ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও পানীয় পাত্রাভাবে তাঁহার জলপান করা হইত না, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্যন্ত মিনতি সত্ত্বেও জলপানার্থে আনীত পানপাত্রে কোনোমতেই তিনি জলপান করিতেন না। যদি কোনো দর্শনার্থী লোটা হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, তাহা হইলে ঐ লোটা লইয়া জলপান করতঃ তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিতেন, নতুবা করপুটই তাঁহার পানপাত্রের কার্য করিত।"

পানপাত্র অভাবে স্বামীজীর অসুবিধা হইতেছে ভাবিয়া একবার এক ঘনিষ্ঠ শিষ্য তাঁহাকে একটি পাথরের জলপাত্র প্রদান করেন। বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে তখনই এটি সম্মুখে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে দান করিলেন।

প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "সাধু সর্বদা অবলম্বন ক'রে থাকবে আকাশবৃত্তি,—আগামীকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখবার তার অধিকার তো নেই।"

একবার তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্য পরের দিনের জন্য সামান্য কিছু রন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। একথা কানে যাওয়া মাত্র স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে তাঁহার অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। ইহারা প্রায়ই বহুবিভতি দুষ্প্রাপ্য ফলমূল, খাদ্য ও অর্থাদি আনন্দবাগে প্রেরণ করিতেন। আশ্রমে আসামাত্র অমনিই তাহা চারিদিকে বিতরিত হইয়া যাইত।

কাশ্মীরের মহারাজা একবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দেন। স্বামীজীমহারাজ তখনি এই ভেট স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। কহেন, "আমার একটা অতিরিক্ত কৌপীনও নেই, কোথায় এসব টাকাকড়ি আমি রাখবো বলতো?"

কাশীর নৃপতি একদিন ঝুড়িভর্তি বহু ফল-পাকড় পাঠাইয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার অভ্যাসমতো তখনই উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা বিতরণ করিতে বলিলেন। ভক্ত ও সেবক রামচরণ তেওয়ারীজীর কিন্তু ইহা মোটেই মনঃপূত হইল না। ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাঁচভূতে মিলিয়া এগুলি খাইয়া যাইবে, স্বামীজী মহারাজকে কোনো কিছুই দেওয়া সম্ভব হইবে না।

সেদিন স্বামীজীর আহার হইয়া গিয়াছে। পরের দিন তাঁহাকে কিছু ফল খাওয়াইবেন মনে করিয়া তেওয়ারীজী বিতরণের সময় উহার কয়েকটি বস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া ফেলিলেন।

সর্বজ্ঞ স্বামীজীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইল না। তিনি পরিহাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "কেঁও রামচরণ, তুম্‌ পরমহংসকা ভাণ্ডারী বনাতে হো?"

ধরা পড়িয়া গিয়া তেওয়ারীজী বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী এবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "রামচরণ, তুমি হয়তো মনে করছো যে, আমার এসব খাওয়া হয়নি। কিন্তু তুমি তো জানো না—আমি এই ভক্তদের জিহ্বা দিয়ে এগুলোর সম্পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করেছি।"

স্বামীজীর ভক্তদের মধ্যে রাজা ও শেঠদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। এজন্য বহিরাগত ব্যক্তিদের কেহ কেহ মনে করিতেন, তিনি বুঝি ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট। অবশ্য ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে তাঁহার স্বরূপটি অজানা ছিল না। সংসারের সমস্ত ভোগসুখ অবলীলায় পশ্চাতে ফেলিয়া যিনি চলিয়া আসিয়াছেন, যোগ সাধনার মহাসিদ্ধি যাহার করতলগত, সমাজের ধনী ও অভিজাতদের মূল্য সেই মহাসন্ন্যাসীর কাছে কতটুকু? তাই দেখা যাইত, রাশিয়ার অধিপতি জারের পুত্র নিকোলাস এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর উইলিয়ম লকহার্ট প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তি যেমন এই মহাযোগীর আশিস ও শুভেচ্ছা পাইতেন, তেমনি প্রতিদিন প্রভাতে বাবার প্রিয়পাত্র, দীনহীন কাঙাল সহাই তেলীও তাঁহাকে দর্শন করিতে না আসিলে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন।

আনন্দবাগে উপস্থিত হইলেই সহাই তেলী সর্বপ্রথমে তাঁহার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিত। 'আও মেরে বাপ,' 'আও মেরে বাপ' বলিয়া স্বামীজী তাহাকে পরম স্নেহে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেন। ধনী ও পদস্থ লোকদের ভিড় দীনদুঃখীদের অনেক সময় দর্শনের অসুবিধা ঘটিত। স্বামীজী তাই মাঝে মাঝে তাহাদের সুবিধার জন্য একটি দিন সপ্তাহে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন—সে দিনটিতে অভিজাত দর্শনার্থীদের আনন্দবাগে ঢুকিতে দেওয়া হইত না।

বিশিষ্ট মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষে আসিয়া ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যান। তিনি তাঁহার 'মোর ট্রাম্পস্‌ অ্যাব্রড' নামক পুস্তকে সে সময়কার এক মনোহর বর্ণনা দিয়াছেন—

"দর্শনের জন্য আনন্দবাগের একপ্রান্তে সবাইকে আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অপেক্ষমান থাকার সময় বুঝিতেছিলাম যে, সেদিন স্বামীজীর দর্শনলাভ বড় সহজ হইবে না, কারণ, সেদিন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী রাজা-মহারাজাদিগকে দর্শন না দিয়া শুধু সমাজের নিম্ন স্তরের জনতার সহিতই দেখা করিতেছেন। আভিজাত্য ও পদমর্যাদা এ মহাপুরুষের কাছে কিছুই নয়, সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। এক এক সময়ে তিনি স্বেচ্ছামতো রাজরাজড়ার সঙ্গেই শুধু দেখা করেন, আর একদিন

দীনদরিদ্র লোকদের দর্শনদানেই তিনি উন্মুখ—ধনীর দল সেদিন তাঁহার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত হইতেছে।"

হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য এই মার্কিন সাহিত্যিকের খ্যাতি তখন বিশ্বব্যাপী। এসময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে 'ইংলিশ-ম্যান' কাগজের প্রতিনিধি প্রশ্ন করিলেন, "ভারতবর্ষে এসে আপনি যা দেখলেন তার ভেতর কোন্ বস্তুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য?"

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "বেনারস ও সেখানকার পবিত্রাত্মা মহাপুরুষটি।" একথা বলিতে বলিতে স্বামী ভাস্করানন্দের উলঙ্গ ছবিটি তিনি সর্বসমক্ষে খুলিয়া ধরিলেন।

সাংবাদিকটি কহিলেন, "এ বড় বিস্ময়ের কথা। সকলেই জানে আপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপনি এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে লোককে হাসাতে পারেন, যাতে হাসবার মতো মোটেই কিছু নেই। এ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা আপনি উত্থাপনা করায় আমরা ভেবেছিলাম, না জানি তাঁকে নিয়ে আপনি কত কিছু হাস্যরসের অবতারণা করবেন, আমরা হেসে খুন হবো। এখন ব্যাপার দেখছি অন্যরূপ।"

তিনি শ্রদ্ধাভরে কহিলেন, 'তিনি যে ঈশ্বর-প্রতিম।"

এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক তাঁহার ভ্রমণ-গ্রন্থে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতের তাজমহল অবশ্যই এক পরম বিস্ময়কর বস্তু, যার মহনীয় দৃশ্য মানুষকে আনন্দে অভিভূত করে, নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু স্বামীজীর মতো মহান্ ও বিস্ময়কর জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে তা কি ক'রে তুলনীয় হতে পারে? এ যে জীবন্ত, এতে শ্বাস প্রশ্বাস বয়, এ যে কথা বলে, লক্ষ লক্ষ লোক এতে আস্থা স্থাপন করে, ভগবান্ ভেবে ভক্তি করে, কৃতজ্ঞতার সহিত এর পুজো করে।"

মার্ক টোয়েন তাঁহার ভ্রমণগ্রন্থে এই ভারতীয় মহাপুরুষের কথা বার বার শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মাচার্য ডাঃ ফেয়ারবার্ন ও স্বামীজীর দর্শন লাভের পর প্রকাশ করেন, "স্বামীজীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি পবিত্রতা ও সততার এমন এক ভাবময় রূপ অন্তরে অনুভব করেছি, সমগ্র খৃষ্ট জগতে যার সমতুল্য কিছু আমি কখনো দেখি নি।"

এ দেশের বহুতর শিক্ষিত ও অভিজাত শিষ্য ভক্তদের মধ্য দিয়া বহির্ভারতের দিগ্বিদিকে স্বামী ভাস্করানন্দের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। এই খ্যাতনামা 'হোলিম্যান অব্ বেনারস' বা কাশীর পবিত্রাত্মা মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য বিশ্বের বহু মনীষী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জার্মান পণ্ডিত ডয়সন, রাশিয়ার জার নিকোলাসের পুত্র প্রভৃতি ছিলেন স্বামীজীর এই সব দর্শনার্থীর অন্যতম।

কাশীর সমকালীন মহাপুরুষদের অনেকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্বামীজী লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দজী চিরকাল স্বামী ভাস্করানন্দকে 'বড়দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহাযোগী তৈলঙ্গ মহারাজের সহিত স্বামীজীর প্রগাঢ় সখ্য ছিল এবং সাক্ষাৎমাত্রই উভয়ে উভয়কে সৌজন্য দেখাইতেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাশীতে বাস করার কালে মাঝে মাঝে ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া গোস্বামীজীর আনন্দের সীমা থাকিত না। একদিন তিনি ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া জনৈক মহারাজা বহু স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থালা তাহাকে নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু স্বামীজী এটি ফিরাইয়া দিলেন। ক্ষুণ্ণমনে ঐ মহারাজকে আনন্দবাগ ত্যাগ করিতে দেখা গেল। স্বামীজীকে উদ্দেশ্য করিয়া সেদিন গোস্বামীজী ভক্তিভরে কয়েকটি প্রশস্তি-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

ভাস্করানন্দজীর দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। আর ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের কত বিচিত্র নরনারীই যে দেখা যাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কাশীধামে সে সময়ে একদল দুর্দান্ত পাণ্ডা উপদ্রব করিয়া বেড়াইত, ইহাদের কবলে পড়িলে নিরীহ যাত্রীদের বিপদের সীমা থাকিত না। স্বামীজী কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া এই পাণ্ডাদের মধ্যেকার বড় বড় পাষণ্ডীদেরই করিতেন তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত। এজন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, কুখ্যাত ঐ সব পাণ্ডা মহাপুরুষের কৃপাবলে ধীরে ধীরে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

ভাস্করানন্দজীর যোগবিভূতির কাহিনী সে-সময়ে সারা ভারতে জনশ্রুতিতে পরিণত হয়। ভক্তদের অনুরোধ ও আবদার রক্ষা করিতে গিয়া এবং অনেক সময় তাঁহাদের কল্যাণার্থে, অবলীলায় তিনি নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করিয়া বসিতেন। যে বস্তু তাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য, বালকের ক্রীড়াবস্তুর মতো তুচ্ছ, দর্শনার্থী ও ভক্তজনের মানসপটে এক এক সময় তাহাই দেখা দিত অপ্রাকৃত রশ্মিরেখার চকিত আবির্ভাবরূপে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র স্বামীজীর নিকট মাঝে মাঝে যাইতেন। একদিন তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র কহিলেন, "স্বামীজী, আপনি প্রায়ই বলেন এই জগৎ নিতান্তই অলীক—মায়া মাত্র। কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করবার কালে তো তা আমাদের মনে হয় না!"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি ভাস্করানন্দ মহারাজের চরণস্পর্শ করেন। কিন্তু চরণ হইতে হস্তটি উঠাইতে না উঠাইতেই সবিস্ময়ে দেখেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। স্বামীজীর স্থূল দেহটি মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

ক্ষণপরেই আবার স্থূলদেহে সেখানে আবির্ভূত হইয়া স্বামীজী স্যর রমেশচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "এবার বুঝতে পাচ্ছো তো? সমস্তই অলীক না হলে আমি এরূপভাবে প্রতি ক্ষণেই আছি, আবার নেই—তা কি ক'রে সম্ভব হয়?"

এ কথা বলিয়াই তিনি স্যর রমেশচন্দ্রের সম্মুখ হইতে দ্বিতীয় বার অদৃশ্য হইলেন। পুনরায় স্বস্থানে আবির্ভূত হইয়া যোগীবর হতবাক্ জাস্টিস্ মিত্রকে বলিলেন, "কি হল রমেশ? জগৎ স্বপ্নদর্শনের মতো অলীক এ কথাটা কি এখন অবিশ্বাস করছো?"

ভারতের কমাণ্ডার-ইন-চীফ্ স্যর উলিয়ম লক্‌হার্ট ভাস্করানন্দজীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। মাঝে মাঝে সস্ত্রীক তাঁহাকে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখা যাইত।

একবার লক্‌হার্ট সাহেবের চৈতন্যোদয়ের জন্য তিনি এক অদ্ভুত যোগবিভূতি প্রদর্শন করেন। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন পুরাতন ভক্ত সেদিন আনন্দবাগে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি চাক্ষুষ দেখিয়া তিনি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—

"সেনাপতি যেদিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন, সেই দিন সেই সময়ে আমি আনন্দবাগে উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজীর নিকট লক্‌হার্ট সাহেব আফ্রীদিগণকে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আমরাও সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

যুদ্ধের গল্প করিতে করিতে যে সময়ে সহসা সাহেবের মনে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময়ে স্বামীজীর নিকটে এক পেনসিল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐ পেনসিল তুলিয়া আনিবার জন্য লক্‌হার্ট সাহেবকে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড! লক্‌হার্ট সাহেব সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ পেনসিলটি তুলিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী বলিলেন, তুমি যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ এরূপ ভাবিও না। জয় পরাজয়ের কর্তা কেবল একজন আছেন। আমি যেরূপ তোমার শক্তি হরণ করিয়াছি, তিনিও ঐ ভাবে তোমার বুদ্ধি হরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া তুমি আফ্রীদিগণকে পরাজিত করিয়াছ, ঐ প্রকার বুদ্ধি তোমার মনে যুদ্ধ জয়কালে কখনই উপস্থিত হইত না। ঈশ্বরের উপরই সর্বদা সব কাজে নির্ভর করিবে।"

আধি-ব্যাধি পীড়িত বিপন্ন মানবের দুঃখ মোচনে স্বামীজীর হৃদয় সদাই বিগলিত হইয়া উঠিত। কৃপা ও আশ্রয়দানের মধ্য দিয়া প্রায়ই প্রকটিত হইত অলৌকিক যোগৈশ্বর্য। ডাঃ ঈশ্বর চৌধুরী বেনারসের একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ। একবার তাঁহার বালক পুত্রটি কোনো এক মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়ে। বিজ্ঞানসম্মত সর্বপ্রকার চিকিৎসাই করা হয়, কিন্তু রোগীর অবস্থা দিনের পর দিন সংকটাপন্ন হইতে থাকে।

অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার চৌধুরী এবার ভাস্করানন্দ স্বামীজীর শরণাপন্ন হন। স্বামীজী তখন বহু দর্শনার্থী ও ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আনন্দবাগে বসিয়া আছেন। ডাঃ চৌধুরীর কাতর প্রার্থনায় তাঁহার দয়া হইল। তখনই হাত বাড়াইয়া সম্মুখের ঝুড়ি হইতে একটি ফল নিয়া তিনি রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। ইহা সেবনের পরই সংকট কাটিয়া যায়, বালকটি বাঁচিয়া উঠে।

তৎকালীন 'বঙ্গবাসী' কাগজে স্বামীজীর কৃপালীলার নানা তথ্য প্রকাশিত হয়। দুইটি কাহিনী এখানে উদ্ধৃত হইল:

"পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কয়েক-জন প্রণাম করিলে পর, অন্য একটি বাবু যেমন প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'তোমার অশৌচ হইয়াছে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তুমি প্রণাম করিও না। তুমি বরং এখনই বাটী চলিয়া যাও, বাটীতে তোমার অনাথিনী মাতা যারপরনাই শোকে কাতরা।' প্রথমে তাঁহাদের একথায় বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু ঐ বাবুটি যেমন বাসায় ফিরিলেন, অমনি দেখিলেন, দরজার কাছে তার পিয়ন দাঁড়াইয়া, হাতে টেলিগ্রাম—'তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; অবিলম্বে বাটী আসিবে'।"

"সুখীপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকট আপন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তির শরীর অতিশয় কৃশ ছিল, যাহা খাইত তখনই তাহা বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। স্বামীজী আগন্তুককে দর্শনমাত্র তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—পাঁড়েজী, ভোজন প্রস্তুত করো।' আদেশ মতো সে ব্যক্তি খিচুড়ি রাঁধিয়া স্বামীজী মহারাজের কণিকামাত্র প্রসাদ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা শহরের একজন প্রবীণ রাজকর্মচারী। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার ও হেকিমদের চিকিৎসায় দীর্ঘকাল থাকিয়াও তাঁহার রোগ নিরাময় হইল না। শুধু তাহাই নয়, ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিলেন।

এ সময়ে চণ্ডীবাবু ভাবিতে থাকেন, জীবন তো শেষ হইয়াই যাইতেছে, কিন্তু দীক্ষাহীনভাবে মরা তো ঠিক নয়। তাই কাশীধামে আসিয়া সকাতরে ভাস্করানন্দ মহারাজকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে মন্ত্র দান করিতেই হইবে।

কৃপাপরবশ হইয়া স্বামীজী কহিলেন, "তোমায় আমি মন্ত্র দেবো ঠিকই, কিন্তু তার আগে কুলগুরুর কাছ থেকে তোমায় দীক্ষায় নিতে হবে।"

চণ্ডীবাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কুলগুরু থাকেন সুদূর পূর্ববঙ্গে, কাশীতে কি করিয়া তিনি তাঁহার দেখা পাইবেন?

কিন্তু মহাপুরুষের কৃপায় অচিরে সব দুশ্চিন্তা দূর হইল। একদিন তিনি শহরের রাস্তা দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। দেখিলেন, তাঁহার কুলগুরু সেই পথেই আসিতেছেন। হঠাৎ এক সুযোগ পাইয়া তিনি কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। এবার কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লাভের পর চণ্ডীবাবু ভাস্করানন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হন। মহাপুরুষ এ সময় তাঁহাকে বলিয়া দেন, "যাও উনচল্লিশ দিনের ভেতর তুমি তোমার কালব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে।" ঠিক ঐ সময়ের মধ্যেই চণ্ডীবাবু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র বসুমল্লিক কলিকাতা শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক। ভাস্করানন্দ স্বামীর একটি কৃপালীলার কথা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—"আমার ভগ্নীপতি, কলিকাতার

পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রায় রমানাথ ঘোষবাহাদুর ও তাঁহার মাতা স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। রমানাথবাবুর পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে জানা যায় যে, পুত্রটির ষোল বৎসর বয়সে একটি বড় ফাঁড়া আছে; ঐ ফাঁড়া হইতে তাহার রক্ষা পাইবার কথা নহে। রমানাথবাবুর মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে বালকের বিবাহ দেন কিন্তু রমানাথবাবু বিবাহ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহারা স্থির করেন, স্বামীজীর আদেশমতো কার্য করিবেন। স্বামীজীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা ছেলের বিয়ে দাও?"

"স্বামীজীর আদেশ পাইয়া, রমানাথবাবু ও তাঁহার মাতা চলিয়া গেলেন। একটি জ্যোতিষী তথায় ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'প্রভো! পুত্রটির বিষম-ফাঁড়া আছে। জ্যোতিষ বাক্যও তো আপনার, অর্থাৎ ঋষিবাক্য। আপনি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া বিবাহ দিতে আদেশ করিলেন?"

"তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি জানি পুত্রের মৃত্যু হইবেই, কিন্তু সেই কন্যাটি, যাহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মানুসারে ইহজীবনে বৈধব্যদশা ভোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, ও যাহার কর্মের সহিত ঐ বালকের কর্ম এক সূত্রে বাঁধা তাহাকে বিধবা হইতেই হইবে; তবে আমি যতদিন জীবিত থাকিব পুত্রটিকে ততদিন মরিতে দিব না, ইহা নিশ্চয় জানিও।'

"জ্যোতিষী স্বামীজীর কথা মানিয়া লইলেন। একদিন স্বামীজীর কলেরা হইল, রমানাথবাবুর পুত্র গণেশও ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু যে কয়দিন স্বামীজী জীবিত রহিলেন, গণেশও অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিল, স্বামীজী রাত্রি বার ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিলেন, গণেশও ঠিক ঐ সময় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

কত মুমুক্ষু ও আশ্রিত ভক্তজন যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, নবজন্ম লাভ করিয়াছে, তাঁহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? এমনই একজন ভাগ্যবান্ ছিলেন, নেপালের এক প্রবীণ রানা, কর্ণেল মিনা বাহাদুর। ভাস্করানন্দজীর কৃপারশ্মি ইহার জীবনে পতিত হয় এবং রূপান্তর সাধন করে। মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভের পর সংসারে সমস্ত সুখৈশ্বর্য ও আত্মীয়স্বজনের মায়া তিনি ত্যাগ করেন। হিমালয়ের শালিগ্রাম নদীতটে এক পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া এই সাধক রত হন কঠোর তপস্যায়।

অনেক সময় জিজ্ঞাসুগণ স্বামীজীর নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য নির্দেশাদি স্বপ্ন অথবা অন্যান্য অলৌকিক পন্থার মধ্য দিয়াও প্রাপ্ত হইতেন। একবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক শিষ্য ভূতনাথ ঘোষ মহাশয়, স্বামীজীর নিকট গিয়া সাধন-বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। খেয়ালী স্বামীজী তাঁহার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর দিলেনই না, বরং তখনই তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ঘোষ মহাশয় ইহাতে খুব বিরক্ত হন এবং চটিয়া যান কিন্তু সেই দিনই রাত্রিতে স্বপ্নযোগে

তিনি স্বামীজীর দর্শন ও নির্দেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার মনের সমস্ত সন্দেহ ও ও বিরক্তির মেঘ অপসৃত হইয়া যায়।

অযোধ্যারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামী ভাস্করানন্দের একজন অনুগৃহীত শিষ্য। স্বামীজীর কৃপাবলে একবার তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। সে সময়ে তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শনের জন্য বেনারসে আসিয়াছেন, হঠাৎ অযোধ্যা হইতে এক জরুরী তার আসিল, অগৌণে সেখানে মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন। স্থির হইল, পরের ট্রেনেই তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু ভাস্করানন্দজী কিছুতেই সেদিন তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী নহেন। বলা বাহুল্য, প্রতাপনারায়ণ মহাসংকটে পড়িলেন।

অনুমতির জন্য বারংবার অনুনয় করা হইলে, স্বামীজী কহিলেন, "যদি নিতান্তই আজ তোমার যেতে হয়, তবে যে গাড়িতে যাবে বলে ঠিক করেছ তার পরের গাড়িতে যেযো।"

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই ঠিক হইল। স্টেশনে পৌঁছিয়া এক সংবাদ শুনিয়া তো মহারাজের চক্ষুস্থির। তারে সংবাদ আসিয়াছে, ইতিপূর্বে যে গাড়িখানা অযোধ্যার দিকে যায়, তাহা পথিমধ্যে অন্য এক গাড়ির সহিত সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয়। ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে। স্বামীজীর নিষেধে যাত্রা স্থগিত না রাখিলে প্রতাপনারায়ণ ঐ গাড়িতেই উঠিতেন এবং জীবন তাঁহার বিপন্ন হইত।

ইহার পূর্বদিন ভাস্করানন্দ মহারাজ নিতান্ত কৌতুকভরে এক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজী মহারাজ সন্ধ্যাকালে আনন্দবাগে ভ্রমণ করিতেছেন। ভক্তের মনে এক উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। জরুরী তার পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশে যাইতে পারিতেছেন না, সারাদিন তাই বিষণ্ণ হইয়াই আছেন। সদানন্দময় স্বামীজী তাঁহার সহিত এ সময়ে এক রঙ্গ শুরু করিয়া দিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা আনন্দবাগের নিকটস্থ পুষ্করিণী দুর্গাকুণ্ডের ধারে আসিয়াছেন। হঠাৎ স্বামীজী রাজার নিকট হইতে তাঁহার হীরক অঙ্গুরীটি চাহিয়া নিলেন, তারপর ক্রীড়াচ্ছলে উহা জলগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অযোধ্যারাজ গুরুদেবকে ভালভাবে জানেন, এ রহস্যময় আচরণে তাই তেমন কিছু বিস্মিত হন নাই। তাছাড়া গুরুজী যখন উহা জলে ফেলিয়া দিলেন, তখন তাঁহার আর কিই বা বলিবার আছে? ব্যাপারটিকে অতঃপর কোনো গুরুত্ব না দিয়া অপর এক সঙ্গীর সহিত তিনি কথা কহিতে লাগিলেন।

শিষ্যের এই শান্ত আচরণ দর্শনে স্বামীজী বড় খুশী হইয়া উঠিয়াছেন। সহাস্যে কহিলেন, "তোমার অঙ্গুরীটি এখনই মিলবে, তুমি সরোবরের যে-কোনো স্থানে হাত ডোবাও দেখি।"

প্রতাপনারায়ণ চাতুরী করিয়া দুর্গাকুণ্ডের অপর পারে গিয়া জল মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিলেন। কী আশ্চর্য! জল হইতে কতকগুলি হীরক অঙ্গুরীয় উঠিয়া আসিল। সবগুলিই দেখিতে একপ্রকার—কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। অঙ্গুরীয়ের অধিকারীও তাঁহার নিজস্ব বস্তুটি চিনিতে সমর্থ নন।

স্বামীজী এবার বালকের মত খল্‌খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, অযোধ্যারাজের অঙ্গুরীটি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহার দেরী হইল না। সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি সেই পুষ্করিণীতে বিসর্জন দিলেন। এভাবে সমস্ত পরিবেশটি মহাপুরুষের এই কৌতুক-ক্রীড়ায় হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বেচ্ছাময় স্বামীজী মাঝে মাঝে নিতান্ত মনের আনন্দে বালকবৎ তাঁহার যোগবিভূতি প্রকাশ করিতেন। একবার কয়েকজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আগন্তুকের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে স্বামীজী একটি শাস্ত্র গ্রন্থ নিয়া বসিলেন। পাঠ ও ব্যাখ্যায় বেলা বাড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল তাই তো, এ সন্ন্যাসীদের তো খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। তিনি তাঁহাদের ভোজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা ঐ সন্ন্যাসীদের একজনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। সন্ন্যাসীটি তাঁহাকে বলেন, "সর্বদর্শী স্বামীজী মহারাজ তখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কিছু খাবে না?' আমরা উত্তর করিলাম যে, তিনি আমাদের তিনজনের উপযুক্ত আহার কোথায় প্রাপ্ত হইবেন, স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা আহারার্থ উপবেশন করো, এখনই তোমাদিগের আহার উপস্থিত হইবে, তোমরা কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য খাইতে চাও তাহা আমাকে বল।' ইহা শুনিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন, আমরা বারবড়ি, বরফি ক্ষীর, দধি, ছানা, সন্দেশ, আম এবং কমলালেবু ভোজন করিব।

"এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম, দুইটি দিব্যাকৃতি সুন্দর বালক আমাদিগের দিকেই আগমন করিতেছে। বালক দুইটি আগমনপূর্বক তাহাদিগের মস্তকস্থিত ঝুড়ি দুইটি স্বামীজীর পদতলে স্থাপন করিয়া মুহূর্তমধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বালক দুইটি কেবলমাত্র সেই কয়েকটি দ্রব্যই আনয়ন করিয়াছিল।"

ভাস্করানন্দজীর জীবনে নানা সময়ে অজস্র অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ দেখা গিয়াছে, কিন্তু ভক্ত লছমন মালাকে তিনি আবিষ্কার করেন, তাহার অলৌকিকত্ব অনেক কিছুকেই যেন হার মানাইয়া দেয়। উত্তরকালে এই দরিদ্র ধীবর ভক্তের প্রতি স্বামীজী মহারাজের কৃপা প্রায়ই তাঁহার অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের বিস্মিত করিত।

শেষ জীবনে স্বামীজী একবার জন্মভূমি মৈথেলালপুর দর্শন করিতে যান। তিনি সেখানে গোপনে আসিয়াছেন, কিন্তু কি করিয়া যেন আগমনের সংবাদটি চারিদিকে রটিয়া যায়। সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশে ক্ষুদ্র গ্রামটি আলোড়িত হইয়া উঠে।

স্বামীজীকে সেদিন এক মঞ্চোপরি উপবেশন করাইয়া অভ্যর্থনা করা হইতেছে, বিরাট এক জনতা তাঁহার সম্মুখে নীরবে সশ্রদ্ধভাবে উপবিষ্ট। উপদেশাদি দানের শেষে

সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইতেছে, এমন সময়ে স্বামীজী তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তিদের আদেশ দিলেন, "দ্যাখো, লছমন মালা নামে এক দরিদ্র জেলে জনতার ভেতর মিশে আছে। সে আমার এক পরম ভক্ত। তাকে তোমরা শিগ্‌গীর খুঁজে বার করো।"

বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এই ভাগ্যবান্ ধীবরকে আবিষ্কার করা গেল। কৃপালু স্বামীজী তাহাকে মঞ্চের উপর নিজের পার্শ্বে সাদরে বসাইয়া দিলেন। সবাই উপলব্ধি করিলেন, ধনীজন ও রাজন্যবর্গবন্দিত যোগীরাজ ভাস্করানন্দ কাঙালেরও এক পরমাশ্রয়।

ছিন্নবাস পরিহিত দরিদ্র ধীবরের মধ্যে স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি সেদিন এক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে আবিষ্কার করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে স্বামীজী বলিতেন, "আমার লছমন মালার ভেদজ্ঞান দূর হয়েছে— সে সার্থক সাধক এবং জ্ঞানী।"

দীর্ঘদিন দিকে দিকে দিব্য করুণার ধারা বিস্তারিত করার পর স্বামী-ভাস্করানন্দের জীবন-লীলা এবার উপস্থিত হয় শেষ অঙ্কে। পরমপ্রাপ্তির আনন্দে এ সময়ে সদাই তিনি ভরপুর। পরমাত্মার পরম আহ্বানের প্রতীক্ষায় যেন একেবারে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

প্রিয় ভক্ত লছমন মালা তখন তাঁহার নিকট আনন্দবাগেই বেশী সময় অবস্থান করে। প্রত্যহ স্বামীজীর আদেশ মতো তাঁহার প্রিয় গানের ধুয়াটি ধরিয়া বার বার সে গাহিয়া চলে—

> লাবে মালাহা কিনারে লাইযা
> সবর্‌কে তীরে ভীড় ভৈ ভারী
> ঠহ্‌রে হ্যায় রামলছমন দু ভাইযা—

গান থামিয়া যায়, উদাস করা সুরের ঝংকার সারা আনন্দবাগের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নিকটস্থ বীথিকায় জড়াইয়া জড়াইয়া নিবিড় হইয়া উঠে, স্বামীজী মহারাজ আত্মভোলা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সুস্মিত হাসি হাসিয়া বলেন, "মালা, আমার জন্যও তোকে শিগ্‌গীর এবার অসিঘাটে নৌকা নিয়ে আসতে হবে।"

ভক্ত লছমন মালার দুই চোখে ঘনায় শোকের অশ্রু। তবে কি প্রভুর বিরহ সত্যই আসন্ন।

১৩০৬ সালের ২৫শে আষাঢ়। স্বামীজীর প্রতীক্ষিত বিদায় লগ্নটি এদিন উপস্থিত হয়। কয়েকদিন পূর্বে উদরের রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন, এবার সেই রোগকেই বাহনরূপে গ্রহণ করেন লোকান্তর যাত্রায়।

মহাপ্রয়াণের কালে মহাপুরুষের মৃতকল্প শরীরে অপূর্ব অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। আপন ধ্যানাসনে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হন, তারপর ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে।

রামদাস কাঠিয়াবাবা

উত্তরাখণ্ডের শীতার্ত মধ্য রাত্রি। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের ঘন আবরণ। চীর ও দেবদারুর বিশীর্ণ শাখা হইতে টুপটাপ করিয়া বরফের কণা ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের মধ্যে ঝুপড়িতে ধুনি জ্বালাইয়া তরুণ সাধু আসনে উপবিষ্ট। ধ্যান-জপে দীর্ঘকাল আক্রান্ত হইয়াছে। দেহ ক্লান্ত অবসন্নপ্রায়। দুই চোখে তাঁহার নামিয়া আসিতেছে দুর্নিবার ঘুম। আসনের উপর দেহটি কোন্ সময়ে যে ঢলিয়া পড়িল, হুঁশ নাই।

চালের ফাঁক দিয়া ধুনির উপর মাঝে মাঝে বরফ পড়িতেছে। এবার কাঠের আগুন একেবারেই নিভিয়া গেল। এই প্রাণান্তকর শীতে ঘুমানোরই বা উপায় কোথায়? কাঁপিতে কাঁপিতে যুবক সাধুটি উঠিয়া বসিলেন। এ বিপদে কি করিয়া প্রাণ আজ বাঁচাইবেন? পাহাড়ীদের অবস্থান দূরে, সেখান হইতে যে আগুন সংগ্রহ করিবেন, তাহারও তো জো নাই।

নিকটেই গুরুদেবের ঝুপড়ি, সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন। তাঁহার নিকট হইতে জ্বলন্ত কয়লা চাহিতে যাওয়া,—সে যে আরো সাংঘাতিক বিপদের কথা। প্রায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিবারই সমান। ডাকাডাকি শুরু করিলে ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িবেন। শিষ্যের তামসিক আলস্যে পবিত্র ধুনি নির্বাপিত হইয়াছে, -সে অপরাধের জন্য দিবেন চরম দণ্ড। আবার এই শীতে তাঁহার কাছে না গেলেও বিপদ কম নয়, অবিলম্বে আগুন সংগ্রহ না করিতে পারিলে মাঘের এই প্রচণ্ড শীতে মৃত্যু অনিবার্য।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া তরুণ সাধু ঝুপড়ির দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। ডাকিতে থাকেন, "গুরুজী গুরুজী।"

কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে ধ্বনিত হয় গুরুগম্ভীর কণ্ঠ—"কে? বাইরে কে দাঁড়িয়ে?'

ভীতিজড়িত কণ্ঠে শিষ্য নিবেদন করেন, "মহারাজ, আমার ধুনির আগুন হঠাৎ নিভে গেছে। যদি কৃপা ক'রে আপনার ধুনি থেকে কিছু কয়লা দেন, আবার তা জ্বালিয়ে নিতে পারি। প্রচণ্ড শীতে জমে যাচ্ছি, মহারাজ।"

ভিতর হইতে এবার আসে রোষদৃপ্ত তর্জন গর্জন, আর অনর্গল ভর্ৎসনা, "ধ্যান জপের সময়ে আসনে বসে নিশ্চয়ই তুমি ঘুমোচ্ছিলে। নইলে জ্বলন্ত ধুনি কি ক'রে নিভে? এই তামস ঘুম ও আরামের দিকে যদি এতই ঝোঁক, তবে বাপ-মাকে এত দুঃখ দিয়ে ঘর ছাড়লে কেন? সেখানে প্রাণভরে খেতে ঘুমুতে পারতে।"

শিষ্য রামদাসের দেহে তখন শীতের কাঁপুনির চাইতে ভয়ের কাঁপুনিই বেশী। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বার বার গুরুমহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। সানুনয়ে বার বার জানান, নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাই আজ এই

অপরাধ ঘটিয়াছে। আর কখনও এরূপ হইবে না। এবার হইতে নিশ্চয়ই ছেদ-বিরতিহীন ধ্যান জপে ব্রতী হইবেন। ধুনি অনির্বাণ রাখিতেও শৈথিল্য ঘটিবে না।

কিন্তু গুরুদেবের ক্রোধ প্রশমিত হয় কই? ঝুপড়ির ভিতর হইতে কঠোর কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠেন, "ইবে জাডামে এক ঘণ্টা ঠিক্‌সে খাড়া হো কর্‌ রহো, লেকিন আগ্‌ তুমকো নেহি মিলেগা।" অর্থাৎ, এই তীব্র শীতে তুমি এক ঘণ্টা বাইরে এমনি করেই দাঁড়িয়ে থাকো—আগুন কিছুতেই মিলবে না।

এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া হিমাচলের এই সুতীব্র শীতে তরুণ সাধু মৃতকল্পের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেহ প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে ঝুপড়ির দরজাটি হঠাৎ খুলিয়া গেল। গুরুদেব তাঁহার আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই ভিতর হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ বাহিরে ছুঁড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন এক সতর্ক-বাণী—আর যেন এমন ত্রুটি কখনো না ঘটে।

নূতন সমিধ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যের পবিত্র ধুনি তৎক্ষণাৎ আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

দীর্ঘ তপস্যা ও কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্য দিয়া উত্তরকালে এই শিষ্যের জীবন-সমিধেও এমনি করিয়া জ্বলিয়া উঠে আত্মনিবেদনের অগ্নিশিখা। গুরু কৃপার দিব্য স্পর্শে সর্বসত্তা তাঁহার জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, লাভ করেন তিনি বহুপ্রার্থিত ব্রহ্মজ্ঞান।

উত্তরাখণ্ডের শীতজর্জর নিশীথের সেদিনকার এই তরুণ সাধকই উত্তরকালের শ্রীবৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়াবাবা, আর তাঁহার গুরু মহাসমর্থ তাপস শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দেবদাসজী মহারাজ।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীমৎ নাগাজীর শাখার এক শক্তিধর আচার্য দেবদাসজী মহারাজ। ভারতের উচ্চকোটির সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ সমাজে তখন তাঁহার বিরাট প্রসিদ্ধি। এই শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তর্লোকের পরিচয় তাঁহার মহাজীবনের জ্যোতির্ময় স্বরূপ, অনুগত শিষ্য রামদাসের সাধনসত্তায় তৎকালে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সাধক রামদাস তাঁহার গুরু মহারাজের অপার যোগৈশ্বর্যের পরিচয় যেমন জানিয়েছেন, তেমনি জানিয়েছেন তাঁহার দিব্য করুণার স্বরূপ। আত্মগোপনশীল যোগীগুরুর কঠিন বাহ্যাবরণটি ভেদ করিতে তাঁহার সাধনোজ্জ্বলা দৃষ্টি সেদিন ভুল করে নাই।

অধ্যাত্মপথের দুঃসাহসিক অভিযানে রামদাস বাহির হইয়াছেন। এই অভিযাত্রার পথে দিনের পর দিন তাঁহাকে কম মূল্য প্রদান করিতে হয় নাই। কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সদ্‌গুরু তাঁহাকে টানিয়া নিতেছেন পরম পরিণতিটির দিকে।

গুরুদেব একদিন রামদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, কোনো বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে, তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বৃক্ষতলের আসন ছাড়িয়া রামদাস যেন কোথাও না যায়। আদেশমতো শিষ্য ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিয়া গেলেন।

দিনের পর দিন গত হইল। গুরুদেবের কিন্তু ফিরিবার কোনো লক্ষণই নাই। কৃচ্ছ্রব্রতের একি বিচিত্র পরীক্ষায় তিনি শিষ্যকে সেদিন ফেলিয়া গেলেন। আসন ত্যাগ করার আদেশ নাই, তাই ক্রমাগত আটদিন রামদাস অবিরাম ধ্যান ভজনে নির্দিষ্ট

আসনটিতে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। আহার নিদ্রা নাই, মলমূত্র ত্যাগ পর্যন্ত নাই। অসামান্য গুরুভক্তিই সেদিন তাঁহার জীবনে দৈবী শক্তির প্রেরণা জাগাইয়া তুলিল।

ফিরিয়া আসিয়া গুরুজী সব শুনিলেন। প্রসন্নমধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল তাঁহার আননে। সস্নেহে শিষ্যকে কহিলেন, "সদ্‌গুরুর চরণে এই আত্মসমর্পণই যে সর্বাপেক্ষা বড় প্রস্তুতি, এতেই মিলে সাধকের আকাঙ্ক্ষিত ধন—গুরুকৃপা, সংসার ত্যাগের বেদনা ও পিতামাতার অশ্রুজল সার্থক হইয়া উঠে পরম প্রাপ্তিতে।"

যোগীবর দেবদাসজী প্রিয় শিষ্যকে অর্পণ করিতে চাহেন তাঁহার অপরিমেয় যোগবিভূতি আর ব্রহ্মজ্ঞান। তিনি জানেন, রামদাস এক বিরাট আধার—অধ্যাত্মযোগের এক চিহ্নিত পুরুষ। তাই তো এই শিষ্যের জন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ও যত্নের অবধি নাই। নিরন্তর শাসন ও ভর্ৎসনায় শিষ্যের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় কিনা, সতর্কভাবে তিনি পরীক্ষা করেন, বাক্য-যন্ত্রণার দহনে তাঁহার হৃদয়ের অভিমানকে করিতে থাকেন ভস্মীভূত।

অক্লান্ত গুরুসেবা ও সাধন-ভজনে সদা ব্যাপৃত থাকিয়াও রামদাসকে সহ্য করিতে হয় শ্লেষ এবং নিন্দার সুতীব্র কশাঘাত। "এ চামার," "এ ভাঙ্গী"—বলিয়া ডাকিয়া গুরুজী তাঁহার ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। উদরের পরিচর্যার জন্যই যে শিষ্য এই বৈরাগ্যময় জীবন গ্রহণ করিয়াছে—বার বার একথা বলিয়া দেবদাসজী তাঁহার উষ্মাকে জাগাইয়া তুলিতে চান। পরীক্ষার পর চলিতে থাকে পরীক্ষা।

রামদাস কিন্তু জানেন, গুরুজীর এ কঠোর বাহ্য রূপের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ভগবৎসত্তার প্রকাশ। ঐশী করুণার মাধুর্যে, আর যোগবিভূতির ঐশ্বর্যে তাহা ভরপুর। এই বিরাট পুরুষের চরণতলে তাই এমনভাবে তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন।

একদিন কিন্তু গুরুদেবের আচরণের রূঢ়তা চরমে পৌঁছিল। প্রচণ্ড রোষে অকস্মাৎ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, সামান্যতম কারণে রামদাসকে প্রহার করিতে লাগিলেন নির্দয়ভাবে।

প্রহার ও অশ্রাব্য গালিগালাজের পর চীৎকার করিয়া তিনি কহিলেন, "আমার এত দিনকার বড় বড় চেলা সব চলে গিয়েছে আর তুই শালা ভাঙ্গী কেন আমার পেছনে এমন ক'রে এখনো লেগে রয়েছিস, বল্‌তো? এক্ষুনি তুই আমার সামনে থেকে দূর হ। কোনো শালার সেবায় আমার এতটুকু দরকার নেই।"

লগুড়াঘাতে জর্জর রামদাস ভূতলে পতিত হইয়াছেন। তবুও গুরুজীর চরণ ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বার বার মিনতি করিতে থাকেন, পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি গুরুর পরমাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর যে কোথাও তাঁহার যাইবার স্থান নাই। সেই গুরুই যদি আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সারা পৃথিবীতে তিনি দাঁড়াইবেন কোথায়? ইহা অপেক্ষা গুরুদেব বরং তাঁহার গলায় কাটারি বসাইয়া দিন। যে চরণে রামদাস তাঁহার সর্বস্ব নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন, জীবন থাকিতে সে চরণ তিনি ত্যাগ করিবেন না।

রুদ্র অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মেঘমালা হইতে এবার বর্ষিত হইল

প্রাণদায়িনী বারিধারা। মুহূর্তমধ্যে দেবদাসজী মহারাজ রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। স্মিতহাস্যে, স্নেহভরা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—তাঁহার স্নেহপুত্তলী রামদাসের শেষ পরীক্ষা এবার সম্পন্ন হইয়াছে। শিষ্য তাঁহার আজ সসম্মানে উত্তীর্ণ—তাহার অহংবোধ এতদিন নিশ্চিহ্নপ্রায়, বুদ্ধিও নিশ্চলা ও তত্ত্বোজ্জ্বলা হইয়া উঠিয়াছে।

গুরু যেন আজ কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। উদার দাক্ষিণ্যভরা কণ্ঠে শিষ্য রামদাসকে তিনি প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইলেন, "বৎস, তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ঋদ্ধি সিদ্ধি আজ থেকে হবে তোমার করতলগত। আমি আরো বলছি, অল্পকাল মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভে জীবন তোমার ধন্য হবে।"

নতশিরে দণ্ডায়মান রামদাসের নয়নে তখন বহিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা। পুলকাঞ্চিত দেহে করুণাঘন গুরুদেবের চরণতলে তিনি সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। গুরু দেবদাসজী এক শহরের উপকণ্ঠে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। প্রিয় শিষ্য রামদাস কিছুটা ব্যবধানে ধুনি জ্বালাইয়া উপবিষ্ট। এমন সময় কয়েকটি ভক্ত দর্শনার্থী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন কয়েকটি টাকা নবীন সন্ন্যাসী রামদাসের চরণতলে রাখিয়া প্রণাম করিল।

রামদাস চমকিত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সে কি কথা! আমার শ্রীগুরুদেব, মহাসমর্থ তাপস দেবদাসজী মহারাজ, স্বয়ং এখানে উপস্থিত। কোনো ভেট যদি দিতেই হয় তো তাঁহাকেই নিবেদন করা উচিত। যোগেশ্বর গুরুদেবের সাক্ষাতে তাঁর নগণ্য শিষ্য আমি এ টাকা কি ক'রে নেবো?"

কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তটি যে মনে মনে এ প্রণামী তাঁহাকেই নিবেদন করিয়াছেন। কিছুতেই সে উহা আর ফিরাইয়া নিতে চাহিল না। ভক্তটি চলিয়া যাইবামাত্র রামদাসজী আসন ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের কাছে গেলেন। টাকা কয়টি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, "মহারাজ, এক ভক্ত দর্শনার্থী এই মাত্র এই ভেট দিয়া গেল। কৃপা ক'রে আপনি গ্রহণ করুন।"

গুরুদেব ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন। এ কোন্ ধরনের অশিষ্ট চেলা সে? স্বয়ং গুরু সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে সে নিজেই পূজার-ভেট গ্রহণ করিয়াছে? এমনি ঔদ্ধত্য তাহার!

রামদাসজী মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কাতরকণ্ঠে গুরুদেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, এ ভেট তিনি কোনোমতেই গ্রহণ করিতে চান নাই। কিন্তু দর্শনার্থী ব্যক্তিটি তাঁহার কথা না মানিয়াই উহা রাখিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, তিনি তো এ ভেট অবিলম্বে গুরুদেবের চরণেই নিবেদন করিতে আসিয়াছেন—আন্তর বা বাহ্য কোনো দিক দিয়াই তিনি নিজে এটা গ্রহণ করেন নাই। তবে গুরুজী কেন এমন কঠোর হইতেছেন?

ক্রোধের অভিনয় ততক্ষণে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবদাসজীর বাহিরের খোলস খুলিয়া এবার বাহির হইয়াছে করুণা ও দাক্ষিণ্যের রূপ। সহাস্য আননে শিষ্যের শিরে হাত রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কহিলেন, "আরে বেটা, তুম্‌ভী তো আভী সিদ্ধ

হো গয়া। অ্যায়সা তো হোনেই পড়েগা। তুমকো তো মালুম নেহি হ্যায়—তুমভী এক শের বন্ গয়া। বাকি, দো শের এক ঠৌর্ মে রহনে নেহি সক্তে।" —অর্থাৎ, বাবা, তুমিও যে ইতিমধ্যে সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়ে গিয়েছ। কাজেই এরূপ ঘটনা ঘটাই যে স্বাভাবিক। তাছাড়া, তুমি জানো না, তুমিও যে হয়ে পড়েছো অধ্যাত্মজগতের এক বাঘ। এবার এক গুহায় আমাদের মতো দুই বাঘের থাকা তো আর ঠিক নয়।

অধ্যাত্মজীবনের স্থিতির জন্য, প্রকৃতকল্যাণের জন্য, শিষ্যকে এখন হইতে পৃথক পথেই চলিতে দিতে হইবে। রামদাসজীকে গুরু মহারাজ এবার তাই প্রেরণ করিলেন পরিব্রাজনে। শিষ্যের স্বাধীন অধ্যাত্মপরিক্রমা শুরু হইল এই পরিক্রমার মধ্য দিয়া। অচিরে দেখা দিল শ্রীশ্রী ১০৮ রামদাস কাঠিয়াবাবার পরম অভ্যুদয়।

বৈরাগ্যময় জীবনের আহ্বানে, বিচিত্র পথরেখা বাহিয়া, রামদাস সদ্‌গুরু দেবদাসজীর চরণোপান্তে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার সে পথের বাঁকে বাঁকে, সমগ্র পরিক্রমার পশ্চাতে, আত্মপ্রকাশ করে দৈবীশক্তির এক সুনির্দিষ্ট লীলা।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে রামদাসের জীবনে দেখা গিয়াছে একই গীতচ্ছন্দ, আর একই মুমুক্ষা-পথের অনুসৃতি। তেমনি তাঁহার সারা অধ্যাত্মজীবনের নেপথ্যেও সদা সঞ্চরমান রহিয়াছে গুরুকৃপা ও ঐশী কৃপার আলোক-সংকেত।

পূর্ব পাঞ্জাবের এক নগণ্য গ্রাম লোনাচামারী। অমৃতসর হইতে ইহা প্রায় বিশ ক্রোশ দূরের পথ। এই গ্রামেরই এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের ঘরে রামদাসের জন্ম। পিতা এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ, গুরুগিরি করিয়া তাঁহার সংসার চালান। নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, কিন্তু গৃহে কোনো কিছুরই অনটন নাই। ক্ষেতের পর্যাপ্ত ফসল ও চার-পাঁচটি মহিষের দুগ্ধে সুখে-স্বচ্ছন্দে এ পরিবারের দিন চলে।

পিতৃগৃহের নিকটেই এক পরমহংস সন্ন্যাসীর আশ্রম। বালক রামদাস মায়ের পিছে পিছে প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। একদিন কিন্তু এ ক্ষুদ্র বালকের এক প্রশ্ন সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পরমহংসজীকে সে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা মহারাজ, আপনার কাছে তো কত লোকই আসে, আর সবাই আপনার চরণে শির নত করে। আপনি তো সকলেরই বড় ও পূজ্য। কিন্তু কি ক'রে আপনি এত বড় হলেন, আমায় বলুন তো। এ কৌশলটি একবার জানতে পারলে আমিও তা কাজে লাগাবো।"

পরমহংস সকৌতুকে এই বালকের দিকে চাহিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "বেটা, আমি যে সদাই পরম পবিত্র রামনাম জপ করি। মঙ্গলময় রাম নামই যে আমাকে ছোট থেকে বড় ক'রে তুলেছে। মনে মনে এ নাম জপ করো, তুমিও একদিন এমনি বড় হতে পারবে।"

বালক চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া নেয়, তারপর জানায় এই রামনামই সে জপ করা শুরু করিবে আর হইয়া উঠিবে পরমহংসজীর মতো এমনি এক বড় সাধু।

পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার ভাগ্যবলে জাগিয়া উঠিল, সেদিন হইতেই রামদাসের অন্তরে আবর্তিত হইতে লাগিল পবিত্র রামনামের প্রচ্ছন্ন জপমালা।

পিতার মহিষ ক'টি মাঠে বিচরণ করিতে যায়। রামদাস পাঁচনি হস্তে মাঝে মাঝে

ইহাদের অনুগমন করে। তখনও সে নিতান্ত ক্ষুদ্র বালক, বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না। একদিন সে মাঠের মাঝখানে এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছে, হঠাৎ সেখানে কোথা হইতে এক জটাজুটসমন্বিত সাধু আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসী বড় ক্ষুধার্ত। রামদাসকে তাড়াতাড়ি কিছু আহার্যের যোগাড় করিতে তিনি বলিলেন।

বালকের উৎসাহের সীমা নাই। সানন্দে সে বলিয়া উঠিল—"সাধুবাবা, তুমি আমার মোষগুলো একটু দ্যাখো, আমি ঘর থেকে তোমার জন্যে সব কিছু নিয়ে আসছি।"

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। বেলা ক্রমে গড়াইয়া পড়িতেছে। গৃহে পিতামাতা উভয়েই নিদ্রিত। বালক রামদাস চুপি চুপি ভাঁড়ার খুলিয়া প্রচুর ময়দা চিনি ও ঘি লইয়া সোৎসাহে বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিল।

তাহার এ সেবানিষ্ঠা দেখিয়া সাধু বড় প্রসন্ন হইলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাচ্চা, তুম্ এক যোগীরাজ বন্ যাওগে।"

রামদাস কিন্তু বড় বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। যোগীরাজ হইবার মতো যোগ্যতা তাহার আছে কিনা, তাহা সে জানে না।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া উত্তর করিল, "কিন্তু সাধুবাবা, আমার বাবা রোজ প্রায় দশ সের ক'রে মোষের দুধ পান করেন, আমিও তেমনি তাঁর সঙ্গে বসে দু-বেলা পাঁচ সের ক'রে দুধ উড়িয়ে দিই। তাহলে আমি কি ক'রে যোগীরাজ হবো?"

অতিথি সন্ন্যাসী সহাস্যে দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিলেন, উদার দাক্ষিণ্যভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বাচ্চা, হামারা বচনসে তুম জরুর যোগীরাজ হোগে।" অতঃপর তল্পী-তল্পা গুটাইয়া ধীরে ধীরে তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু একি অলৌকিক কাণ্ড? সর্বত্যাগী সাধকের উচ্চারিত এই আশীর্বাণী যেন চৈতন্যময়। এ বাণীর ইন্দ্রজাল বালক রামদাসের সমস্ত জাগতিক চেতনাকে মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার স্মৃতি হইতে পিতা-মাতা, গৃহ-অঙ্গন, বন-প্রান্তর —এই চারণরত মহিষের দল সমস্ত কিছুর আকর্ষণই যেন অপসৃত হইয়া যায়। সারা অন্তরে তাঁহার ধ্বনিত হইতে থাকে শুধু একটিমাত্র বোধ—গৃহাশ্রম তাঁহার জন্য নয়। এক অদৃশ্য অপরিচিত লোকের আহ্বান কেবলই কানের কাছে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে।

সাত বৎসর বয়স্ক বালকের অন্তরের এই প্রতিক্রিয়া সত্যসত্যই বড় বিস্ময়কর। উত্তরকালে রামদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহার বাল্যজীবনের এই অনুভূতিটির কাহিনী সোৎসাহে তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের কাছে বিবৃত করিতেন।

রামদাসের পিতা আড়ম্বর সহকারে পুত্রের উপনয়ন দিলেন। তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচারী বালককে নিকটস্থ গ্রামে এক আচার্যের নিকট প্রেরণ করা হইল। মেধাবী রামদাস অল্পদিনের মধ্যেই আচার্যের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

সামান্য অভ্যাসেই পাঠ তাহার রোজ তৈরি হইয়া যায়, তারপর মালাটি হাতে নিয়া সে নিবিষ্ট হয় অভ্যস্ত রামনাম জপে।

ঈর্ষাপরায়ণ একদল সহপাঠী একদিন আচার্যের নিকট নালিশ জানায়—রামদাস

তাহার কোনো পাঠেই মনঃসংযোগ করে না, গুরুর বাক্য অবহেলা করিয়া সে শুধু বসিয়া বসিয়া মালা টপ্‌কায়।

রামদাসকে তখনই ডাকা হইল। কিন্তু আচার্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনো পাঠই তাহার আয়ত্ত করিতে বাকি নাই। নিজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তবেই রোজ সে রত হয় তাহার নিয়মিত জপসাধনে। তাহাতে আর দোষ কোথায়?

মিথ্যা অভিযোগ আনয়নের জন্য আচার্য ঐ ছাত্রদের তিরস্কার করেন। ইহার পর হইতে আচার্য-গৃহে শিক্ষার্থী রামদাসের প্রতাপ প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়। আট-নয় বৎসর এই পণ্ডিতের শিক্ষাধীনে থাকিবার পর বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ তাঁহার সমাপ্ত হয়। গুরু-গৃহ হইতে যেদিন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন সেদিন দেখা যায়, তরুণ শিক্ষার্থীর বক্ষোদেশে বাঁধা রহিয়াছে একখানি ভগবদ্‌গীতা। এই মহাগ্রন্থখানির সহিত তাঁহার জীবন তখন এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

পুত্র আচার্য-গৃহ হইতে পড়া শেষ করিয়া ফিরিয়াছে। পিতা তাই এবার তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রামদাস তাহাতে কান পাতেন কই? মুমুক্ষু তরুণের স্মৃতিতে তখনো অস্ফুট স্বরে ধ্বনিত হইতেছে বালক কালের দেখা সন্ন্যাসীর সেই বাণী—বাচ্চা, তুম জরুর যোগীরাজ বন্‌ যাওগে।

গৃহজীবনের মোহ ও বিষয়াসক্তি রামদাসের জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে—তাই অধ্যাত্মজীবনের পথে বাহির হইয়া পড়িতে তিনি কৃতসংকল্প। পিতা মাতাকে এবার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই বিবাহ দেওয়া হোক—তিনি নিজে আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবেন না। আত্মপরিজনের ভর্ৎসনা বা অশ্রুজল কোনো কিছুই তাঁহাকে এ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না।

গ্রামের প্রান্তে এক বিরাট বটবৃক্ষ। ইহার নিচে তরুণ সাধক রামদাস আসন পাতিয়া জপে বসিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনের সংকল্প। এক লক্ষ জপ সমাপ্ত করিবার পর তিনি শ্রবণ করিলেন এক দিব্য বাণী। এ প্রত্যাদেশ তাঁহাকে জানাইয়া দিল—'বৎস, তুমি অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ সম্পূর্ণ করো জাগ্রত মহাতীর্থ জ্বালামুখীতে গিয়ে, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।'

এই নির্দেশ পাইবার পর রামদাসের উৎসাহের সীমা রহিল না। জ্বালামুখী তাঁহার লোনাচামারী গ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। অবিলম্বে সেই তীর্থের দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু পথিমধ্যে এক নূতন কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রামদাস হঠাৎ দেখিলেন, বৃক্ষতলে জটাজুটসমন্বিত দিব্যশ্রীমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অমোঘ আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর। রামদাস ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল নিজের পূর্ব জীবনের সংস্কার। এ সন্ন্যাসী যেন কত কালের আপন জন। ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। ফলে জ্বালামুখী তীর্থে বসিয়া তপস্যা করার সংকল্প একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া গেল।

মুমুক্ষু তরুণ ব্যগ্রভাবে মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস ও মন্ত্রদীক্ষার জন্য বার বার

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৃপা অবশেষে মিলিল, শরণার্থী যুবককে চেলা করিয়া নিতে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া রামদাস এক শুভ মুহূর্তে গ্রহণ করিলেন বৈরাগ্য-আশ্রম। এই শক্তিধর মহাপুরুষই দেবদাস মহারাজ, তাঁহার দীক্ষাবীজ ও আশ্রয়ই উত্তরকালে রামদাসকে পেঁছাইয়া দেয় সিদ্ধির অমৃতলোকে।

পিতার কাছে সন্ন্যাসের সংবাদ পেঁীছিতে দেরি হয় নাই। পুত্র ও তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরুর নিকট তখনই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। ভীতি প্রদর্শন ও অনুনয়-বিনয় সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হইল—রামদাস প্রাণ গেলেও তাঁহার বৈরাগ্য আশ্রম ত্যাগ করিতে সম্মত নন। এদিকে তাঁহার মাতা শোকাকুলা হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। পিতা তাই সন্ন্যাসীকে অনুরোধ জানাইলেন, পুত্রকে জননীর সহিত একবার সাক্ষাতের অনুমতি দিন, অন্তত শেষবারের মতো নিজগৃহে সে একবারটি দেখিয়া আসুক। গুরুর অনুমতি মিলিবার পর রামদাস লোনাচামারীতে ফিরিয়া আসিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু নিজগৃহে আর বাস করেন নাই, গ্রামের প্রান্তস্থিত এক বটবৃক্ষমূলে তিনি আসন পাতিয়া বসিলেন। কিন্তু জননীকে নিয়াই বিপদ বাধিল, প্রবল কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন, তাঁহাকে ধৈর্য ধারণ করাইবে কে? রামদাস কিন্তু টলিলেন না, দৃঢ়স্বরে কহিলেন, মাতা স্থির না হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিবেন।

এ সময়ে কোনো নির্দিষ্ট গৃহে তিনি ভোজন করিতেন না। পর্যায়ক্রমে গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থ-ঘরে তাঁহার ভিক্ষা চলিত।

ইতিমধ্যে সেখানে একদিন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। সেদিন গভীর রাত্রিতে রামদাস বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। সম্মুখস্থ আকাশমণ্ডল অকস্মাৎ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং গায়ত্রীদেবী তরুণ সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছ, আমি তোমার প্রতি আজ প্রসন্না। তুমি তোমার ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করো।"

করজোড়ে রামদাস উত্তর দিলেন, 'মা, আমি যে এখন সন্ন্যাসী হয়েছি। কামনা-বাসনা আমার থাকতে নেই, প্রার্থনার প্রয়োজনও তাই দেখছিনে। আমার অন্তরের এই শুধু প্রার্থনা—তুমি আমার প্রতি সদা প্রসন্না থাক।"

"তথাস্তু"—বলিয়া দেবী অন্তরীক্ষে মিলাইয়া গেলেন।

রামদাসের নিকট গ্রামের বহু নরনারীই তখন আনাগোনা করিতেছে। এ সময়ে তিনি কিন্তু এক মহাবিপদে পতিত হন। এক সুন্দরী তরুণী সন্ন্যাসী রামদাসকে দেখিয়া বড় মুগ্ধ হয়, তাঁহাকে সে প্রলুব্ধ করিতে থাকে। রমণীর বাস এই গ্রামেই, রামদাসের সে পূর্ব পরিচিতা। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে।

যুবতীটি একদিন কামার্তা হয়, গভীর নিশীথে সে তাঁহার আসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। তরুণ সাধক প্রমাদ গণিলেন। অনন্যোপায় হইয়া সজোরে তিনি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, ভয় পাইয়া এই রমণী সরিয়া পড়ে।

পরের দিন দেখা যায়, রামদাস গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আর কখনো তিনি জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন নাই।

এইবার সাধকজীবনে পরিব্রাজনের পালা। গুরুর নির্দেশে বহু তীর্থ ও জনপদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাকে দীর্ঘদিন কাটাইতে হয়। এই সময়ে একবার রামদাসজী মহারাজ কোনো এক দেশীয় রাজার রাজ্যে উপস্থিত হন। এখানকার রানী এক বিধবা তরুণী, তাছাড়া অসাধারণ রূপলাবণ্যবতীও তিনি। রামদাসকে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া রানী সাহেবা তাঁহার সেবাযত্ন করিতে থাকেন। তরুণ সাধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া রানী ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, একদিন ব্যাকুল অন্তরে প্রেম নিবেদনও করিয়া বসেন। স্বীয় যৌবন ও বিপুল সম্পদ ভোগ করিবার জন্য নবীন সন্ন্যাসীকে বারংবার তিনি মিনতি জানাইতে থাকেন।

এই রূপসী তরুণীর সান্নিধ্য ও তাঁহার প্রেমের স্পর্শ সাধক রামদাসকে কিছুটা চঞ্চল করিয়া তোলে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে সন্ন্যাসজীবনের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠেন। অন্তরে জাগে বিবেকের তীব্র দংশন। মোহাবিষ্ট হইয়া এ তিনি কি করিতেছেন? বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিয়া মুক্তির সাধনায় তিনি ব্রতী, রমণীর রূপমোহ কি আজ তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবে?

সেই মুহূর্তেই এই নারী ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত কিছু প্রলোভন ত্যাগ করিয়া রামদাস সবেগে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার? ঐ রূপসী রানী সাহেবার স্মৃতি তখনও তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া যাইতে চাহে না। রাজপ্রাসাদের এ মোহিনী যেন তাহার মায়াজাল বিস্তার করিয়া আবার তাঁহাকে কবলিত করিতে চাহিতেছে। সাময়িক এক দুর্বলতা তরুণ সাধকের অন্তরে আবার সে সময়ে দেখা দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। দ্রুত পদবিক্ষেপে রাজ্যের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়েন।

উত্তরকালে মহাসাধক রামদাস কাঠিয়াবাবাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত—"অহেতুক ভগবৎকৃপা ছাড়া তরুণ সাধকের পক্ষে রিপু জয় করা বড় কঠিন।"

পরিব্রাজকরূপে রামদাসজী একবার উত্তরাখণ্ডের গহন বনাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন জনবিরল কোনো উচ্চ পাহাড়ে একটি প্রস্তরাবদ্ধ গুহামুখ তিনি দেখিতে পান। কৌতূহলী হইয়া তরুণ সাধক উহার দ্বার উন্মোচন করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দীর্ঘ জটাজূটসমন্বিত বিরাটকায় এক প্রাচীন যোগী সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুহার প্রান্তদেশে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। লোল চর্মের আবরণে চক্ষুদ্বয় ঢাকিয়া গিয়াছে। রামদাস ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

প্রাচীন তাপস এবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া গুহাদ্বারে দাঁড়াইলেন। তারপর হস্ত দ্বারা নয়নোপরি বিলম্বিত চর্মাবরণটি ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলেন। রামদাসের

তখন মনে হইল, মহাপুরুষের চক্ষুতারকা হইতে যেন অগ্নি বর্ষিত হইতেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ যোগীবর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদাস তৎক্ষণে ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অর্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি আপনার বালক—এক দীন চেলা।"

"চেলা ? সে কি কথা ? বেশ, চেলা-ই যদি হও, আমার আদেশ মতো সব কিছু কাজ করতে পারবে ?"

"আজ্ঞে মহারাজ, আপনার কৃপায় অবশ্যই সব পারবো।"

গুহার নিচেই এক সুগভীর পার্বত্য খাদ, খরস্রোত নদী সেখানে গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধ সাধু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "যদি চেলা-ই হয়ে থাক, তবে এই মুহূর্তে আমার আদেশ ঐ জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়।"

নিচে তাকাইয়া রামদাস শিহরিয়া উঠিলেন। পার্বত্য-খাদের ঐ উন্মত্ত প্রবাহে ঝাঁপ দিবার অর্থ, নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আদেশ পালন না করিলেই বা বাঁচিবার উপায় কোথায় ? রুদ্রপ্রতিম এই যোগীর রোষবহ্নি হইতে যে নিস্তার নাই।

ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া রামদাস পর্বতশৃঙ্গ হইতে তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করিলেন। জলে নিপতিত তাঁহার দেহখানি তখন তীব্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। এ সময়ে হঠাৎ এক মহাঅলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধ তাপস অত্যাশ্চর্য যোগ-বিভূতিবলে তাঁহার হস্তখানি নিম্নদিকে প্রসারিত করেন। মুহূর্তমধ্যে তাহা দীর্ঘায়িত হইয়া রামদাসের স্রোত-বাহিত দেহখানিকে স্পর্শ করে। যোগশক্তির বিস্ময়কর ক্রিয়া এখানেই শুধু থামে নাই, তৎক্ষণাৎ যোগী হস্তের আকর্ষণে ভাসমান দেহখানি শূন্যে উত্থিত হয়, সরাসরি সেটিকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয় গুহাদ্বারে।

ভয়ে বিস্ময়ে রামদাস তখন একেবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান যোগীবরের ক্রোধোদ্দীপ্ত রূপটি কিন্তু আর নাই। আননে তাঁহার প্রসন্নমধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামদাসকে আশিস্ জানাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি চেলা হবার যোগ্য, এটা ঠিকই। তোমার কল্যাণ হোক—সদ্‌গুরুর কৃপায় অভীষ্ট পূর্ণ হোক। কিন্তু এখান থেকে তুমি অবিলম্বে প্রস্থান করো। এ অঞ্চল ঋষিদের এক বিশেষ তপঃক্ষেত্র। এখানে তুমি আর অবস্থান ক'রো না।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া রামদাস ধীরে ধীরে যোগীর সাধনস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

পরিব্রাজন পর্ব এবার শেষ হয়। রামদাস অতঃপর দেবদাসজী মহারাজের সহিত মিলিত হন, গুরুদেবের একনিষ্ঠ সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। শক্তিধর আচার্যের নিরন্তর সাহচর্য ও সাধন-নির্দেশে রামদাসের অধ্যাত্মজীবনে ক্রমে সাধিত হয় বিরাট রূপান্তর।

গুরু দেবদাসজী পূর্বাশ্রমে ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী। নিম্বার্ক শাখার অন্তর্ভুক্ত এক অসামান্য যোগীর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তারপর বহু বৎসর তপশ্চর্যায়

পর এই কঠোরতপা সাধক অপরিমেয় যোগশক্তির অধিকারী হন। রামদাস জ্বালামুখী গমনের পথে যখন দেবদাসজীর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন তখনই তিনি এক বহুবিশ্রুত যোগী। পরিব্রাজনের সময় কিছুকালের জন্য উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তারপর আবার শুরু হয় গুরু ও শিষ্যের জীবনে ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধনের এক নূতনতর অধ্যায়। দেবদাসজীর যোগবিভূতি ও কৃপালীলা শিষ্যের সম্মুখে একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে।

গুরুদেব কোনো কোনো সময়ে একাধিক্রমে একই আসনোপরি ছয় মাসকাল জড় সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। দিনের পর দিন তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া তরুণ শিষ্য রামদাসজীর বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। যোগীবর দেবদাসজীর বাহ্য জীবনের চলা-ফেরার বৈশিষ্ট্যও বড় কম ছিল না। নয়নে নিদ্রার লেশমাত্র নাই, গাঁজা আর চরসের ধূমপানে আগ্রহও ছিল তাঁহার অপরিসীম।

রামদাসজীর চোখে গুরুর আহার্য গ্রহণের পর্বটি ছিল সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার। ধুনি হইতে খানিকটা ভস্ম লইয়া কমণ্ডলুর জলে তিনি ফেলিয়া দিতেন, তারপর এই বিভূতি মিশ্রিত জল সবটা পান করিতেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই মিশ্র বস্তুকে অগোণে উদর হইতে বিদায় দিতেও তাঁহার বিলম্ব ঘটিত না। যৌগিক প্রক্রিয়াবলে উহা উদ্‌গিরণ করিয়া ফেলিয়াই শিষ্য রামদাসকে দেবদাসজী উহা তোল করিতে বলিতেন। প্রতিবারই মাপিয়া দেখা যাইত, এই ভস্ম-গোলা জল সমপরিমাণই পাকস্থলী হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহাই ছিল তাঁহার গুরুদেবের দৈনন্দিন আহার।

মহাযোগীর এ আহার সম্বন্ধে ব্যতিক্রমও যে মাঝে মাঝে না দেখা যাইত এমন নয়। একবার দেবদাসজী শিষ্যকে ডাকিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, তাঁহার দেহে প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হইতেছে, অবিলম্বে প্রচুর দুগ্ধ পান না করাইলে তাঁহার আর নিস্তার নাই।

ব্যস্তব্যস্ত রামদাসজী দ্রুতপদে একটি বৃহৎ ভাণ্ড লইয়া গৃহস্থদের বসতিতে চলিয়া গেলেন। সাধুবাবার জন্য প্রায় আধ মণ দুধ সংগৃহীত হইল। হাঁড়িটি সম্মুখে স্থাপন করিবামাত্রই দেবদাসজী মহারাজ ঢক্ ঢক্ করিয়া উহার সবটা পান করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দেহের গরম তাহাতেও মিটিতেছে না—তিনি আরও বেশি পরিমাণ দুগ্ধ আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া রামদাসের তো চক্ষুস্থির!

যুক্তকরে সানুনয়ে তিনি কহিলেন, "বাবা, তুমি পরমাত্মাস্বরূপ—তোমার দেহের উত্তাপ মেটাবার মত সামর্থ্য আমার কোথায়? আধমণ দুধ তো দেখছি এক মুহূর্তে উড়ে গেল, তারপর আর এখন কি করা যায়?"

গুরুদেব কৃপাপরবশ হইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "না বেটা, তুমি আরও সামান্য কিছু দুধ নিয়ে এসো। এবার আমার পিপাসা নিশ্চয় মিটবে।"

আরো কয়েক সের দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইল। উহা পানের পর তবে দেবদাসজীর ঐ উত্তাপ দূর হয়।

ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের পরীক্ষার জন্যও শক্তিধর গুরুকে মাঝে মাঝে লীলাখেলার অবতারণা করিতে দেখা যাইত। একবার কোনো পার্বত্য শহরের নিকটে এক গহন বনে

মহিমা আজিও তাঁহার অন্তর-সত্তায় ফুটিয়া উঠে নাই,—ইহাই বার বার সখেদে কহিতে লাগিলেন।

দেবদাসজী মহারাজ এবার প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "ঠিকই। তুমি নিতান্ত বালক মাত্র। তাই আজকের এই অপরাধ ক্ষমা করা গেল। কিন্তু জেনে রাখবে, প্রকৃত সদ্‌গুরুর দৃষ্টি থেকে সামান্যতম চিন্তাটুকুও কখনো গোপন করা যায় না।"

একবার রামদাস তাঁহার গুরুজীর সঙ্গে পাঞ্জাবের কোনো এক তীর্থের দিকে চলিয়াছেন। লাহোর নগরীর সন্নিহিত অঞ্চলে পেঁছিয়া একসময়ে উভয়ে আসন পাতিয়া বসিলেন। চতুর্দিক হইতে আরও বহু সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন। রীতিমতো এক বৃহৎ সাধু-জমায়েৎ। লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অনেকে মহাত্মাদের নিকট আনাগোনা করিতেছেন।

রামদাস ও তাঁহার গুরুজীর সম্মুখে এই সময়ে এক প্রসিদ্ধ ধনবান শেঠ উপবিষ্ট। শালের ব্যবসায়ে এ লোকটি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে।

দেবদাসজী হঠাৎ ইহাকে আদেশ করিয়া বসিলেন, "জমায়েতের সাধুদের তুমি আজ ভাণ্ডারা দাও।"

সমবেত সাধুদের সংখ্যা হইবে সহস্রাধিক। শেঠজী চমকিয়া উঠিলেন। এত লোককে ভোজন করাইতে হইবে? এ যে বহু টাকার ব্যাপার। না, এ তিনি পারিবেন না। শুধু তাহাই নয়, সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এ সময়ে কিছু শ্লেষাত্মক মন্তব্যও তিনি করিলেন।

দেবদাসজী তাঁহার কথায় বড় কুপিত হইয়া উঠিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "বানিয়া, দেখতে পাচ্ছি তোমার ধন-গর্ব বড় বেশী হয়ে পড়েছে। সর্বত্যাগী সাধুদের অবজ্ঞা করার সাহস তোমার হয়েছে। এ এক গুরুতর অপরাধ! এজন্য আজ তোমার কিছু দণ্ড হওয়া উচিত। ঘরে ফিরে গিয়ে দেখবে—অগ্নিদেব তোমার শালের বস্তায় আবির্ভূত হয়েছেন।"

যত সব অলক্ষুণে কথা! শেঠজী ত্রস্তব্যস্তে গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ ধুনিতে কিঞ্চিৎ জল উৎসর্গ করিয়া দেবদাসজী মুচকি হাসিয়া রামদাসকে কহিলেন, "বানিয়ার শাল গুদামে আগুন লাগা শুরু হয়ে গেল।"

কিছুক্ষণ বাদেই শাল ব্যবসায়ী শেঠজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। অশ্রুসজল চক্ষে তিনি কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমার যে সর্বনাশ উপস্থিত। আপনি কৃপা ক'রে রক্ষা না করলে আমি ধনে প্রাণে মারা যাচ্ছি। আমার শাল গুদাম এত সুরক্ষিত কিন্তু কি ক'রে যেন সত্য সত্যই সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি নিতান্ত অবোধ, আপনি আজ আমায় ক্ষমা করুন। কথা দিচ্ছি, এ সাধু জমায়েতকে আমি সাতদিন ধরে ভালো ক'রে ভাণ্ডারা দেব।"

কাতর অনুনয়ে দেবদাসজী করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। শেঠজীকে এবার অভয় দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেটা, তুমি শান্ত হয়। গুদামের আগুন এখনই নিভে যাবে।

কিন্তু সাধুদের অবজ্ঞা করার জন্য দণ্ড তোমাকে পেতে হবেই। তোমার একখানা দামী শাল এ আগুনে নষ্ট হবে। যাও, আর এরকম অপরাধ কখনো ক'রো না।"

পরে দেখা গেল, সত্য সত্যই একখানা শালই মাত্র দগ্ধ হইয়াছে, তাছাড়া বানিয়ার গুদামের আর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই।

ব্যাপার দেখিয়া রামদাস একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার নানা প্রশ্নও আবার জাগিতেছে। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে তিনি গুরুজীকে এ ঘটনাটির উপর আলোকপাত করিতে কহিলেন।

দেবদাসজী মহারাজের বুঝিতে বাকী নাই, যোগবিভূতির এ ধরনের প্রয়োগ, সাধু জমায়তের ভোজনের প্রশ্ন লইয়া এরূপ দণ্ড প্রদান, তাঁহার শিষ্যকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সহাস্যে কহিতে লাগিলেন, 'বেটা, তুমি তো জানো না, এই বানিয়া প্রকৃতই এক সজ্জন ও ধর্মপ্রাণ লোক। কিন্তু ধনগর্ব তাকে পথভ্রষ্ট ক'রে দিচ্ছিল। আজকের এই দণ্ড তার পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। জেনে রেখো, এখন থেকে তার জীবনের মোড় অবশ্য ফিরবে।"

সদ্গুরুর রোষবহ্নির পশ্চাতে সদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাঁহার কল্যাণ হস্ত, এই নিগূঢ় তত্ত্বটি জানিয়া রামদাসের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

দেবদাসজী মহারাজের যোগৈশ্বর্য ও তাঁহার অলৌকিক জীবনের মহিমা এমনি করিয়াই দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, শিষ্য রামদাসের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে তাঁহাকে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। উত্তরজীবনে গুরুজীর বিভূতিলীলার নানা কাহিনী তিনি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বর্ণনা করিতেন।

একবার রামদাসজী ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ দেবদাসজী মহারাজ মধ্যভারত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন ভূপালতালের নিকটে আসিয়া হঠাৎ কি জানি কেন, শিষ্যদের তিনি কিছুটা দূরে অবস্থান করিতে আদেশ দেন। তারপর স্বয়ং ঐ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া ঘোরনিনাদে বার বার করিতে থাকেন শঙ্খধ্বনি।

ভূপালতালের অপর তীরেই মুসলমান নবাবের প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইতিপূর্বে নবাব এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, এই সরোবরের তীরবর্তী অঞ্চলে কেহ শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি করিতে পারিবে না। আদেশ অমান্যের শাস্তি—শিরশ্ছেদ।

হঠাৎ এ প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তো সকলে বিস্মিত। ব্যাপার কি জানিবার জন্য নবাব তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইলেন। দরবারে সংবাদ পৌঁছিল, এক হিন্দু সন্ন্যাসী সরকারী আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া ওখানে শঙ্খ বাজাইতেছে।

আর যায় কোথায়। নবাব বাহাদুর ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রাসাদের অদূরে দাঁড়াইয়া বার বার আইন অমান্যের দুঃসাহস সাধুটির কি করিয়া হয়? প্রহরীদের আদেশ দিলেন, তাহারা যেন অবিলম্বে ঐ উদ্ধত সাধুর শিরশ্ছেদ করে অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে।

সাধুর আসনের সম্মুখে গিয়া নবাবের অনুচরেরা কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। সেখানে কোনো জীবিত মানুষ তো নাই। শুধু রহিয়াছে একটি সাধুর খণ্ডিত

মস্তক ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত অবস্থায় ভূপালতালের তীরে ছড়ানো রহিয়াছে।

নবাবের প্রহরীদল ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। কিন্তু একি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! আবার সেই স্থান হইতেই কে যেন সজোরে শঙ্খধ্বনি করিতেছে। প্রহরীরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া এবার যাহা দেখিল তাহা আরও রহস্যময়। মনুষ্য-দেহের কর্তিত অংশগুলি সেখান হইতে ইহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, রক্তপাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না।

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নবাবের ধারণা হইল, এই সাধু নিশ্চয়ই এক মহাশক্তিধর যোগীপুরুষ। মনে তাঁহার ভয় ও ভক্তি দুয়েরই সঞ্চার হইল। ভাবিয়া দেখিলেন, ইহার সহিত আর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

অমাত্যবর্গসহ অগৌণে তিনি সরোবরের তটে উপস্থিত হন। সকলে হতবাক্ হইয়া দেখেন, দীর্ঘ জটাজুটসমন্বিত এক তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী সেখানে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

যোগীকে অভিবাদন করিয়া নবাব বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। সেবা পরিচর্যা ও আদেশ পালনের জন্য তাঁহার তখন ব্যগ্রতার সীমা নাই।

যোগীবর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ভেবে দ্যাখো, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করা তোমার পক্ষে কি গর্হিত হয় নি? তুমি মুসলমান, বেশ তো তোমার ধর্ম তুমি পালন ক'রে যাও। সঙ্গে সঙ্গে অপর ধর্মের লোকদের তাদেরও প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে দেওয়া তো তোমার উচিত। তোমার এ অন্যায় ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করো।"

নবাব তখনই যোগীবরের আদেশ সানন্দে মানিয়া নিলেন। এই ভূপালতালের তীরে মহাত্মা দেবদাসজী অতঃপর এক দেবমন্দির প্রস্তুত করান। উত্তরকালে রামদাস কাঠিয়াবাবা এটিকেই তাঁহার গুরুদ্বারা বলিয়া অভিহিত করিতেন।

শক্তিধর গুরুর আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে রামদাসজীর জীবনে দুশ্চর তপস্যার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত, একনিষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনা ও চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তির পথে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। মহাসমর্থ গুরুর সদাসজাগ-দৃষ্টি ও নিপুণ পরিচালনা এই উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকে তাঁহার প্রার্থিত সিদ্ধির দিকে পৌঁছাইয়া দিতে থাকে।

শীত নাই গ্রীষ্ম নাই, ধুনি জ্বালাইয়া রামদাসকে সারা রাত্রিই ভজন করিতে হইত। মাঘের প্রচণ্ড শীতে তাঁদের একমাত্র গাত্রাবরণ ছিল তিনহাত লম্বা একখণ্ড সুতির বস্ত্র।

রামদাসের কোমরে গুরুজী মোটা ও ভারী একটি কাঠের আড়বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আবার ঝুলানো থাকিত কাষ্ঠনির্মিত এক লেঙোটি। এই কঠিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই দিনান্তের সাধন শেষে রামদাস ও তাহার সতীর্থদের শয়ন করিতে হইত। তামসিক ঘুম যাহাতে নবীন সাধকদের ভজন ও ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, সেজন্যই গুরু দেবদাসজীর এ কঠোর ব্যবস্থা।

কিন্তু নিদ্রা তো দূরের কথা, এ কাষ্ঠ-লেঙোটি বিশ্রাম বা শয়নেও বিঘ্ন জন্মাইত।

আড়বন্ধটি সর্বদা এরূপ উঁচু হইয়া থাকার জন্য দেহটিকে শায়িত ও বিন্যস্ত রাখা বড়ই দুষ্কর ছিল। তাই গোড়ার দিকে রামদাস বালুকাময় স্থানকেই শয্যারূপে নির্বাচন করিতেন এবং কাষ্ঠনির্মিত আড়বন্ধ লেঙোটি উহাতে প্রবেশ করাইয়া তবে তিনি খানিকক্ষণ শয়ন করিতে পারিতেন। পরবর্তীকালে এ কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার এ কাষ্ঠের পরিচ্ছদটিই কাঠিয়াবাবারূপে তাঁহাকে সর্বত্র পরিচিত করিয়া তোলে।

গুরুকৃপা শিরে ধারণ করিয়া রামদাস সাধনার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন—দেবদাসজী মহারাজের নানা কঠোর পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন। মহাসমর্থ গুরুর আশীর্বাদে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুই-ই হয় তাঁহার করতলগত।

এই সময়ে দেবদাসজী একদিন শিষ্যকে আদেশ দেন, দ্বারকাধাম তাহাকে দর্শন করিতে হইবে। কারণ, দ্বারকা তাঁহাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মুখ্যধাম।

রামদাস কিন্তু মহারাজকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নহেন। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে আমি ভগবৎস্বরূপ বলেই জানি। শাস্ত্রেও রয়েছে সদ্‌গুরুর চরণেই সর্ব তীর্থ বর্তমান। আপনার চরণতলে বসেই তো আমার তীর্থধর্ম সবকিছু হচ্ছে। দ্বারকায় যেতে তাই আমার তেমন ইচ্ছে নেই।"

দেবদাসজী মহারাজ অমনি গর্জিয়া উঠিলেন। শ্লেষাত্মক ভাষায় রামদাসকে বলিতে লাগিলেন, "আরে, তুই দেখছি মস্ত জ্ঞানী হয়ে পড়েছিস্! তোর বুঝি ধারণা হয়েছে যে, তোর মতো জ্ঞানী তোর গুরুপর্যায়ের মধ্যে কেউ হয় নি? আমি দ্বারকাধামে গিয়েছি, আমার গুরু, দাদা-গুরু সবাই গিয়েছেন আর তুই এমনি মহাজ্ঞানী যে, তোর আর এই মুখ্যধাম দর্শনের প্রয়োজন নেই। এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি আদেশ করছি, দ্বারকাধাম থেকে ঘুরে আয়।"

রামদাস বাধ্য হইয়া দ্বারকার পথে সেদিন পা বাড়াইলেন।

কিন্তু শ্রীধাম দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া যে দুঃখসংবাদ শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সদ্‌গুরু দেবদাসজী মহারাজ ইতিমধ্যে নরদেহটি ত্যাগ করিয়াছেন।

গুরুর শূন্য আসনের দিকে তাকাইয়া রামদাস শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই পরমাশ্রয়ের লোভে পিতামাতা, ভাই-বন্ধু এবং সংসারের সবকিছু আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। ভগবদ্‌স্বরূপ গুরুজীর বিহনে এ জীবনে আর কোন্ প্রয়োজন? এ সন্ন্যাসীর বেশই বা আর ধারণ করা কেন? শোকাকুল রামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে মস্তকের জটাজাল উৎপাটন করিতে লাগিলেন। গুরু-ভ্রাতাগণ তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া জোর করিয়া সেদিন তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেন। অনাহারে, অনিদ্রায় ও নিরন্তর ক্রন্দনে রামদাসের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে সাতদিন এইরূপ শোক অবস্থায় কাটিল। ইহার পর বিদেহী দেবদাসজী মহারাজ একদিন জ্যোতির্ময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইলেন শোকার্ত শিষ্যের সম্মুখে।

স্নেহভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "বৎস, কেন তুমি এমন করছো? এবার তুমি শান্ত হও। আমি আশীর্বাদ করি, তোমার প্রকৃত কল্যাণ হোক। জেনে রেখো—আমার মৃত্যু হয় নি, শুধু আমার নর-জীবনের লীলাটি সমাপ্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাতে তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান তো কিছু গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া, প্রয়োজন মতো আমি তোমায় মাঝে মাঝে দর্শন দেবো।"

দেবদাসজীর কৃপালীলার কাহিনী বলিতে গিয়া কাঠিয়াবাবা মহারাজ উত্তরকালে প্রায়ই বলিতেন, গুরুজী তাঁহার এ কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষণে তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে দর্শন দিয়া অনুগৃহীত করিতেন।

গুরুর দেহাবসানের পর হইতে কাঠিয়াবাবা সাধনার আরও গভীরে প্রবেশ করেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চধুনি জ্বালাইয়া উহার মধ্যে তিনি কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। আবার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অবস্থান করেন বরফ-গলা শীতল জলে। এক একদিন এই কৃচ্ছ্রব্রতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। অন্যান্য সাধুরা সকালবেলায় তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আনিতেন। নিস্পন্দ দেহে বার বার আগুনের তাপ লাগানোর পর কাঠিয়াবাবাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখা যাইত।

একবার কাঠিয়াবাবা এক গ্রামে পঞ্চধুনি জ্বালাইয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অপর একটি সন্ন্যাসীও রহিয়াছেন। রামদাসজীর সাধন-সাফল্য ও খ্যাতি প্রতিপত্তি এই সন্ন্যাসীর ঈর্ষা জাগাইয়া তুলে। ধুনিমণ্ডলের মধ্যে ধ্যানস্থ রামদাসজীর প্রাণনাশের জন্য সেদিন সে এক জঘন্য কুকর্ম করিয়া বসে।

ধ্যানস্থ কাঠিয়াবাবাজীর তখন কোনো হুঁশ নাই, এই সুযোগে সন্ন্যাসীটি প্রজ্বলিত ধুনিগুলির চারিদিকে সহস্র সহস্র ঘুঁটে সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। বাহ্যজ্ঞান-রহিত সাধকের দেহের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত হয়, আর দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীটি ইতিমধ্যে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে।

দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিলে গ্রামের লোকজন সেদিকে ছুটিয়া আসে। সকলেরই দৃঢ় ধারণা, তপোনিরত সাধুবাবার দেহ নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইয়াছে। সমবেত চেষ্টায় আগুন নেভানো হইলে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য—কাঠিয়াবাবাজী যোগযুক্ত হইয়া, প্রশান্ত বদনে তাঁহার আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অগ্নি তাঁহার কোনো অনিষ্টই করে নাই।

সঙ্গী সাধুটির নৃশংস কার্য দেখিয়া গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়। পলায়িত সাধুটিকে ধরিয়া আনিতে চাহিলে কাঠিয়াবাবা তাহাদের নিরস্ত করিয়া কহেন, "ভাইসব, তোমাদের কিছু করবার দরকার নেই, দুষ্ট নিজের ওপর দণ্ড টেনে নিয়ে এসেছে।"

দুই দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, সেই সাধুটি অপর একটি অপরাধের অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। অতঃপর বিচারে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে থাকিয়াও সেদিন রামদাস বাবাজীর শরীর দগ্ধ হয় নাই—কেহ কেহ তাঁহাকে এই রহস্যের মর্ম জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি জানান—

পঞ্চধুনি তাপিত করিয়া বসিবার পূর্বে সাধককে অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করার মন্ত্রটিকে চৈতন্যময় করিয়া নিতে হয়। স্মিতহাস্যে আরও কহেন, "যাদের দেহ অগ্নিতে ক্লিষ্ট বা দগ্ধ হয় তারা যোগী নয়, এ কথাটা স্মরণে রাখবে।"

গুরুকৃপায় কাঠিয়াবাবা মহারাজ এরূপ বহুতর যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধন ও পরিব্রাজনের কালে এগুলি নানা সময়ে প্রয়োজনমতো প্রকট হইয়া উঠিত। একবার তিনি আগ্রায় যমুনার ধার দিয়া চলিয়াছেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের কাল, চারিদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তি চলিতেছে।

যমুনার উপরে গোরা পল্টনে ভর্তি একটি ক্ষুদ্র জাহাজ নোঙর করা। গোরা সৈন্যেরা তীরস্থিত সাধু কাঠিয়াবাবাকে দেখিয়া এই সময়ে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠে, একজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াও বসে। গুলিটি কিন্তু কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল না। অকুতোভয় কাঠিয়াবাবাজীর কিন্তু একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই। যমুনার তীর ধরিয়া আপনমনে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

গোরা সৈনিকটি নিরস্ত হইবার পাত্র নয়, বন্দুক উঠাইয়া সে জাহাজ হইতে আবার গুলি চালাইতে উদ্যত হইল। কাঠিয়াবাবাজী বিরক্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন, "ভালো বিপদ হয়েছে। এ ব্যাটা দেখছি কিছুতেই আজ ছাড়বে না।"

অন্তর্লীন হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তিনি চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিলেন। ক্ষণপরেই সৈনিকের হস্তধৃত বন্দুকটি কোন্ এক ইন্দ্রজাল বলে স্খলিত হইয়া যমুনায় ডুবিয়া গেল।

এতক্ষণে জাহাজের গোরা সৈনিকদের কিছুটা হুঁশ হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে— এ সাধু নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি ধারণ করে, ইহার সহিত তাই সৌহার্দ্য স্থাপন করাই ভালো। গোরার দল তখন জাহাজ হইতে নামিয়া আসে, টুপী খুলিয়া কাঠিয়াবাবাজীকে বার বার অভিবাদন জানাইতে থাকে।

সদ্‌গুরু দেবদাসজী মহারাজ নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রোপিত দীক্ষাবীজটি এবার কাঠিয়াবাবার মধ্যে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। গুরুকৃপা ও আপন তপস্যার ধারাপথটি বাহিয়া তাঁহার জীবনে সাধিত হয় এক পরম রূপান্তর, একনিষ্ঠ সাধক রামদাস এবার বহু আকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বর দর্শনে সিদ্ধকাম হন। সাধনার এ পরিণতিটি ঘটে ভরতপুরের পবিত্র তীর্থ সবলানিকা কুণ্ডায়। কাঠিয়াবাবাজী নিজেই ইহার বর্ণনা দিয়াছেন—

রামদাসকো রাম মিলা
সবলানিকা-কুণ্ডা।
সন্তন তো সাচ্চা মানে
ঝুঠ্ মানে গুণ্ডা।

—অর্থাৎ সাধক রামদাসের ভাগ্যে উপাস্য শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন হয় সবলানির কুণ্ডে, সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা এ কথা গ্রহণ করবে সত্য বলে, আর অসত্য বলে মনে করবে শুধু দুর্বৃত্তেরা।

ভরতপুরে ঈশ্বর দর্শনের পর হইতেই শুরু হয় সিদ্ধকাম সাধক কাঠিয়াবাবার আচার্য-জীবন। এ সময় হইতেই ক্রমে ক্রমে দুই একটি করিয়া শিষ্যকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম চেলার নাম গরীবদাস। ভরতপুরের এক নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ ভক্ত ব্রাহ্মণ কাঠিয়াবাবার মাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া বালক পুত্রটিকে আনিয়া তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করেন। ত্যাগে, প্রেমে ও তপোনিষ্ঠায় এই বালক পরিণত হন অসামান্য সাধকরূপে।

ভগবানদাস, ঠাকুরদাস এবং নরোত্তমদাস নামেও কয়েকটি বিশিষ্ট চেলা কাঠিয়াবাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। উত্তরকালে আরও বহুসংখ্যাক সাধক অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাস বাংলাদেশে।

কঠোর তপস্যা ও পর্যটনের পালা সাঙ্গ হইবার পর লোকগুরুরূপে কাঠিয়াবাবার এই আত্মপ্রকাশ। এবার তিনি ভাবিতে থাকেন, কোথায় স্থাপন করিবেন তাঁহার আশ্রম।

কঠোরতপা সাধুদের পক্ষে উপযোগী উত্তরাখণ্ডের নির্জন পর্বত গুহা। কিন্তু মনে মনে বিচার করিলেন—সেখানেও তো উদরের চিন্তা কম করিতে হয় না। বর্ষাকালে কোন্ স্থানে কন্দমূলের অংকুর দেখা যায় তাহা আগে হইতে খুঁজিয়া দেখিয়া রাখিতে হয়। এটাও তো আহারের জন্য এক বিশেষ প্রয়াস। সমতল ভূমেই বা কোথায় থাকিবেন? ব্রজভূমির আকর্ষণই এ সময়ে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রেমের ঠাকুর কানাইয়ালালের লীলাভূমি এটি। তাছাড়া, এই পবিত্র ভূমিতে সাধুদের সেবার জন্য ব্রজবাসী ও ব্রজমাঈদের স্বাভাবিক আগ্রহ রহিয়াছে। তাই বৃন্দাবনে আশ্রয় নিবার জন্যই রামদাসজী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গঙ্গাজীর কুঞ্জের নিকটস্থ ঘাটে, বটবৃক্ষতলে, কাঠিয়াবাবা তাঁহার আসনটি প্রথমে পাতিয়া বসেন। সঙ্গে সেবকশিষ্য গরীবদাসজী। যমুনার ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ বহু লোকই স্নান করিতে আসে। তাহাদের অনেকেই এই সুদর্শন, তেজোদৃপ্ত সাধুকে নম্র নতি জানাইয়া যায়, ধর্মকথা আলোচনা করিয়াও অনেকে তৃপ্ত হয়।

একদিন গভীর রজনীতে ঐ বৃক্ষতলে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিল। প্রথম রাত্রির ভজন শেষ করিয়া কাঠিয়াবাবা তাঁহার আসনের উপর শায়িত রহিয়াছেন। চুপি চুপি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ বাহিয়া এক তরুণী সেখানে উপস্থিত হয়, হঠাৎ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

বাবাজী মহারাজ চমকিত হইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। চেলা গরীবদাসজী নিকটেই ঘুমাইতেছিল, হাঁকডাক করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। গরীবদাস আলো জ্বালিলে দেখা গেল, কাঠিয়াবাবার আসনের উপর এক বিধবা যুবতী বসিয়া আছে।

তিরস্কার ও প্রশ্নবাণ বর্ষণের পর রমণী জানায়, সে এক আশ্রয়হীনা বিধবা। আজ সে বড় কামার্তা হইয়াছে, দুর্দমনীয় আবেগ এড়াইতে না পারায় নিশীথে তাহার এ অভিসার।

বাবাজী মহারাজ তো ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন,

"তোমার কাম যদি এতই জেগে থাকে, তবে গৃহস্থ পুরুষদের কাছে যাও। ত্যাগী সাধুসন্তদের কাছে এমন ক'রে আসা কেন?"

যুবতী বিনাইয়া বিনাইয়াই বলে তাহার মনের কথা, "মহারাজ, আপনার অপূর্ব রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দর্শনের পর থেকেই আমার কামবাসনা কেবলি বেড়ে চলেছে। আপনি কৃপা ক'রে আমার অভিলাষ পূরণ করুন।"

এতক্ষণ অবধি তবুও কাঠিয়াবাবা কিছুটা ধৈর্য ধরিয়াছিলেন, রমণীর এ কথা শোনামাত্র ঘটিল এক বিস্ফোরণ।

ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, চেলা গরীবদাসকে হাঁক দিয়া কহিলেন, "ওরে, তুই কিছুটা দূরে সরে যা তো, এই পাপীয়সীকে আমি সাধুর সিদ্ধাই কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। ও সাধুর সাধুত্ব হরণ ক'রে নিতে চায়, কিন্তু তাঁর সামর্থ্য যে কত ভয়ংকর হতে পারে সেইটেই ওকে আমি আজ দেখিয়ে ছাড়বো।"

ভীতা সন্ত্রস্তা রমণী করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। জোড়হস্তে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নিবেদন করিল, এ দুষ্কার্য করিতে সে স্বেচ্ছায় আসে নাই। একদল কুচক্রী ব্রজবাসী ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারে এখানে পাঠাইয়াছে। মহারাজ কামজিৎ কিনা, তাহারা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

যুবতীটি বার বার কাঠিয়াবাবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজ সব কথা শুনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা, এখনি এখান থেকে তুমি চলে যাও। আর কখনো কোনো সাধুর কাছে এরূপভাবে যেও না। জেনো সব সাধুই এক রকমের নয়—তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু যোগীরাজও থাকেন।"

কম্পিত হৃদয়ে পলায়ন করিয়া রমণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ব্রজভূমির ছোট বড় সব লোকের সহিতই কাঠিয়াবাবার সখ্যভাব।

তাঁহার গাঁজা-চরসের আড্ডায় অনেকেই আসিয়া জড়ো হয়, বাবাজী মহারাজের সহিত তাহাদের নানা কথা ও ঠাট্টা তামাশা চলে।

গোঁসাইয়া নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তিও রোজ সেখানে আসে। বৃন্দাবনে সে এক দুর্ধর্ষ ও পুরাতন দুর্বৃত্ত। চৌদ্দ বৎসর কাল দ্বীপান্তরে বাস করিলেও তাহার অপরাধপ্রবণতা কিছুমাত্র কমে নাই। বৃন্দাবনবাসীরা তাহার দৌরাত্ম্যে অস্থির।

একদিন জোর গাঁজা-চরস উড়ানো হইতেছে। বাবাজীর এই ধূমপান-বৈঠকের বিশিষ্ট সদস্য, পালোয়ান ছন্নুসিং হঠাৎ বলিয়া উঠে "বাবাজী মহারাজ, আপনার মতন মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ এখানে থাকতে ডাকাত গোঁসাইয়ার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হল না! ওর অত্যাচার থেকে ব্রজবাসীদের আপনি কৃপা ক'রে রক্ষা করুন।"

কথা কয়টি বড় মিনতিপূর্ণ। বাবাজীর হৃদয়তন্ত্রীতে সেদিন উহা আঘাত করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল সমর্থ মহাযোগীর করুণাঘন রূপ।

গোঁসাইয়া কিছুক্ষণ পরেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাঠিয়াবাবা সস্নেহে তাহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাইয়া, তুই কি সাধু হয়ে প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পেতে চাস? চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে তুই আমার চেলা হয়ে থাকবি?"

করুণামাখা এ কথা কয়টিতে কোন্ জাদু ছিল তাহা কে বলিবে? গোঁসাইয়ার সর্ব সত্তায় সেদিন উহা আলোড়ন তুলিয়া দিল।

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকে গোঁসাইয়া। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "মহারাজ, আমি জীবনে যত কুকাজ করেছি, কোনো মানুষ তা করতে পারে না। এ সব জেনেশুনেও কি সত্যিই তুমি আমায় কৃপা করবে? তোমার চেলা ক'রে নেবে?"

দুর্ধর্ষ অপরাধীর জীবনে সেদিন উদ্ধারের পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে। কৃপাময় মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে কহিলেন, "হ্যাঁরে হ্যাঁ। আমি তোকে সত্যিই আমার চেলা করবো। আজই করবো। যা, এখনই বাজার থেকে একগাছা তুলসীর কণ্ঠমালা নিয়ে আয়।"

গোঁসাইয়ার দীক্ষাদান সমাপ্ত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপূর্ব রূপান্তর দর্শনে ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাহার দৌরাত্ম্য ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি এবার একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। কাঠিয়াবাবা মহারাজের করুণার দিব্য স্পর্শ এই দুর্বৃত্তকে রূপান্বিত করিয়াছে এক প্রেমিক সাধুতে।

যমুনাতটের এক নিভৃত অঞ্চলে গোঁসাইয়া তাঁহার ভজন-পূজনে দিন অতিবাহিত করে। সে যে এবার এক নূতন মানুষ। পুরাতন পাপ-জীবনের কথা সবাইকে অবলীলায় শুনাইয়া দিতে তাহার বাধে না। নিজের চুরি-ডাকাতির নানা কাহিনী স্বরচিত সংগীতে গাঁথিয়া সকলের সঙ্গে সেও বেশ আমোদ উপভোগ করে। দুর্ধর্ষ দস্যুর রূপান্তর ঘটিয়াছে এক সদানন্দময় মহাবৈরাগী পুরুষরূপে। সাধারণ লোকে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে ডাকে—চোর-গোঁসাইয়া।

কুখ্যাত পাষণ্ডীর এই উদ্ধারসাধন বৃন্দাবনধামে কাঠিয়াবাবার এক বিস্ময়কর কীর্তি-রূপে প্রচারিত হয়।

যমুনার ঘাটে বাবাজীর সভায় বেশ জনসমাগম হইত। ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজা চরস উড়াইবার লোকও কম জুটিত না। বাবাজী মহারাজের নিকট দর্শনার্থীদের ভিড় ও পুরি কচৌরির আমদানি দেখিয়া চোরের দল সন্দেহ করিত, তাঁহার নিকট বুঝি সঞ্চিত টাকা-কড়িও বেশ কিছু রহিয়াছে। এ সন্ধানে তাহারা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে হানা দিতে ছাড়িত না। বিস্ময়ের কথা, এ দুর্বৃত্তেরাই আবার দিনের বেলায় কাঠিয়াবাবার কাছে বসিয়া তাঁহারই গাঁজা-চরস ধ্বংস করিত।

একবার এইরূপ একদল তস্করের সঙ্গে বাবাজীর প্রবল বিতণ্ডা চলিতেছে। সংখ্যায় ইহারা তিনজন। উত্তেজিত হইয়া দুর্বৃত্তেরা বলিয়া উঠে, "বাবাজী, তুমি আমাদের এমন করে ধমকে কথা বল, তোমার সাহস তো কম নয়। এর প্রতিফল তুমি একদিন রাত্রিবেলায় ভালো ক'রেই পাবে।"

কাঠিয়াবাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে! চোর ছ্যাঁচোড়ের দল আস্কারা পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। দেখছি, সাধুদের চোখ রাঙাতেও তোদের বাধছে না।"

তারপর বলিয়া উঠিলেন, "দেখবি আজই তোরা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হবি।"

দুর্বৃত্তেরা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়া গেল, "দ্যাখো বাবাজী থানায় পুরতে পারে এমন শক্তি কারুর নেই।"

কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিক সেইদিনই পূর্বেকার এক দুষ্কর্মের অভিযোগে এই তিন ব্যক্তি পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়। অভিযোগ বড় গুরুতর, মুক্তি পাওয়া কঠিন। কোনোমতে জামিনে ছাড়া পাইয়া ইহাদের দুইজন কাঠিয়াবাবার কাছে ছুটিয়া আসে, চরণ ধরিয়া বার বার তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজের ক্রোধ তিরোহিত হইতে দেরি হইল না। শান্তস্বরে তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা। কিন্তু তোরা প্রতিজ্ঞা কর্—আর কখনও চুরি-ডাকাতি করবিনে, আর সাধুদের মর্যাদা রেখে চলবি।"

তস্করেরা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল। মোকদ্দমার দিন দেখা গেল, কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় মুক্তি পাইয়াছে, আর তৃতীয় অপরাধীটির উপর হইয়াছে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

কিছুদিন পরের কথা। বাবাজী সেদিন মথুরার রাস্তায় চলিয়াছেন। দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব-পরিচিত তৃতীয় চোরটির কোমরে শিকল বাঁধা, সরকারী রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কাঠিয়াবাবাকে দেখিয়াই সে হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাশ্রু নয়নে বার বার ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিল, "বাবাজী মহারাজ, আমরা ব্রজবাসী—সবাই তোমার বালক, নিতান্ত অবোধ। রুষ্ট হযে আমাদের এ কঠিন দণ্ড দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?"

লোকটির ক্রন্দনে কাঠিয়াবাবার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। সাধু-সন্তদের আর কখনো তুই যেন অসম্মান করিসনে। যা, আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই তুই জেল থেকে মুক্ত হবি।"

চমকিত হইয়া বন্দী বলিয়া উঠিল, "কিন্তু মহারাজ, এ আপনি কি বলছেন? এখন আর তা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? মামলায় আপীল ক'রেছিলাম তাও যে অগ্রাহ্য হয়েছে। মুক্তি পাবার বিন্দুমাত্র আশা আমার নেই।"

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, "ক্যা? সন্তনকা বচনমে অব্‌ভী তেরা বিশ্বাস হোতে নহী। মেরা বচন কভী ঝুঁঠ নহী হোগে।" অর্থাৎ সে কি রে? সাধুর বাক্যে এখনও দেখছি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? ওরে, আমার বাক্য যে কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

কয়েদীটি কিন্তু তৃতীয় দিনে ঠিকই মুক্ত হইয়া আসে। সরকার হইতে কি এক বিশেষ কারণে আদেশ বাহির হয়, প্রত্যেক কারাগার হইতে তিনজন করিয়া কয়েদীকে অবিলম্বে খালাস দেওয়া হইবে। দেখা যায়, বাবাজী মহারাজের মার্জনাপ্রাপ্ত লোকটির নাম ঐ মুক্তি তালিকায় রহিয়াছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের গাঁজা ও চরস পান ছিল এক নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। ধুনির আগুনের মতো তাঁহার বৈঠকে কল্কের আগুন কখনো নির্বাপিত হইত না।

কিন্তু বাবাজী মহারাজের একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে ধরা পড়িত। নিরন্তর গাঁজা-চরসের ধূমপান করার পর তাঁহার নয়নদ্বয় একটুও আরক্তিম হইত না। প্রশান্তিময় আনন হইতে সর্বদা বিকীর্ণ হইত দিব্য আনন্দের ছটা।

সেবার বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা হইতেছে। এ উপলক্ষ্যে দিগ্‌বিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ব্রজধামে উপনীত হন এবং পরিক্রমা করিতে থাকেন। মেলায় উপস্থিত সকল বৈষ্ণব সাধুদের সমর্থনে এ সময়ে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী বৃন্দাবনের মোহান্ত পদে বৃত হন।

উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে এ মেলাক্ষেত্রে একজন ব্রজবাসী কৌতুককর প্রতিযোগিতায় সকলকে আহ্বান করে। একটি বৃহদাকার কল্‌কে শিকলে বাঁধিয়া বট-বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, আর উহার ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হয় সওয়া সের চরস। উপরে ও নিচে সাজানো হয় সওয়া সের করিয়া দুইটি বালাখানা তামাকুর স্তর। এই বৃহৎ কল্‌কেতে টান দিয়া ছিলিম উড়ানো সত্যই অতি কঠিন ব্যাপার। এটি হইতে ধোঁয়া বাহির করিবার মতো শক্তি কোন্ সাধুর আছে, প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তরা তাহাই দেখিতে চান।

ব্রজভূমির বহু পরাক্রান্ত সাধুই সেদিন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই বিচিত্র ছিলিম হইতে ধোঁয়া বাহির করা কাহারও সামর্থ্যে কুলায় নাই।

বৃন্দাবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাবাজী মহারাজকে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেই এই বল পরীক্ষায় জয়ী হইতে হইবে নতুবা তাহাদের মাথা যে হেঁট হইয়া যায়। কাঠিবাবাও পরম উৎসাহে এ আনন্দরঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি সজোরে এই কল্‌কেতে দম দিবামাত্রই উহার শীর্ষদেশে দপ্‌দপ্ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন তাঁহার জয়জয়কার।

আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি উভয় দিক দিয়াই চিরকাল বাবাজী মহারাজ ছিলেন বৈষ্ণব সাধুসমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কাঠিবাবার চরস পানের আরও একটা কৌতুককর ঘটনা রহিয়াছে। সেবার ভরতপুর হইতে তিনি শিষ্য গর্বিদাসজীসহ বৃন্দাবনে ফিরিতেছেন। উভয়ের সঙ্গে রহিয়াছে প্রায় দুই সের চরস। আইনমতে এই পরিমাণ চরস রাখা নিষিদ্ধ—পথিমধ্যে গুরু ও শিষ্য পুলিস কর্তৃক ধৃত হইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উভয়কে উপস্থিত করা হইল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, “সাধু, এত বেশী পরিমাণ চরস দিয়ে তুমি কি করবে?”

বাবাজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, “সাহেব, এ আবার বেশী কি? এতো আমার দুই-এক দিনের খোরাক।”

সাহেব এরূপ অবিশ্বাস্য কথা মানিয়া নিতে রাজী নহেন। ইহা চাক্ষুস না দেখিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বাবাজী এবার এক ছিলিমে প্রায় এক পোয়া চরস সাজিয়া কল্‌কেতে জোর টান দিলেন। দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সাহেবের বিস্ময় ততক্ষণে চরমে উঠিয়াছে। শুধু একটি ছিলিমে এ পরিমাণ চরস কোনো মানুষ যে সত্যই পান করিতে পারে ইহা তাঁহার ধারণার অতীত। মনে মনে বুঝিলেন, ইহা এই সাধুর দৈবী শক্তির কাজ। খুশী মনে কহিলেন, "আচ্ছা সাধু, তুমি চলে যাও। কেউ যাতে পথে এই চরসের জন্য তোমাদের না আটকায় এজন্য আমি একটা আদেশপত্র দিচ্ছি।"

বাবাজী মহারাজ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "সাহেব, এ হুকুমনামার আমার কোনো দরকার নেই। কেউ যদি রাস্তায় ধরে, ভয় কি? আবার এমনি ক'রেই ছিলিম উড়িয়ে দেব।"

সাহেব হোহো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কাঠিয়াবাবাজীর গাঁজা-চরস পানের নানা কাহিনী সাধু ও ভক্তমহলে খুব শুনা যাইত। আবার সকলেই জানিতেন, বিপুল পরিমাণ তীব্র নেশার বস্তু পান করিয়াও তাঁহার দেহে বা মনে কখনো বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিত না।

দীর্ঘকালের এ প্রচণ্ড নেশার অভ্যাসটি বাবাজী মহারাজ কিন্তু একদিনে এক মুহূর্তেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এক সামান্য অসুস্থতায় ভক্তেরা এক চিকিৎসক ডাকিয়া আনে। ঐ চিকিৎসকের একটিমাত্র কথায় বাবাজী ভাঙ চরস পান ছাড়িয়া দেন।

একবার বাবাজীর প্রধান শিষ্য সন্তদাস মহারাজ প্রশ্ন করেন, "বাবা, দুই-চারবার গাঁজা-চরসের ছিলিম উড়িয়ে অন্যান্য সাধুরা নেশার একেবারে মত্ত হয়ে ওঠে, অথচ আপনি তো অনবরত ছিলিম টেনেও এমন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারেন। এ কি ক'রে সম্ভব হয়?"

কাঠিয়াবাবা উত্তরে বলিলেন, "বাবা, জিস্‌পর ভগওয়ানকা অমল্ চড় গিয়া উস্‌পর আওর কোঈ অমল্ কভী চড়তা নহীঁ।" অর্থাৎ—বাবা, যার সর্বসত্তায় ভগবানের নেশা চড়ে গিয়েছে সংসারের আর কোনো নেশাই যে তার উপর ভর করতে পারে না।

উজ্জয়িনীতে সেবার কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ সময়ে মেলাক্ষেত্রে এক শক্তিধর শৈব সন্ন্যাসীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি ও যোগবিভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া শৈব সন্ন্যাসীরা মেলাক্ষেত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের একদল লোক উদ্ধতভাবে বৈষ্ণব সাধুদের বিতাড়িত করিতে থাকে।

চিরাচরিত প্রথামতো বৃন্দাবনের মোহান্তকে কুম্ভমেলায় উপস্থিত থাকিতে হয়। কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুসহ কাঠিয়াবাবাজী তাই এ সময়ে উজ্জয়িনীর পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকটি বৈষ্ণব সাধু জমায়েতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুরা ক্ষুণ্ণ মনে শৈব সন্ন্যাসীদের অত্যাচারের কথা তাঁহাকে নিবেদন করে।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—বৃথাই তাহারা ত্যাগী সাধু হইয়াছেন। মৃত্যুভয় যাহাদের এত বেশী, গৃহকোণই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। কুম্ভমেলার ক্ষেত্রে নিজস্ব

অধিকারের জন্য তাহাদের লড়াই করা উচিত ছিল। যাবলে কিই-বা ক্ষতি হইত—বিষ্ণু নাম করিয়া তাহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিত। কাপুরুষের দল! নিজেদের মাথা তো তাহারা হেঁট করিয়াছেই, ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর মর্যাদাহানিও করিয়াছে।

বাবাজী মহারাজের এসব তীক্ষ্ণ বাক্য বৈষ্ণব সাধুদের অন্তরে গিয়া বিঁধিল। মেলাক্ষেত্রে পুনরায় স্থান অধিকারের জন্য তাঁহারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একটি হস্তী সংগ্রহ করিয়া সোৎসাহে তাঁহারা মোহান্ত রামদাস বাবাজীকে ইহাতে আরোহণ করাইলেন। পিছনে চলিতে লাগিল কয়েক সহস্র বৈষ্ণব সাধুর বিরাট দল।

কাঠিয়াবাবাজীর নেতৃত্বে এই "সাধু ফৌজ" কুম্ভমেলায় পৌঁছিলে এক বিস্ময়কর কাণ্ড সংঘটিত হয়। হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন বাবাজী মহারাজের দিব্য প্রশান্ত মূর্তিটি সেদিন উদ্ধত সন্ন্যাসীদের এক মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেয়। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া মেলাক্ষেত্রে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে থাকে।

কাঠিয়াবাবার ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাত্মশক্তি সেদিন লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও দর্শনার্থীর মধ্যে এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ একবার তাঁহার কয়েকটি শিষ্যসহ কোনো এক সাধু জমায়েতের সহিত পথ চলিতেছেন।

প্রতিদিন শেষ রাত্রের কৃত্যাদি শেষে, ইষ্টপূজা সমাপনের পর, যাত্রা শুরু হয়। তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলে পরিব্রাজন। মধ্যাহ্নে সাধুরা কোনো ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ের ধারে পৌঁছিয়া আসন পাতিয়া বসেন। গ্রামবাসীরা সাধুসন্তদের দর্শন করে ও দণ্ডবৎ জানায়, আহার্যের যোগাড় করিয়া দেয়। এ সময়ে গৃহস্থদের প্রদত্ত ভেট নিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটি ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদও সাধুদের মধ্যে বাধিয়া যায়।

জমায়েতের সঙ্গে এক পরমহংসজীও পথ চলিতেছেন। একদিন রামদাস কাঠিয়া-বাবাকে ডাকিয়া পরমহংসজীও শ্লেষাত্মক বাক্য বলিতে শুরু করিলেন—"বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত বৈরাগ্য কিছুই নেই, পেটের চিন্তায় সবাই সব সময়ে অস্থির, আর এ নিয়ে কি বিশ্রী ঝগড়াঝাঁটি তারা করে।"

বাবাজী স্থির করিলেন আত্মাভিমানী পরমহংসজীকে কিছু শিক্ষা দিবেন। দীনভাবে জোড়হস্তে তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ, প্রকৃত বৈরাগ্য কি বস্তু, আপনি আমায় তা একটু বুঝিয়ে দিন। আজ থেকে আপনার নির্দেশ মতোই আমি চলবো, আপনার আসনের পাশেই পাতবো আমার আসন।"

পরমহংসজী অতঃপর গম্ভীরভাবে বাবাজী মহারাজকে বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা শুনাইয়া দিলেন।

চতুর কাঠিয়াবাবাজী কিন্তু ইতিমধ্যে এক চমৎকার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধুদের ডাকিয়া তিনি চুপি চুপি বলিয়া দিলেন, "তোমরা জেনে রেখো, আজ থেকে জমায়েতের ভোজনের ব্যাপারে ঋদ্ধি সিদ্ধির কোনো ক্রিয়া আর হবে না। তোমরা

সুবিধামতো গ্রামের ভেতর যাও, গৃহস্থদের কাছ থেকে ডাল, আটা, ঘি সংগ্রহ ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।"

ঘটিল ঠিক তাহাই। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, গ্রামবাসীদের যেন কি হইয়াছে, তাহারা আর জমায়েতের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভোজন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে না। বৈষ্ণব সাধুদের সকলেই গ্রামে গিয়া ভোজন সমাধা করিয়া আসে, কিন্তু কাঠিয়াবাবা মহারাজ ও পরমহংসজী আসন ছাড়িয়া বাহির হন না। তাঁহাদের সম্মুখে পূর্বের মতো ভেট ইত্যাদিও আর উপস্থিত হয় না।

এদিকে পরমহংসজী দিনের পর দিন শুধুমাত্র জল পান করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কাঠিয়াবাবার কিন্তু এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই, ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা চরস উড়াইয়া তিনি পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছেন।

পরমহংসজী কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়িলেন। ক্ষুধায় মৃতকল্প হইয়া একদিন তিনি বাবাজী মহারাজকে কহিলেন, "বাবা, আজ যে আমার প্রাণ যায়। তুমি গ্রাম থেকে শিগ্‌গীর কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসো, আমায় বাঁচাও।"

কাঠিয়াবাবা জোড়হস্তে সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, সেদিন বৈরাগ্যতত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে আপনি কিন্তু আমায় বলেছেন, কারুর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা যাবে না। তবে আজ আবার আপনার এই বিরুদ্ধ মত কেন?"

পরমহংসজী ইতিমধ্যে একেবারে নরম হইয়া আসিয়াছেন। কাঠিয়াবাবাজীর নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তিনি মার্জনা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহারাজ এবার প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার আর কোনো ভয় নেই। আজ এক্ষুনি গ্রামের গৃহস্থেরা বহুতর ভেট নিয়ে জমায়েতের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। ঋদ্ধি সিদ্ধির ক্রিয়া আবার পূর্ববৎ হতে থাকবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, বহিরঙ্গ ভাব দেখে বৈষ্ণব সাধকদের বিচার করা কখনো ঠিক নয়। এঁরা বড় চতুর—আর এদের লীলাও বড় গোপন, বড় চাতুর্যপূর্ণ। কোন্ বৈষ্ণব মূর্তিতে কোন্ সমর্থ পুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তা সকলের পক্ষে জানা তো সম্ভবপর নয়।"

অল্পকাল পরেই দেখা গেল, একদল গ্রামবাসী বহু সংখ্যক সাধুর উপযোগী আহার্য নিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলকে দণ্ডবৎ করিতেছে।

এইরূপে নানা লীলা ও আনন্দরঙ্গের মধ্য দিয়া কাঠিয়াবাবার যোগৈশ্বর্য বহুস্থানে প্রকটিত হইত।

বৃন্দাবনে কেমারবন অঞ্চলে একটি পুরাতন বাগিচা ছিল। ইহার মালিকেরা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাঠিয়াবাবাজীকে এটি ব্যবহার করিতে দিতে ইচ্ছুক হন।

বাবাজী তখন যমুনাতীরে গঙ্গাজীর কুঞ্জে বাস করিতেছেন। প্রস্তাবটি শুনিয়া কহিলেন, "আমি যমুনাতীর ছেড়ে ওখানে এসে উঠতে পারি, যদি স্থানটি আমায় একেবারে দান ক'রে দাও।"

মালিকেরা রাজী হইলেন। বাগিচায় এক খড়ের ছাউনি করিয়া কাঠিয়াবাবা

তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিলেন, এই ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যেই এক ধুনি প্রজ্বলিত করা হইল। ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের বহুখ্যাত স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবার নিজস্ব আশ্রমের সূচনা।

আশ্রমিকদের সংখ্যা তখন নিতান্ত সামান্য—শুধু গরীবদাস ও প্রেমদাস এই দুই চেলা, আর সেই সঙ্গে রহিয়াছে গঙ্গা নাম্নী একটি পয়স্বিনী গাভী।

সেবক-শিষ্যদের সহিত বাবাজী মহারাজের যে সম্বন্ধ, এ গাভীটির সহিতও তাঁহার সে সম্পর্ক ও যোগসূত্র বর্তমান। সে-বার প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইতেছে, কাঠিয়াবাবাজী ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গে শিষ্যগণসহ আশ্রমের গাভী গঙ্গাও সেখানে সেদিন উপস্থিত। তখন মাঘ মাস, নদীর বালুসৈকতে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ। একদিন প্রত্যুষে দেখা গেল বাবাজী মহারাজ নগ্নকায় হইয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার কম্বলটি জড়ানো রহিয়াছে গাভীটির অঙ্গে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্য এ সময়ে কাঠিয়াবাবাকে দণ্ডবৎ করিতে আসিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এ তীব্র শীতে আপনি শুধু শুধু এমন কষ্টভোগ করছেন কেন? গরুটির গায়েই বা নিজের কম্বল কেন চাপিয়েছেন? ওরা তো অনাবৃত থাকতেই অভ্যস্ত।"

উত্তর হইল, "বেটা, দেখছো তো এবার কি রকম শীত পড়েছে। এ পশু মৌনী, মুখে কিছু বলতে পারে না। তাইতো আমাকে এর প্রতি এত দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া আমার তো ধুনি রয়েছে, গায়ে বিভূতি মাখানো আছে। তেমন কিছু শীত লাগে না।"

"কিন্তু বাবা, সুদূর বৃন্দাবন থেকে গরুটিকে আপনি অনর্থক এ কুম্ভমেলায় টেনে এনেছেন কেন?"

"সে কি গো, আমি টেনে আনবো কেন? এর জন্য আমাকে পায়ে হেঁটে কষ্ট ক'রে আসতে হয়েছে—একলা এলে আমি তো রেলগাড়িতে চড়ে বেশ আরামে আসতে পারতাম। কিন্তু এই গাভীটিই যে যত গোল বাধালো। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে করুণভাবে বললে—'বাবা, তুমি কুম্ভমেলায় চলে যাবে, আর আমায় সঙ্গে ক'রে নেবে না? তোমার সঙ্গে আমারও মেলায় যাবার বড় ইচ্ছে করছে।' কি করি? বাধ্য হয়ে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়েই পদব্রজে আমায় এতটা দূরের পথ আসতে হল। এতে অবশ্য আমার নিজের তেমন কিছু কষ্ট হয়নি।"

মনুষ্য ও জন্তুজনের পার্থক্য এই সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে এমনিভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শিষ্য গরীবদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন। একনিষ্ঠ গুরুসেবার মধ্য দিয়াই অধ্যাত্মসাধনের উচ্চস্তরে তিনি উন্নীত হন। অথচ এই নিষ্ঠাবান্ সাধকের সঙ্গে কাঠিয়াবাবাজী কম কঠোর ব্যবহার করিতেন না।

গরীবদাসের উপর আশ্রমের রন্ধনের ভার ছিল। দেখা যাইত, বাবাজী মহারাজ তাঁহার অসাক্ষাতে হাঁড়িকুড়ি ও আহার্য সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট করিয়া তারপর

তাঁহাকে অযথা নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন। প্রায়ই তিনি ছল করিয়া সমস্ত দোষ এই শিষ্যের ঘাড়ে চাপাইতেন।

ব্রজ পরিক্রমার কালে গোবিন্দদাসজীর সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া যাইত।

জ্যৈষ্ঠ মাস দুপুর ভরিয়া গোবিন্দদাস বাবা মহারাজের তৈজসপত্রাদি স্কন্ধে বহিয়া চলিয়াছেন, অথচ সারাদিন তাঁহার উপবাস, এক ফোঁটা জলও পেটে পড়ে নাই। তারপর বেলা গড়াইয়া গেল, বাবাজী মহারাজ ও সঙ্গীয় বৈষ্ণবদের জন্য তিনি রন্ধনাদি সমস্ত কিছু শেষ করিলেন।

ইহাই ধৈর্য পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। কাঠিয়াবাবা তাই এ সময় বসিয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করিলেন। রুটি প্রস্তুত করিতে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া কঠোর তিরস্কার শুরু করিলেন। অশ্লীল গালাগালির পালাও শুরু হইল, তারপর লাঠি দিয়া গোবিন্দদাসের মস্তকে করিলেন প্রচণ্ড প্রহার!

এত কিছুতেও কিন্তু শিষ্যের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই। গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, অপরাধ সবই আমার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃপা ক'রে আমায় এবার ক্ষমা করুন।”

বাহিরের এ উগ্রতা কিন্তু বাবাজীর অন্তরের প্রেমকরুণাকে বিন্দুমাত্র শিথিল করে নাই। প্রহার করার পর গোবিন্দদাসজীর আর্তি দেখিয়া সেই দিন তিনি নিজে আহার করিতে পারেন নাই।

এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "গোবিন্দদাস এই যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি তার প্রতি সেদিন অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম। বস্তুতঃ গুরুর কাছ থেকে বর লাভ করার সময় তার এসে গিয়েছে। আমি এবার তাকে বর দান করবো। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, এমন পরম শান্তি সে নিজের ভেতর খুঁজে পেয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর এ দুঃখের সংসারে ফেলে ক্লিষ্ট ও তাপিত করা কেন? বৈকুণ্ঠ পাওয়ার উপযুক্ত সে হয়েছে। তবে বৈকুণ্ঠেই চলে যাক না কেন? অন্য বর দিয়ে আর কি হবে?"

সদ্গুরু সেদিন তাই গোবিন্দদাসের পরম প্রাপ্তি ও বৈকুণ্ঠ গমনকে বিলম্বিত করিতে চাহেন নাই। শিষ্যও পরম আনন্দে তাই কয়েকদিনের মধ্যে লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্যের প্রতি রূঢ়তা ও কঠোরতায় সদ্গুরুর প্রেম প্রকাশ পায়, সাধারণ মানুষ কিন্তু তাহা সহজে বুঝিতে চাহে না। বাবাজী মহারাজের প্রধান চেলা সন্তদাস মহারাজ একবার এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। বড় সুন্দর উত্তর শোনা যায়।

বাবাজী বলিলেন, "হাঁ, এতেই সাধুদের প্রেম, কল্যাণেচ্ছা প্রকাশ পায়। গুরু গালিগালাজ ও প্রহার দেন চিত্তকে নির্মল করবার জন্য, ক্রোধ ও অভিমানের মূলোৎপাটনের জন্য। অথচ সরল গুরু এজন্য নিজে নিতান্ত কঠোর ও অত্যাচারী বলেই পরিচিত হন। শিষ্যের প্রতি প্রেমের জন্যই এ দুর্নামের বোঝা তিনি মাথায় তুলে নেন না কি?"

এসব কথা বলিতে গেলে এসময়ে স্বীয় গুরুর স্মৃতি মনে পড়িত, আর কাঠিয়া-বাবা মহারাজের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিত। ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলিতেন, "আমার গুরুজী ছিলেন পরম দয়ালু। তাঁর কোনো মোহ ছিল না। শিষ্যের ওপর, ছিল নির্মল কল্যাণকর প্রেম। জেনে রেখো, প্রেম ও মোহ্ এক বস্তু নয়।"

কাঠিয়াবাবাজীর অন্যতম ভক্ত প্রেমদাসজীকে নিয়া একবার বড় গোল বাধিল। কোনো এক পণ্ডিত সভায় গিয়া ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান-মার্গীয় ব্যাখ্যাদি শুনিয়া প্রেমদাস ভক্তিপথ হইতে কিছুটা বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী পুরুষের মতো তখন তাঁহার মনোভঙ্গী। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি আর মানিতে চাহেন না। সর্বভূতেই তো ব্রহ্ম বিরাজমান, তবে ব্যক্তি বিশেষকে বা বিগ্রহ বিশেষকে শ্রদ্ধা করার দরকার কি—এই শ্রেণীর নানা উক্তি করিয়াও তিনি বেড়ান।

শিষ্যের এ ধরনের কথাবার্তার প্রতি কাঠিয়াবাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। তিনি শুধু সংক্ষেপে কহিলেন, "ওর কথা আর কি শুনবো, ও তো একেবারে পাগলই হয়ে গিয়েছে।"

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে এই কথা কয়টি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রেমদাসজীর মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়. আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র তিনি বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান আর উন্মত্তভাবে চিৎকার করেন।

পথ চলিতে চলিতে গরীবদাসজী সেদিন এ হতভাগা গুরুভ্রাতাকে বড় শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পান। বাবাজী মহারাজের নিকট তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া মিনতির সুরে বলিতে থাকেন, মহারাজ, প্রেমদাস নিতান্তই আপনার এক বালক ছেলে—বাল-গোপাল। এর প্রতি আপনি কৃপা করুন। এই উন্মাদ রোগের আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করুন।

অনুরোধটি শুনিয়া প্রথমে তো কাঠিয়াবাবা অগ্নিশর্মা! উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—তিনি তো আর চিকিৎসক নহেন, এসব রোগীর ভার তাঁহার উপর তবে চাপানো কেন?

কিন্তু গরীবদাসজীর করুণ আবেদন অবশেষে তাঁহাকে টলাইয়া দিল। এবার অনেকটা কোমল হইয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, তাই হোক্। ভজনকুটিরের ঐ কোণে ঠাকুরের প্রসাদ রাখা হয়েছে, তাই ওকে খাইয়ে দাও। ব্যাধির কবল থেকে হতভাগা এখনই মুক্তিলাভ করবে। ও অবশ্য ঠাকুরের প্রসাদের মাহাত্ম্য কিছুদিন যাবৎ মানছে না। তবু ওকে খাইয়ে দেখিয়ে দাও। দেখুক, সত্যই মাহাত্ম্য কিছু আছে কিনা।"

ঐ প্রসাদ প্রেমদাসজীর মুখে তখনই তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উন্মাদ প্রেমদাসের জিহ্বায় এ আস্বাদ তখন যেন কেমন বড় তিক্ত লাগিতেছে, সামান্য একটু গ্রহণ করিবার পর তিনি আর ইহা খাইতে রাজী নন।

কাঠিয়াবাবা তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "ওরে খা—খা! তুই আর একবার দ্যাখ, এর স্বাদ কি রকম।"

প্রেমদাসজী ধীরে ধীরে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবার কিন্তু তাঁহার মনে হইল ইহার স্বাদ অমৃতোপম। সমগ্র ভোজন পাত্রটি নিঃশোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্ত প্রেমদাসের উন্মাদ রোগ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

স্মিতহাস্যে কাঠিয়াবাবা কহিলেন, "ওরে, তুই না কত বলে বেড়াতিস্, সর্ববস্তুই সমান? কেমন, এবার প্রসাদের মাহাত্ম্য ও তার বৈশিষ্ট্য তো দেখলি? এজন্যই বৈষ্ণবদের এত শুদ্ধাচার, এই জন্যই তাঁরা এত পবিত্র হয়ে শ্রীজীর ভোগ দেন। অপর খাদ্যের সঙ্গে এর কি কোনো তুলনা হয় রে? এমন বস্তুর মাহাত্ম্য সবাই বুঝবে কি ক'রে বল।"

শিষ্যদের উপর মহারাজের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ন ও সতত সজাগ। ইহাদের অধ্যাত্ম রূপান্তর সাধনের প্রয়োজনে নানা অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণা-লীলা বিস্তারিত হইত। প্রেমদাসজীর মৌনী জীবনের অধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া ইহার অপূর্ব নিদর্শন এক সময়ে দেখা গিয়াছিল।

এই সেবক শিষ্যটি সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ হইলেও কিছুটা কোপনস্বভাব ছিলেন। বিশেষত গাঁজিকা চরস টানিবার পর তাঁহার ক্রোধের মাত্রা খুবই বাড়িয়া যাইত। একদিন নেশার ঘোরে প্রতিবেশী কয়েকটি ব্রজবাসীকে তিনি যথেচ্ছভাবে গালিগালাজ করিতে থাকেন।

মহারাজ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওরে, তোর ক্রোধটা বড় বেশী, লোকের সঙ্গে কেবলই ঝগড়া করিস। আজ থেকে মৌনী থাকবি। কারুর সঙ্গে তুই বারো বৎসরের মধ্যে কথা বলবিনে।"

উত্তরকালে মৌনীজী বলিতেন—বাবাজী মহারাজ এ কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাঁহার জিহ্বাতে তালা লাগাইয়া দিল, আর তাঁহার একটি কথা বলিবারও শক্তি রহিল না। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সেই সময় হইতে বারো বৎসর কাল মৌনী থাকিতে হয়। মৌনীজী নামেই এই সাধক শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একবার এক বিষাক্ত সর্প মৌনীজীকে দংশন করে। বিস্ময়ের বিষয়, বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলেও কাঠিয়াবাবার এই শিষ্যের মুখ হইতে যন্ত্রণাসূচক একটি বাক্যও এ সময় নির্গত হয় নাই। তাঁহার এই মৌনব্রতের বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বাবাজী মহারাজ এক ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করিলেন।

আশ্রমভবনে কয়েক শত ব্যক্তি সেদিন নিমন্ত্রিত। মৌনীজীকে তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, "মৌনীজী, আজ তোমার ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে, তুমি সকলের সঙ্গে এবার কথা কও।"

কিন্তু বলিলে কি হইবে? একটি বর্ণ উচ্চারণেরও সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? বারো বৎসর আগে, আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুজী তাঁহার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছেন, শব্দোচ্চারণের সমস্ত ক্ষমতাই লোপ পাইয়া গিয়াছে।

মৌনীজী ইঙ্গিত দ্বারা সকলকে জানাইলেন, বাবা মহারাজ যদি কৃপা করিয়া বাক্‌শক্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার পক্ষে কথা বলা সম্ভবপর, নতুবা নয়।

এবার কাঠিয়াবাবাজী নিজে আদেশ দিলেন, "মৌনী, তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। তুমি কথা বল।"

মৌনীজীর বোধ হইল কে যেন জিহ্বার কুলুপটি এই মুহূর্তে খসাইয়া দিয়া গেল। বাক্‌স্ফূর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'শ্রীজী'। ইহার পর নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

এক সময়ে মৌনীজী অভিমানভরে কিছুদিনের জন্য কাঠিয়াবাবা মহারাজের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু শীঘ্রই অনুশোচনা ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। আশ্রমের কাজ কিরূপে চলিতেছে, বাবাজী মহারাজের সেবাই বা কি করিয়া সম্পন্ন হইতেছে—এই সমস্ত ভাবনা তাঁহাকে পাইয়া বসে। ইহার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

বাবাজী মহারাজ এ সময়ে আসনের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মৌনীজী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। অনুতপ্ত সেবক শিষ্যের নয়ন দুটি অশ্রুসজল।

বাবাজী তখন এক অপরূপ লীলাভিনয় শুরু করিলেন। ধীর করুণ কণ্ঠে শিষ্যকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে, আমি বুড়ো হয়েছি, তুই আমার কাছে আর থাকবি কেন? আমি কষ্ট পেয়ে মরে যাবো তারপর তুই আশ্রমে ফিরে আসবি।"

মৌনীজীর নয়ন হইতে তখন দরদর ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া আর এক হাতে তিনি গুরুজীর চরণসেবা করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু এ কি অলৌকিক কাণ্ড! তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহার হস্ত তো বাবাজীর চরণের উপর পড়িতেছে না। শূন্যে শয্যায়ই তাহা বার বার নিপতিত হইতেছে। বাবাজী মহারাজের দেহটি শয্যা হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে, শিষ্যের হৃদয়ে কান্নার ঢেউ উঠিল। গুরুজীর আকস্মিক অন্তর্ধানে মুহ্যমান হইয়া তিনি অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হইবার পর আবার এক নূতনতর বিস্ময়, মৌনীজী দেখিলেন, গুরুমহারাজের দেহ পুনরায় শয্যায় ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ববৎ বিশ্রাম শয়নে নিশ্চলভাবে তিনি শায়িত।

এইবার কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন, "কেমন রে? আমি এভাবে চলে গেলে তুই যদি খুশী হোস্, তবে বল্ আমি চলেই যাই। এ বুড়োকে ছেড়ে তোরা অন্যত্র গেলে—দেহটাকে কে সেবা-শুশ্রূষা করবে বল দেখি?"

মৌনীজী নির্বাক বিস্ময়ে শ্রীগুরুকে পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। বুঝিলেন, মহাসমর্থ গুরুদেবের স্বরূপ ও তাঁহার লীলার তাৎপর্য বুঝিবার মতো সামর্থ্য তিনি এতটুকুও অর্জন করেন নাই।

কাঠিয়াবাবাজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও মানস-সন্তান ছিলেন সন্তদাস মহারাজ। এই শিষ্যের জীবনেও মহাকারুণিক গুরুর অজস্র করুণা ধারা বর্ষিত হয়, অলৌকিক যোগবিভূতির বহুতর লীলা নানাক্ষেত্রে নানারূপে প্রকটিত হইয়া উঠে।

সন্তদাস মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। কলিকাতা হাইকোর্টের তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। আধ্যাত্মিক জীবনের পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনে এক সময়ে উদগ্র হইয়া উঠে, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি কাঠিয়াবাবাজীর চরণে আশ্রয় নিয়া ধন্য হন।

তারাকিশোরবাবু তখনও কলিকাতার আইন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত। ইতিমধ্যে শুধু দুই একবার বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, দীক্ষা গ্রহণ তখনো হয় নাই।

মহাপুরুষ তাঁহাকে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে ধ্যান করিতে বলেন। কিন্তু পূর্ব অভ্যাস-বশত সে সময়ে তারাকিশোরবাবুর পক্ষে জাগিয়া উঠা বড় কঠিন হয়। একদিন ঘরের ভিতর জানালার ধারে মশারি টাঙাইয়া তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন। শেষরাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া উচ্চ স্বরে বলিতেছেন, "ওরে ওঠ্, ওঠ্।"। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীরের উপর একটি ইষ্টকখণ্ড পতিত হইল।

তারাকিশোরবাবু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। শয্যা হইতে ঢিলটি কুড়াইয়া নিবার পর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মশারির কোথাও কোনো ফাঁক নাই, অথচ এই ইষ্টকখণ্ড কোথা হইতে উহার ভিতর দিয়া গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলেন না। নির্দেশিত সময়ে ভক্ত তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে না—অতন্দ্রদৃষ্টি, সমর্থ যোগিপুরুষ কি সেইজন্যই তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন?

এ ঘটনার পর হইতে রাত্রির শেষ যামে জাগিয়া সাধন-ভজন করিতে তারাকিশোর-বাবুর আর ভুল হয় নাই।

বাবাজী মহারাজের করুণাধারা এই মুমুক্ষু সাধকের উপর নানা লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। সন্তদাসজী স্বরচিত গুরুর চরিতে এ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—"এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষরাত্রে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।"

কলিকাতায় থাকিতে তারাকিশোরবাবু একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর কমিবার তো কোনো লক্ষণই নাই, বরং তাহা কেবল বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার এক অদ্ভুত খেয়াল হইল। তিনি ভাবিলেন, 'বাবাজী মহারাজ তো সর্বদাই গাঁজা সেবন করেন, আর তাতেই তিনি পরম প্রীত হন। তবে তাঁকে গাঁজই ভোগ দিই না কেন? তারপর তাঁর সেই প্রসাদী ছিলিম পান করলে নিশ্চয়ই এই জ্বর নিবারণ হবে।'

অতঃপর বাজার হইতে নূতন কল্কে ও গাঁজা আনিয়া ছিলিম সাজিয়া তাহা নিবেদন করা হইল।

কি জানি কেন, ঐ গাঁজার ছিলিমটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তারাকিশোরবাবুর মনে হইল, গুরুজী উহা পান করিতেছেন। কল্কে হইতে তখন সত্যই বেশ ধূম নির্গত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি ঐ প্রসাদী গাঁজা নিজে পান করিলেন। বিস্ময়ের কথা, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরের কথা। তারাকিশোর বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়া বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন বাবাজী মহারাজ কয়েকটি ব্রজবাসীর সহিত বসিয়া সানন্দে গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন। কিছুকাল পরে তিনি অপর প্রকোষ্ঠ হইতে তারাকিশোরবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন, কহিলেন, "কই হে এসো, এবার তুমি এ প্রসাদী ছিলিম নিয়ে পান ক'রে ফেল।"

একজন ব্রজবাসী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজীও কি গঞ্জিকায় অভ্যস্ত? কাঠিয়াবাবাজী চতুর হাসি হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "না, বাবাজী গাঁজা বড় একটা খায় না, তবে জ্বরে আক্রান্ত হলে কখনো কখনো বাবা মহারাজকে স্মরণ ক'রে গাঁজার ভোগ দেয়, তারপর অবশ্য সেই প্রসাদটুকু ভক্তিভরে গ্রহণ ক'রে থাকে।"

তারাকিশোরবাবু উপলব্ধি করিলেন, সর্বজ্ঞ গুরুদেবের নিকট তাহার কোনো কিছুই অবিদিত থাকে না। তাছাড়া ইহাও বুঝিলেন, কলিকাতায় জ্বরভোগের সময় যে গঞ্জিকা ভোগ তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন বাবাজী তাহা সত্যসত্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রয়দানের পর সদ্গুরুকে শিষ্যের অনেক ভারই বহন করিতে হয়—কাঠিয়াবাবা মহারাজের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একবার তারাকিশোরবাবু কর্মোপলক্ষে শহরের বাহিরে গিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহাদের পাড়ায় সে সময়ে চোরের বড় উপদ্রব। গৃহে এ সময়ে লোকজন মোটেই নাই। তাই তাঁহার স্ত্রী রাত্রিবেলায় বড় ভয়ে ভয়ে থাকিতেন।

তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের কাল। কিন্তু এত গরমেও তারাকিশোরবাবুর স্ত্রী সাহস করিয়া রাত্রিতে দরজা-জানালা খুলিতে পারেন না। একদিন রাত্রিতে গরমে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ঘরের একটি জানালা খুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বাতায়নের অদূরে বাবাজী মহারাজ সহাস্যে দণ্ডায়মান।

মধুর কণ্ঠে বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "মাঈ, তোমার এত ভয় কেন, বল তো? আমি তো সদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছি।"

পরক্ষণেই দিব্যমূর্তিটি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আপাতকঠোর ও রহস্যময় কাঠিয়াবাবা মহারাজের বহিরঙ্গ আচরণ ছিল বড় দুরবগাহ। আগন্তুক ও স্বল্প পরিচিত লোকের পক্ষে তাহার প্রকৃত রূপ অবগত হওয়া বড় সহজ ছিল না। করুণাপরবশ হইয়া বাবাজী মহারাজ যখন নিজের রহস্যাবরণ উন্মোচন করিতেন, তখনই শুধু তাহা সাধারণের বোধগম্য হইত।

কাঠিয়াবাবাজীর বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীরাধাবিহারীজীর প্রতিষ্ঠার সময়ে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। বহু লোক সেদিন এ উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ প্রাপ্ত হয় এবং তারপর প্রচুর

লাড্ডু ও কচুরী ভাণ্ডারে জমা থাকে। বাত্রিতে হঠাৎ আবও বহুসংখ্যক সাধু আসিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে আহারার্থ সমবেত হয়। কিন্তু বাবাজী মহারাজ উহাদের দেখিয়াই কেন যেন উগ্রমূর্তি ধারণ করেন। নির্মমভাবে তিরস্কার করিয়া এই আগন্তুকদের তিনি সেদিন বিতাড়িত করিলেন।

কাঠিয়াবাবাজীর অন্যতম শিষ্য, অভয়চরণ রায় সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অভ্যাগত সাধুদের প্রতি বাবাজী মহারাজের এরূপ ব্যবহার তাঁহার চোখে বড় অযৌক্তিক ও রূঢ় ঠেকিল। মনে মনে ভাবিলেন, 'গুরু মহারাজের এ আচরণ মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়, বিসদৃশও বটে। ভাণ্ডারে তো বহু খাদ্যই বেশী হইয়াছে, তবে এ সাধুদের কিছু কিছু বিতরণ করিতে বাধা কোথায়?"

অন্তর্যামী বাবাজী মহারাজ শিষ্যের অন্তরের চিন্তাধারা সবই জানিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে এ সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই।

দিনান্তের কার্যশেষে অভয়বাবুকে তিনি নিজের ধুনির পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। গঞ্জিকার কল্‌কেটিতে টান মারিয়া ধীরে ধীরে স্নেহপূর্ণস্বরে এই প্রবীণ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, অভয়, তুমি ভাবছো—এ সাধুদের আমি খাবার না দিয়ে কেন তাড়িয়ে দিয়েছি। বাবা, তুমি নিতান্ত বালক, একেবারে জ্ঞানহীন। কিছু বোঝবার মতো সামর্থ্য তোমার এখনও হয় নি। তুমি জানো না, ওরা কেউ সত্যিকারের সাধু নয়, সাধুবেশধারী মাত্র। ক্ষুধার্তও ওরা নয়, ভোজন ওদের আগেই হয়েছে—এখানে এসেছিল শুধু সঞ্চয়ের জন্য। আর এজন্য তুমি মোটেই খেদ ক'রো না। যথার্থ ক্ষুধার্ত সাধুরা একটু বাদেই আশ্রমে এসে পৌঁছাবে— খুব তৃপ্ত ক'রে তাদের ভোজন করাও।"

সত্যই তাহা ঘটিল। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে একদল সাধু দর্শন দিলেন। অভয়বাবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইহারা নিষ্কিঞ্চন এবং সাধননিষ্ঠ সাধু, আর সত্যসত্যই ক্ষুধার্ত।

এক দরিদ্র ও অসহায় ব্রাহ্মণকে কাঠিয়াবাবাজী আশ্রমের আশ্রয় দান করেন। লোকটি দুরন্ত হাঁপানি রোগে ভোগে, প্রায়ই তাহাকে এজন্য কষ্ট পাইতে হয়। এই ব্যাধির তাড়নায় বিব্রত থাকিয়াও সে আশ্রমের বহু কার্য সম্পন্ন করে।

একদিন ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে, ধুনির সম্মুখে বসিয়া কেবলই ধুঁকিতে থাকে। বাবাজী মহারাজ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'কেন তুই শুধু শুধু এখানে পড়ে আছিস্। পেটের জন্য যারা বৈরাগী তাদের স্থান এখানে নেই। কোন কাজ না ক'রে, বসে বসে শুধু সাধুর অন্ন ধ্বংস করিস, এতে কি তোর লজ্জা হয় না? যা, এখনই তুই আশ্রম থেকে বেরিয়ে যা।"

পূর্বোক্ত অভয়চরণ এবং তারাকিশোর তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত। উভয়েই এ আচরণ দেখিয়া বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অভয়বাবুর চোখে মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণটি এযাবৎকাল সাধ্যমতো আশ্রমের সেবা করিয়াছে। এখন সে রোগে-

পঙ্গু ও ভগ্নস্বাস্থ্য। এ অবস্থায় সত্যই আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিলে তাহার কি উপায় হইবে? অভয়বাবুর কাছে এটি নিতান্তই হৃদয়হীনের কাজ বলিয়া মনে হইল।

কক্ষান্তরে গিয়া তিনি নিঃশব্দে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। এমন সময় কাঠিয়াবাবা মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সস্নেহে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "অভয়রাম, তুমি নিতান্তই বালক। আসল ব্যাপার যে কি, তাহা তুমি কি ক'রে বুঝবে? আমার আজকের এ নিষ্ঠুর আচরণের গূঢ় অর্থ রয়েছে। ব্রাহ্মণটি বড় সজ্জন, সাধনারও সে একজন প্রকৃত অধিকারী। আগে বড় বেশী দুঃখ দুর্দশায় ছিল, সব সময়ে অন্নাভাবে বিব্রত থাকায় ভগবানের নাম রীতিমতো করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। আমি তাই তার অধ্যাত্মপথের বাধাটি সরিয়ে দিয়েছিলাম—আশ্রমের আশ্রয় পেয়ে তার ভজনের সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু দেখছি, অতি সহজে ভোজন পাবার পর প্রকৃত যে কাজ সেই ভজনকেই সে ভুলে গিয়েছে। এসময়ে আশ্রমে বাস করলে তার ভজনকার্যে বিঘ্ন ঘটবে, অধ্যাত্ম-জীবনের খুবই ক্ষতি হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হলেই সে প্রকৃত কল্যাণকে এবার খুঁজে পাবে, নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে আবার কাতর হয়ে সে ভগবানকে ডাকবে। ভজনসাধন ঠিক চলতে থাকলে তবে তো তার মুক্তি আসবে? তুমি বালক, এত কথা কি ক'রে বুঝবে? প্রকৃত কল্যাণের যে পথ, তা তো তোমার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।"

কথাগুলি শুনামাত্রই অভয়বাবুর ভ্রম দূর হইল, তিনি বড় লজ্জিতও হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার সীমিত দৃষ্টি দ্বারা লোকোত্তর মহাপুরুষের আচরণকে বিচার করিতে গিয়া ধৃষ্টতারই পরিচয় তিনি দিয়াছেন।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত কল্যাণ বলিতে কাঠিয়াবাবা বুঝিতেন—মোহবন্ধন হইতে মুক্তি ও ভগবান্ লাভ। তাই শিষ্যদের অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ ও পরিণতির দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন সদা সতর্ক দৃষ্টি। জৈব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্তি, জাগতিক জীবনের সুখসম্পদ, এসব ছিল এই মহাজ্ঞানী পুরুষের কাছে একেবারে অর্থহীন। কোনো মানুষের জীবনে ভগবৎ-দর্শন না ঘটিলে উহাকে তিনি 'বন্ধ্যা'-জীবনের মতোই নিষ্ফল বলিয়া গণ্য করিতেন।

বাবাজী মহারাজ একদিন শিষ্যগণসহ আশ্রমে বসিয়া রহিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "পরোপকারকে ওয়াস্তে সন্তন্ ধরে শরীর।"

এ কথার তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া এক প্রতিবেশী প্রাচীন সাধু, কল্যাণদাসজীর কথা উঠিল। কেমারবনের দাবানলকুণ্ডের নিকটস্থ এক আশ্রমের ইনি মোহান্ত। অভ্যাগত সাধু-সন্ত ইহার নিকট সর্বদা আশ্রয় পায়। তাছাড়া, পরোপকারী ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিও যথেষ্ট রহিয়াছে।

কাঠিয়াবাবাজী কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া কহিলেন, "সাধুদের অনুষ্ঠের যে প্রকৃত উপকার তা কিন্তু মোটেই এ শ্রেণীর নয়। এ তো নিতান্ত সামান্য বস্তু। এ উপকার পেয়ে উপকৃত ব্যক্তির কল্যাণ যা হয়, তা খুবই তুচ্ছ। কারণ, পারমার্থিক সম্পদ

তো এর ভেতর দিয়ে কখনো আসে না। তাছাড়া, উপকারী ব্যক্তি বা দানব্রতী কর্মকর্তাকে এজন্য আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। পরজন্মে তাঁর বিষয়বৈভব, মানসম্মান প্রভৃতি হয়তো অনেক কিছু হয়। প্রকৃত মহাত্মারা কিন্তু এ শ্রেণীর হিতকর্মে কখনো লিপ্ত হন না, তাঁরা বরং জীবের দুঃখতাপের মূলকে বিনাশ করেন—আর এ ধরনের উপকার নিয়ে আসে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। এজন্যই এসব মহাত্মাদের কর্মপ্রণালী ও তার মর্ম পৃথিবীর সাধারণ লোক সহজে বুঝে উঠতে পারে না।"

অভয়চরণ রায় মহাশয় বাবাজী মহারাজের অন্যতম শিষ্য। শেয়ার বাজারে ও ব্যবসায়ে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এক সময়ে তিনি খুব মুষড়াইয়া পড়েন। এই দুরবস্থার সময় নিতান্ত অযাচিতভাবে কাঠিয়াবাবাজীর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার পর কিছুকালের জন্য তিনি অযোধ্যায় বাস করিতে থাকেন। আর্থিক বিপর্যয় ও উত্তমর্ণদের আতঙ্কে এ সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে ম্রিয়মাণ দেখা যাইত।

এক রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া অভয়বাবু সখেদে নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, 'ভগবানকে অন্তরের বহু মিনতি জানালাম, কিন্তু তিনি তো এসে দেখা দিলেন না, আমার দুঃখমোচনও করলেন না। তাহলে কি তিনি নেই? সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প স্থির করিলেন, পরদিন সরযূর সেতু হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া চিরতরে সমস্ত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটাবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। কাঠিয়াবাবা মহারাজ অকস্মাৎ তাঁহার সেই কক্ষে সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। বাবাজী মহারাজ ধীরে ধীরে তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে অভয়বাবুকে কহিতে লাগিলেন, "অভয়রাম, তুমি এমনি শুয়ে শুয়ে কাল কাটাবে ও খেদোক্তি করতে থাকবে, আর শ্রীভগবান্ তোমাকে দর্শন দেবেন—না? আমি তো তোমায় ইষ্টনাম বলেই দিয়েছি। সে নাম তুমি করছো না কেন? ভগবান্ হচ্ছেন দুর্লভ বস্তু, পরম ধন—তাঁকে কি অমনি পাওয়া যায়।"

অভয়বাবু ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া তখনই গুরুদত্ত নাম জপ করিতে লাগিলেন। এক অপূর্ব দিব্য আনন্দের জ্যোতি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে তাঁহার সব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে আর তৎস্থলে উদ্ভূত হইয়াছে এক অপূর্ব মানসিক প্রশান্তি।

কিছুদিন পরের কথা। অভয়চরণ অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিয়াছেন। কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহাকে দেখা মাত্রই বলিয়া উঠিলেন, "কি হে অভয়রাম, ভগবান্ আছেন—এ বিশ্বাস এখন কতকটা হয়েছে তো? বাবা, তোমার কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। তুমি আপন ঘরে গিয়ে বাস করো, নাম জপ ক'রে যাও, তোমার পাওনাদারেরা অসদ্ব্যবহার করবে না।'

কলিকাতায় ফিরিয়া অভয়বাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন। উত্তমর্ণগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উদারতা ও সহানুভূতিই প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর গৃহে বসিয়া তিনি সাধনায় রত হইলেন।

কাঠিয়াবাবা মহারাজ অভয়বাবুকে এ সময়ে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করেন। মথুর

হাসি ছড়াইয়া, অঙ্গুলি সংকেতে একটি জটাজুট সমন্বিত সাধুর আলেখ্য তাঁহাকে প্রদর্শন করান, আর এই সঙ্গে বিশেষভাবে বলিয়া দেন, "ইনি এক মহাত্মা। এঁর সঙ্গে তুমি মাঝে মাঝে বাস করতে পার, তোমার তাতে যথেষ্ট কল্যাণ হবে।"

কিছুকাল পরে অভয়চরণ রায় বৃন্দাবনধামে আসেন এবং একদিন ঘটনাচক্রে কোনো ভক্তের কুঞ্জে উপনীত হন। এইস্থানে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের সহিত হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রভুপাদকে দেখিয়াই অভয়বাবু চিনলেন, এ মহাত্মার মূর্তিই কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করাইয়াছেন।

অতঃপর কাঠিয়াবাবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মহাপুরুষ চকিতে বলিয়া উঠিলেন, "অভয়রাম, স্বপ্নে তোমায় আমি ঠিকই দেখা দিয়েছিলাম। আজ বোধহয় তার যথার্থতা বেশ বুঝতে পেরেছো। আমার নির্দেশিত সে মহাত্মার সাথেও তোমার দেখা হয়েছে। ওর সঙ্গ তুমি ক'রে যাবে। সাচ্চা সাধু যাকে বলা হয় উনি তাই। আচ্ছা চল, আজ এখনি তোমার সাথে গিয়ে আমিও তাঁর সাথে আলাপ ক'রে আসি।"

বাবাজী মহারাজ তখনি শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই দিন কিন্তু কাঠিয়াবাবাজীর আচরণ ও চালচলন দেখিয়া অভয়বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে প্রভুপাদের সঙ্গে অলৌকিক ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া মিলন ঘটাইয়া দিলেন তাঁহার সঙ্গে যেন কোনো পরিচয়ই নাই, অপরিচিত ব্যক্তির মতোই কথা কহিতেছেন। কোথায় তাঁহার পূর্বাশ্রমের দেশ, বৃন্দাবনে আগমন কেন, কি করিয়া ভিক্ষা নির্বাহ হইতেছে, গোস্বামীজীকে এসব প্রশ্নই তিনি করিতে লাগিলেন।

কাঠিয়াবাবা চলিয়া গেলে গোস্বামীজী নিজ পরিকরদের সেদিন বলিয়াছিলেন, "দ্যাখো, যে মহাপুরুষ আজ এখানে কৃপা ক'রে এসেছিলেন, তিনি সত্যই অসামান্য। গর্গ ও নারদ শ্রেণীর ব্রহ্মবিদ্ ইনি।"

স্বেচ্ছামতো, অলৌকিকভাবে দর্শনাদি দিয়া কাঠিয়াবাবা মহারাজ সাধনার উপযুক্ত অধিকারীদের অনেক সময় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। এ সম্পর্কে প্রচলিত নানা কাহিনীর মধ্যে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত ঘটনাটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। বিজয়বাবু তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের (সন্তদাস মহারাজ) এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অধ্যাত্ম সাধনার দিক দিয়া তখন খুব উন্নত।

একদিন তিনি কলিকাতায় তারাকিশোরবাবুর গৃহে গিয়াছেন। বৈঠকখানায় ঢুকিয়াই তো তিনি অবাক্। দেয়ালে এক সাধুর ছবি। তিনি ব্যগ্রভাবে এ সাধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানা গেল, ইনি তারাকিশোরবাবুর গুরুদেব, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ মোহান্ত—রামদাস কাঠিয়াবাবা।

বিজয়বাবু অতঃপর এ মহাত্মা সম্পর্কে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাহাতে কক্ষস্থিত ব্যক্তিদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি কহিলেন, "আমি সম্প্রতি স্বাস্থ্যলাভের জন্য সাঁওতাল পরগনায় গিয়েছিলাম। যেখানে আমি থাকতাম তার নিকটে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় আমি এঁকে দর্শন ক'রে এসেছি। পুরো তিন দিন তিনি ঐ

গাছতলায় ধ্বনি জ্বালিযে আসন ক'বে বসেছিলেন। আমি বোজই চবণতলে গিযে বসতাম, আব আমায় কত স্নেহ, কত আদব-যত্ন কবতেন।"

স্থূলদেহটি নিয়া কাঠিয়াবাবা কিন্তু তখন বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন কবেন নাই। তাবাকিশোববাবু যতই বলেন,—বাবাজী মহাবাজেব পক্ষে এ সমযে সাঁওতাল পবগনায় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা—বিজযবাবু ততই জোর দিয়া বলিতে থাকেন, এই মহাপুরুষকে তিনি তিন দিবস ব্যাপিযা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখিয়া আসিয়াছেন, এ বিষযে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পবে বৃন্দাবনে আসিয়া তাবাকিশোববাবু কাঠিযাবাবাজীকে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন কবেন। বাবাজী মহাবাজ স্মিতহাস্যে উত্তব দেন, বাবা, আমি এখানে অবস্থান করলেও অনেক সময় অন্য স্থানে বহুলোক আমাব এ মূর্তিকে দর্শন ক'বে থাকে। এ বহস্য এখন তুমি বুঝবে না, পবে বুঝতে পাববে।"

ভক্ত ও আর্তজনেরা কাঠিযাবাবাকে দেখিত এক করুণাঘন মহাপুরুষরূপে। আবাব স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বিপবীত মূর্তিব প্রকাশও তাঁহাব মধ্যে দেখা যাইত। সন্তদাস মহাবাজ এ সম্পর্কিত ঘটনাব বর্ণনা তাঁহাব লিখিত জীবনচবিতে দিযাছেন

বাবাজী একদিন শিষ্য পবিবৃত হইযা আশ্রমে বসিয়া আছেন। এমন সমযে শ্রীহট্টেব এক বিশিষ্ট আইন ব্যবসাযী সেখানে আসিযা উপস্থিত। মহাপুরুষ সে সময়ে এক অদ্ভুত অভিনয় শুরু কবিযা দিলেন। তিনি যেন এক আকস্মিক ব্যাধিতে তখন আক্রান্ত—দৈহিক যন্ত্রণায় অস্থিব হইযা বার বাব কেবল কাতবোক্তি কবিতেছেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি এ দৃশ্য দেখিযা বড ঘাবড়াইযা গেলেন। চাঞ্চল্য ও বেদনার্ত চিৎকাবেব মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া তিনি কিছুক্ষণেব মধ্যে স্থান ত্যাগ কবেন। বাবাজী মহাবাজকে প্রণাম করাব কথাও তিনি বিস্মৃত হন।

ভদ্রলোকটিব বিদায গ্রহণেব সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কাঠিযাবাবাব কাতবোক্তি ও আর্তনাদ কোথায অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রিয় ভক্তদেব সহিত আবাব তিনি পূর্ববৎ নানা হাসি-ঠাট্টা ও রঙ্গবস কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্তদাসজীব বুঝিতে বাকী বহিল না আগন্তুক বড় হতভাগ্য—বাবাজী মহারাজের চবণ বন্দনা কবিবাব অধিকাবটুকুও সে লাভ কবিতে পাবিল না। মহাপুরুষ তাহাকে সেদিন ছলনা কবিয়াই বিদায় দিলেন।

বাহ্য আচবণ দেখিযা এই বিবাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে বুঝিবাব উপায কাহাবো ছিল না। লোকচক্ষুব অন্তবালে, লোকোত্তব মহাজীবনেব নিগূঢ লোকেই তিনি আত্মগোপন কবিযা থাকিতেন। শুধু বিশেষ বিশেষ করুণাব ক্ষেত্রে দেখা যাইত, তাঁহাব অলৌকিক যোগৈশ্বর্য মুহূর্তমধ্যে ঝলকিযা উঠিযাছে। বিস্মযে ও সম্ভ্রমে আশেপাশেব ভক্ত ও সাধারণ মানুষ তখন এ বিবাট পুরুষেব চবণতলে লুটাইযা পডিত।

এই শক্তিধব মহাপুরুষেব জীবনে সাধাবণ ও অসাধারণ—লৌকিক ও অলৌকিক এই দ্বৈতসত্তাব এক অপরূপ মিলন সাধিত হইতে দেখি। বহির্জগতেব প্রযোজন ও পরিবেশ অনুযায়ী সহজ সাধাবণ আচবণই তিনি কবিতেন। সেই সঙ্গে আপন সাধনসত্তার

গভীরে লুক্কায়িত রাখিতেন অপরিমেয় শক্তির উৎস, প্রচ্ছন্ন রাখিতেন দ্বন্দ্বাতীত চৈতন্য-লোকের অখণ্ড বোধ।

আপন জীবনের দ্বৈতসত্তার এক চমৎকার ব্যাখ্যা কাঠিয়াবাবাজী শিষ্য সন্তদাস মহারাজের নিকট বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "বাবা, হাতীকা দো দাঁত রহতা হ্যায়—এক বাহারমে দেখানেকে লিয়ে, দুসরা ভিতরমে খানেকে লিয়ে। ভিতরকা দাঁত দুসরা আদমীকো মালুম নহীঁ পড়তা হ্যায়। সন্তকো ইসী তরহ্ দো বৃত্তি রহতী হ্যায়—এক বাহার দেখানেকে, দুসরা আপনা ভিতরমে, উসকা খবর কভী কিসিকো নহীঁ মিলতা হ্যায়।" অর্থাৎ—বাবা, হাতীর দুইটি দাঁত রয়েছে—একটি বাইরের লোককে দেখাবার, আর একটি ভেতরের, যা দিয়ে সে তার খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খায়। ঐ ভেতরের দাঁত কিন্তু বাইরের অন্য কোনো লোকেরই চোখে পড়ে না। প্রকৃত সমর্থ সাধুদেরও এমন দুইটি বৃত্তি থাকে। একটি বাহ্য—বাইরের মানুষকে দেখাবার জন্য দ্বিতীয়টি তাঁর অন্তরস্থ নিগূঢ় সত্তা। এই দ্বিতীয়টির সংবাদ বহিরঙ্গ লোকের অনেকের ভাগ্যেই মিলে না।

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ আচরণের এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই বাবাজীর লীলা চাতুর্যের প্রকাশ দেখা যাইত।

কাঠিয়াবাবাজীর খ্যাতি শুনিয়া বাহির হইতে অনেকে ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। কিন্তু কেমারবনের আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

বাবাজী মহারাজের মধ্যে সমাধিবান্ মহাসাধকের লক্ষণ সহসা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। প্রশান্ত গম্ভীর মহাযোগীর দিব্য মহিমার যে কথা শুনা যায়, তাহা চোখে পড়ে কই? নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই নিজে তিনি দৈনিক বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। শাক-তরকারি কিনিতে গিয়া দর কষাকষিতে প্রকাশ পায় তাঁহার প্রবল উৎসাহ। আবার আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অপরে কখনো কিনিয়া আনিলে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া পাকা বৈষয়িক গৃহস্থের মতো তাহার হিসাব গ্রহণ করেন, এক পয়সা চুরি বা অপচয় যেন না হয়। এমনি তাঁহার সতর্কতা।

সেবাকুঞ্জের সম্মুখে গঞ্জিকা-চক্রের মধ্যমণিরূপে বাবাজী রাস্তায় উপবিষ্ট থাকেন। হঠাৎ দেখিয়া কে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে? কে সত্য সত্যই ধারণা করিতে পারিবে যে, ইনিই অধ্যাত্ম-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, অসামান্য যোগ-বিভূতির অধিকারী ১০৮ স্বামী শ্রীকাঠিয়াবাবা।

পথের পার্শ্বে, বৃক্ষের ছায়ায় বাবাজী মহারাজ উপর্যুপরি গাঁজা চরস পান করিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ভবঘুরে চোর-বদমায়েসও যে দুই চারিজন নাই তাহাও নয়। তীর্থযাত্রীর দল এ গঞ্জিকাসেবীদের সমীপস্থ হইলে দুই-একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে কাঠিয়াবাবাকে দেখাইয়া দেয়। বার বার তাহারা হাঁকিয়া বলিতে থাকে, "আরে দেখো দেখো, ইয়ে দুধাহারী বাবা হ্যায়। খালি দুধ পীকর্ রহতে হেঁ। ইনকো কুছ প্রণামী তো চড়হাও।"—অর্থাৎ দেখ দেখ ভাইসব, ইনি—

দুধাহারীবাবা। কেবল দুধ পান করেই জীবন ধারণ করেন। এঁর জন্য তোমরা কিছু কিছু প্রণামী দাও।

প্রণামীর টাকায় গাঁজা-চরসের ব্যয় সংকুলানটা অন্তত হইবে, এই জন্যই হয়তো বাবার প্রণামী সংগ্রহের জন্য সঙ্গীদের এমন আগ্রহ। বাবা মহারাজও তেমনি এই বিচিত্র অভিনয়ের সম্মুখে নিঃশব্দে বসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিতেছেন। ভাবখানা এই—তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীদের গাঁজার আসরের খরচটা যদি কিছু জুটিয়াই যায়, আপত্তি কি? তাছাড়া, কিছু অর্থ আশ্রমের খরচের জন্য পাওয়া গেলেও মন্দ কথা নয়। তীর্থকামী গৃহস্থেরা সাধুদের জন্য দু-একটা টাকা খরচ করুক না কেন, তাতে তাহাদের কল্যাণই হইবে।

এরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে উদবৃত্ত যাহা কিছু থাকে কাঠিয়াবাবা মহারাজ সতর্কতার সহিত কোমরে বাঁধিয়া আশ্রমে নিয়া আসেন। এ অর্থের নিরাপত্তার জন্যও তিনি যেন সর্বদাই মহা উৎকণ্ঠিত। আশ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, এই যত্নরক্ষিত পয়সাকড়ি তাঁহারা কোনোমতে স্পর্শ করে।

সায়ংসন্ধ্যার পরে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া বাবাজী মহারাজ যে সব কথাবার্তা সাধারণত বলেন, তাহাও বড় বিভ্রান্তিকর। কোনো ধর্মালোচনা বা তত্ত্বোপদেশ তাহাতে নাই। ভগবৎ প্রসঙ্গের স্থলে প্রায়ই আলোচিত হয় অতি সাধারণ বৈষয়িক কথা। স্থানীয় বাজারে খাবারের দাম কেন চড়িতেছে, গাঁজার সরবরাহ শীঘ্র বাড়িবে কিনা, ইত্যাদি কথায়ই বেশী সময় কাটিয়া যায়।

কোন্ রাজা বা লক্ষপতি শেঠ বৃন্দাবনে আসিয়া বাবাজীকে প্রণামী দিয়া গিয়াছে, ইহা নিয়াও তাঁহার যেন গৌরব প্রকাশের অন্ত নাই। কোথাকার এক দানশীল মহারাজা বৃন্দাবনে আসিতেছেন, আশ্রমের জন্য প্রত্যহ নিশ্চয় তিনি পাঁচ মূর্তির খোরাক পাঠাইয়া দিবেন, এ আশার কথা বাবাজী বার বার সবাইকে জানাইতে থাকেন, যেন এই দানের উপর তিনি কত নির্ভর করিয়া আছেন।

কোন শেঠ কত টাকার ভাণ্ডারা দিবে, ধূমধাম করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহা নিয়াও বিতর্কে মাতিয়া উঠেন, প্রবল উৎসাহ দেখান। যাহারা আশ্রমে আসিয়া প্রণামীর টাকা বেশী দেয়, তাহাদের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ। বাহ্য আচরণ দেখিয়া মনে হয়, বাবাজী নিতান্তই এক অর্থলুব্ধ সাধু, গ্রাম্য পাকা বিষয়ীর মনোবৃত্তি নিয়াই এই ক্ষুদ্র আশ্রমটির পরিচালনা করিতেছেন।

অথচ ধনাঢ্য শেঠ ও রাজরাজড়াদের সম্মুখীন হইবার প্রস্তাব শুনিলেই বাবাজী মহারাজের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। কেহ আসিয়া হয়তো জানায়, বৃন্দাবন-ধামে এক দানশীল মহারাজা আসিয়াছেন। শহরের প্রসিদ্ধ মন্দির ও সাধুসন্তদের তিনি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন—অবশ্যই তিনি বাবাজীর জন্যও ভেট ও পূজা নিয়া শীঘ্র এদিকে আসিবেন।

কথাটি শুনামাত্র ফুটিয়া উঠে বাবাজীর আর এক রূপ, ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। নবাগত মহারাজের সঙ্গে যেন দীর্ঘ দিনের শত্রুতা রহিয়াছে, এমনই তাঁহার

মনোভঙ্গী। সরবে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি কহিতে থাকেন, "শালা ইঁহা আয়েগা তো এক চিমটা লাগা দেঙ্গে। হ্যাম্ ক্যা উস্‌কো মর্যাদা করেঙ্গে? হামরা সাথ উস্‌কো ক্যা মতলব? চলা যা যমালোকমে। হামারা পিছে উহ্ কেঁও পড়তা হ্যায়?" অর্থাৎ—সে শালা এখানে এলে, এক চিমটার বাড়ি মেরে দেব। আমি কেন তার সম্মান ও অভ্যর্থনা করতে যাবো? মরুকগে সে ব্যাটা,—আমার পিছনে ঘুরবার তার কি দরকার?

উষ্মা শুধু এখানেই শেষ হয় না, আরও যে সব অশ্লীল ভাষা বাবাজী এই অচেনা অতিথিদের প্রতি প্রয়োগ করেন, তাহা শুনিলে অনেকেই কানে আঙুল দিবে।

তীর্থ দর্শনকালে বৃন্দাবনে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ একদিন কেমারবন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, ভারত-বিখ্যাত ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ কাঠিয়াবাবাজীর চরণ দর্শন।

কিন্তু আশ্রমে সর্বসমক্ষে সেদিন এক শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা হইল। এই সম্মানীয় অতিথিকে সামান্যতম সৌজন্য ও কৃপা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে অকারণে নানা প্রকার গালাগালি দিয়া দূর করিয়া দিলেন। নিজের অমাত্য ও সঙ্গীদের সামনে এই অপ্রত্যাশিত অপমানে মহারাজা সেদিন একেবারে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন।

রাজ-অতিথির কোন্ ত্রুটি বা ভুল সেদিন অন্তর্যামী কাঠিয়াবাবাকে এমন রূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা কে বলিবে?

আশ্রমের শ্রীবিগ্রহ ও কাঠিয়াবাবাজীর উদ্দেশে ভক্তেরা নানা দ্রব্যাদি উপস্থিত করিত। ভেটের এ সমস্ত বস্তুতে যাহাতে আশ্রমবাসী ভক্ত শিষ্যদের ভোগলিপ্সা না জন্মায় সেদিকে বাবাজীর সতর্কতার অন্ত ছিল না। এক শ্রেণীর মোহান্তের ধারণা, তাঁহাদের স্থাপিত বিগ্রহ ও আশ্রমের জন্য ভোগ্যবস্তুর যোগান দেওয়া গৃহস্থ ভক্তদের এক বড় কর্তব্য। বাবাজী কিন্তু এ মনোভাবকে বড় নিন্দনীয় মনে করিতেন। গৃহস্থদের প্রদত্ত বস্তুর প্রতি আশ্রমিকেরা যাহাতে প্রলুব্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থাও তাঁহাকে কঠোরভাবে, সতর্কতার সহিত করিতে দেখা যাইত। অধ্যাত্মসাধনার ব্যাপারে ভগবৎ-নিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতার উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।

দূরে অবস্থিত ভক্তেরা ভেট হিসাবে আশ্রমে কাপড় চাদর ইত্যাদি পাঠাইত। বাবাজী এগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতেন। দয়া করিয়া কখনো কখনো গৃহস্থ শিষ্যদের ইহার দুই একখণ্ড দান করিলেও আশ্রমবাসী সাধুদের অদৃষ্টে কোনো কালেই কিছু জুটিবার উপায় ছিল না। একান্ত প্রয়োজনের সময় বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়ও তিনি তাহাদের ইহা দিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত, সঞ্চিত বস্ত্রাদি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে কীটদষ্ট হইয়া একেবারে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, তরুণ শিষ্যদের ভোগেচ্ছা দমনের জন্যই বাবাজী মহারাজের এই ব্যবস্থা। এজন্য অনেকের নিন্দা সমালোচনা তাহাকে সহ্য করিতে হইত।

শেষ রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া সাধন-ভজন ও আশ্রম-কর্ম করা সাধু ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য। তাহাদের এ কাজকে সহজতর করিয়া তুলিতে বাবাজীর ছল-কল ও কৌশলের

অন্ত ছিল না। অনেক সময় অযথা হৈ চৈ তুলিয়া দিয়া বলিতেন, "বাত্রে আজকাল চোরের বড় আনাগোনা, সতর্ক হয়ে সবাই সারারাত জেগে থাকো।"

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই বাবাজী মহারাজ সকলকে আশ্রমকার্যে লাগাইয়া দিতেন। এজন্য ছল করিয়া শেষ রাত্রিতে তিনি নিজের আহারের প্রথাও প্রবর্তন করেন। তাই বাধ্য হইয়াই সকলে সে সময়ে ঠাকুরসেবা ও ভোগরাগের বন্দোবস্তের জন্য তৎপর হইত। নিদ্রা সারা দিনে দুই-তিন ঘণ্টা, আর অন্নাহার দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার, ইহাই ছিল শিষ্যদের উপর বাবাজী মহারাজের নির্দেশ। লঘু ও অনলস দেহ নিয়া সাধনার অগ্রসর হওয়ার উপরই তিনি অত্যধিক জোর দিতেন। অধ্যাত্মজীবনের শুদ্ধতা ও শুচিতা সম্পাদনেও তাহার সতর্কতার অন্ত ছিল না। সিদ্ধিকামী প্রকৃত সাধকদের কৃচ্ছ্র ও ত্যাগ তিতিক্ষার দহনে পরিশুদ্ধ করিয়া নেওয়াই ছিল তাঁহার মূল নীতি।

কাঠিয়াবাবা ভারতবিশ্রুত মহাপুরুষরূপে কীর্তিত, কিন্তু তাঁহার আশ্রমটি নিতান্ত সাধারণ ও ক্ষুদ্রায়তন। উহার ভিতরকার ভজন প্রকোষ্ঠ এবং পরিবেশ ছিল বড় অদ্ভুত। হনুমানজীর এক পবিত্র বিগ্রহ আশ্রমে স্থাপিত রহিয়াছে। এ বিগ্রহের কক্ষটি অতি অপরিসর। ইহার পাশে দুইটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় চোরকুঠরী। স্থানে স্থানে বহুতর গর্ত, গোখরো ও বহুবংশী সাপের দল সেখানে স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ায়। সম্মুখস্থ একফালি ছোট বারান্দার উপর রহিয়াছে বাবাজী মহারাজের নিজের শয়নের স্থান। প্রতিবেশী সর্পদলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। উহাদের গতিবিধি ও মনোভাব এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ যেমন বুঝিতে পারেন, উহারাও তেমনি তাঁহার নির্দেশাদি নির্বিচারে মানিয়া নেয়।

প্রভাতে উঠিয়া কাঠিয়াবাবা হনুমানজীর বিগ্রহের গায়ে সিঁদুর লেপন করেন, তারপর ফুলের মালা পরাইয়া দেন। কিন্তু প্রতিদিনই প্রত্যূষে দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড দুর্ধর্ষ বহুবংশী সাপ হনুমান-বিগ্রহের দেহটি জড়াইয়া পরমানন্দে নিদ্রিত রহিয়াছে। একটি লাঠির মাথায় কাপড় জড়াইয়া বাবাজী সস্নেহে সাপটিকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দেন, আর বলিতে থাকেন, "আরে জলদি হঠ্ যা, হঠ্ যা।"

সুখসুপ্তি ভঙ্গের পর নাগপ্রবর ধীরে সুস্থে নামিয়া গিয়া তাহার নিজ গর্তে অন্তর্ধান করে। বাবাজী মহারাজের নিত্যকার কৃত্যাদি ইহার পর শুরু হয়।

শুধু সর্পদল কেন, আশ্রমের বৃক্ষলতাদি হইতে শুরু করিয়া চড়ুই পাখিগুলিও যেন তাঁহার পরম বান্ধব। কোনো মানুষের সখ্য হইতে ইহাদের সখ্য এই মহাপুরুষের কম কাম্য নয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নেহসিক্ত হৃদয়ে তিনি ইহাদের সান্নিধ্যে গিয়া বসেন। বৃক্ষলতাদির গোড়ায় মৃত্তিকা সযত্নে খুঁড়িয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করেন, আবার পোষ্য চড়ুইদলের সম্মুখে রুটির টুকরা ছড়াইয়া বসিয়া অপার সন্তোষে লক্ষ্য করেন তাঁহাদের আহার-পর্ব।

এই বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রজ্ঞানঘন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, চেতন ও অচেতন সব

কিছু যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। এক ও অখণ্ড বোধ সেখানে ওতপ্রোত, তাই সমস্ত কিছু ভেদাভেদের গণ্ডিরেখা একেবারে হইয়াছে বিলুপ্ত।

কাঠিয়াবাবাজীর বাহ্যিক আচরণ, বিশেষত টাকাকড়ি বিষয়ে তাঁহার কৃপণতার অভিনয়, বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিত। কেহ কেহ সত্য সত্যই ভাবিত, বাবাজী মহারাজ অর্থাদি সম্পর্কে সর্বদা যেরূপ সচেতন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট গোপন ধন সঞ্চয় বেশ কিছু রহিয়াছে। আশ্রমের রসুইয়া পুষ্করদাস বড় অর্থলোভী, বহুদিন তাহার এমনি এক সন্দেহ বর্তমান ছিল। গুপ্তধন চুরি করার জন্য এ লোকটি তিন-চারবার কাঠিয়াবাবার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।

সে-বার মঠে তিনজন বিশিষ্ট মোহান্তের আগমন হয়। বাবাজী মহারাজ ইঁহাদের সঙ্গে বসিয়া প্রচুর পরিমাণ ভাঙের শরবত পান করেন। সুযোগ বুঝিয়া পুষ্করদাস ইঁহাদের পানীয়ের সহিত এ সময়ে বেশ খানিকটা আর্সেনিক বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। মোহান্ত তিনজন কিছুক্ষণ বাদেই অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন। অথচ প্রচুর বিষসহ ভাঙের শরবত পান করিয়াও কাঠিয়াবাবা মহারাজের কোনো নেশা বা ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই।

সংজ্ঞাহীন এই মোহান্তদের দেহে তাড়াতাড়ি নিজ কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিয়া তিনি কি যেন এক প্রক্রিয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

অভ্যাগতের দল সন্দেহ করিলেন যে, পুষ্করদাসই সকলের অর্থ লুণ্ঠন ও প্রাণনাশের জন্য গোপনে বিষ দিয়াছে। দুষ্কৃতীকে তখনি তাঁহারা পুলিসের হাতে দিতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু কাঠিয়াবাবাজী কিছুতেই রাজী নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা সবাই তো চেতনা লাভ করেছো, কোনো অনিষ্টই তোমাদের হয় নি। যে দুষ্ট, সে নিজেই কৃতকর্মের জন্য ফল ভোগ করবে। তবে তাকে পুলিসের হাতে দেবার কি প্রয়োজন ?"

ক্রুদ্ধ মোহান্তগণ কিন্তু পুষ্করদাসকে ছাড়িয়া দিতে রাজি নন, তাঁহারা বার বার জোর করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহারাজ এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, তোমাদের যা অভিরুচি হয়, তাই করো। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামা বাধিয়ে কোনো ফল হবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। আমি পুলিসকে বলবো, এক সাথে বসে একই ভাঙের শরবত আমিও পান করেছি। তোমাদের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণেই পান করেছি। অথচ আমার তো কোনো অনিষ্ট হয় নি। দেখবে, তোমাদের অভিযোগ মোটেই টিকবে না, ফলে তোমরাই বরং উল্টো বিপদে পড়বে।'

অগত্যা মহান্তেরা নিরস্ত হন। নির্বোধ, অর্থলোভী সেবককে কৃপাময় বাবাজী সেবার এমনি করিয়াই রক্ষা করেন।

ইহার পরও আর একবার এই রসুইয়া ব্রাহ্মণ কাঠিয়াবাবাজীকে হত্যার চেষ্টা

করে। সেবার সে বাবাজী মহারাজের রুটিতে বিষ গুলিয়া দেয়, আর নীরবে এ তীব্র বিষ হজম করিয়া ফেলিয়া বাবাজী পুষ্করদাসের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন, ঘটনাটি ঘটার বহু পরে শিষ্যদের তিনি একথাটি বলিয়াছিলেন।

একবার বাবাজী মহারাজ তাঁহার শিষ্যবর্গসহ আগ্রায় গিয়াছেন। পুষ্করদাসের জন্মভূমি এ অঞ্চলে। এখানকার পূর্ব পরিচিত কয়েকটি দুর্বৃত্তের সহযোগিতায় পুষ্করদাস আবার একদিন কাঠিয়াবাবাকে হত্যার সংকল্প করে।

বাবাজী মহারাজ সেদিন গভীর রাত্রে আসনের উপরে নিদ্রিত রহিয়াছেন। এ সময়ে পুষ্করদাসের নিয়োজিত দুর্বৃত্তগণ এক উচ্চ স্থান হইতে তাঁহার নিদ্রিত দেহের উপর খুব ভারী প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলে। বাবাজী আহত হইয়াও লাঠি হস্তে এই দুষ্টদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন, ভয়ে তাহারা পলায়ন করে।

প্রস্তরের আঘাতে কাঠিয়াবাবার বাহুর একটি শিরা কাটিয়া যায় এবং দীর্ঘদিন তাঁহাকে ইহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

দুর্ঘটনার পরক্ষণেই কিন্তু দুষ্ট পুষ্করদাস তাহার গোপন স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর বাবাজী মহারাজকে বার বার সমবেদনা জানাইতে থাকে। ক্ষমাসুন্দর মহাপুরুষ হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই পাচককে একটি কথাও সেদিন বলেন নাই। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে নিয়া অবিলম্বে তিনি আগ্রা ত্যাগ করেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এত কিছুর পরও কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহার এ কুখ্যাত রসুইয়াটিকে ত্যাগ করেন নাই। শুধু তাহাই নয়, পাপকার্যের জন্য এই দুষ্কৃতকারীকে নিজে তিনি কোনোদিন ভর্ৎসনাও করেন নাই। পূর্ববৎ সহজভাবে সে আশ্রমে চলাফেরা করিত, আর রন্ধনকার্যের ভারও ছিল তাহার উপরই ন্যস্ত।

পুষ্করদাসের এ সব জঘন্য অপরাধের প্রতি বাবাজী মহারাজের ছিল এক উদাসীন ও নির্বিকার ভাব। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে এটা কিন্তু বড় দুর্বোধ্য ছিল। এ পাপাচারীকে কেন তিনি উপযুক্ত শাস্তি দিতেছেন না, ভক্ত তারাকিশোর (সন্তদাসজী) একবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

কাঠিয়াবাবাজী উত্তরে বলেন, "অচ্ছা বাবা, কেউ কি কাউকে সত্যি সত্যিই দুঃখ দিতে পারে? আপন আপন কর্ম অনুসারেই আমাদের সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাছাড়া, ভেবে দেখ পুষ্করদাস আমার কি কোনো ক্ষতি সাধন করতে পেরেছে? আমি তো এক ও অখণ্ড সর্বদাই রয়েছি। সেই যে সত্যিকার 'আমি', পুষ্করদাস তার কোন অনিষ্ট করবার ক্ষমতা রাখে?—তবে আমি ওকে আশ্রম থেকে বার ক'রে দেব কেন? তিরস্কারই বা করবো কেন? বাবা তোমায় আমি সত্য বলছি—আমার শরীরে সুখ-দুঃখের কোনো কিছু খবর নেই, কোনো কিছু বৈলক্ষণ্যও এতে নেই।"

হতবাক হইয়া তারাকিশোরবাবু এই দেব-মানবের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

পুষ্করদাসের অর্থগৃধ্নুতা ক্রমেই কিন্তু বাড়িয়া চলিল। তাহার দৃঢ় ধারণা,—কাঠিয়া-

বাবাজীর কোমরের আড়বন্ধের মধ্যেই সঞ্চিত ধন লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাঁহার প্রাণনাশ করিলেই সে উহা হস্তগত করিতে পারিবে।

শেষ চেষ্টা হিসাবে একদিন সে বাবাজী মহারাজের রুটির সঙ্গে আর্সেনিক বিষ মিশাইয়া দিল। পরিমাণ প্রায় দুই ভরি। এবারকার পরিস্থিতিটি বড় জটিল হইয়া পড়ে। বাবাজী মহারাজ এ বিষক্রিয়ার ফলে মাটিতে পড়িয়া যান ও মস্তকে গুরুতর আঘাত পান। পাকস্থলীর গোলযোগও চরমে উঠে।

পেট ফাঁপিয়া উঠিবার ফলে বাবাজী মহারাজ কোমরের কাঠের আড়বন্ধের চাপ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সেবকেরা সেদিন তাঁহার অনুমতি নিয়া ঐ আড়বন্ধটি করাত দিয়া চিরিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, খণ্ডিত কাষ্ঠ-বন্ধনীর মধ্যে গুপ্ত সোনাদানার কোনো সন্ধান না পাইয়া পুষ্করদাসকে হতাশ হইতে হয়।

কাঠিয়াবাবার গুরুতর পীড়ার সংবাদে তারাকিশোরবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া কলিকাতা হইতে বৃন্দাবনে ছুটিয়া যান।

বাবাজীর সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের কিন্তু বলেন, "সে কি কথা? কাঠিয়াবাবাজীর সিদ্ধ দেহে রোগ হবার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয় কোনো সাধু তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে।" তারাকিশোর গোঁসাইজীর এই কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, বড় উৎকণ্ঠিতও হইয়াছেন।

বাবাজী মহারাজের রোগশয্যার পাশে পৌঁছিয়াই তারাকিশোরবাবু তাঁহাকে গোঁসাইজীর ঐ মন্তব্যটির কথা বলেন। বাবাজী এবার সহাস্যে কহিতে থাকেন, "দেখো, দেখো কলকাত্তামে হী বয়ঠে মহাত্মাকো ক্যায়সা ইঁহাকা খবর মিল গিয়া। হাঁ বাবা পুষ্করদাসনে ইস বার দো ভরি সঁখিয়া হামকো রোটিকে সাথ দে দিয়া। অবু হামারা শরীর বুঢ্‌ঢা হো গিয়া। ইস ওয়াস্তে সঁখিয়া ভী শরীরকে ইয়ে বখৎ বড়া দুখ দিয়া"—অর্থাৎ দেখ, কলকাতায় বসে থেকেও মহাত্মা এখানকার খবর কেমন পেয়ে গিয়েছেন। ঠিক কথাই তিনি বলেছেন। এবার পুষ্করদাস আমার রুটির সঙ্গে দু ভরি শঙ্খিয়া বিষ (আর্সেনিক) দিয়েছিল। আজকাল আমার শরীর বৃদ্ধ অপটু, কাজেই শঙ্খিয়া বিষ এটাকে কষ্ট দিতে পেরেছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এত কিছু অপকর্মের নায়ক, পুষ্করদাস তখনও আশ্রমের রন্ধনকার্যে পূর্ববৎ নিযুক্ত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রোগশয্যায় শায়িত কাঠিয়াবাবার পথ্যাদি দিবার সব কিছু দায়িত্ব তাহারই উপর ন্যস্ত।

তারাকিশোর ও অন্যান্য শিষ্যগণ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবার জোর আন্দোলন চালান—এ দুরাত্মাকে এখনই আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। বাবাজীকে তারাকিশোর সকলের এ অভিমত স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন।

কাঠিয়াবাবা উত্তরে বলিলেন, "বেটা, অব্ ইস্‌কা ভ্রম সব মিট গিয়া। ইস্‌কা মনমে থা কি হামার আড়বন্দকা ভিতর বহুত সোনেকা আশরফি হ্যায়, আর হামকো মারকর উহ সব লে লেগা। অব্ আড়বন্দ কাট গিয়া—উস্‌কা ভ্রম ভী মিট্ গিয়া।—লেকিন তুমহারী মর্জি হোয় তো ইসকো অবহী নিকাল দেও।" অর্থাৎ—বাবা, এর ভ্রম

এবার একেবারে দূর হয়েছে। এ মনে ভেবেছিল, আমার কোমরের আড়বন্ধের ভেতর বহু মোহর লুকানো আছে। আমায় মেরে ফেলে সব কিছু অধিকার ক'রে বসবে—এই অভিসন্ধিই এর ছিল। আড়বন্ধ কেটে ফেলার পর সে ধারণা এখন আর নেই। তবে তোমাদের সকলের যদি অভিমত হয়, তবে একে এখনি এই আশ্রম থেকে বার ক'রে দাও।

ইহার পর কি যেন ভাবিয়া কাঠিয়াবাবা নিজেই পুষ্করদাসকে বিতাড়িত করিতে গেলেন। উত্তেজিত স্বরে তাহাকে কহিলেন, "তুমসে রসোই কুছ নহীঁ বনতা হ্যায়। হর বখৎ তুম্ রসোই মে জ্যাদা নমকস ডাল্ দেতে হো—ঔর তুম্ হামকো জহর ভী পিলায়া। তুম্ আশ্রমমে আওর মৎ রহনা। আভী ইঁহাসে নিকাল যাও!" অর্থাৎ, তোমাকে দিয়ে রান্না ঠিকমত হবার যো নেই। সর্বদা তুমি রান্নার অত্যধিক নুন দাও—তাছাড়া তুমি আমায় বিষ খাইয়েছ। যাও, এ আশ্রমে তুমি থাকতে পাবে না, এখনই বিদায় হও।

পুষ্করদাস বুঝিল, আশ্রমের সকলে এবার তাহার উপর ক্ষেপিয়া গিয়াছে, আর এখানে তাহার থাকিবার উপায় নাই। নতশিরে সকলের সম্মুখ দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আশ্রমিকগণ তখন সবিস্ময়ে কেবলই কাঠিয়াবাবাজীর কথাগুলি ভাবিতেছিলেন। আহার্যের মধ্যে অত্যধিক নুন মিশ্রণ ও বিষ প্রয়োগ যাহার নিকট সমান, সে মহাপুরুষের মহিমা ও অধ্যাত্মশক্তির পরিমাপ কে করিবে?

বাবাজীর সমদর্শিতার আরও নানা বিচিত্র কাহিনী রহিয়াছে। একবার এক তীর্থকামী দেশীয় নৃপতি বৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। বাবাজী সম্বন্ধে বহুতর অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া ইনি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন।

এই মহারাজাটি খুব ভক্তিপরায়ণ। তাছাড়া, সাধুসেবায় তাঁহার আন্তরিকতার অবধি নাই। সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া বাবাজী সেদিন তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত। সমারোহের সহিত মহারাজা তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন, শ্রদ্ধাভরে বহু বস্তু ভেট দিলেন।

রাজঅতিথি বাবাজী মহারাজকে কিছুক্ষণ পর এক অদ্ভুত আচরণ করিতে দেখা গেল। বিদায় নিয়া প্রাসাদ হইতে তিনি বাহির হইতেছেন, হঠাৎ নৃপতির এক দারোয়ানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। লোকটি বড় ধর্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান—ভাগ্যবান্ও সে বটে, কারণ অযাচিতভাবে সেদিন কাঠিয়াবাবা তাহাকে যে কৃপা প্রদর্শন করেন, সবাই তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়।

লোকটি ভক্তিভরে বাবাজীকে প্রণাম করিল, আর সদানন্দ মহাপুরুষ অমনি তাহার পাশে রাজভবনের দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলেন। থলিয়া হইতে কলকে ও গাঁজার মোড়ক খুলিয়া ছিলিম সাজা হইল। তারপর দারোয়ানের সহিত বসিয়া বাবাজী ছিলিমের পর ছিলিম উড়াইতে লাগিলেন। সকলে তো অবাক্। খোসগল্প ও হাসি তামাশা দেখিয়া মনে হইবে, লোকটি তাঁহার অন্তরঙ্গ বয়স্য।

কিছুক্ষণ এইভাবে গঞ্জিকা সেবন ও আনন্দরঙ্গে কাটানোর পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাজা বাহাদুর এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ চুপচাপ দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বাবাজী মহারাজের এই বিচিত্র লীলা দেখিতেছিলেন। বলা বাহুল্য কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না, সমদর্শী মহাপুরুষের দৃষ্টিতে রাজা ও রাজভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই।

ব্রহ্মবিদ্ কাঠিয়াবাবার বালকবৎ ভাবটিও ছিল বড় মনোহর। একদিন স্নানান্তে তিলক কাটিবার পর একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। নিকটস্থ এক ভক্ত তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ। মহারাজ, আজ আপনাকে বড় খুবসুরত দেখা যাচ্ছে।"

শিশুসুলভ আনন্দে বাবাজী যেন গলিয়া গেলেন। সোৎসাহে বার বার সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "এছাড়া আমার একটা বনাতের আল্‌ফি আছে, সেটা যখন আমি পরি, তখন যে কি খুবসুরত আমায় দেখায়, তা তো কেউ দেখো নি। একবারটি দেখলে বুঝতে পারতে—কি চমৎকার!"

ত্রিপুরার রাজবাড়ির মেয়েরা সূচীশিল্প সমন্বিত একটি সুদৃশ্য চাদর কাঠিয়াবাবাকে ভেট পাঠাইয়াছেন। রঙীন চটকদার বস্তুটি দেখিয়া বাবাজীর আনন্দ আর ধরে না। প্রচণ্ড উৎসাহের চোটে উহা শালের মতো করিয়া গায়ে দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি এটা এমনি গায়ে জড়িয়ে রাখবো—আর বৃন্দাবনের সবাইকে এখনই দেখিয়ে আসবো।"

ব্রজবাসীমাত্রেই তাঁহার পরম সখা। তাই এ বস্তু তাহাদের না দেখালেই বা চলিবে কেন? যে কথা সেই কাজ। বাবাজী বালকের মতো আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছুটিতে ছুটিতে নিকটস্থ বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবার গর্ব করিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, এই সুন্দর কাপড়খানা আমার জন্য ভেট এসেছে। আর জানো? ত্রিপুরার রাজবাড়ির মেয়েরা এটা আমার জন্য বুনে দিয়েছে। হ্যাঁ, তারা নিজে হাতে বুনেছে।"

বাজারের ব্রজবাসীরাও বাবাজী মহারাজের এই বালকপনায় পরম আনন্দিত। বার বার আশ্বাস দিয়া মাথা নাড়িয়া তাহারা কহিতে লাগিল, "সত্যি মহারাজ, এ কাপড়খানা বড় চমৎকার হয়েছে। এ রকমটি আর কোথাও দেখা যায় না।"

সেদিন ভোরে আশ্রম সীমানায় গোলমাল শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। দেখা গেল, প্রতিবেশী আখড়ার কোনো একটি বালক-সাধুর সঙ্গে কাঠিবাবাবা মহারাজ তুমুল ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছেন। বাবাজীর আশ্রম হইতে সে কিছু ডালিম পাতা নিতে আসিয়াছে, কি একটি ঔষধে নাকি তা ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু বাবাজীর ধনুর্ভঙ্গ পণ—কিছুতেই তিনি ডালিম পাতা কাঁটি নিতে দিবেন না। বালকের সঙ্গে সমভাবে প্রচণ্ড ঝগড়া করিয়া চলিলেন, যেন এই পাতা কটির উপরই সেদিন তাঁহার আশ্রমের বাঁচামরা সব নির্ভর করিতেছে।

বাবাজী চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন তুমি এ পাতা ছিঁড়বে? আমার গাছ ছোট—কিছুতেই এ দেওয়া হবে না। চোখের মাথা কি খেয়ে বসেছো? অন্য কোথাও যেতে পারো না!"

বালকটিও ছাড়িবার পাত্র নয়। উত্তেজিত হইয়া সে গালাগালি শুরু করে, বাবাজীও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ অশ্লীল গালি দেন।

বাগানের প্রান্ত হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া এবার তিনি ছিলিম সাজিলেন। আশ্রমের ভক্তদের শুনাইয়া শুনাইয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "আমার ডালিম গাছের পাতা নিয়ে চলে যাবে! ইস্, অত সহজেই নেওয়া যায় আর কি? দেখলে তো। আমিও ওকে ছেড়ে দিই নি। জোর গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

এখনি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া এবং প্রকাণ্ড সম্পদ বাঁচাইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়াছেন—ভাবটা ঠিক এমনই।

আবার এই মহাত্মার মধ্যেই দেখা যায় এই সহজ বালক ভাবেরই এক বিপরীত রূপ। অধ্যাত্ম-শক্তির ধারক ও বাহক—এক মহাশক্তিধর যোগীরূপে তিনি তখন শিষ্যদের সম্মুখে বিরাজমান।

কাঠিয়াবাবার শিষ্য, সন্তদাস মহারাজ সে সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। কুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতির প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় বিব্রত হইয়া বাবাজীকে একদিন তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমার বুকের ভেতর শক্তি যেন বেধে যাচ্ছে।"

বাবাজী মহারাজ নিতান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হাঁ—হাঁ, উঁহা কমল রহতা হ্যায়, উহু রোক দেতা হ্যায়?" অর্থাৎ ঐ স্তরে চক্র বিরাজিত রয়েছে, শক্তির ঊর্ধ্বগতিতে তাই তো এমন ক'রে আজ ওখানে বাধা পড়ছে।

সাধক তারাকিশোর ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, গ্রন্থির এ বাধা কি গুরুদেব কৃপা করিয়া ছাড়াইয়া দিবেন না?

কাঠিয়াবাবা অমনি শিষ্যকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিছুতেই একাজ করিতে এখন তিনি রাজী নন। ইহার কারণও তিনি কিয়ৎপর জানাইয়া দিলেন—এখনি যদি এ গ্রন্থি ছাড়াইয়া দেন, তবে শিষ্যের পক্ষে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কোনো কাজ করা আর সম্ভব হইয়া উঠিবে না। অথচ গুরুজী জানেন, সংসারে এই শিষ্যের যে যথেষ্ট কর্ম রহিয়াছে। সময় আসিলেই তিনি এই গ্রন্থিভেদ করাইয়া দিবেন, এ আশ্বাসও তাঁহাকে তিনি দিলেন।

রঙীন কাপড় ভেট পাইয়া বালকের মতো আনন্দে যিনি বাজারে ছুটিয়া যান, কয়েকটা কচি ডালিম পাতার জন্য প্রতিবেশী বালকের সঙ্গে যিনি মুহূর্তে তুমুল বিরোধ বাধাইয়া বসেন—এ আবার তাঁহার কোন্ অলৌকিক যোগবিভূতিময় রূপ।

শক্তিধর গুরুরূপে তাঁহার এ প্রকাশটি বড় মহিমময়। চিন্ময় লোকের চাবিকাঠি যে রহিয়াছে তাঁহারই হাতে, তাই সাধক শিষ্যের গ্রন্থিভেদ অবলীলায় তিনি করাইতে পারেন।

কাঠিয়াবাবাজীর এই বালকবৎ ভাব, এই লীলা অভিনয় দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল। তিনি যে এক অসাধারণ যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অনেক দর্শনার্থীর ধারণায় আসিত না। আবার এই

মহাসমর্থ যোগীর অন্তরসত্তায় প্রেমরসনীর অমৃতধারাটি যে সদা তরঙ্গিত হইত, সে সংবাদই বা কয়জন রাখিত ?

সন্তদাসজীর লেখনীতে ইহার এক অপরূপ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেদিন আশ্রমের ঠাকুর শ্রীবিহারীজী ও শ্রীরাধিকাজীকে নিয়া বৃন্দাবনধামে শোভাযাত্রা হইতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, কাঠিয়াবাবাজীর প্রতি রোমকূপ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় বাহির হইতেছে ঘর্মস্রোত। সন্তদাসজী তাড়াতাড়ি পাখা নিয়া গুরুদেবকে ব্যজন করিতে বসিলেন।

বাবাজী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া হাস্যভরে বলিতে লাগিলেন, "বেটা, যা ভাবছো তা নয়। এ কিন্তু গ্রীষ্মের ঘাম নয়, হাওয়া ক'রে একে নিবারণ করা যাবে না। আসলে এ হচ্ছে এক প্রকার প্রেমজ্বর। শ্রীরাধিকাজী বিগ্রহের চারিদিকে বৃন্দাবনের গোপীদের দর্শন করাতেই এ প্রেমজ্বরের উৎপত্তি। এরূপ প্রেমজ্বর আমার এই প্রথম নয়, আরও অনেকবার হয়েছে। একবার এ দেহে এটা প্রায় একমাস কাল অবধি ছিল, কিন্তু তখন শরীর থেকে জল বিন্দুমাত্রও নির্গত হয় নি, সমস্ত শরীর আগুনের মতো উত্তপ্ত থাকতো। তাছাড়া, শরীরের রোম আর জটা অহর্নিশি কাঁটার মতো খাড়া হয়ে থাকত।"

চাক্ষুষভাবে সেদিন প্রেমের এ সাত্ত্বিক বিকার দর্শনে সন্তদাসজীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

উচ্চকোটির সিদ্ধ সাধকগণ কাঠিয়াবাবাজীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। মহাপুরুষের প্রকৃত মহিমা প্রধানত ইহাদেরই ছিল বোধগম্য। এই সাধকদের আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া অনেক সময় বাবাজী মহারাজের অধ্যাত্মজীবনের রেখাচিত্র কিছুটা ফুটিয়া উঠিত।

যত বড় সাধক বা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষই কাঠিয়াবাবার নিকট উপস্থিত হোন না কেন বাবাজীর ভাবভঙ্গী ও আচরণে সাধারণত কোনো তারতম্য দেখা যাইত না।

বৃন্দাবনে যোগীবিভূতিসম্পন্ন এক ক্ষুদ্রকায় সাধু বাস করিতেন। ইহার বয়সের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধকসমাজে প্রসিদ্ধি ছিল এবং এজন্য অনেকে তাঁহাকে কল্পান্তী নামে অভিহিত করিতেন। বিভিন্ন মঠ ও সাধুর আখড়ায় এই মহাপুরুষের তখন খুব মর্যাদা। কিন্তু ইহার সহিত কাঠিয়াবাবার আচরণ ছিল নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার তিনি করিতেন, এই মহাত্মার সহিতও ছিল তেমনই ব্যবহার।

কাঠিয়াবাবার সহিত পরিচিত হইবার পর, বৃন্দাবনে থাকা কালে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপনীত হইতেন। উদ্দেশ্য বাবাজীর চরণ দর্শন করা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, উভয়ের মধ্যে কোনো কথাবার্তা প্রায়ই হইত না। গোস্বামী-প্রভু বাবাজী মহারাজকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করার পর অপর সকলের সঙ্গে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন। তারপর প্রণামান্তে আবার তেমনি মৌনভাবে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখা যাইত।

উভয়ের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বা তত্ত্বালোচনা হয় না, ইহা লক্ষ্য করিয়া জনৈক ভক্ত গোস্বামীজীকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি তো বাবাজী মহারাজের সঙ্গে রোজই আলাপ করে

যাচ্ছি? তিনি যে মৌনী থেকেই আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেন, আমায় প্রেরণা যোগান। বাইরের কোনো লোকের কথাবার্তা যেমন আমি শুনি, বাবাজীর নীরব বাণী আর তাঁর নির্দেশ আমি তেমন স্পষ্টরূপে বুঝতে পারি।"

পরমহংসজী নামে এক প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ ব্রজভূমি অঞ্চলে বাস করিতেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার বিরাট খ্যাতি ছিল। একবার ব্রজপরিক্রমার সময়ে সাধু জমায়েতের সঙ্গে এই পরমহংসজীও আসিয়া উপস্থিত। বড় বড় মোহান্ত ও সাধকদের নিকট ইঁহার ছিল অসামান্য মর্যাদা। একদিন কাঠিয়াবাবার তাঁবুতে শ্রীবিহারীজীর আরতি হইতেছে এমন সময় ঐ পরমহংসজীকেও সেখানে দেখা গেল। আরতি অন্তে তিনি কাঠিয়াবাবা মহারাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

আশ্রমের শিষ্যদের মধ্যে দু-একজন এ সময়ে এই পরমহংসজীকে উপযুক্ত আদর আপ্যায়ন করিতে ইচ্ছুক হন। বাবাজী মহারাজের নিকট এ প্রস্তাব তখনি জানানো হইল। নিতান্ত নিরস ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, "বেটা, পরমহংসজীকে সমাদার জ্ঞাপনে আমার নিজের দিক দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি কেন, তাঁর গুরুদেব এলেও তাঁকে আমার আসনের কাছে সংবর্ধনা ক'রে আনতে আমি যেতুম না। তবে তোমাদের যদি তাঁকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে ডাকতে পার। আমাদের এখানে তো তামাক, গাঁজা, সুলফা, ভাঙ সব রয়েছে, তাঁর আদর আপ্যায়ন করো। আমার দিক দিয়ে কোনোই বারণ নেই।"

এ কথা শোনার পর পরমহংসজীকে সংবর্ধনা জানানোর উৎসাহ আর কাহারো রহিল না। দেখা গেল, ঐ মহাসমর্থ সাধু, প্রাচীন অন্যান্য সাধারণ ভক্তদের মতোই, দূর হইতে কাঠিয়াবাবার আসনের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, আর একবার তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বাবাজী মহারাজ সে-বার কলিকাতায় আসিয়াছেন। এ সময়ে কয়েকজন শিষ্যসহ ভোলাগিরিজী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। গিরি মহারাজের খ্যাতি প্রতিপত্তি তখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু, এই বহুলখ্যাত মহাপুরুষের আগমনে কাঠিয়াবাবার আচরণে কোনো তারতম্যই লক্ষিত হইল না। নির্বিকারভাবে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া তিনি নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ভোলাগিরিজী কক্ষে ঢুকিয়াই করজোড়ে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বাবাজীর সহিত তাঁহার সামান্য কিছু কথাবার্তা হইল। অতঃপর দুই-চারিজন ভক্তের অনুরোধে গিরিমহারাজ তাঁহাদের কিছু তত্ত্বোপদেশ দিলেন। কাঠিয়াবাবা এ সময়ে স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, "এ-রকম উপদেশের ফল কিছু আছে কি? শ্রোতাদের জীবনে এসব কি তেমন কার্যকরী হবে?"

মাননীয় অতিথির এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কাঠিয়াবাবা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার ভোলাগিরিজীর কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি তাঁহার সাথে নানা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন—গিরিমহারাজ যেন তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বয়স্য।

কুম্ভমেলার সময় কাঠিয়াবাবা মহারাজের তাঁবুতে অগণিত সাধুর সমাবেশ হইতে

দেখা যাইত। বহু সিদ্ধদেহ সাধক এ মহাপুরুষের চরণ দর্শনে অভিলাষী হইয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। এই সব সমর্থ সাধুদের উপস্থিতিতেও বাবাজীর আচরণে কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। সাধারণ দর্শনার্থীদের তিনি যেমন হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্বাদ জানাইতেন আগন্তুক মহাপুরুষদের বেলায়ও ছিল তেমনি তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

১৩১৬ সালের ৪ই মাঘ। ঘন শীতের কুহেলীতে সারা ব্রজধাম ছাইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রিতে চারিদিক সুপ্তিমগ্ন। কাঠিয়াবাবাজীর প্রতীক্ষিত মহাপ্রয়াণের লগ্নটি সেদিন সমাগত।

মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক রামফলকে ডাকিয়া কিছুটা পানীয় জল চাহিলেন। পান শেষে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "রামফল, লে ভাই। তোর হাথ্‌কা জলভী অব্ পী লিয়া। তু শো যা, হামভী অব্ যায়েঙ্গে।"

মহাপুরুষের মহাযাত্রার এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভক্ত রামফল কি করিয়া বুঝিবে? রাত জাগিয়া এ কয়দিন গুরু মহারাজের সেবা করিতে হইয়াছে, দেহ তাহার বড়ই ক্লান্ত। অতঃপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

একটু পরেই আশ্রমের দুইটি ভক্ত সাধক হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর জাগিয়া উঠিয়াছেন। উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, আশ্রমের অঙ্গন এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখনই বাবাজী মহারাজের কক্ষে তাঁহারা ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, মরদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানসসন্তান, পরমপ্রিয় শিষ্য সন্তদাসজী এ সংবাদ পাইয়া দুই দিন পরে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন।

আসিয়া দেখিলেন, গুরু মহারাজ দেহরক্ষা করিবার পর সমগ্র আশ্রমটি যেন প্রাণশক্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আশ্রমপতির অদর্শনে গাভীগুলিও শোকাকুল, চোখে তাহাদের নিরন্তর অশ্রু ঝরিতেছে। আশ্রমের বিগ্রহে—শ্রীরাধিকাজীর কপোলেও গড়াইয়া পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা নয়নবারি।

আর একটি অলৌকিক দৃশ্যের কথাও সন্তদাস মহারাজ তাঁহার গুরুজীর জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"স্থানীয় প্রথানুসারে ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের উদ্দেশে ভাণ্ডারা করা হয়। সেই দিবস হইতে আশ্রমস্থ শ্রীরাধিকাজীর নেত্র হইতে অশ্রুর ন্যায় রসধারা প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয় এবং উভয় দেবমূর্তির মলিন ভাব অদৃশ্য হয়। পূর্বোক্ত প্রকার রসধারা কয়েক দিবস ধরিয়া বিগলিত হওয়াতে শ্রীরাধিকার নেত্র কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়া যায়। তজ্জন্য তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য নেত্র বসাইতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।"

মর্ত্যলোকচারী দেবমানব কাঠিয়াবাবার তিরোধানে চৈতন্যময়ী দেবীবিগ্রহের এ এক অত্যাশ্চর্য বিরহ-লীলা।

বামাক্ষেপা

নিঝুম নিশীথ রাত্রি। নাটোরের রাজপ্রাসাদে রানী গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন। সহসা এক দুঃস্বপ্ন দেখার পর তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে বিহ্বল হইয়া পালঙ্কে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—একি ভয়ঙ্কর কথা! তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মা-তারা আজ চারদিন যাবৎ উপবাসী!

স্বপ্নযোগে দেবী এইমাত্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আননে তাঁহার বিষাদের ছাপ, সকাতরে বলিলেন, "যুগযুগান্ত ধরে এ সিদ্ধপীঠে আমি বিরাজ করছি। কিন্তু এবার দেখছি, বিদায় না নিয়ে আর উপায় নেই। মন্দিরের পুরোহিত আর তোমার দারোয়ান আমার প্রিয় পুত্র ক্ষেপাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। তাদের এ আঘাত পড়েছে আমারই গায়ে—এই দ্যাখো, আমার পিঠে রক্তের দাগ। আর এ প্রহার বড় তুচ্ছ কারণে। মন্দিরে আমার বিগ্রহের কাছে তখন ভোগ নিবেদন করা হয়েছে। আমার পাগল ছেলেকে ডেকে বললাম—ক্ষেপা আয়, আমার সঙ্গে খাবি। তাই সে মন্দিরে ঢুকে খেতে বসেছিল। এই তার অপরাধ। ক্ষেপাকে আজ চারদিন প্রসাদ দেয় নি, অনাহারে সে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরে, ছেলে না খেলে কি, মা খেতে পারে? তাই আমিও রয়েছি উপবাসী।"

রানী বেদনার্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর তাঁহার মিনতি শুনিয়া দেবী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তারাপীঠ ছেড়ে যাবো না। কিন্তু এখন থেকে ব্যবস্থা কর রোজ আমার ভোগের আগে আমার প্রিয় পুত্র ক্ষেপাকে খেতে দেওয়া হবে।"

বলা বাহুল্য, রানী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন—এখন হইতে তারাপীঠে ভোগ নিবেদনের আগে দেবীর এই নির্দেশই পালিত হইবে। তাছাড়া, ক্ষেপার সেবা-পরিচর্যায়ও আর কখনো কোনো ত্রুটি হইবে না।

ভয়ে বিস্ময়ে সে রাত্রির মতো রানীর ঘুম টুটিয়া গিয়াছে। শয্যায় শুইয়া বার বার কেবলই এই স্বপ্নের কথা তিনি মনোমধ্যে আলোড়ন করিতেছেন। তাছাড়া, আরও ভাবিতেছেন—কে এই ক্ষেপা? কি মহাভাগ্যবান্ সাধক সে! ব্রহ্মময়ী তারামায়ের সে আদরের দুলাল হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব একাত্মকতা এই ক্ষেপার সহিত জগজ্জননী তারাদেবীর! নহিলে তাহার পিঠের আঘাত মায়ের দিব্য অঙ্গে কেন এমন করিয়া লাগে?

প্রত্যূষেই নাটোর প্রাসাদে দেওয়ানজীকে আহ্বান করা হইল। অশ্রু ছলছল চোখে রানী তাঁহার স্বপ্নের কাহিনী বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "কত ক্ষতি স্বীকার ক'রে নাটোরের নিজস্ব মৌজার বিনিময়ে রাজা আসাদুল্লা খাঁর মৌজা তারাপীঠকে এই রাজসরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধ পীঠের কোনো অবমাননা না হয়, মায়ের সেবার কোনোরূপ বিঘ্ন না হয়, সেইজন্যই এটা করা হয়েছিল। অথচ আমাদেরই সেবা-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মা আমার আজ চারদিন যাবৎ উপবাসী।"

রাজসরকারের হুকুম ও নির্দেশাদিসহ দুইজন বিশিষ্ট কর্মচারী ভোরবেলায়ই তারাপীঠে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিল পূজা ও ভোগের প্রচুর উপকরণ।

দেবীর স্বপ্নাদেশ আর রানীর হুকুম শুনিয়া তারাপীঠের সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মন্দিরের পুরোহিত ও দারোয়ানকে সেদিনই দণ্ডিত করা হইল।

কিন্তু এত কিছু কাণ্ডের যিনি নায়ক, সেই ক্ষেপা-বাবা কোথায়? রাজপুরুষদের আগমনের কথা শুনিয়া বালকবৎ মহাসাধক ভয়ে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া তবে তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল।

কর্মচারীদ্বয় তখন জোড়হাতে নাটোর-রাজ্যের তরফ হইতে এই মহাপুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ষোড়শোপচারে তারামায়ের পূজা ও ভোগ দেওয়া হইল। ক্ষেপা প্রধান কৌলের পদে বৃত হইলেন। স্থায়ী নির্দেশ রহিল, এখন হইতে তারামায়ের ভোগের আগে মায়ের ছেলে ক্ষেপাকে ভোজন করাইতে হইবে।

আর একবারের ঘটনা। ক্ষেপাবাবা তখন প্রায়ই ধ্যানাবস্থা ও সমাধিতে মগ্ন থাকে। কখনো বাহ্যজ্ঞানহীন কখনো বা একেবারে বালকবৎ ভাব। একদিন তো ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি মন্দির-বিগ্রহের গায়ে মূত্রত্যাগ করিয়াই বসিলেন।

পুরোহিত ও পাণ্ডার দল তখন 'হায় হায়' করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। ক্ষেপাকে অনুযোগ ও গালাগালি দেওয়া হইলে তিনি পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ করেছি, আমার মায়ের গায়ে আমি মুতেছি, তোদের তাতে কিরে, শালারা।'

সকলে এক মহাসংকটে পড়িলেন। তারাদেবীর পবিত্র বিগ্রহ অপবিত্র করা হইয়াছে। ফল কি হইবে কে জানে? শুদ্ধিকরণের বিশেষ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির মধ্য দিয়া আবার তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দরকার। নাটোর রাজসরকারে সেইদিনই সংবাদ পাঠানো হইল।

এবারও আসে মায়ের আর এক প্রত্যাদেশ। কর্তৃপক্ষ তারাপীঠে লোক পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন—মায়ের পূজা পূর্ববৎই চলিতে থাকিবে, ক্ষেপাবাবা স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, মায়ের আদরের দুলাল। তাঁহার কোনো কাজের ত্রুটি ধরিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে দেবীবিগ্রহ অপবিত্র করার প্রশ্ন উঠে না, মায়ে-পোয়ের ব্যাপারে অপরের মাথা ঘামানোরও দরকার নাই।

তারামায়ের এ প্রিয় পাগলা ছেলেই বহুবিশ্রুত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা। ঊনবিংশ-শতাব্দীর বাংলায় শক্তিসাধনার এক অগ্নি-শিখারূপে আবির্ভূত হন ক্ষেপাবাবা, তাঁহার এই অগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে বহু ভাগ্যবান্ সাধকের তপস্যাপূত জীবন।

মন্দির চত্বরের শেষে, বিস্তীর্ণ বালুতটে, তারাপীঠের মহাশ্মশান। খরস্রোতা দ্বারকা নদী অর্ধচন্দ্রাকারে এটি বেষ্টন করিয়া বহিয়াছে। এই শ্মশানই শিবকল্প মহাসাধক বামার বিচরণভূমি, তাঁহার তপোক্ষেত্র। এই তপোক্ষেত্রের পটভূমি দিনের পর দিন ফুটিয়া উঠিয়াছে তারাপীঠের মহাকৌলের মহিমময় রূপ।

অমাবস্যার নিশি দ্বারকাতটে ঘনাইয়া আসে। নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া ঘন

ঘন ধ্বনিত হয় শকুন গৃধিনীর বুকফাটা আর্তনাদ। চিতাধূমে ও পূতিগন্ধে চারিদিকে ছড়ানো। লোকের বিশ্বাস তারাপীঠ শ্মশানে মৃতের দেহাস্থি রাখিলে মুক্তি অবধারিত, চিতাগ্নি এখানে তাই কখনো নির্ভিবার অবসর পায় না। তাছাড়া, এ শ্মশানের প্রথা-মতো শবকে প্রায়ই চিতায় অর্ধদগ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া উদরস্থ করে শকুনি, শৃগাল ও কুকুরের দল। পূতিগন্ধময় পচা শব ও কঙ্কাল করোটিতে সমগ্র অঞ্চল সমাচ্ছন্ন—আর সম্মুখে শিমুলতলায় বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডী আসনের কোল ঘেঁষিয়া শায়িত থাকেন, বামাক্ষেপা—এই শক্তিপীঠের জীবন্ত ভৈরব।

ক্ষেপা একেবারে দিগম্বর। দীর্ঘ কৃষ্ণকায় দেহটি ভূমিতে এলায়িত। সারা অঙ্গে তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীম ভৈরব কান্তি। সুরা ও গঞ্জিকার প্রসাদে আয়ত চোখ দুটিতে রক্তজবার রং। কিন্তু সত্যকার অনুসন্ধানী সাধকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—ঐ ভীমকান্তি দেহের ভিতরে উঁকি মারিয়া ফিরিতেছে এক আত্মভোলা দেবশিশু, নয়নে তাঁহার সদা বিচ্ছুরিত স্বর্গীয় আনন্দের দ্যুতি।

ক্ষেপাবাবার কোল ঘেঁষিয়া সানন্দে খেলিয়া বেড়ায়—কালো, ভুলো, লালি, শ্বেতফুলি—তাঁহার প্রিয় পার্ষদ, কুকুরের দল। বাবার ভক্তেরা শ্মশানে ইহাদের খাবার ঢালিয়া দেয়, শুরু হয় চিৎকার, ছুটাছুটি। মৃতের হাড় মাংসেও ইহাদের রুচি কম নয় —টানাটানিতে কখনো দু-একটা টুক্‌রো ক্ষেপার আসনের কাছেও ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

মহাপুরুষ কখনো কুকুরদের আদর করিয়া কোলে টানিয়া নেন, কখনো বা সরোষে তাড়াইয়া দেন। তাঁহার এই সারমেয় বয়স্যেরা মাঝে মাঝে বিগড়াইয়া গিয়া আঁচড় কামড়ও দেয়। শুধু খুব বেশী রক্তপাত হইলেই ক্ষেপা চটিয়া যান। শাসাইয়া বলেন —"বেদো শালারা, তোদের দেখছি বাড় বেড়েছে।"

ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল আশেপাশে দণ্ডায়মান। পিশাচ-বালকবৎ এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলে ক্ষেপাবাবা মাঝে মাঝে বলিয়া বসেন, "এই শালা, মাল্-টাল্ কিছু এনেছিস্ তো বার কর্।"

কারণ বা গঞ্জিকা—একটা কিছু মিলিলেই তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। খেয়ালী পুরুষের সবই দুর্জ্ঞেয়। আচার আচরণের অর্থ বুঝা দায়। হয়তো দেখা যায়, সেই একই সময়ে মদ গাঁজা ভেট দিতে উদ্যত অপর ব্যক্তিকে অকারণে গালি দিয়া তাড়াইতেছেন।

তারামন্দিরের আরতি-অনুষ্ঠান শেষ হয়। এবার মন্দিরের পাণ্ডা ক্ষেপাবাবার জন্য শ্মশানে বালুর উপর পাতায় করিয়া ভোগ প্রসাদ রাখিয়া যান। বাবার রোজকার আহারের সঙ্গী তাঁহার প্রিয় বয়স্যগোষ্ঠী, কেলো ভুলোর দল। কুকুরের দল যে পাতে হুটোপুটি করিয়া খায় মহামানব বামাক্ষেপাও সেই পাতেই মহানন্দে হন ভোজনরত। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

শব-শিবা-সারমেয় পরিবৃত, শ্মশানচারী ক্ষেপাবাবার মহাজীবনে বহিয়াছে নানা

বিপরীত ভাবের সমাবেশ। কখনো তিনি উন্মাদ, কখনো বালক, আবার কখনো বা আচরণ করেন পিশাচবৎ। কিন্তু শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তস্তলে সদাই বহিতেছে প্রজ্ঞা ও প্রেমের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। এর রস-সম্পদের সন্ধান পায় সেই সাধকের দল—ক্ষেপার কৃপায় যাহাদের আত্মিক দৃষ্টি হইয়াছে উন্মোচিত। মহাতান্ত্রিকের বহির্জীবনের আবরণটি অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর, শুধু ক্ষেত্রবিশেষে কখনো কখনো এটিকে খসিয়া পড়িতে দেখা যায়।

তারাপীঠে এ সময়ে তন্ত্রসাধনার বহু উত্তম অধিকারী একের পর এক উপস্থিত হইতে থাকেন। কৌলবরিষ্ঠ ক্ষেপাবাবার কৃপা-প্রসাদে তন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহাদের অনেকে ধন্য হয়।

ক্ষেপার আবির্ভাবভূমি বীরভূমের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বহুকালের। একদিকে যেমন বেগবতী তন্ত্রসাধনার ধারা এখানে বহিয়া চলিয়াছে, তেমনি আর একদিকে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রেমরসের তরঙ্গভঙ্গ। জয়দেব, চণ্ডীদাস বীরভূমেরই সন্তান। এখানকারই একচাকা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন অবধূত নিত্যানন্দ। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই সাধনক্ষেত্র এই বীরভূম, কিন্তু তন্ত্রসাধনার মধ্য দিয়াই এখানকার অধ্যাত্ম প্রতিভা উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুরোণোক্ত একান্ন শক্তিপীঠের ভিতর পাঁচটি রহিয়াছে এই অঞ্চলে। তা ছাড়া নানা সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠও ইতস্তত এখানে কম ছড়ানো নাই। বশিষ্ঠদেব হইতে শুরু করিয়া বামাক্ষেপা অবধি—উচ্চকোটির সিদ্ধকৌলেরা আবির্ভূত হইয়াছেন এখানকার তারাপীঠে, বিস্তারিত করিয়াছেন তন্ত্র সাধনার আলো। তন্ত্র সাধনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে এই পীঠ যুগ যুগ ধরিয়া কীর্তিত হইয়া আছে।

পুরাণ শাস্ত্রমতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা—ইহারা সবাই তারাসিদ্ধ। সারা ভারতে মহাবিদ্যা তারাদেবীর আটটি সিদ্ধপীঠ চিহ্নিত রহিয়াছে এবং শাক্ত-সাধকদের তপস্যা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া এই পীঠগুলি আজো রহিয়াছে পরম জাগ্রত।

জনশ্রুতি আছে, ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেব তারা-সিদ্ধ হইয়া দেবীর শিলাময়ী প্রতীক এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

তারাপীঠ কিন্তু পুরাণোক্ত একান্ন পীঠের অন্তর্ভুক্ত নয়, সিদ্ধপীঠরূপেই এটি গণ্য। মহাতান্ত্রিক ঋষি বশিষ্ঠদেবই ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর যুগযুগান্তের ধারা বাহিয়া তারাপীঠের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়াছেন সমর্থ শক্তিসাধকের দল, ইঁহাদের অনেকেরই স্মৃতি আজ লোকচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু কৌলসাধনার অন্তঃসলিলা ধারাটি বরাবরই এখানে বহিয়া চলিয়াছে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বের কথা। তারাপীঠে তখন বিশে ক্ষ্যাপা নামে এক বিরাট শক্তিসাধকের আবির্ভাব হয়। ইহার পর আসেন কৌলাচার্য আনন্দনাথ, তিনি ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণের সমকালীন। নানা ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া তারাপীঠের সেবা পরিচালনার ভার নাটোররাজের উপর পতিত হয়, রাজা রামকৃষ্ণও পরম আগ্রহভরে এই

সিদ্ধপীঠের সমস্ত কিছু দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেন। শুনা যায়, তারা-সিদ্ধ মহাপুরুষ আনন্দনাথের নিকট হইতে রাজা রামকৃষ্ণ নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দেশ গ্রহণ করিতেন। কিছুকাল এখানকার পঞ্চমুন্ডী আসনে বসিয়া তিনি তপস্যাও করিয়াছিলেন।

আনন্দনাথের প্রশিষ্য ছিলেন আচার্য মোক্ষদানন্দ। তাঁহার সময়েই তারাপীঠে স্বনামধন্য সাধক কৈলাসপতি বাবার আবির্ভাব ঘটে। এই শক্তিমান্ মহাপুরুষের সাধনার জ্যোতিতেই মহাসাধক ক্ষেপা উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে কৈলাসপতি-বাবা নিজের সাধন-জীবনের ঐশ্বর্য অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, বামাক্ষেপা হন তারাসিদ্ধ। তন্ত্রসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

তারাপীঠের সন্নিকটে আটলা গ্রামে বামাক্ষেপার জন্ম হয়। ক্ষুদ্র এই গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রধানত যজন-যাজন ও ক্ষেত-খামারের আয়ে তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত।

ক্ষেপার পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অতি সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। ঘরে তাঁহার সচ্ছলতা না থাকিলেও অভাব-অনটন তেমন বেশী ছিল না। সর্বানন্দ বড় ধর্মভীরু, পবিত্রচেতা ও সরল মানুষ। অল্প বয়সে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়া তারা-মায়ের আরাধনায় তিনি ডুবিয়া যান। ধর্মপ্রাণা পত্নী রাজকুমারী ও কয়েকটি পুত্র-কন্যা নিয়া তাঁহার সংসার। এই সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্রই বামাক্ষেপা।

১২৪৪ সনের ১২ই ফাল্গুন। ক্ষেপা এই শুভ দিনটিতে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশব হইতেই তিনি আপনভোলা। পবিত্রতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি। এত সরল বলিয়াই প্রতিবেশীরা বলিত 'হাউড়ে'—নির্বুদ্ধি। বিন্দুমাত্র সাংসারিক বোধ যাহার নাই, সংসারী লোকের চোখে বোকা এবং পাগল ছাড়া সে আর কি হইতে পারে? তাহার সরলতা যে জন্মান্তরের তপস্যার ফল তাহাই বা কে বুঝিতে চাহিত।

স্বভাবভক্ত বামাচরণের আচরণ বড় অদ্ভুত। প্রতিবেশীদের ঠাকুরঘরের যত বিগ্রহ সব গোপনে সরাইয়া আনিয়া নদীর তীরে সে পূজার অভিনয় করিত। এই খেলাধুলা সাঙ্গ হইবার পর কোন্ বিগ্রহ কোথায় হারাইয়া যাইত তাহার ঠিক ছিল না। তাই কাহারও বাড়িতে বিগ্রহ হারাইয়া গেলে অমনি খোঁজ পড়িত বামাচরণের। 'হাউড়েকেই' সকলে চাপিয়া ধরিত, আর প্রায়ই ভাগ্যে তাহার জুটিত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা।

বাল্যকালে বামের খেয়ালীপনা ও অন্যমনস্কতার নানা অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। একবার তো তাহার আগুনে পুড়িয়া মরিবার যো-ই হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে এক খড়ের গাদা ছিল তাহার প্রিয় খেলার স্থান। ভাবতন্ময় 'হাউড়ে' পরম নিশ্চিন্তে সেদিন সেখানে বসিয়া আছে, হঠাৎ এক সময় খড়ের গাদার নিচে আগুন লাগিয়া যায়। পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, আগুন কোনদিকে ছড়ায় কে জানে? চারিদিকে মহা শোরগোল। নিচে হইতে খড় সব পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু বামাচরণের সেদিকে কোনো হুঁশই নাই। আগুন নিভাইতে আসিয়া সকলে দেখিল, 'হাউড়ে' এ সময়ে এই খড়ের

গাদার উপর মনের আনন্দে বসিয়া আছে। সৌভাগ্যক্রমে এ অগ্নিদাহে সেদিন তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই।

পাঠশালার পাঠ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু বামাচরণের ভাগ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় কই? ঘরে যে বড় অর্থাভাব।

পিতা সর্বানন্দের সংসার তখন বড় হইয়াছে, অনটনও বাড়িয়াছে। তাই অর্থাগমের জন্য এক নূতন উপায় তাঁহাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। তাঁহার নিজের বেশ সংগীত-প্রতিভা রহিয়াছে। সুমিষ্ট গান যেমন করিতে পারেন, বেহালা বাজাইতেও তেমনই পারদর্শী। পুত্রদ্বয় বাম ও রামেরও সংগীতে দখল কম নয়। ইহাদের নিয়া সর্বানন্দ এক কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন করিলেন।

অভিনয়ে বামাচরণ কখনো কৃষ্ণ কখনো রাম প্রভৃতি সাজেন। ঠাকুর দেবতার বেশে সজ্জিত হইয়া রামায়ণ, কৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীর গাথা তিনি গান করেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়া স্বভাবভক্ত বামের মধ্যে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব আনন্দাবেশ, ভাবতন্ময় বালক এক একদিন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

বামাচরণের পড়াশুনার তেমন বেশী সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অভিনয় করিয়া ও অভিনয় দেখিয়াই ক্রমে ক্রমে ব্যাস-বাল্মীকির পুরাণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হইতে থাকে। তাছাড়া, পাঁচালী, কাশীরাম-কৃত্তিবাসের কাব্য প্রভৃতির মাধ্যমে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীটি তাঁহার গড়িয়া উঠে। কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের সংগীতঝঙ্কার বালক-হৃদয়ে সদাই তোলে অনুরণন। উত্তরকালে এইসব সংগীত ও লীলাআখ্যান ভক্তদের কাছে ক্ষেপা সোৎসাহে গাহিতেন।

বামের বড় ভগ্নী, জয়কালী দেবী বড় ভক্তিমতী। ইঁহার প্রভাবও গোড়ার দিকে তাঁহার জীবনে অনেকটা পড়িয়াছিল। দিদি ছিলেন সত্যকার এক সাধিকা। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তিনি সন্ন্যাসিনী হন, যৌবনে তারাপীঠে গিয়া কিছুকাল সাধনাও করেন। তারপর আটলা গ্রামে মায়ের কাছে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। শুনা যায়, তারা-সাধিকা এই নারী একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজের দেহরক্ষার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তারাপীঠে তাঁহাকে বহন করিয়া আনার পর তারা-নাম জপিতে জপিতে তাহার লোকান্তর ঘটে।

উত্তরকালে কখনো এ কথার উল্লেখ করিলে বামের আয়ত নয়ন দুটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। বলিতেন, "দিদি আমার বড় আশ্চর্য মেয়ে ছিলেন গো, তাঁর মরণটা ঘটলো আশ্চর্য রকমে।"

দিদির ধর্মজীবনের স্পর্শ বালক বামাচরণের জীবনে, গোড়ার দিকে, নূতন পথের ইঙ্গিত আনিয়া দিয়াছিল।

প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার ছিলেন নাটোর-রাজের কর্মচারী। তারা মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার তখন তাঁহার উপর অর্পিত। তারাপীঠের তন্ত্রসাধক কৈলাসপতি বাবার পায়ের ধূলা প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে পড়িত। সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তখন কৈলাস-

পতির খ্যাতির সীমা নাই। সরকার মহাশয়ের গৃহে তিনি আসিলেই বাম কি যেন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। এই মহাপুরুষের ছোটখাট সেবাযত্নের ভার পাইলে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিত না। তিনিও বালককে প্রায়ই ডাকিয়া পাঠাইতেন, স্নেহসম্ভাষণ ও আদরযত্ন করিতেন। শক্তিসাধনার যে অংকুরটি বামাচরণের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা কৈলাসপতি বাবার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

বামাচরণ যখন পিতৃহারা হন তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। কৃষ্ণযাত্রার দলটি ভাঙিবার পর জননী রাজকুমারী দেবীর মাথায়ও আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। সর্বানন্দের চেষ্টায় কোনো প্রকারে এতদিন দিন গুজরান হইতেছিল, এইবার তাঁহার অভাবে এতগুলি পোষ্য নিয়া তিনি বিষম বিপাকে পড়িলেন। সামান্য জোতজমি যাহা রহিয়াছে তাহাতে মোটেই কুলায় না। তদুপরি 'হাউড়ে' বামার সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে বিপদ বাড়িয়াই চলে।

কৃষাণেরা জমিতে কাজ করিতে আসে। জননী বামাকে মাঠে পাঠাইয়া দেন, সে তাহাদের খাবার দিয়া আসিবে, তত্ত্বাবধান করিবে। বাম নিত্যকার কাজে উপস্থিত হন ঠিকই, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আকাশের দূর দিগন্তে। আকাশ-তারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা সময়টা কাটাইয়া দেন। মাঠের কাজ মাঠেই পড়িয়া থাকে, কৃষাণদের খাবার প্রায়ই সময় মতো পৌঁছায় না। ফলে রুষ্ট হইয়া মায়ের কাছে তাহারা রোজ অভিযোগ জানাইতে আসে। মা বুঝিতে পারেন, এ হাউড়ে ছেলেকে দিয়া তাঁহার কোনো কাজ চলিবে না।

সংসার চালানো কঠিন হইয়াছে, রাজকুমারী তাই নিরুপায় হইয়া দুই ছেলেকে তাহাদের মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মাতুল পাকা বিষয়ী, ভাগিনেয়দের বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়া নিজের অর্থ অপচয় করিতে তিনি রাজী নন। তাই তাহাদের গোচারণে লাগাইয়া দিলেন।

মাঠে গিয়া বামাচরণ আপন ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকেন, আর তাঁহার এ উনমনস্কতার সুযোগ নিয়া গরুগুলি নির্বিচারে শস্য নষ্ট করে। দিনের পর দিন লোকের অভিযোগে মাতুল অস্থির হইয়া উঠেন, বামের উপর চলিতে থাকে নির্যাতন।

দুঃখিনী মা সব কথাই শুনিলেন, হতভাগ্য পুত্রদের গৃহে ফিরাইয়া না আনিয়া আর উপায় রহিল না। ভাইকে নিয়া বামাচরণ স্বগ্রামে আটলায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানে পৌঁছিয়া তাঁহার ভাবান্তর দেখা দেয় আরও ব্যাপকভাবে—জাগতিক সকল কিছু কাজেই দেখা যায় কর্মবিমুখতা। গোচারণ, চাষবাস, হাটবাজার কোনকিছুই আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়, সাংসারিক জীবনের উপর আসিয়া গিয়াছে প্রবল নিরাসক্তি।

শুধু দেখা যায়, দেবী পূজাতে বামাচরণের পরম উৎসাহ। ইহাতে কোনো বিধি-বিধান, শুদ্ধাচার অথবা মন্ত্রতন্ত্রের বালাই তাঁহার নাই। চাঁপা, করবী, ঘেঁটফুল—পথ চলিতে যাহা মিলে তাহাই কচুপাতায় সাজাইয়া সানন্দে তিনি তারা-মায়ের নামে

অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দেন। 'মা-তারা' নিনাদে গ্রামের পথঘাট মুখরিত হয়। স্বভাব-সরল হাউড়ে বামার জীবনের সাথে, তাঁহার সারা অস্তিত্বের সাথে, ওতপ্রোত হইয়া উঠে তারা-মায়ের দিব্য সত্তা। সবার অলক্ষ্যে, নিজেরও অজ্ঞাতে, তরুণ সাধক এবার হইয়া উঠেন তারা-ময়।

আপন খেয়ালখুশিতে বামাচরণ গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও বা আচম্বিতে তারাপীঠে তারামায়ের মন্দিরে ছুটিয়া চলিয়া যান। যুগ যুগ ধরিয়া এখানকার শিলাসনে মায়ের পাদপদ্ম দুটি অঙ্কিত রহিয়াছে, পাগল বামাচরণ তাহার উপর ঢালিয়া দেন রাশি রাশি বুনোফুল আর বেলপাতার অঞ্জলি।

তারাপীঠের শ্মশানে তখন বহু তন্ত্রসাধকের আনাগোনা। তাছাড়া, এখানকার প্রধান কৌলপদে রহিয়াছেন মোক্ষদানন্দ। সিদ্ধ মহাপুরুষ কৈলাসপতি বাবাও এখানে উপস্থিত। তারাপীঠে গেলেই বামাচরণ এই মহাত্মাদের স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করিয়া ধন্য হন।

কৈলাসপতি বাবার দিব্যদৃষ্টি সজাগ সতর্ক প্রহরীর মতো নিরন্তর তাঁহাকে যেন বেষ্টন করিয়া রাখে। স্নিগ্ধমধুর মমত্বে ও আদর-যত্নে কৈলাসপতি বামাচরণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তারাপীঠ শ্মশানে না আসিলে তাই তাঁহার স্বস্তি নাই। অজানা অমোঘ এক আকর্ষণে বার বার তিনি মহাশ্মশানে ছুটিয়া আসেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই সিদ্ধকৌলের কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। প্রাণ ঢালিয়া রত হন তাঁহার সেবা পরিচর্যায়।

কিছুদিন পরের কথা। তারা-মায়ের জন্য বাম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। হাউড়েকে লোকে এবার তাই ডাকিতেছে 'ক্ষ্যাপা' নামে। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, অন্তরে দেখা দিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা। মাতৃদর্শনের জন্য তিনি অধীর। জননী রাজকুমারীর শঙ্কার অবধি নাই, সতর্কভাবে বামকে তিনি ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পাগল ছেলে কখন কোথায় উধাও হইয়া যায়, কে জানে?

ক্ষেপা কখনো আপন ঘরে বসিয়া নিভৃতে তারাদেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, কখনো বা ধ্যানের পর জাগে ইষ্ট বিচ্ছেদের দুঃসহ যন্ত্রণা, 'তারা—তারা' বলিয়া জ্ঞানহারা হইয়া যান।

বড় অদ্ভুত তাঁহার এই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। কখনো দেখা যায় চক্ষুতারকা দুইটি ঊর্ধ্বে স্থির হইয়া গিয়াছে, দেহটি নিঃসাড়, মুখ দিয়া অবিরত ফেনা নির্গত হইতেছে। ভীত হইয়া জননী তাড়াতাড়ি প্রতিবেশীদের ডাকিয়া জড়ো করেন।

পুত্র সংবিৎ পাইলে বামাচরণকে কত অনুনয় করিয়া বুঝান, "ওরে, এই সংসারের ভার আর কে বইবে বল? তোদের সবাইকে নিয়ে এবার যে অন্নাভাবে মরতে হবে।"

মাতৃভক্ত বাম মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠেন। মাকে প্রবোধ দেন, "বামুনের ছেলে কোথাও কি একটা ঠাকুর পুজোর কাজ জুটবে না? ঘুরে এলে রোজগার হবেই—তুমি ভেবো না, মা।"

কাজের চেষ্টায় বাম বাহির হইলেন। কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনই নিরাসক্ত। অন্তরে সদাই তৈলধারাবৎ চলিতেছে মা-তারার স্মরণ-মনন-ধ্যান। আপনভোলা এই পাগল কি করিয়া পূজো অর্চনা যথানিয়মে করিবেন?

এক জায়গায় দুই চারিদিন পূজারীর চাকুরী করিলেন। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিয়া আটলায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

ইষ্টদেবীর অবিরাম স্মরণ-মননে বাম তখন উন্মাদ সাধুতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। জগজ্জননীর অমৃতসত্তার আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, পাগল হইয়াছেন পরম প্রাপ্তির জন্য।

ইষ্টদেবী তারা-মা এবার এ পরম অধিকারী সাধককে জানাইলেন আহ্বান। ক্ষেপা বামের পূর্বজন্মের সাধন-সংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে, আন্তর সাধনার ফলটিও হইয়াছে পরিপক্ক। বৈরাগ্যের পাগলা হাওয়ায় সংসারের যোগসূত্রের শীর্ণ বোঁটা, এবার খসিয়া পড়িল। ঘর-সংসার সব কিছু ঠেলিয়া ফেলিয়া তিনি সেদিন তারাপীঠের মহাশ্মশানে ছুটিয়া চলিলেন।

বালুকাময় শ্মশানভূমি বিধৌত করিয়া খরস্রোতা দ্বারকার জল ছুটিয়া চলিয়াছে। বন্যার জলোচ্ছ্বাসে সেদিন তাহার বুকে নামিয়াছে উত্তাল উদ্দামতা। বৈরাগ্যচঞ্চল বামাচরণের হৃদয়ও তেমনি হইয়া উঠিয়াছে তরঙ্গায়িত। অধীর হইয়া তিনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন, সাঁতার কাটিয়া পৌঁছিলেন অপর তীরে।

বালুচরের ভাঙা ঘাটের নিকটেই কৈলাসপতিবাবার কুটির। ভাবোন্মত্ত বামাচরণ তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন।

তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ সেদিন যেন তাঁহারই অপেক্ষায় ছিলেন। গৃহত্যাগী তরুণকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বাবা বামাচরণ, অস্থির হ'য়ো না। যে পরম ধন পাবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়েছ, তা শিগ্‌গীরই মিলবে। তুমি যে তারা ব্রহ্মময়ীর কৃপার উত্তম অধিকারী।"

এখন হইতে ক্ষেপা তারাপীঠের মহাশ্মশানেই রহিয়া গেলেন। কৈলাসপতির সান্নিধ্যে দিনগুলি তাঁহার মধুময় হইয়া উঠিল, শ্মশানে ও দ্বারকাতটে দিনের পর দিন মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান, কৈলাসপতির কাছে নির্দেশাদি নিয়া মা-তারার ধ্যানে মগ্ন হন। রাত্রির আকাশে তাঁহার মাতৃনামের আরাবে মুখরিত হইয়া উঠে।

কৈলাসপতি ছিলেন ঋদ্ধি-সিদ্ধিযুক্ত সাধক। বহুতর চমৎকার বিভূতির লীলা প্রায়ই ক্ষেপা তাঁহার মধ্যে দেখিতেন। একবার সবিস্ময়ে দেখিলেন, দ্বারকা নদীতে বন্যার ঢল নামিয়াছে, পারাপারের উপায় নাই। কি আশ্চর্য! এ সময়ে ওপার হইতে কৈলাসপতি অবলীলায় খড়ম পায়ে হাঁটিয়া এপারের সৈকতে অবতরণ করিতেছেন।

আর একবারের কথা। কৈলাসপতি বাবা সেদিন সদ্য ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন। শ্মশানের পাশেই রহিয়াছে মরা তুলসীর ঝাড়। এটি দেখাইয়া ক্ষেপাকে কহিলেন — "ক্ষেপা, [illegible] মৃত না জীবিত?"

"বাবা [illegible] যে একেবারে শুকনো, মরা গাছ।"

'জী[illegible] মৃত্যু কিন্তু একই বাবা—তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" একথা বলিয়া

মহাপুরুষ কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই প্রাণহীন শুষ্ক তুলসীর ঝাড় সিদ্ধ তন্ত্রসাধকের মুখনিঃসৃত বাণীর ফলে সেদিন ধীরে ধীরে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। উত্তরকালে এ ধরনের নানা কাহিনী ক্ষেপা বলিতেন, গুরুদেবের অলৌকিক বিভূতিলীলা বর্ণনা করিতে করিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, আর তাঁহার আয়ত নয়ন দুটি ভরিয়া উঠিত পুলকাশ্রুতে।

সাধক হিসাবে বামাচরণ অনন্যসাধারণ—এক পরম শুদ্ধ আধার। নিবিড় স্নেহে কৈলাসপতিবাবা তাই তাঁহাকে বুকে টানিয়া নিয়াছেন। কৌলমার্গের নিগূঢ় মন্ত্র ও ক্রিয়াদির ভিতর দিয়া শুরু করাইয়াছেন বামাচরণের শক্তি-সাধনা।

এদিকে পাগলা ছেলের জন্য রাজকুমারীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই—আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়াছে। ক্ষেপা তারাপীঠে গিয়া সন্ন্যাস নিয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া তিনি ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিলেন। বার বার বুঝাইতে লাগিলেন, নিতান্ত অপরিণত বয়স তাঁহার—শুধু শুধু কেন এই দুশ্চর তপস্যার পথে আসা? তাছাড়া, ভূতপ্রেত শব-শিবা সঙ্কুল এই শ্মশানে কে প্রতিদিন তাঁহার দেখাশুনা করিবে? কে আহার যোগাইবে? অসুখে বিসুখে শুশ্রূষাই বা করিবে কে? এদিকে সংসারের অভাব-অনটন চরমে পৌঁছিয়াছে। মা ও ভাই-বোনেরা প্রায়ই থাকে অর্ধাসনে, তাহাদের ভারই বা কে নিবে?

শ্মশানচারী ক্ষেপা তখন তারা-ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ মন প্রাণ সাধনার গভীরে নিমজ্জিত। জননীর ক্রন্দন কিছুটা কানে পৌঁছিল, কিছুটা পৌঁছল না।

এবার প্রিয় শিষ্য ক্ষেপার সমর্থনে অগ্রসর হইয়া আসিলেন কৈলাসপতি। সমগ্র বীরভূম অঞ্চলে তখন এই মহাপুরুষের বিরাট প্রভাব, ক্ষেপার জননীও তাঁহাকে কম সমীহ করেন না।

কৈলাসপতি ক্ষেপার জননীকে কহিলেন—"মা, তোমার এ ছেলে যে নিত্যমুক্ত, পরম বৈরাগ্যবান্ পুরুষ। দেখছো তো, আজ অবধি তোমার সংসারে সে কোনো কাজেই আসে নি। কারণ, সংসার তার জন্য নয়। এখন ঘরে ফিরে গেলেও তোমার কোনো কাজেই সে লাগবে না। অধ্যাত্মসাধনার পথে যে বিরাট সম্ভাবনা তার রয়েছে, তা যে তাকে ফলাতে হবে। অগণিত মুমুক্ষুকে তোমার এই ছেলে মুক্তিদান করবে, বহুজনের কল্যাণ হবে তার এই সাধক-জীবনের ভেতর দিয়ে। আমি বলছি, এ ছেলের সাধনা ও সিদ্ধিতে তোমার কুল পবিত্র হবে, ধন্য হবে। কোনো ভয় নেই মা, তোমার হাউড়ে ছেলের ভার আজ থেকে আমিই নিয়ে নিলাম।" জননী সাশ্রুনয়নে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্ষেপা তো ঘর-সংসার সব কিছু ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু জননী ও ভাই-ভগিনীদের কি উপায় হইবে? কি করিয়াই বা তাহাদের ভরণপোষণ চলিবে? প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার তারা-মন্দিরের কর্মচারী। নিঃসহায়া রাজকুমারীর সংসার যাহাতে চলে সেজন্য তিনি উদ্যোগী হইলেন। স্থির হইল, বামাচরণ তারাদেবীর অর্চনার জন্য রোজ ফুল সংগ্রহ করিবেন, এজন্য মাসে তাঁহাকে কয়েকটা টাকা দেওয়া যাইবে। [illegible] ইহা দিয়া মায়ের কিছুটা সাহায্য হইবে।

কিন্তু ক্ষেপাকে নিয়াই যত গোল বাধিল। বাহ্য জীবনের সমস্ত কিছু কাজকর্মের অতীত তিনি। ফুলের সাজি নিয়া রোজ বাগানে যান, কোনো কোনো দিন ফুল তোলার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়—বেহুঁশ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাঙাজবার ডালটি ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। রক্তজবা দেখিলেই মনে পড়িয়া যায় তারামায়ের রাতুল চরণ, অমনি ভাববিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। মন্দিরের পূজারীর হইয়াছে বিপদ। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি গালাগালি দেন তারপর নিজেই ফুল তুলিয়া আনিয়া কাজ চালান।

দুর্গাদাস ভাবিলেন, ক্ষেপার হয়তো এ কাজ ভালো লাগিতেছে না, তারা-মায়ের মন্দিরের কাজে তিনি বেশী আনন্দ পাইবেন, মনোযোগও হয়তো দিবেন। নূতন কাজ শুরু হয়। এবার হইতে তাঁহার উপর ভার পড়ে মন্দিরের কাজের জন্য উপচার সংগ্রহ করার, চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগাড় তৈরি করার।

কিন্তু আত্মসমাহিত সাধকের পক্ষে এ কাজই বা সম্ভব হয় কই? মাতৃধ্যানে সদা বিভোর বাম কোনো কাজই করিতে পারেন না। বেহুঁশ অবস্থায় পূজার উপকরণ এক একদিন নষ্ট করিয়া ফেলেন, অদৃষ্টে জুটে তীব্র ভর্ৎসনা।

দুর্গাদাস বুঝিলেন, বাহিরের বন্ধন টুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপার বাহিরের কাজও ঘুচিয়া গিয়াছে—তাই এই কর্মবিমুখতা। সবাইকে বলিয়া দিলেন, এখন হইতে ক্ষেপার কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকিবে না। কেউ কোনো কাজের ভার যেন তাহাকে না দেয়, সে ইচ্ছামতো কাজ করিবে ও মায়ের কাছে পড়িয়া থাকিবে।

তারা-মায়ের ছেলে তারা-মায়েরই সঙ্গে মহাশ্মশানে চিরদিনের জন্য রহিয়া গেলেন। ইহার পর আপনভোলা ক্ষেপার সাধন-জীবনে দেখা দিল চরম বৈরাগ্যের পালা।

শরীরের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই, আহার-বিহারেও দেখা যায় যদৃচ্ছাচার। মাথা গুঁজিবার জন্য যে একটা পর্ণকুটিরের প্রয়োজন, সে বোধও তাঁহার আজ আর নাই। নিচে তারা-মায়ের সিদ্ধপীঠ মহাশ্মশান, আর উপরে উদার আকাশের মহাবিস্তার। মুক্ত বিহঙ্গের মতো ক্ষেপা এখানে স্বেচ্ছাবিহার করিতে থাকেন। মাথার উপর দিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপ অলক্ষে চলিয়া যায়। আনন্দময়ী মায়ের ধ্যানানন্দে তিনি দিন-রজনী যাপন করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে দেখা দিল এক দুর্দৈব। কিছুদিন রোগভোগের পর জননী রাজকুমারী দেহত্যাগ করিলেন।

ক্ষেপা সেদিন শ্মশানঘাটে স্নান করিতে নামিয়াছেন। দেখিলেন, ওপারে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচরণ জননীর মৃতদেহ নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষাবিক্ষুব্ধ উত্তাল নদী পার হওয়া সহজ নয়, তাই নদীর অপর তীরেই দাহকার্যের ব্যবস্থা চলিতেছে।

মুহূর্তমধ্যে ক্ষেপার অন্তরে খেলিয়া যায় চিন্তার বিদ্যুৎচমক। সেকি কথা? জননীর সৎকার কি তারা-মায়ের সিদ্ধপীঠের এ শ্মশানে সম্পন্ন হইবে না? দেহাস্থি

তাঁহার তারাপীঠের পবিত্র ক্ষেত্রে রাখা হইবে না? তীব্র উত্তেজনায় সাধক বামাচরণের ভিতরকার 'ক্ষেপা' এবার জাগিয়া উঠিল।

ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "মা-তারা, দেখিস, আমার মা যেন তোর এ শ্মশানে ঠাঁই পায়।" সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোতা দ্বারকা নদীতে দিলেন ঝাঁপ। শবদেহটি তাঁহাকে যে এপারের এই পবিত্র সিদ্ধপীঠে নিয়া আসিতেই হইবে।

শবযাত্রীরা অপর তীরে চিতায় অগ্নিসংযোগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় ক্ষেপাকে সাঁতরাইয়া আসিতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। কি কাণ্ড সে ঘটাইবে তাহা কে জানে।

ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতরাইয়া ক্ষেপা ওপারে পেঁছিলেন, মায়ের শব-দেহটি কাড়িয়া নিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তারপর একখণ্ড বস্ত্র দিয়া উহা পিঠে বাঁধিলেন, খরস্রোতা দ্বারকার জলে দিলেন ঝাঁপ। আত্মীয়স্বজন ও শ্মশানবন্ধুর দল এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন।

উত্তাল তরঙ্গবক্ষে সন্তরণ করিয়া নয়, তারানামের তরীতেই যেন ক্ষেপা সেদিন বন্যা-বিক্ষুব্ধ নদী পার হইয়া আসেন।

তারাপীঠের পবিত্র ভূমিতে জননীর দেহ দাহ করার পর তাঁহাকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়।

মায়ের সৎকারের পর কিছু দিন কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষেপা পূর্বের মতোই আনন্দে শ্মশানে স্বেচ্ছাবিহার করিতেছেন। আদ্যশ্রাদ্ধের আর মাত্র দুই দিন বাকী। হঠাৎ সেদিন কনিষ্ঠ রামচরণকে আদেশ দিয়া বসিলেন, "ওরে দেখ, মায়ের শ্রাদ্ধ কিন্তু অমনি ফাঁকি দিয়ে করবিনে। ক'খানা গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দে।"

রামচরণ চমকিয়া উঠিলেন। দাদার এ আবার কোন পাগলামি? ঘরে এক কানাকড়িও নাই, অতিকষ্টে দিন চলিতেছে, তবে এত লোক খাওয়ানোর প্রশ্ন কি করিয়া আসে?

দাদার খেয়ালীপনা তিনি জানেন, তাই কথার কোনো উত্তর দিলেন না। প্রতিবেশীরাও অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া একথা উড়াইয়া দিলেন, অনেকে শ্লেষের হাসিও হাসিলেন। কিন্তু ক্ষেপার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ, জননীর শ্রাদ্ধে সমারোহ করিতে হইবে, বহু লোককে ভোজন করাইতে হইবে। আটলাতে গৃহের সংলগ্ন একখণ্ড পতিত জমি রহিয়াছে, ক্ষেপা নিজ হাতেই একদিন তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিলেন। ভাবখানা এই—সমাজ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত তাঁহার দিক দিয়া একেবারে স্থির, নড়চড় হইবার জো নাই।

শ্রাদ্ধকার্যের দিন কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। ক্ষেপা পূর্ববৎ শ্মশানে বসিয়া আছেন, আর এদিকে ভারে ভারে বহু উপচার ও খাদ্যসম্ভার আটলায় রামচরণের নিকটে আসিয়া পেঁছিতেছে। তরুণ সাধক ক্ষেপার জানা অজানা সুহৃদ ও ভক্তজনের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের যেন বান ডাকিয়াছে। প্রচুর ভোজ্য দ্রব্যে গৃহ প্রাঙ্গন ভরিয়া উঠিল। এ যেন এক ইন্দ্রজাল।

শ্রাদ্ধের দিন গৃহে শত শত অতিথি আসিয়া জড়ো হইয়াছেন। ভ্রাতা রামচরণ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি সব শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার ব্রাহ্মণ ভোজনের পালা।

বর্ষার মেঘগম্ভীর আকাশ হঠাৎ এ সময়ে বড় বিরূপ হইয়া উঠিল। তবে কি প্রবল ঝড়বৃষ্টি আসন্ন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিবে? মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে তবে কি বিঘ্ন ঘটিবে? ভয়ে ভাবনায় রামচরণ মুষড়িয়া পড়িলেন।

এদিকে তারাপীঠের শ্মশানে বামাক্ষেপা রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। আকাশে হঠাৎ মেঘসমারোহ দেখিয়া তিনি উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। জননীর পারলৌকিক কার্য সুসম্পন্ন হইবে না? সে কি কথা? দ্রুতপদে উপস্থিত হইলেন শ্রাদ্ধবাসরে।

ক্ষেপাকে দেখিয়াই রামচরণ কাঁদিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দাদা, শ্রাদ্ধের এ বিরাট আয়োজন তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে? ঐ দ্যাখো, ঝড়-বৃষ্টি তেড়ে আসছে। মায়ের কাজ কি পণ্ড হবে?"

ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া ক্ষেপা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমার তার মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতদের ভোজনে কোনো বিঘ্ন হবে না, তুই শান্ত হ্‌।"

এবারে উচ্চ স্বরে তারা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষেপা ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। অঙ্গনে বহু লোকের সমাবেশ। এ সময়ে তরুণ শক্তিসাধকের অলৌকিক বিভূতি প্রকাশিত হইতে দেখা গেল। আটলা গ্রামের নিকটে ও দূরে সর্বত্র তখন ঝড়-বাদলের প্রচণ্ড মাতামাতি। অথচ শ্রাদ্ধবাসরে এক ফোঁটা বারিপাতও হইল না। কয়েকখানা গ্রামের লোক ভোজনে বসিয়াছে; তাহাদের ভূরিভোজনের মধ্য দিয়া ক্ষেপার মায়ের কাজ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ক্ষেপার এ অলৌকিক সিদ্ধাই সেদিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

সন্ন্যাসের পর হইতেই শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ক্ষেপা তন্ত্র সাধনার নানা অভিচার ও ক্রিয়া-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে থাকেন। তন্ত্রসিদ্ধ, শক্তিধর মহাপুরুষ কৈলাসপতিবাবা ও মন্দিরের প্রধান কৌলাচার্য মোক্ষদানন্দের পদতলে বসিয়া তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলে। ক্রমপর্যায়ে তন্ত্রোক্ত সমস্ত কিছু ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান তিনি শেষ করিতে থাকেন। শক্তির পর শক্তির স্তর অবলীলায় তিনি অতিক্রম করিয়া যান। তাঁহার সাধনার এ অগ্রগতি প্রবীণ আচার্যদেরও বিস্মিত করিয়া তোলে।

ক্ষেপা শুদ্ধসত্ত্ব, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, শক্তিসাধনার পথে সবেগে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু বাহ্য মৈথুনাদির প্রয়োজন এ দিব্যাচারী সাধকের কখনো হয় নাই। সিদ্ধদেহের ভিতরে উদ্‌গত হইয়াছে যে অমৃতময় রসধারা তাহাই করিয়াছে তাঁহাকে সাহায্য। ক্ষেপাকে তাই বলিতে শুনা যাইত, "তারা-মা বড় আশ্চর্য ভৈরবী।"

মানুষের ভিড় এড়ানোর জন্য ক্ষেপা প্রায়ই এক অদ্ভুত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার আচার-বিচারহীন ভীম, ভৈরব ভঙ্গীর অন্তরালে লুকানো থাকিত পরম দিব্যভাব ও দিব্যাচার। তারা ব্রহ্মময়ীর আসনটি ছিল তাঁহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কারের বলে, কঠোর তপস্যার বলে, এবার তাঁহার জীবনে ঘটিতে থাকে বিস্ময়কর রূপান্তর।

ক্ষেপার কারণ-পান ছিল যেন কুলকুণ্ডলিনীতে কারণ হোমের অনুষ্ঠান। কিন্তু কারণের দাস কখনও তিনি ছিলেন না। ভক্তেরা সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সুরা আনয়নের হুকুম হইত। এজন্য ব্যগ্রতাও হয়তো দেখাইতেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত পরিমাণে এ বস্তু পান করিলেও কখনো তাঁহার ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

ক্ষেপা চিরকুমার সন্ন্যাসী। সাধনজীবনে কখনো বাহ্য ভৈরবী গ্রহণের আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন নাই। সে-বার কিন্তু তারাপীঠে এক ভৈরবী আসিয়া উপস্থিত। ভৈরবীটি তরুণী ও রূপলাবণ্যবতী। ক্ষেপার প্রতি এই সাধিকা এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করিতে থাকে, তাঁহাকে বশ করার জন্য নানা ছলনারও আশ্রয় নেয়।

একদিন নিশীথ রাত্রে রমণী নিভৃতে তাঁহার কুটিরে উপস্থিত হয়, নীরবে পদসেবা শুরু করিয়া দেয়। ক্ষেপা চমকিয়া উঠেন, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "মা, আমার ভৈরবীতে দরকার নেই। আমার এখানে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।"

সাধিকা রমণীটি কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সেখান হইতে নড়িবার কোনো আগ্রহ তাহার দেখা গেল না। ক্ষেপা এবার নিজের উগ্রমূর্তি প্রকাশ করিলেন, রোষদৃপ্ত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দাঁড়া বেটি, আমার চিমটা নিয়ে আসছি।" এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভৈরবী ভীত হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়ে। কৃপালু ক্ষেপার আশীর্বাদে অতঃপর তাহার জীবনে ঘটে আধ্যাত্মিক রূপান্তর।

বামাক্ষেপা সত্যসত্যই কামজয়ী পুরুষ কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য তারাপীঠের তহশীলদার একবার এক সুন্দরী বারাঙ্গনাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু মহাপুরুষকে প্রলুব্ধ করার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সেদিন গভীর রাত্রিতে ক্ষেপা শ্মশানে রহিয়াছেন, এমন সময় এই গণিকা হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। নির্লজ্জা নারী কিন্তু ক্ষেপার পুরুষাঙ্গটি খোঁজ করিতে গিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। সে দেখে, মহাপুরুষের এ অঙ্গটির কোনো চিহ্নই নাই। ইন্দ্রজাল বলে দেহ হইতে উহা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেপা এতক্ষণ ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়াছিলেন। এবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। তারপর 'আমার মা এসেছিস, মা এসেছিস' বলিয়া বালকবৎ উৎসাহে সেই নারীর স্তন্য পান করা শুরু করিলেন। সে কি তীব্র শোষণ। ইহার ফলে স্তন হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে রক্তধারা। ক্ষণপরে "মলাম মলাম" বলিয়া চিৎকার করিয়া রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যায়। গণিকাটির জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ক্ষেপাবাবা সস্নেহে তাঁহাকে কাছে ডাকেন, শান্তস্বরে বলেন, "নে মা, এখন ঘরে যা। ছেলের-সঙ্গে আর কখনো এমনটা করিস নে।"

মহাপুরুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া ভয়বিহ্বলা রমণী বলিতে থাকে, "বাবা, আমার পাপের যে অন্ত নেই, বলে দাও আমার কি গতি হবে? আমায় তুমি কৃপা ক'রে উদ্ধার করো।"

আশ্রিতের করুণ ক্রন্দনে ক্ষেপা বিগলিত হইয়া গেলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, এখন যা মা, তারা-মা তোকে কৃপা করবে।"

মহাপুরুষের অঙ্গ স্পর্শের পর হইতে ঐ গণিকা পবিত্র জীবন যাপন শুরু করে।

শিমুলতলার পঞ্চমুণ্ডী আসনে ক্ষেপা প্রায়ই ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন। শক্তিধর আচার্যদ্বয়ের কৃপায় তিনি পরিণত হইয়াছেন উচ্চকোটির সাধকে, তারামন্ত্রে হইয়াছেন সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর সঙ্গে এখন তাঁহার বড় অন্তরঙ্গতা।

ইতিমধ্যে একদিন মহাশ্মশানের ধারে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। তন্ত্রাচার্য কৈলাসপতিকে ক্ষেপা প্রায়ই গঞ্জিকা সাজিয়া দেন। সজ্জিত কল্কেটি প্রতিদিনের অভ্যাসমতো বাবা-মহারাজ প্রথমে তাঁহার ইষ্টদেবীকে নিবেদন করেন, তারপর নিজে গ্রহণ করেন। ক্ষেপা তাঁহার প্রসাদ পান।

সেদিন আদেশমতো ক্ষেপা গুরুর কল্কেটি সাজিয়া আনিয়াছেন, কৈলাসপতিও চক্ষু মুদিয়া উহা ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিতেছেন। এই অবসরে ক্ষেপা নিশ্চিন্ত আরামে গঞ্জিকার কল্কেটি উঠাইয়া সেবন শুরু করিয়া দিলেন।

এ কি কাণ্ড! কৈলাসপতি চমকিয়া উঠিলেন। একনিষ্ঠ শিষ্য ক্ষেপা তো এভাবে কখনো গুরুর মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এ যে অসম্ভব। এই বিপরীত আচরণের কারণ খুঁজিতে গিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দেবী সংকেত। গুরু বুঝিলেন, যে বীজ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন তাহা লাভ করিয়াছে বনস্পতির পূর্ণ পরিণতি।

কৈলাসপতি মনে মনে বিচার করিলেন—কথাটা সত্যই এবার ভাবিবার। বাম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবার দুই সিদ্ধ কৌলের এক শক্তিপীঠে থাকার তো প্রয়োজন নাই। বেশ তো, ক্ষেপার সাধনা তাঁহার নিজস্ব পথে চলুক, গুরুশিষ্যে একত্রে আর বাস করা নয়।

আননে আত্মতৃপ্তির হাসি টানিয়া কৈলাসপতি শুধু বলিলেন, "বাবা, তা হলে তোমাকেই যে এখানকার ভার নিয়ে এবার বসতে হয়। আমি আজ তবে চলি।"

ক্ষেপা উত্তরকালে বলিতেন, "গুরু আমার যেন পাখির মতন আকাশে উড়ে চলে গেলেন।" সন্ধ্যাকাশের অপসৃয়মান রক্তিম আভা তখন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মহাসাধক কৈলাসপতিবাবা তারাপীঠ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। অনেকে বলিত, তিনি কৈলাসের পথে গিয়াছেন; কিন্তু কোনো সন্ধান তাঁহার আর মিলে নাই।

মোক্ষদানন্দও ইহার পর বিদায় নেন। অতঃপর ক্ষেপাবাবাই বৃত হন তারাপীঠের প্রধান কৌলপদে। পীঠস্থলীর অধিনায়কত্ব তিনি করিতেন বটে, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ খাদ্যাখাদ্য, জাত-বেজাতের কোনো বালাই ছিল না। দেবতা ও মানুষে, মানুষ ও কুকুরে তাঁহার যেমন ভেদজ্ঞান ছিল না, দেবভোগ্য প্রসাদে আর পশুর খাদ্যেও তেমন রুচি-অরুচির প্রশ্ন কখনো উঠিত না। সমগ্র সত্তা তখন এক দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ—পরম অখণ্ড বোধে সব কিছু একাকার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট ক্ষেপা প্রিয় কুকুরদের সঙ্গে হুটোপুটি করিয়া তাহাদের খাদ্য খাইতেছেন। আবার কখনো বা তাঁহার জন্য রক্ষিত প্রসাদান্ন প্রিয়

পারিষদ কেলো ভুলো প্রভৃতি কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইতেছেন। আচমনের যেমন বালাই নাই, স্নানশুদ্ধির প্রয়োজনও তাঁহার কাছে তেমনই নিরর্থক হইয়া গিয়াছে।

তারামন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া সারা রাত্রি ক্ষেপা 'তারা-তারা' আরাবে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তোলেন। আবার মাঝে মাঝে দেবীবিগ্রহের সম্মুখে হন তিনি সমাধিমগ্ন। সমাধি ভাঙিয়া যায়, ক্ষেপা অনেকক্ষণ অবসন্ন দেহে জড়বৎ বসিয়া থাকেন। এ অবস্থায় শুচি-অশুচির ভেদজ্ঞান কিছুই নাই। এক একদিন এই অবস্থায় মন্দির-প্রকোষ্ঠ ক্ষেপার মলমূত্র ও থুতুতে নোংরা হইয়া উঠিত, দুর্গন্ধে কাহারও কাছে যাইবার উপায় থাকিত না। খণ্ড ও অখণ্ডের সীমারেখা তাঁহার কাছে বিলুপ্ত, ভেদবুদ্ধির পরপারে নিরন্তর তিনি করিতেছেন অবস্থান। তারা মায়ের কোলের আদরের সন্তান ক্ষেপা। তাই তো বাহ্য আচার-আচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্রই নাই।

কিন্তু মহাপুরুষের এই বালকবৎ এবং পিশাচবৎ ভাব সংসারের সাধারণ জীব বুঝিতে চাহিবে কেন? মন্দিরের কর্মচারীরা ক্ষেপাকে একদিন কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। তারাপীঠের একদল লোক তুমুল আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়—ক্ষেপা তারামায়ের মন্দির অপবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

নাটোররাজের কর্মচারীদের মনে অনুরূপ ঘটনার স্মৃতি জাগরূক আছে, আন্দোলনকারীদের উৎসাহ তাই তাঁহারা থামাইয়া দিলেন। আপনভোলা ক্ষেপা কিন্তু অকুতোভয়, পরমানন্দে স্বেচ্ছামতো তিনি শ্মশানে বিহার করিয়া চলিয়াছেন।

তারা-মায়ের সিদ্ধ সাধকরূপে বামাক্ষেপা খ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার শক্তি-বিভূতির কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তারাপীঠে শোক-দুঃখ ক্লিষ্ট নরনারী ও মুমুক্ষু সাধকদের ভিড় লাগিয়া যায়। শক্তিধর ক্ষেপা সদাই থাকেন খেয়ালখুশীতে, স্বাভাবিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে দুই হাতে ছড়াইতে থাকেন ঐশী কৃপা।

যে কোনো আর্ত ভক্ত একবার কাঁদিয়া কাটিয়া ক্ষেপাবাবার শরণ নেয়, লাভ করে তাহার প্রার্থিত বস্তু। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের পদতলে বসিয়া এ সময়ে কত জননী মৃতকল্প পুত্র ফিরিয়া পাইয়াছে, কত নারী এড়াইয়াছে বৈধব্যের অভিশাপ।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ক্ষেপার বালকবৎ আচরণের নানা কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। দূর-দূরান্ত হইতে তাঁহার কাছে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী আসিতেন। শ্রদ্ধাভরে অনেকে তাঁহাকে কিছু কিছু টাকাও ভেট দিতেন। ভক্তদের এইসব প্রণামী সঞ্চয় করিয়া রাখার জন্য তিনি তাঁহার এক নিত্যসঙ্গী ভক্তকে ভার দেন। ক্ষেপার ইচ্ছা, এই অর্থে তারা-মায়ের পীঠস্থানের খানিকটা উন্নতি সাধন করা হইবে। ভক্তটি কিন্তু লোভের বশে এই গচ্ছিত অর্থ ধীরে ধীরে অপহরণ করিয়া বসে।

রাবার এক ভক্ত স্থানীয় উকিল, তাঁহার উৎসাহে এই ব্যক্তিটি আদালতে অভিযুক্ত হয়।

হাকিম ক্ষেপাবাবাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাই কঠোরভাবেই মামলাটি তিনি বিচার করিতেছেন। হঠাৎ একদিন ক্ষেপা নিজেই এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "হাকিম বাবা, তুমি ওকে এবারকার মতো ছেড়ে দাও।" হাকিম ও

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তদ্বিরকারী উকিল ভক্তটি তো প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু এই মুক্তি-প্রার্থনার কারণ কি, আদালত হইতে ক্ষেপাকে এ প্রশ্ন করা হইলে তিনি করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওর জেল হলে আমার সিদ্ধি আর কারণ কে তৈরী ক'রে দেবে? তাছাড়া, আমি কথা কইব কার সঙ্গে?"

বলাবাহুল্য, ক্ষেপার আগ্রহাতিশয্যে এবং ভক্ত উকিল-মোক্তারদের চেষ্টায় অপরাধীটি মুক্তিলাভ করে। ক্ষেপার কেলো-ভুলো কুকুরদের সঙ্গে এই তস্করের পার্ষদগিরিও অব্যাহত থাকিয়া যায়।

রামপুরহাটের ডাঃ হরিচরণ ব্যানার্জি ক্ষেপার এক ভক্ত। সেদিন তিনি বড় ব্যস্তসমস্ত বাড়ি ফিরিতেছেন। শিবিকাটি তারাপীঠের নিকটে পেঁছিলে বাবাকে প্রণাম করিতে গেলেন।

ক্ষেপা বার বারই সেদিন তাঁহাকে তারাপীঠে বিশ্রাম করিয়া বাড়ি ফিরিতে বলিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মের দিন। রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পথে তাঁহার যে বড় কষ্ট হইবে। ডাক্তারের জন্য বাবার স্নেহ সেদিন যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। ভক্তের সমাদরের জন্য তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

সঙ্গীয় ভক্তেরা ক্ষেপার এ আচরণে বিস্মিত হইলেন। সর্ব বিষয়ে যিনি নিরাসক্ত, তাঁহার পক্ষে এ ধরনের জাগতিক অনুরোধ যে বড় অস্বাভাবিক। ডাক্তারবাবুও কিছুটা ভড়কাইয়া গেলেন। বাড়িতে তাঁহার কন্যা ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত, দেরি করিবার উপায় নাই, তাই তাড়াতাড়ি রওনা হইতে হইল।

ক্ষেপা কোনোমতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চান না। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন আর কহিতেছেন, "বাবা, সামান্য কিছু খেয়ে যাও।" ভক্তটিকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সেদিন তাঁহার কি দুঃখ!

বাড়ি ফিরিয়া ডাক্তার শুনিলেন, তাঁহার কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার এ পারিবারিক দুর্দৈবের কথা অন্তর্যামী ক্ষেপা পূর্বেই জানিয়াছিলেন, তাই বুঝি তাঁহাকে এমন ব্যাকুল হইয়া নিজে কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন।

ক্ষেপা ছিলেন স্বেচ্ছাময়। গালাগালি দিয়াই কত দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি সারাইয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তারা-মায়ের চরণামৃত ও শ্মশানের মাটি প্রাণরক্ষা করিয়াছে বহু নরনারীর।

মন্দিরের সোপানে বসিয়া মরণাপন্ন এক ব্যক্তি সেদিন ধুঁকিতেছে, আর অবিরাম করিতেছে অশ্রুপাত। ক্ষেপা কাছ দিয়া যাইতেছিলেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো বাবু, আনন্দময়ীর দুয়ারে এসে এমনতর নিরানন্দ কেন?"

রুগ্ন লোকটি দেবীর প্রসাদ পাইতে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় সে কাতর, প্রসাদ নিবার মতো অবস্থা তাহার নাই। ক্ষেপার হৃদয় বিগলিত

হয় এবং সেদিন তাঁহার স্পর্শে মৃত্যুপথযাত্রী এই রোগীটি একেবারে রোগমুক্ত হইয়া উঠে। অতঃপর আকণ্ঠ পুরিয়া তারা-মায়ের প্রসাদ সে গ্রহণ করে।

সুস্থ হইবার পর লোকটি ক্ষেপাবাবাকে কহিল, "বাবা, তুমি কি সাক্ষাৎ ভগবান্? তোমার ছোঁয়া পাবার পরমুহূর্তেই আমার মৃত্যুসম যন্ত্রণা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।"

উত্তর হইল, "ভগবান্ তোকে ছুঁলে তুই শালা কি খাবার জন্য এমন ক'রে ছটফট করতিস রে? তোর সব যে একাকার হয়ে যেত? আমি হলাম তারা-মায়ের পায়ের ধুলোর ধুলো।"

নন্দ হাড়ি ক্ষেপার একজন অনুগত ভক্ত। দুই হাতে তাহার জঘন্য কুষ্ঠরোগ। ইহা নিয়াই রোজ সেই ক্ষেপাবাবার সেবা পরিচর্যা করে। বাবার পানীয় জল আনা হইতে শুরু করিয়া কেলো-ভুলো কুকুরগোষ্ঠীর দেখাশোনা অনেক কিছু কাজ নন্দই করিয়া থাকে।

সেদিন এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এ ব্যাটা জাতে হাড়ি, তাতে আবার কুষ্ঠরোগী। আপনি কেন ওর হাতের জল খাচ্ছেন?"

ক্ষেপা চটপট উত্তর দিলেন, "আমি ওর হাতের জল খাই—আমার ইচ্ছে। তাতে তোর শালা কি?"

বিস্ময়ের বিষয়, নন্দের উপর এত স্নেহ থাকা সত্ত্বেও বাবা তাহার এই ঘৃণ্য রোগটি উঠাইয়া নিতেছেন না। নন্দও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনোদিন কিছু বলে না।

সে-বার নন্দ হাড়ির এ ব্যাধির আক্রমণ খুব বাড়িয়া উঠিল। প্রায় পাঁচ সাতদিন যাবৎ সে তারাপীঠ শ্মশানে আসিতেছে না, ক্ষেপাবাবা তাহার জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন ভক্ত ধরিয়া বসিলেন, "বাবা, নন্দ আপনার এমন অনুগত ভক্ত, এবার সে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে রোগমুক্ত আপনাকে করতেই হবে।" অনুমতি পাইয়া সকলে নন্দকে নিয়া আসিলেন।

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র ক্ষেপাবাবা উত্তেজিত কণ্ঠে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, "শালা! পাপ করবার সময় মনে থাকে না? যেমন কর্ম তেমন ফল। যা বেটা এখান থেকে। তোর ঐ হাত পচে গলে খসে খসে পড়বে।'

করুণাময় ক্ষেপাবাবার একি কঠোর ব্যবহার! নন্দ হাড়ি তো অভিমানে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মহাপুরুষের আর এক মূর্তি। নন্দকে নিকটে ডাকিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, সান্ত্বনা দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, এখন থেকে পাপ পথে আর যাবিনে, কেবল তারা-মায়ের নাম করবি। যা তোর রোগ সেরে যাবে, ঐ শ্মশানের মাটি রোজ দু'হাতে মাখবি।" নন্দের কুষ্ঠরোগ মাসখানেকের মধ্যেই নিরাময় হইয়া গেল।

বেলে গ্রামের নিমাই দীর্ঘদিন যাবৎ হার্নিয়া রোগে ভুগিতেছে। একে নিজের রোগযন্ত্রণা, তদুপরি দারিদ্র্যের বিভীষিকা, কোনোরকম কাজকর্মই সে করিতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ কি করিয়া করিবে? শেষকালে মরিয়া হইয়া সে স্থির করিয়া ফেলিল, গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিবে।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। নিমাই সেদিন তারাপীঠ শ্মশানের পাশে এক জঙ্গলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতে তাহার একগাছি রজ্জু। নিকটে জনমানব কোথাও নাই। বট গাছের ডালে রজ্জুটি লাগাইয়া সে আজ এখনি ঝুলিয়া পড়িবে নতুবা এই জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই।

গলায় ফাঁস লাগাইতে যাইবে, ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল এক হৃৎকম্পকারী নিনাদ 'তারা—তারা!' নিমাই-এর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ ফাঁসের দড়িটি খসিয়া পড়িয়া গেল। সভয়ে চাহিয়া সে দেখে, স্বয়ং ক্ষেপাবাবা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

গম্ভীর কণ্ঠে মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা, আত্মঘাতী হওয়া যে মহাপাপ। শিগ্গীর এখান থেকে পালা—পালা।"

নিমাইয়ের মরা আর হইল না। কিন্তু সেদিন হইতে স্থির করিল আর সে গৃহে ফিরিয়া যাইবে না, তারা-মায়ের মন্দির চত্বরে থাকিয়া দর্শনার্থীদের কাছে ভিক্ষা করিবে ও দিন কাটাইবে।

একদিন ক্ষেপাবাবা নিকটেই কোথায় গিয়াছেন, শিমুলতলার তাঁহার আসনের সম্মুখস্থ ধুনিটি তখনও জ্বলিতেছে। নিমাই ভাবিল, এই ফাঁকে ধুনি হইতে গাঁজার কল্‌কেতে একটু আগুন নেওয়া যাক। এক টুকরা অঙ্গার টানিয়া নিবার সাথে সাথেই ঘটিল ভীম-ভৈরবকান্তি ক্ষেপার আবির্ভাব। সম্মুখে আসিয়াই নিমাইয়ের তলপেটে সজোরে তিনি এক লাথিমারিয়া বসিলেন। তৎক্ষণাৎ সে একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বাহ্যজ্ঞান হওয়ার পর নিমাই সবিস্ময়ে দেখে, তাহার প্রাণান্তকর হার্নিয়া রোগ আর নাই। ইহার পর বহুদিন সুস্থ শরীরে থাকিয়া সে সংসারের কাজকর্ম করিয়া গিয়াছে।

শিমুলতলায় ক্ষেপা সেদিন নীরবে শুইয়া আছেন। একটি খাটিয়া বহন করিয়া এ সময়ে কয়েকজন লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। খাটিয়াটি নামানোর পর দেখা গেল এক করুণ দৃশ্য। একটি যক্ষ্মারোগী মৃতকল্প হইয়া ধুঁকিতেছে।

ক্ষেপা রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে, এটাকে আবার শ্মশানে নিয়ে এলি কেন? জ্যান্ত পোড়াবি নাকি? তা, শালা পাপ করেছে অনেক, জ্যান্তই চৌঁয়ে ওকে পোড়া।"

রোগীর এক নিকট আত্মীয় করজোড়ে কাতর স্বরে কহিল, "ঠিক বাবা। একে যে আপনার চরণতলে ফেলে রাখবার জন্যই নিয়ে এসেছি। কোনো চিকিৎসারই আজ অবধি ফল হয় নি। মায়ের একমাত্র সন্তান। দয়া ক'রে আপনি ওকে বাঁচান, বাবা।"

"দূর হ' বেদো শালারা! আমি কি ডাক্তার না কবরেজ? তবে আমার কাছে আনা কেন?"

ভক্তেরা ছাড়িবেন না। উত্ত্যক্ত হইয়া ক্ষেপাবাবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। হঠাৎ রোগীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বল্ শালা? আর কখনো পাপ করবি?"

এদিকে তো শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম। সকলে আতঙ্কিত

হইয়া তখনি খাটিয়ার কাছে ছুটিয়া গেল। সেকি? শেষটায় ক্ষেপাবাবা কি খুনের দায়ে পড়িবেন? ইতিমধ্যে রোগীটি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "যা শালা। এবার বেঁচে গেলি?"

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু লোকটির মূর্ছা ভাঙিয়া যায়। সে উঠিয়া বসিয়া সকলকে বলিতে থাকে, তাহার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইয়াছে, এখনই কিছু খাবার না পাইলে সে বাঁচিবে না। দীর্ঘদিন যে রোগী শয্যায় একটু পাশ ফিরিতে পারে নাই, এভাবে আজ তাহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সকলে তো অবাক।

ক্ষেপাবাবা কহিলেন, "ও শালাকে পেট ভরে ঠেসে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দে। কিছুদিনের জন্য এখানে ওকে রেখে যা, তারা-মায়ের দয়ায় একেবারে ভালো হয়ে যাবে।"

লোকটি ইহার পর সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়।

ক্ষেপাবাবা একদিন ভক্তদল পরিবৃত হইয়া শিমুলতলায় বসিয়া আছেন। হঠাৎ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "বদ্ শালারা সব আসছে, বদ্ জিনিস নিয়ে।"

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, দুইটি যুবক কয়েক বোতল বিলাতি মদ, এক হাঁড়ি সন্দেশ ও বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়া সেখানে উপস্থিত। ক্ষেপাবাবাকে তাহারা পানভোজন করাইয়া, সংগীত শুনাইয়া তুষ্ট করিতে চায়।

ক্ষেপা হঠাৎ রুদ্ররোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটি পোড়া কাঠ নিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ মদের বোতল ও মিষ্টির হাঁড়িটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যুবক দুইটি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিল। পরে জানা গেল, ডার্বি-সুইপের প্রথম পুরস্কারের আশায় ক্ষেপাকে তাহারা প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল।

অনেকের মনের কথা ফাঁস করিয়া দিয়া ক্ষেপা তাহাদের চৈতন্য আনিয়া দিতেন। সেবার এক জমিদার তারাপীঠে পূজা দিতে আসিয়াছেন। মস্ত সমারোহের ব্যাপার। প্রত্যূষে দ্বারকা নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তটে দাঁড়াইয়া তিনি জপতপ করিতেছেন। ক্ষেপা এ সময়ে জলে নামিতেছিলেন, জপে নিরত ভদ্রলোকটির দিকে চোখ পড়িতেই তিনি হাসি চাপিতে পারিলেন না। দুষ্টামি করিয়া বার বার তাঁহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোক ক্রোধভরে চেঁচাইয়া উঠেন, "কোথাকার অসভ্য পাগল। জপ করছি, দিলে আমায় অপবিত্র ক'রে!"

ক্ষেপা উত্তর দিলেন, "তারা-মায়ের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছো, তাঁর নাম জপছো, এর ভেতর আবার ম্যাকোম্পানীর জুতোর কথা ভাবা কেন, বাবা।"

ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিলেন। সত্যিই যে তাই। কলিকাতায় গিয়া ঐ কোম্পানীর একজোড়া দামী জুতা কেনার কথা হঠাৎ তাঁহার মনে উঁকি দিয়াছিল। কে এই অন্তর্যামী পুরুষ, মনের সামান্যতম চকিত চিন্তাও যাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই?

মন্দিরে ফিরিয়া পাণ্ডাদের কাছে এ ঘটনা জানানোর পর তাহারা বলিল, "ইনি সাধারণ পাগল নন—ইনিই হচ্ছেন তারাপীঠের শিবকল্প মহাপুরুষ বামাক্ষেপা।"

ভদ্রলোকটি ব্যাকুল হইয়া আবার ক্ষেপার দর্শন লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেদিন আর তাঁহার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ণমনে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্ষেপা একদিন তারামন্দিরের আঙিনায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে একদল দর্শনার্থী শিক্ষিত ভদ্রলোক, তিনি তাঁহাদের সহিত দু-একটি কথা বলিতেছেন। পাশেই একটা পাতায় তারা-মায়ের প্রসাদ রক্ষিত। ক্ষেপা মাঝে মাঝে উহা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদ কুকুরেরাও ঐ পাত্র হইতে খাদ্য তুলিয়া নিতেছে।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাঁইথিয়ার কয়েকটি তরুণও উপবিষ্ট। কুকুরদের সঙ্গে ক্ষেপাবাবাকে একত্রে আহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বড় ঘৃণা বোধ হইতেছিল। অন্তর্যামী ক্ষেপা বাবার দৃষ্টিতে ইহা এড়ায় নাই। ইঙ্গিতে ঐ যুবক কয়টিকে ডাকিয়া তিনি নিকটে বসাইলেন। তারপর নিজ হস্তদ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাবারা, এবার কি দেখছেন?"

যুবকদল বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ক্ষেপাবাবা একি ইন্দ্রজাল সেখানে সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। তাহারা দেখিল, মায়ের প্রসাদভোজী ক্ষেপা এবং তাঁহার বয়স্য কুকুরদেরই কেবল মানবাকৃতি, আশপাশের আর সব দর্শনার্থী ভদ্রলোকদের আকার মনুষ্যেতর জীবের। সাপ, কুকুর, বিড়াল রূপে এক মুহূর্তে তাহারা পরিণত হইয়া গিয়াছে। শক্তিধর মহাপুরুষ যেন প্রত্যেকের নিজস্ব বৃত্তিকে জন্তু ও সরীসৃপে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যুবকদের স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসে। সেদিনকার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার সুফল ফলিতে দেখা যায়, তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

ক্ষেপাবাবা বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। একবার কোনোমতে তাঁহার মুখের কথাটি আদায় করিতে পারিলে মৃতকল্প রোগী সম্পর্কে লোকের আর ভয় ভাবনা থাকিত না। আবার এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে ক্ষেপাকে নিয়া বিপদে পড়িতেও হইত।

সেবার তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাবাবাকে খুব ধরিয়া বসেন, তাঁহার পরিচিত এক রোগীকে নিরাময় করিতেই হইবে। রোগীটি স্থানীয় জমিদার, নাম পূর্ণচন্দ্র সরকার। ক্ষেপাকে পালকি করিয়া সযত্নে তাঁহার কাছে নিয়া যাওয়া হইল।

পথ চলিতে চলিতে নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি রোগীর কাছে গিয়ে বলবেন—এই শালা, উঠে বোস্, তোর রোগ সেরে গিয়েছে। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।"

বালকবৎ মহাপুরুষ কহিলেন, "আচ্ছা নগেনকাকা, তাই বলবো। মাঝে মাঝে কথাগুলো শিখিয়ে দেবেন, ভুলে না যাই।"

রোগীর ঘরে গিয়াই কিন্তু তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল বিপরীত কথা। বলিলেন,

"ও নগেনকাকা, এ শালা তো এখুনি ফট্।" অর্থাৎ এ রোগীর আর কোনো আশা নাই, এখনই জীবনান্ত হবে।

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেপা পালকিতে আসিয়া বসিলেন, রোগীও ত্যাগ করিল শেষ নিশ্বাস।

নগেন পাণ্ডা বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁহার অনুগত লোক, তাঁহাকে তাঁহারা বড় ধরিয়া বসিয়াছিল। তিনিও ক্ষেপাবাবার ভরসাতেই আশ্বাস দিয়াছিলেন। বাড়ির পথে ফেরার সময় ক্ষুন্ন মনে ক্ষেপাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন, "বাবা, ছি-ছি, এখানে আমার আর মানমর্যাদা কিছু রইল না। এমন জানলে আপনাকে আমি আনতাম না।"

করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে ক্ষেপা বলিলেন, "নগেনকাকা, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না। সত্যিই আমার কোনো দোষ নেই। আমি তো তোমার শেখানো কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা-মা এসে যে কানে কানে বললে—ক্ষেপা, ও কথা মোটেই তুই বলিসনে, বলে দে—ফট্। আমিও তাই বলে ফেললুম।"

বালকস্বভাব এই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের অহেতুক আশীর্বাদ অনেক সময় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্মিত করিত। সে-বার একটি তরুণী তাহার পিতার সঙ্গে তারাপীঠের বিগ্রহ ও তারাপীঠভৈরব ক্ষেপাবাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ইহাদের বাড়ি রামপুরহাটে। শুদ্ধমনে, পবিত্রভাবে, কিছু ক্ষীরের খাবার মেয়েটি তৈরী করিয়া আনিয়াছে।

প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে উহা নিবেদন করা মাত্রই ক্ষেপা পরম আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বেশ মা, বেশ। তোর ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে।"

কথা কয়টি শুনিয়াই মেয়েটি কাঁদিতে শুরু করিল। দুই নয়নের অশ্রুধারা আর থামিতে চায় না। ক্ষেপা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, ও কাঁদছে কেন?"

"বাবা, আপনি যে ঢালাও আশীর্বাদ ক'রে বসলেন, কিন্তু ও যে বিধবা! পুত্র হবার আশা আর কই।"

"কাঁদিসনে মা, থাম্। যা বলেছি, তা সবই হবে। তারা-মা আমাকে যে বলেছেন—তোর ছেলে হবে, লক্ষ্মীও ঘরে থাকবে।"

ক্ষেপার একথা ফলিতে দেরি হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এক ধনবান্ বণিক বৈষ্ণব-মতে এই তরুণীর পাণিগ্রহণ করে। সন্তান-সন্ততি বিত্ত-বিষয় সবই এ মেয়েটির হইয়াছিল।

দ্বারভাঙার মহারাজা সে-বার তারাপীঠে উপস্থিত হইয়া ক্ষেপাবাবার শরণ নেন। মহারাজা অপুত্রক, সেইজন্যই শক্তিধর মহাপুরুষের আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সিপাইসান্ত্রী ও জাঁকজমক দেখিয়া, ক্ষেপা সসংকোচে কহিলেন, "নগেনকাকা, এরা সব কারা?"

"বাবা, ইনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, আপনাকে খুব ভক্তি করেন, তাই দর্শন করতে এসেছেন।"

"সেকি কথা? আমি শ্মশানের ভিক্ষুক, সামান্য লোক। আমার এখানে আবার রাজরাজড়া কেন? তবে তো এখান থেকে আমায় সরে যেতে হবে।"

সকলে প্রমাদ গণিলেন। অতঃপর মহারাজা সাধারণ বেশে সজ্জিত হইয়া একাকী বাবার চরণ দর্শনে আসেন। মহাপুরুষের আশীর্বাদে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, উত্তরকালে তিনি পুত্র লাভ করেন।

ক্ষেপা বলিতেন, "আমি বাবু তোদের শাস্তর-টাস্তর কিছু বুঝিনে, শুধু তারা-মাকে নিয়েই আমার কারবার।" সত্যই তাই। ক্ষেপার সমস্ত সত্তায় তাঁহার তারা মা, আদ্যাশক্তি ছিলেন ওতপ্রোত। সিদ্ধকাম এই মহাসাধকের সমগ্র জীবন ছিল এক অখণ্ড চৈতন্যে বিধৃত।

খেয়াল-খুশীমতো এক একদিন ক্ষেপা তারা-মায়ের পূজায় আসিয়া বসেন। কিন্তু কোথায় তাহার উপচার-উপকরণ? শাস্ত্রসম্মত প্রথায় পূজোর ধার তিনি কোনোকালেই ধারেন না। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় কোনো কোনোদিন মন্দিরে গিয়া তারা-মায়ের বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানস্থ হন। চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকে উৎকণ্ঠিত ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল, আর থাকে তাঁহার প্রসাদলোভী অনুচর কুকুরগোষ্ঠী। ক্ষেপার পূজায় আসনশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধির বালাই নাই—মন্ত্রতন্ত্র ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানও অবান্তর। আসল উপচার তাঁহার মুখের 'তারা-তারা' রব, আর ভাববিহ্বল আকুতি। কম্পিত হস্তে বিল্বপত্র ও পুষ্পরাজি অঞ্জলি দেন বার বার আর সজল নয়নে বলিতে থাকেন, "এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে, এই জল লে, এই ফুলচন্দন আর বলি লে।"

এই পূজা তিনি নিজের খেয়াল-খুশীতেই সমাপ্ত করেন। দেবীর পূজা নয়, এ যেন মায়ের উপর তাঁহার ছেলের সহজ অধিকারের এক অপূর্ব বাল্য-লীলা।

বাহিরের বস্তু অবস্তু, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আত্মসমাহিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিল না, তাহার প্রয়োজনও হইত না। মন্দিরে, শিমুলতলায় ও শ্মশানে সর্বপাশমুক্ত ক্ষেপা দিগম্বররূপে সর্ব সমক্ষে পড়িয়া থাকিতেন। কেহ এ সম্বন্ধে কিছু বলিলে অবলীলায় উত্তর দিতেন, "আমার বাবা ন্যাংটা, মা ন্যাংটা, আমারও তো অভ্যাসটা হওয়া চাই। তা ছাড়া বাপু, আমি তো লোকালয়ে থাকিনে, থাকি আমার মায়ের সঙ্গে, মায়ের শ্মশানে। আমার আবার কাকে ভয়—কাকে সংকোচ।"

তন্ত্রসিদ্ধ মহাশক্তিধর সাধকরূপে বামাক্ষেপার প্রতিষ্ঠা এসময়ে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তারাপীঠের পুণ্যভূমিতে ধীরে ধীরে সমাগত হইতে থাকে অগণিত মুক্তিকামী শক্তিসাধক ও দর্শনার্থীদল। ইহাদের অনেকেরই কাছে ক্ষেপার বাহিরের রূপটি ছিল অতি কঠোর। তাঁহার ভীমভৈরব মূর্তি আর আচার-বিহারহীন বহিরাবরণ প্রায়ই

জাগাইয়া তুলিত বিস্ময় ও ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রম। কারণচক্র এবং গঞ্জিকার ধূম্রকুণ্ডলী হইতে সত্যকার ব্রহ্মবিদ্ বামাক্ষেপাকে চিনিয়া নিবার সৌভাগ্য কিন্তু অনেকেরই হইত না।

নিজের চারিদিকে কুহেলিকার এক রহস্যময় আবরণ টানিয়া দিয়া ক্ষেপা অনেক সময় অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। আপন অন্তরসত্তার গভীরে, নিভৃত আনন্দে, মহাপুরুষ সদাই থাকিতেন একান্তভাবে ভরপুর। কিন্তু আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়া যে সাধকেরা তাঁহার শরণ নিতেন শুধু তাঁহাদের কাছেই প্রকাশিত হইত তাঁহার কৃপাঘন রূপ। লাভ করিত তাঁহারা তন্ত্রসাধনার গূঢ় নির্দেশ।

সমসাময়িক বাংলার বিশিষ্ট শক্তিসাধকের ভিতর এমন লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি তারাপীঠের পবিত্র পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া সিদ্ধির পাথেয় সঞ্চয় করেন নাই—আর ক্ষেপার বিশাল বক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হন নাই কৃতার্থ। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নিগমানন্দ স্বামী এই তারাপুরেই শ্মশানে আসিয়া ক্ষেপার শরণ নেন, তাঁহার কৃপায় সমর্থ হন ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎলাভে। প্রচারিত ও অপ্রচারিত আরও বহু তন্ত্রসাধক ক্ষেপাবাবার নির্দেশে মহাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হন, লাভ করেন পরমা সিদ্ধি।

কৌলমার্গের দুশ্চর তপস্যা ক্ষেপাকে উত্তীর্ণ করে এক বিরাট ব্রহ্মজ্ঞরূপে। যে বিপুল যোগবিভূতি ও অধ্যাত্মশক্তি তিনি আহরণ করেন, সাধন জগতে তাহার তুলনা খুব কমই মিলে। অথচ এই অপরিমেয় শক্তিকে ক্ষেপা নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই চিরদিন বহন করিয়া বেড়াইয়াছেন। যোগবিভূতি সংহরণের এই সামর্থ্য ছিল তাঁহার এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস। প্রায়ই চলিয়াছে অবিরাম ধারা বর্ষণ। আজকাল ক্ষেপাবাবা বড় ঘন ঘন সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সেদিন সারা দিন-রাতের সমাধি হইতে বুত্থিত হইয়া শান্ত স্বরে ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "দেখুন বাবারা, সেবারে মোক্ষদা-নন্দবাবাকে যেখানে সমাধি দিয়েছেন, সেখানেই যেন এ দেহের সমাধি দেওয়া হয়।"

একি হৃদয়ভেদী কথা বাবা আজ কহিতেছেন। ভক্তেরা বুঝিলেন, তাঁহার তিরোধান আসন্ন। সকলে বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

দেহের অবস্থা দিনের পর দিন কেবলই খারাপের দিকে যাইতেছে। ২রা শ্রাবণের রাত্রিতে উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। নিত্যসঙ্গী ভক্ত, সেবক ও সাধকের দল, সবারই চোখে মুখে বিষাদের ঘন ছায়া। ক্ষেপা শেষবারের মতো 'তারা-তারা' রবে পীঠস্থান উচ্চকিত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এ সমাধিই তাঁহার মহা সমাধি।

অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া শক্তিসাধনার পূত শিখাটিকে বশিষ্ঠদেবের আসনে বামাক্ষেপা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবার সেই শিখাটি চিরতরে নির্বাপিত হইয়া গেল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

"পীতাম্বর, পীতাম্বর ! ওরে আর কবে তুই মানুষ হবি ?"

জননীর ক্রুদ্ধস্বর প্রায়ই পঞ্চমে উঠে, কত গালাগালিই করিতে থাকেন। কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে ? দুর্দান্ত ছেলেকে নিয়া জননী নর্মদাবাঈ'র দুশ্চিন্তার অবধি নাই। পতির মৃত্যুর পর দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিতেছেন। কিন্তু এ চঞ্চল বালকের দৌরাত্ম্যে স্বস্তিতে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার জো কই ?

উজ্জয়িনীর এক সারস্বত-ব্রাহ্মণকুলে ঐ বালকের জন্ম, শাস্ত্রপাঠ ও গুরুগিরি তাহার কুলগত বৃত্তি। বাড়ির কাছেই এক পণ্ডিতের টোলে তাহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকের একটি পাতাও তাহাকে উল্টাইতে দেখা যায় না।

অবশ্য পীতাম্বরের সময়ই বা কোথায় ? শিপ্রার জলধারার বাঁকে বাঁকে, ভর্তৃহরি এবং গোরখ্‌নাথের গুহায় সব সময়ে সে আনাগোনা করে। কখনো মহাকালের পবিত্র কুণ্ডে, কখনো বা সন্দীপন মুনির জঙ্গলাকীর্ণ আশ্রমে স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ায়। ভগ্ন পরিত্যক্ত পুরাতন প্রাসাদ, ভূতের ভয়ে যাহার কাছ দিয়া কেহ ঘেঁষে না, সেখানেই রাতের পর রাত কাটাইয়া বালক বাড়ি ফিরে। এ দুরন্ত ছেলেকে নিয়া নর্মদাবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

মায়ের উষ্মা একদিন চরমে পৌঁছিল। অবাধ্য ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া খুব খানিকক্ষণ তিনি গালাগালি দিলেন। তারপর উত্তেজিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দু'চার ঘর যজমান আর দু'এক বিঘা জমি, সম্বলের মধ্যে তো এই। তাও দেখবার কোনো লোক নেই। নিতান্ত অভাগা তুই, নইলে এ শিশুকালে তোর বাপেরই বা মৃত্যু হবে কেন ? তোর ওপরই সব কিছু আশা-ভরসা রেখে আমি বসে আছি। কিন্তু আমার দুর্দৃষ্ট, সংসারের কোনো কাজকর্মই তুই দেখবিনে। বংশের সবাই ক'রে এসেছে লেখাপড়া, শাস্ত্রপাঠ, তাও তুই করবিনে। হ্যাঁরে, বল দেখি, তবে কি তুই—সাধু হবি ?"

পীতাম্বর এতক্ষণ অভ্যাসমতো নীরব ঔদাসীন্যে ভর্ৎসনাগুলি হজম করিতেছিল। কিন্তু মায়ের শেষ বাক্যটি তাহার অন্তরে এক বিপ্লব বাধাইয়া দিল।

'সাধু হবি ?'—একি বিচিত্র সম্মোহন এ কথা দুইটিতে। বালকের অন্তর্লোকের দ্বারে কে যেন হঠাৎ এক অদৃশ্য চাবিকাঠি ঘুরাইয়া দেয়, উন্মোচিত হয় বিস্মৃতলোকের এক-আলোকিত দৃশ্যপট। পূর্ব জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার উদ্‌গত হয়, নূতনতর জীবনের আস্বাদ তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। মাতার সম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ সে দূরে ছুটিয়া পালায়।

অতঃপর বালক এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে। যাহা কিছু জামাকাপড় ছিল সব পোড়াইয়া ফেলে, শরীরে লেপন করে ভস্মরাশি, পরিধান করে কৌপীন। এবার জননীকে গিয়া বলে, "মা—মা, দ্যাখো দ্যাখো, সত্যিই আমি সাধু হয়েছি।"

পাগল ছেলের কাণ্ড দেখিয়া মা সবরে হাসিয়া উঠেন।

বালক পীতাম্বরের সেদিনকার এই সাধুবেশ কিন্তু শুধু তামাশাতেই পর্যবসিত হয় নাই। অসতর্ক মুহূর্তে জননী বলিয়াছেন,—তবে কি সে সাধু হইবে? সে কথারই গুঞ্জরণ বার বার চলিতে থাকে তাঁহার অন্তরে।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা। শুভদিন দেখিয়া জননী পীতাম্বরের উপনয়ন সংস্কার করান, ইহার তিন-চারিদিনের মধ্যেই বালক হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সংসারের কোনো আকর্ষণ, কোনো বন্ধনই তাহাকে সেদিন আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বয়স তাহার তখন মাত্র নয় বৎসর—নিতান্তই এক অবোধ বালক। কোথায় কোন্ দেশে সে চলিয়া গেল কে জানে? বিধবা জননীর একমাত্র ভরসা ছিল পীতাম্বর, ছিল তাঁহার নয়নের মণি। আজ তাহার বিহনে দুই চোখে নামিয়া আসিল অন্ধকার।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম, মহাকাল বিগ্রহ, বিরাজিত রহিয়াছেন উজ্জয়িনীর উপান্তে। নর্মদাবাঈ এই মহাকালের মন্দিরে দিনের পর দিন মাথা খুঁড়িতে থাকেন পুত্রের কল্যাণ কামনায়, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুতি জানান বার বার।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। তারপর হঠাৎ একদিন নামিয়া আসে মহাকালের কৃপার ধারা, নর্মদাবাঈ ফিরিয়া পান তাঁহার নয়নমণি পীতাম্বরকে।

লোকমুখে পুত্রের সংবাদ পাইয়া পাগলিনীর মতো জননী সেদিন দেওঘরের তপোবন পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে এক মিলন-দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়।

বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে, আকাশের বুকে ভাসিয়া চলিয়াছে কুলায়গামী পাখির ঝাঁক। বৃদ্ধা নর্মদাবাঈ আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছেন, "পীতাম্বর! আমার পীতাম্বর!"

কাহার এ মর্ম আলোড়নকারী আহ্বান? চঞ্চল চরণে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান এক সুদর্শন সন্ন্যাসী। আননে তাঁহার গুম্ফ-শ্মশ্রুরাজি, শিরে প্রকাণ্ড জটার ভার মুহূর্তে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, ভাবাবেগে কম্পিত সন্ন্যাসী পতিত হইলেন বৃদ্ধার চরণে। মধুরকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন, "মা!"

চল্লিশ বৎসর পরে জননীর কানে হৃদয় জুড়ানো ডাক আবার পৌঁছিল। সন্ন্যাসীর চিবুকে হাত দিয়া নর্মদাবাঈ তাঁহার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। হ্যাঁ, এই তো তাঁহার পীতাম্বর। এই তো তাঁহার গৃহত্যাগী উদাসী পুত্র—আজিকার দিনে সে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে বহু-বিশ্রুত যোগী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামে।

মাতা পুত্রের মিলনে নিস্তব্ধ গিরিশিখরে সেদিন আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। সজল নয়নে জননী সবাইকে বার বার কহিতে লাগিলেন তাঁহার এ হারানো রত্ন উদ্ধারের কাহিনী।

ধ্যানধারণা ও শিবার্চনার মধ্য দিয়া উজ্জয়িনীতে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। শুদ্ধসত্ত্ব সাধিকা একদিন বুঝিতে পারিলেন, অন্তিম সময় তাঁহার এবার ঘনাইয়া আসিতেছে। হারানো পুত্রের জন্য অন্তরে বার বার জাগিয়া উঠিতেছে হাহাকার। মহাকালের চরণে নিবেদন করিলেন প্রাণের সংকল্প, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে

একবার তিনি জীবনসর্বস্ব পীতাম্বরকে যেন দেখিতে পান। ইষ্টদেব তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন।

সেদিন তিনি শিবজীর পূজার পর পুত্রের কথা ভাবিয়া কাঁদিতে ছিলেন। প্রভু আবির্ভূত হইলেন, স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, 'বেটি, তোর প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হবে। বৈদ্যনাথধামের তপোবন পাহাড়ে তোর পুত্র রয়েছে তপস্যারত। তার এখানকার নাম বালানন্দ। সেখানে চলে যা, হারানো পুত্রকে আবার তুই ফিরে পাবি।'

জমিজমা যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বিক্রয় করিয়া, নর্মদাবাঈ একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে উজ্জয়িনী ত্যাগ করেন। বহুস্থানে পর্যটনের পর উপস্থিত হন তপোবন পাহাড়ে। এখানে মহাকালের কৃপায় মিলন ঘটে তাঁহার পুত্রের সঙ্গে। জননীর মনে সংকল্প ছিল যদি তাঁহার শেষ অভিলাষ পূর্ণ হয়, তবে ভক্তিভরে সওয়া লক্ষ বিল্বপত্র উৎসর্গ করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের তিনি পূজা দিবেন।

একথা শুনিয়া বালানন্দজী সোৎসাহে সকল কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সংকল্পিত পূজা সমাপ্ত হইল। অতঃপর কিছুদিন পুত্রের সেবা পরিচর্যা গ্রহণ করিয়া নর্মদাবাঈ প্রস্থান করিলেন সাধনোচিত ধামে।

'পীতাম্বর' বলিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বালানন্দকে ডাকিবার আর কেহ এ সংসারে রহিল না।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, এক ধর্মপ্রাণ সারস্বত ব্রাহ্মণবংশে বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপুরুষ শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ থাকিলেও, বাল্যকালে বালানন্দ শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তারপর নবম বৎসর বয়সে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় চিরতরে তিনি ঘর-সংসার পরিত্যাগ করেন।

উপনয়ন সংস্কার মাত্র কয়েকদিন হয় সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে ত্যাগপূত জীবন গ্রহণের সংকল্প তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া একদিন নিশাকালে জননী ও আত্মীয়-বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িলেন ঘর হইতে।

কোথায় কোন্‌দিকে যাইবেন, কিছু ঠিক নাই। একমনে শুধু গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।

অনির্দেশ্যভাবে পীতাম্বর পথ চলিতেছেন, চোখে মুখে উদাসীন ভাব, এক চতুর পথচারীর দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হইল। উপনয়নের সময় সোনার বালা, হার, মাকড়ি, বালককে দেওয়া হইয়াছিল, তখনও সেগুলি তাঁহার অঙ্গে রহিয়াছে। চতুর পথচারীটি সহজেই বুঝিয়া নিল, ঝোঁকের বশে বালক ঘর ছাড়িয়া পালাইতেছে, এবার সুযোগ মতো তাহার সোনার গহনাগুলি হস্তগত করা দরকার।

ভয় দেখাইয়া সে কহিল, "বাছা, যাচ্ছো তো তুমি অনেক দূরে দেশ-দেশান্তরে— কিন্তু এসব অলংকার পরে থাকলে চোর-ডাকাত যে পিছু লাগবে। প্রাণহানির আশঙ্কাও রয়েছে। এগুলো বরং আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যাও, ফেরবার পথে আবার নিয়ে যেও।"

নির্বিকার চিত্তে পীতাম্বর অলংকারগুলি খুলিয়া দেন। আবার নিরুদ্দেশের যাত্রা শুরু হয়। সৌভাগ্যক্রমে এক সাধুর সঙ্গে পথে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। ইনি নর্মদা-পরিক্রমায় যাইতেছেন, ইহার সঙ্গে পীতাম্বর ভিড়িয়া পড়িলেন। নর্মদার তীর ধরিয়া চলিয়া উভয়ে উপনীত হইলেন গঙ্গোনাথে, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে।

বরোদা শহর হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে নর্মদাতটে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ গঙ্গোনাথ বিগ্রহ বিরাজিত। ইহারই এক পাশে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আসনটি পাতা রহিয়াছে। সম্মুখে অখণ্ড ধুনি ও অখণ্ড দীপক প্রজ্বলিত। মহাপুরুষের চরণোপান্তে একটিবার বসামাত্র বালক পীতাম্বরের জন্ম-জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার জাগিয়া উঠিল। ব্যাকুলভাবে তিনি প্রার্থনা জানাইলেন, "মহারাজ, আমার কৃপা করুন, আপনার আশ্রয় দিয়ে আমায় রক্ষা করুন।"

দেখা গেল, বালকের এখানে আগমনের রহস্য, নাম-ধাম সব যোগীবর জ্ঞাত আছেন। প্রসন্নমধুর হাস্যে কহিলেন, "বেটা, এ তো খুব ভালো কথা। আসছে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনটি শুভ, ঐ দিনই তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে তুমি গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে আনো। তোমার দীক্ষার দিনে গাঁয়ের লোক আর নর্মদার সাধুদের ভোজন না করালে চলবে কেন?"

মহাপুরুষের কৃপা ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে, এ যে পরম সৌভাগ্যের কথা। তাছাড়া পীতাম্বর শুনিয়াছেন, আজ অবধি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই এ আশ্বাসবাণী শুনিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। আবার এই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হইল। দীক্ষার দিন বহু লোককে যোগীবর খাওয়াইতে চাহেন। কিন্তু সে সামর্থ্য পীতাম্বরের কই?

অন্তর্যামী মহাপুরুষ বালকের মনের কথা বুঝিয়া নিলেন। এবার সহাস্যে নিজের ভিক্ষার ঝুলিটি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "বাচ্চা, তুমি তো জানো না, আমার এই ভিক্ষার ঝুলির ভেতর ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই-ই রয়েছে। কোনো চিন্তা করো না তুমি।"

ব্রহ্মানন্দজীর এই ঝুলিটির অলৌকিক শক্তির কথা সে অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। স্থানীয় সাধু-সন্তদের বিশ্বাস ছিল, এই ঝুলির কল্যাণেই গঙ্গোনাথ আশ্রমের অধিবাসী ও অভ্যাগত সাধু-সন্তদের ভোজনের ব্যবস্থা অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া যাইত।

পীতাম্বর এবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে থাকেন। নবীন সাধকের সুন্দর সুঠাম রূপ ও ত্যাগবৈরাগ্য দর্শনে সকলেই মোহিত। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ গ্রামবাসী হইতে শুরু করিয়া বড় বড় পাটিদারেরা উৎসাহী হইয়া উঠে। ভারে ভারে আটা ময়দা ঘি ব্রহ্মানন্দজীর এই বালক শিষ্যের দীক্ষা অনুষ্ঠানের দিনে তাহারা পাঠাইতে থাকে। মহাত্মার ভিক্ষা-ঝুলির প্রতাপ পীতাম্বর এবার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

নির্দিষ্ট শুভলগ্নে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিলেন, নূতন নামকরণ হইল বালানন্দ। জ্যোতির্মঠের আনন্দ উপাধিধারী সাধুকুলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন পীতাম্বর।

দীক্ষা শেষে বালানন্দ করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, গুরুদক্ষিণা কি দেব, তা আমায় আদেশ করুন।"

মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "বৎস, সদ্‌গুরু থাকেন সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে, তাঁকে তুমি কোন্‌ জাগতিক বস্তু দিয়ে খুশী করবে, বলতো ? শুধু একটি হরিতকী আমায় দাও। আর স্মরণ রেখো, প্রকৃত গুরুদক্ষিণা ঋদ্ধিতেই নেই, রয়েছে সিদ্ধিতে। আমার দেওয়া এই বীজমন্ত্র সাধন ক'রে যে সিদ্ধি তুমি অর্জন করবে, তাই তুমি আমার উদ্দেশে নিবেদন কর। এই হবে প্রকৃত গুরুদক্ষিণা। আর এতেই আমি প্রসন্ন হবো।"

নবীন ব্রহ্মচারী এবার সাধন-ভজনে রত হইলেন। শক্তিধর গুরুর প্রকৃত স্বরূপ চেনা ভার। এই মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার যোগবিভূতির লীলা দেখিয়া শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পশ্চিম ভারতে, বিশেষত বরোদা, আমেদাবাদ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের তখন খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। নর্মদা পরিক্রমাকারী সাধুদের চোখেও তাঁহার মর্যাদা অসামান্য।

গঙ্গোনাথ আশ্রমে সাধুসন্ত অতিথিদের সেবা ও অন্ন বিতরণ লাগিয়াই আছে। প্রতি বৎসরই দুই একটি সমারোহপূর্ণ যজ্ঞ সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, অন্নকূট ও দুর্ভিক্ষের সময় আশ্রমের দ্বার নিরন্নদের জন্য সর্বদাই থাকে উন্মুক্ত। বলা বাহুল্য, এসব সংকটের সময়ে প্রয়োজনীয় যত কিছু দ্রব্য সররবাহ করেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজের গুণমুগ্ধ ভক্তের দল।

যোগসিদ্ধ শক্তিধর মহাপুরুষের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির নানা চমকপ্রদ কাহিনী এ অঞ্চলে সে সময়ে প্রায়ই শুনা যাইত।

একবার মহাসমারোহে ভাণ্ডারা চলিতেছে। ভোজন-পর্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে কয়েক শত লোক আসিয়া উপস্থিত। তৈরী খাদ্যের পরিমাণ খুব কমিয়া আসিয়াছে, তাই আশ্রম ভাণ্ডারের কর্তা ভীত হইয়া অভ্যাগতদের জন্য ছোট ছোট খিচুড়ির গোলা তৈয়ার করা শুরু করিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তো ইহা দেখিয়া চটিয়া আগুন।

কর্মকর্তাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মুঝে মালুম হোতা হ্যায়, তুম্‌ বাঙ্গালীকা লেড়কা, কম্‌তি খানেওয়ালা। কাহে অন্ন ইত্‌না কম্‌তি দেতে হো ? তুম পুরা পুরা দেও, তুমহারি কুছ চিন্তা নেহী।"

একথা বলিয়া মহারাজ তখনি নিজ'হাতে বাঁধিয়া দেখাইলেন গোলার আকার কতটা বড় হইবে। কাজকর্মের শেষে সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন, যোগীবরের স্পর্শের প্রভাবে এতো লোককে খাওয়ানোর পরেও ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য মজুত রহিয়াছে।

স্থানীয় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইলেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার ঝুলিটা নিয়া বাজারে বাহির হইতেন। সাধারণের চোখে ইহা ছিল—অন্নপূর্ণা মাঈর সিদ্ধ ঝোলা। সকলে সোৎসাহে এ ঝুলির সামনে টাকাকড়ি ও আহার্যের উপকরণ ঢালিয়া দিত। তারপর মহারাজের খিচুড়ি-গোলা চারিদিকের আট-দশখানি গ্রামের বুভুক্ষুদের ক্ষুধা মিটাইত।

বরোদার গায়কোয়াড় ও মহারানী এই মহাপুরুষের খুব ভক্ত ছিলেন। সদানন্দময় ব্রহ্মানন্দজী এক একদিন বরোদা প্রাসাদে গিয়া হাসির তুফান ছুটাইতেন। একবার গায়কোয়াড় শিউজী রাওকে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন, "মহারাজ আপনার নাকি একটা চাঁদির তোপ আছে, তার গোলা এক মাইল অবধি যায়?"

গায়কোয়াড় কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, যা শুনেছেন তা সত্য ঐ গোলা এক মাইল যায় বটে।"

"আপনার গোলার দৌড় মাত্র এক মাইল, আর আমার গোলা যায় দশ ক্রোশ। তবে এটাও শুনে নিন, আপনার গোলা চাঁদির তোপের, আর আমার গোলা—খিচুড়ির।"

উপস্থিত সকলেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এ কৌতুকে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বরোদার রানী যমুনাবাঈ একবার তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। নবদীক্ষিত বালানন্দজীও গুরুর সঙ্গে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে এক পরিচিত গ্রাম্য ভক্ত মহারাজকে ধরিয়া ফেলিল। অনেক দিন সে তাঁহার দেখা পায় নাই; তাই উৎসাহের সহিত ভিক্ষার ঝুলিটি ভর্তি করিয়া একগাদা শাকসবজি দিয়া দিল।

প্রাসাদে পৌঁছিবামাত্র রানী যমুনাবাঈ সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "দেখে মনে হচ্ছে আজ আমাদের ভাগ্য খুব ভালো। বাবা মহারাজের ঝোলা একেবারে ভর্তি। নিশ্চয় আমরা অনেক কিছু উপাদেয় বস্তু আজ খেতে পাবো।"

"মাঈ, ঠিক বলেছ। অনেক প্রসাদ তোমরা আজ এ ঝুলি থেকে পাবে।" সোৎসাহে বলিয়া বসেন ব্রহ্মানন্দজী, "বল দেখি, কার কি চাই।"

"মহারাজ, আঙুর খেতে আমাদের বড় ইচ্ছে হয়েছে," রানী যমুনাবাঈ ভাবিয়াছিলেন 'আঙুরের সময় এখন মোটেই নয়, দেখি যোগীবর তাঁর অন্নপূর্ণার ঝোলা থেকে এখনি তা বার ক'রে দিতে পারেন কিনা।'

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেই মুহূর্তেই এক থোলা আঙুর উহার ভিতর হইতে টানিয়া তুলিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "এই দ্যাখো, আমার মাঈর জন্য তো আঙুর ঠিকই মিলেছে।"

শিষ্য বালানন্দজী সঙ্গে আসিবার সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বাবা মহারাজের গ্রাম্য ভক্তটি তাঁহার এই ঝুলিটি কেবল শাকসবজি দিয়াই ভরিয়া দিয়াছে। তাছাড়া, এ ঋতুতে আঙুর পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এ সময়ে ঝুলিতে ঐ দুষ্প্রাপ্য ফলের আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পরিহাসপ্রিয়তা ও আনন্দ-রঙ্গের অন্তরালে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার অসামান্য যোগশক্তিকে রাখিতেন সংগোপিত, তাই নর্মদার এই বরপুত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা বড় সহজ ছিল না।

এই শক্তিধর যোগীর আশীর্বাদ ও কৃপা কত সাধক ও মুমুক্ষুর জীবনকে যে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিশোর বালানন্দের মাথায় তখন পরিক্রমা সমাপ্ত করার ঝোঁক চাপিয়া বসিয়াছে।

গঙ্গোনাথ আশ্রমে সাত-আট মাস থাকার পর তিনি আবার নর্মদা তীর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

এই যাত্রাপথে প্রখ্যাত সাধু গৌরীশঙ্কর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। বৎসরের পর বৎসর এই মহাত্মা নর্মদা পরিক্রমা করিয়া বেড়াইতেন। অপরিমেয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধি ছিল তাঁহার করতলগত। যোগ-বিভূতির লীলা প্রায়ই তাঁহার চলেফেরার মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিত।

সঙ্গে অজস্র শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীর দল। সদাব্রত ও ভাণ্ডারা জমায়েতের মধ্যে লাগিয়াই আছে, মহাপুরুষ যখনই নদীতটের যে ঘাটে বা যে মন্দিরে যান 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠে।

যোগীবর ব্রহ্মানন্দের সহিত গৌরীশঙ্করজীর নিবিড় সখ্য ছিল। কিশোর বালানন্দকে তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য জানিয়া পরম সমাদরে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এই শক্তিধর যোগী ছিলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিক্ষা গুরু। তরুণ সাধক ইঁহার সহিত সাত-আট বৎসর অতিবাহিত করেন।

অতঃপর, বালানন্দজীর জীবনে শুরু হয় দীর্ঘ পরিব্রাজনের পালা। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ভারতের অগণিত তীর্থ ও জনপদে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। পর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজের চরণোপান্তেও তিনি উপনীত হইতেন। এ সময়ে যোগসাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি শিক্ষার সুযোগ তাঁহার মিলিত। গুরুদেবের দেহরক্ষার কাল অবধি গঙ্গোনাথে এভাবে তিনি যাতায়াত করিতেন।

নর্মদার পরিক্রমণ ছিল বালানন্দজীর জীবনের এক পবিত্র ব্রত। এ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া তাঁহাকে বহু কষ্ট বরণ করিতে হয়, জীবনও বিপন্ন হয় বার বার।

একবার নর্মদাতীরের মাণ্ডলা নামক স্থানে বালানন্দজী উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে একটি উদাসী সাধু। উভয়েরই হাতে একটি করিয়া ঝোলা এবং বস্ত্র-কম্বলের পুঁটলী। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি হইতেছিল, কমিশনার সাহেব স্বয়ং এজন্য পরিদর্শন কার্যে আসিয়াছেন। বাংলোর সম্মুখে তরুণ সাধু দুইটিকে দেখিয়া তখনি তাঁহাদের ধরিয়া আনাইলেন। তাঁহার সন্দেহ, এইসব অল্প বয়স্ক সাধুরাই সুযোগ পাইলে চুরি-ডাকাতি করে, তারপর বনাঞ্চলে উধাও হইয়া যায়।

সাধুদ্বয়ের ঝোলার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া গেল ছোট দুইটি শাবল ও কুঠার। সাহেব রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, "এবার প্রমাণ মিলেছে, তোমরা ওসব দিয়ে সিঁদ কাটো; আর চুরি-ডাকাতি করো।"

বালানন্দ বার বার বুঝাইতে থাকেন, "সাহেব তা নয়, এ শাবল দিয়ে আমরা কন্দমূল খুঁড়ে বার করি, তা খেয়ে প্রাণ বাঁচাই। আর এ লোহার টাঙ্গী কাজে লাগে পর্ণকুটির বাঁধবার সময়।"

কিন্তু এ ধরনের যুক্তিতে কর্ণপাত করে কে? সাহেবের হুকুমে চাপরাশীরা সাধুদের

পোঁটলা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল তল্লাসীর ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইল। দেখা গেল, একটি মোড়কে বেশ কিছুটা গাঁজা ও শংখবিষ জড়ানো রহিয়াছে।

সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন, "দেখছি তোমরা শুধু চোর ডাকাতই নও, খুনী দস্যুও বটে। এত বেশী পরিমাণ শংখবিষ সঙ্গে নিয়ে চলেছো কেন? নিশ্চয়ই গোপনে এ খাইয়ে তোমরা মানুষ খুন করো। দাঁড়াও, তিন বৎসর ক'রে তোমাদের জেল খাটাচ্ছি।"

বালানন্দ তাঁহাকে প্রাণপণে বুঝাইতে লাগিলেন, গাঁজা ও শংখবিষ পরিব্রাজন-রত সাধুদের প্রায়ই দরকার হয়। বিশেষত তীব্র শীতের রাতে, নর্মদার অনাবৃত তটে, এ বস্তু ছাড়া মোটেই চলে না। শীত নিবারণে শংখবিষ বড় কার্যকরী।

সাহেব কিন্তু কিছুতেই তাঁহার একথা মানিয়া নিতে রাজী নন। ধমকাইয়া কহিলেন, "সাধু, এ শংখবিষ এখনি আমার সামনে খেয়ে দেখাতে হবে, নইলে জেল খাটতে হবে পুরো তিনটি বৎসর।"

বালানন্দজী প্রমাদ গণিলেন। জেল ভোগ করার চাইতে বরং শংখবিষ খাওয়াই ভালো। প্রাণ যায় যাইবে, কয়েদখানার অনাচারের মধ্যে তো আর মৃতকল্প হইয়া থাকিতে হইবে না। মোড়কের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ বিষ ছিল, সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সবটাই তিনি একেবারে উদরস্থ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিয়া নিলেন, এ বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু তাঁহার অনিবার্য। বাংলোর সীমানার বাহিরে, এক বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি সঙ্গী সাধুটিকে বলিলেন, "ভাই, আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কিছুক্ষণের ভেতরই মৃত্যু ঘটবে আমার। তোমার কাছে আমার অনুরোধ মৃত্যুর পর এ দেহটাকে নর্মদার পবিত্র জলে ফেলে দেবে। তারপর তুমি যেথায় ইচ্ছে চলে যেও।"

দেহ অসাড় হইয়া আসিয়াছে, চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার আর দেরি নাই। এমন সময়ে তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল নর্মদামাঈর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। স্নেহপূর্ণ বচনে দেবী অভয়দান করিলেন, তারপর হইলেন অন্তর্হিতা। অতঃপর বালানন্দজীর সংবিৎহারা দেহটি ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে সাহেবের বাংলোয় এক হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রটি শিকার হইতে খানিকটা আগে ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীদের সহিত বসিয়া এক কাপ চা খাওয়ার পরই অকস্মাৎ তাহার ভেদবমি শুরু হয়। নিকটস্থ শহর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনার পূর্বেই যুবকটির মৃত্যু ঘটিল।

কমিশনারের পুত্রের অসুখ শুনিয়া স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসময়ে দেখা করিতে আসেন। সাধুটিকে অচেতন অবস্থায় বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। শুনিলেন, সাহেব তাহাকে আটক করিয়াছেন, এবং শংখবিষ পান করিয়া সে মৃতকল্প হইয়া আছে।

সাহেবকে তিনি বুঝাইলেন, সর্বত্যাগী সাধুটিকে এভাবে নির্যাতন করা মোটেই ভালো হয় নাই। চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়া তুলিয়া অগৌণে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, সাহেব ইতিমধ্যে নরম হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী দুটিকে তখনি

তিনি ছাড়িয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। ডাক্তারী ঔষধ দ্বারা বালানন্দজীকে বমন করানো হইল, ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটির গৃহেকয়েকদিন বিশ্রাম করারপর তিনি কর্মক্ষম হইয়া ওঠেন। আবার শুরু হয় নর্মদা পরিক্রমা।

অনেকদিন পরে ঐ সাহেবের সঙ্গে নদীতীরের এক বনে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন হাতে একটি শাবল নিয়া কন্দমূল উঠাইতে ব্যস্ত ছিলেন। সাহেব চিনিলেন, এটি সেদিনকার শঙ্খবিষ ভোজনকারী সাধু। বালানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "সাহেব, এবার তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো, শাবল দিয়ে আমরা সিঁদ কাটিনে—বনজঙ্গল থেকে আমাদের আহার্য কন্দমূল খুঁড়ে বার করি।"

সাহেবের মনোভঙ্গীর এবার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সলজ্জভাবে তিনি হাসিতে লাগিলেন। বালানন্দজীকে কিছু অর্থ ভেট দিবার জন্য তিনি এসময়ে খুব পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজী করানো গেল না। স্মিতহাস্যে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, "সাহেব, আমরা বনবাসী সাধু, টাকা নিয়ে কি করবো? টাকা নেবার ইচ্ছেই নেই, তাছাড়া, টাকা দিয়ে এ অঞ্চলে কিছু কেনাও যায় না।"

সাহেব সসম্ভ্রমে টুপি উঠাইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।

নর্মদা পরিক্রমাকারী সাধুসন্তদের বিশ্বাস, এ পথের জলে-জঙ্গলে সর্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে নর্মদামাঈর করুণা ও অলৌকিক শক্তিবিভূতি। দেবী সর্বদাই তাঁহার ভক্ত সাধুসন্তদের রক্ষা করেন। পরিব্রাজক বালানন্দের সারাজীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায় ছিল নর্মদা পরিক্রমণ। গোড়ার দিকে গৌরীশঙ্করজীর জমায়েতে, তারপর অপর সাধু মণ্ডলীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিক্রমার কালে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, দেবীর ঐশী শক্তির নানা প্রকাশও তাঁহার সাধক-জীবনকে প্রভাবিত করে।

একবার বালানন্দজী একদল সাধুর সঙ্গে নদীতটের এক অরণ্য পথ দিয়া চলিয়াছেন। সায়ং-সন্ধ্যা তখন অতিক্রান্ত। কৃষ্ণপক্ষের রাত, চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সারাদিন পথ চলিয়া সাধুরা সবাই অবসন্ন, ক্ষুৎপিপাসায় আর নড়িতে পারিতেছেন না। হঠাৎ সকলে দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক ভীল রমণী তাহার গাভীটি সঙ্গে নিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বালানন্দজী নিকটে গিয়া কহিলেন, "মাঈ, বড় ভালো হল তোমার দর্শন পেয়ে। আমরা সবাই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, রাত্রির মতো এই বৃক্ষতলে আশ্রয় নেব স্থির করেছি। এখানকার পথঘাট আমাদের জানা নেই। আমাদের জন্য শিগগীর তুমি তোমার গাঁ থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো। আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

ভীল রমণীর নয়নে হাসির ঝলক। কহিল, "বাছা, তোমাদের কিছু চিন্তা নেই। আমার এই গরুর দুধ থেকেই তোমাদের আজকের ক্ষুৎপিপাসা সব মিটে যাবে। পাত্র নিয়ে একে-একে দাঁড়াও, আমি দুধ দুয়ে দিচ্ছি তোমরা ইচ্ছেমতো পান করো।"

জলপাত্র হিসাবে সাধুদের সবার সঙ্গে আছে এক একটি লাউয়ের তুম্বা। রমণী

তাহাতে দুধ যোগান দিতেছে আর সাধুরা একের পর এক আকণ্ঠ পান করিতেছেন। সকলের দুগ্ধপান সমাপ্ত হওয়ার পর ভীল রমণী গাভীটিসহ অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এবার সাধুদের হুঁশ হইল। তাঁহারা সংখ্যায় তো নিতান্ত কম নন। এতগুলি লোকের ক্ষুৎপিপাসা কি করিয়া এই গাভীর দুগ্ধে মিটিয়া গেল? এ তো সত্যই বড় বিস্ময়ের কথা। তাছাড়া এই ভীল রমণীই বা কে? কি জন্যই বা দুগ্ধবতী গাভীটি-সহ রাত্রে এই জনহীন অরণ্যে সে অপেক্ষা করিতেছিল? নিকটে কোথাও গ্রামের চিহ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। সে তবে কোথায় গেল।

প্রবীণ সাধুরা কহিলেন, "ভীল রমণীর ছদ্মবেশে স্বয়ং নর্মদামাঈ-ই আজ এভাবে আমাদের কৃপা ক'রে গেলেন। এ অঞ্চলে মায়ের কৃপা এমনি ক'রেই সতত ঝরে পড়ে।"

উত্তরকালে বালানন্দ বলিতেন, পরিক্রমাকালে আরও কয়েকবার নর্মদামাঈর অলৌকিক আবির্ভাব তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। দেবীর কল্যাণহস্ত একাধিকবার গহন অরণ্যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

সে-বার বালানন্দজী কামাখ্যা তীর্থে উপনীত হন। দেবীবিগ্রহ দর্শনের পর একাদিক্রমে কয়েকদিন তিনি পাহাড়ের উপর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তারপর এ অঞ্চলের অরণ্যপ্রদেশ পর্যটন করিবার কালে হঠাৎ একদিন মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। জোর ভেদবমি শুরু হয়। মনে মনে ভাবিতে থাকেন, এ জনশূন্য স্থানে চিকিৎসক কোথায় পাওয়া যাইবে? এ মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই, মৃত্যু অনিবার্য।

শরীর একেবারে অবসন্ন। সারা অন্তর পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া নিস্পন্দভাবে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, এক দিব্য কুমারীমূর্তি তাঁর সম্মুখে। মৃদুকণ্ঠে তিনি কহিতেছেন, "ব্রহ্মচারী, তুই ভাবিসনে। এবার তোর মরা হবে না। বেঁচে উঠবি। কিন্তু শিগগীর এখান থেকে প্রস্থান করিস।"

এ দৈবী নির্দেশের পর মূর্তিটিকে আর দেখা গেল না। অতঃপর বালানন্দ গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

পরের দিন নিদ্রাভঙ্গের পরে দেখিলেন, ঐ মারাত্মক রোগ এক রাত্রির মধ্যে একেবারে নিরাময় হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রবল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। দুর্বল দেহটি নিয়া গড়াইতে গড়াইতে দূরবস্থিত এক কূপের সম্মুখে গিয়া কোনোমতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার অনুরোধে গ্রামের মেয়েরা মাথায় জল ঢালিয়া দিল, দেহ স্নিগ্ধ হইল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, অথচ কাহারও প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবার তাঁহার উপায় নাই। কারণ, স্বহস্তে পাক করা অন্ন ছাড়া তিনি কিছু গ্রহণ করেন না।

এক ব্যক্তি এ সময় দয়া করিয়া একটি ইটের চুলার উপর তাঁহার লোটায় খিচুড়ি চড়াইয়া দেয়। স্বহস্তে উহা নামাইয়া নিয়া বালানন্দ তাঁহার ভোজন সমাপ্ত করেন। কলেরার পরই এ এক বিচিত্র কাণ্ড! শীতল জলে স্নান ও খিচুড়ি পথ্য গ্রহণের পর বালানন্দজী কিন্তু একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালানন্দজী তারকেশ্বর এবং অন্যান্য তীর্থাঞ্চল পর্যটন করিতে থাকেন। একবার হুগলী জেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি শুনিতে পান, জলেশ্বরে এক জাগ্রত ও প্রাচীন শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। জলেশ্বর শিব নামে উহা পরিচিত।

দীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করার পর এই বিগ্রহ তিনি দর্শন করিতে আসিলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন, ভিতরে গৌরীপট্টের উপর অর্ধ-হস্ত পরিমাণ একটি শিবলিঙ্গ। পাশেই কিছুটা উচ্চস্থানে এক প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

সন্নিহিত কূপের জলে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বালানন্দজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ জপধ্যানে কাটিয়া গেল। তারপর দেখা দিল এক অদ্ভুত অলৌকিক অভিজ্ঞতা। চারিদিক হইতে মন্দিরের দেওয়াল যেন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। আকাশে বাতাসে প্রচণ্ড ভীতিপ্রদ হা-হা রব! এক অদৃশ্য শক্তি তুলিয়াছে ঝটিকার আলোড়ন।

হঠাৎ সেখানে দৈববাণী শোনা গেল, "ওরে, ভয় নেই, তুই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে অঘোর মন্ত্র জপ কর্।"

নিবিষ্ট মনে বালানন্দ জপ আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে দিব্য প্রশান্তি ও আনন্দে সারা অন্তর তাঁহার ভরপুর হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, দেবাদিদেবের কৃপা মিলিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পরদিন তাঁহাকে এই মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'কে এই শক্তিমান সাধক? এ শিব মন্দিরে রাত্রিযাপন করা তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।'

সেবার তিনি উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময় এক শক্তিমান যোগীপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বালানন্দজীর শিষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার এক বর্ণনা দিয়াছেন :

"কাঙড়া উপত্যকার ভাকসুতে যাইয়া গুরুদেব গোমতীস্বামীর নিকট কিছুদিন অবস্থান করিতেছেন। সেখানে উভয়ে একদিন নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে এক মহাত্মা সেখানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সাধুটি বিদায় হইলেন। একটু তফাতে যাইবার পরেই তিনি 'জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব' বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া গুরুদেব ও গোমতীস্বামী বাহিরে আসিলেন ও উক্ত সাধুটিকে দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই দেখিলেন যে, তিনি জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব বলিতেছেন আর হাততালি দিতেছেন, অমনি তাহার পা দুখানি ভূমি হইতে কিছু কিছু উপরে উঠিতেছে।

"এরূপ করিতে করিতে তিনি শূন্যমার্গে খেচরগামী হইয়া এক উচ্চ পর্বত শিখরের দিকে উঠিতে লাগিলেন ও কিছুক্ষণ পরে তথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গুরুদেব চমৎকৃত হইলেন ও উক্ত মহাত্মার সহিত উত্তমরূপে আলাপ-পরিচয় করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন। অতঃপর নিজ নিজ আসনে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেব গোমতীস্বামীকে এ মহাপুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহার সহিতও বিশেষভাবে ইহার পরিচয় হয় নাই। তবে আরও দু'এক

বার ইহাকে নিম্নে আসিতে ও খেচরগামী হইতে দেখিয়াছেন। উপরের কোন্ শিখরে তিনি অবস্থান করেন, সেখানে কিভাবে অবস্থান করেন ও মধ্যে মধ্যে নিম্ন প্রদেশেই বা কেন আসেন ইহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

"পরে এই খেচর সিদ্ধির বিষয়ে বাক্যালাপ হওয়ায় গোমতীস্বামী বলিলেন যে, এরূপ অদ্ভুত শক্তি এক যোগপ্রভাববলে ও দ্বিতীয়ত দ্রব্যবলে লাভ হয়। যোগবিভূতির বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। দ্রব্যশক্তি বিষয়ে তিনি অবগত আছেন যে, পারদ মিলিত একপ্রকার 'গুটিকা' কোনো কোনো সাধু প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহা মুখে রাখিলে খেচরত্ব লাভ হয়। এ সাধুটির এ খেচরত্ব কি উপায়ে লাভ হইয়াছে জানিতে পারেন নাই।"

শক্তিধর যোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের যে দীক্ষা বীজটি বালানন্দের জীবনে রোপিত হয়, উত্তরকালে তাহা পরিণত ও সার্থক হইয়া উঠে, এক অসামান্য সিদ্ধযোগীরূপে ভারতবর্ষের যোগীসমাজে বালানন্দ কীর্তিত হন। তাঁহার এ সাফল্যের মূলে একদিকে রহিয়াছে গুরু ব্রহ্মানন্দজীর কৃপা, অপরদিকে বিশিষ্ট মহাপুরুষদের শিক্ষাদান ও সহযোগিতা।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী উত্তরকালে নিজ শিষ্যদের উপদেশ দিতেন 'মক্ষিকা বন যাও'— অর্থাৎ যেখানে যা কিছু অধ্যাত্ম-অমৃতের সঞ্চয় দেখ, তাহা হইতে তোমার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তোল।

অধ্যাত্মপথের এ আদর্শটি তাঁহার নিজের সাধন-জীবনেও অনুসৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দজী ও গৌরীশঙ্কর মহারাজ ছাড়াও বালানন্দের জীবনে আরও কয়েকটি মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। নর্মদাতীরের মার্কণ্ডেয় মহারাজের নিকট তিনি হঠযোগের দুরূহ ক্রিয়া সকল আয়ত্ত করেন। তেমনি কাশী ধ্রুবেশ্বর মঠের মণ্ডলেশ্বর রামগিরিজীর কৃপায় বেদান্তের নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। উত্তরাখণ্ডের ত্রিযুগীনারায়ণস্থিত প্রসিদ্ধ মহাত্মা মনসাগিরির নিকট বালানন্দজী এক সময়ে নিগূঢ় মন্ত্রাদি লাভ করিয়াছিলেন। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কৃপাও তাঁহার সাধনজীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে উন্মোচিত করিয়া দেয়, উচ্চতর যোগ-সাধনার ক্রিয়াদি ইঁহার নিকট তিনি শিক্ষা করেন।

সিদ্ধ সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনে অতঃপর দেখা যায় গুরুসত্তার মহিমময় প্রকাশ। বহু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এ সময়ে তাঁহার সাধন-নির্দেশ লাভ করিয়া ধন্য হন। প্রথম দীক্ষিত শিষ্য রামচরণ বসু মহাশয়কে আশ্রয় দানের পর হইতেই তাঁহার কৃপার ধারাটি দিগ্‌বিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। রামবাবুর সহিত বালানন্দজীর সাক্ষাৎ ও দীক্ষাদানের কাহিনীটি বড় মনোজ্ঞ।

কামাখ্যা হইতে ফিরিবার পর তিনি বাংলার নানা অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করিতেছেন। এ সময়ে একদিন তিনি রাণাঘাটে উপস্থিত হন। রামচরণবাবু সেখানকার সাবডিভিশনাল

অফিসার। ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন সাহেবী রুচিসম্পন্ন, ধর্মজীবনের দিকে ঝোঁক না থাকিলেও সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন।

এ সময়ে তিনি এক বিপদে পড়িয়াছেন। রাণাঘাটের নিকট একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। সাবডিভিশনাল অফিসার রাম বসু এ সময়ে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন নাই বলিয়া অভিযোগ উঠে, সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলে। গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার কৈফিয়ত তলব করেন। চাকুরি নিয়া টান পড়িবে বলিয়াও অনেকের আশঙ্কা হয়। ফলে সারা পরিবারে তখন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে।

রামচরণবাবুর মাতা বড় ভক্তিমতী। একদিন তিনি ইষ্টদেবের চরণে পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানাইতেছে, হঠাৎ অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল, 'তোদের ভয় নেই। এক শক্তিমান সাধক এ গৃহে আসছেন, বিপদ এবার কেটে যাবে।'

একটু পরেই বৃদ্ধা জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, জটাজুটসমন্বিত দিব্যকান্তি এক সাধু বাংলোর হাতায় ঢুকিতেছেন।

সাধুটি রামচরণবাবুকে কহিলেন, "বাবা, একটা বাঘছালের বড় দরকার পড়েছে। এখানকার লোকেরা বললে, আপনি নাকি একজন বড় শিকারী। ভাবলাম, আপনার কাছে হয়তো এ বস্তুটি পাওয়া যাবে। সেজন্যই এলাম।"

সাধুর দিব্যকান্তি এবং প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া রামচরণবাবুর মন ভিজিয়া গেল। দুই একটি ব্যাঘ্রচর্ম তাঁহাকে দেখাইলেন, কিন্তু পছন্দমতো নয় বলিয়া সাধু ইহা গ্রহণ করিলেন না।

সামান্য একটুমাত্র দর্শন, কিন্তু রামচরণবাবুর জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার যেন সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সেদিন রাত্রিতে নিদ্রার ঘোরে তিনি এ সাধুর স্বপ্ন দেখিলেন। অতঃপর অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বার বার ডাকিয়া বলিতে থাকে, 'ওরে এ সাধুর দ্বারাই তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এঁরই চরণে তুই আশ্রয় গ্রহণ কর।'

রামবাবু সপরিবারে মহাত্মার শরণ নিলেন। রেল দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট গোলমাল তাঁহার আশীর্বাদে একেবারে চুকিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে রামবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বালানন্দ মহারাজ উভয়কে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

গুরুর প্রতি রামচরণবাবুর ভক্তি ক্রমে দৃঢ় একৈকনিষ্ঠায় পরিণত হয়, সমগ্র জীবনটি হইয়া ওঠে গুরুময়। একবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কারবঙ্কল হওয়ায় উহাতে অস্ত্রোপচার করা হয়, রামবাবু কিন্তু নিজের উপর ক্লোরোফরম প্রয়োগ করিতে দেন নাই। সার্জন যখন দেহে অস্ত্রোপচার করিতেছে, তখন তিনি একান্ত মনে গুরুদেব বালানন্দ মহারাজের চরণ ধ্যান করিয়া চলিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, এ সময়ে তিনি কোনো জ্বালাযন্ত্রণাই অনুভব করেন নাই।

এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই বালানন্দ মহারাজের এক পত্র তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছে। তিনি তখন গির্ণার পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। একদিন ধ্যানস্থ অবস্থায় রামবাবুর অস্ত্রোপচারের দৃশ্যটি ছায়াচিত্রের মতো তাঁহার সম্মুখে বার বার

ভাসিয়া উঠিতে থাকে। তিনি দেখেন শিষ্যের পৃষ্ঠদেশে ছুরি চালানো হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র বেদনাবোধ বা কাতরতা নাই ; গুরুর দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টিটি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। মহারাজের চিঠিতে এই তথ্যাদি জানিয়া রামচরণবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না।

বালানন্দজীর এক প্রবীণ শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম দয়ানিধি ঝা। দেওঘরে স্বামীজীর করণীবাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে পুত্রসহ তিনি সেখানে বাস করিতে থাকেন। একদিন গভীর রাত্রিতে এক বিষধর সর্প তাঁহার পুত্রকে দংশন করে। অবস্থা তৎক্ষণাৎ সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। দয়ানিধি ঝাকে কিন্তু মোটেই বিচলিত হইতে দেখা গেল না, গুরুর চরণে প্রণাম জানাইয়া নির্বিকার চিত্তে তিনি তাঁহার নিয়মিত জপ-সাধনায় বসিয়া গেলেন।

এই প্রবীণ শিষ্যটি এই সময়ে ধ্যানাবস্থায় এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠেন। তিনি দেখিতে পান, যমদূতের মতো কতকগুলি বিকটাকার মূর্তি আশ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর বালানন্দজী ত্রিশূল হস্তে তাহাদের বিতাড়িত করিতেছেন। ঝা'র পুত্রটি কিন্তু সে রাত্রিতে বিস্ময়কররূপে রক্ষা পায়।

দেওঘরের সন্নিহিত তপোবন পাহাড়ে বালানন্দ মহারাজ এক সময়ে তাঁর তপস্যায় রত থাকেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণতির মধ্য দিয়া তাঁহার যোগীজীবন সার্থক হইয়া উঠে। বালানন্দজীর এই সময়কার বহু মনোজ্ঞ কাহিনী রহিয়াছে।

ভক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"একদিন তিনি গুহার মধ্যে একান্তে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কতক্ষণ ধ্যানাবস্থায় ছিলেন মনে নাই, কিন্তু যখন চক্ষু উন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন, এক বিচিত্র রং-বিশিষ্ট সর্প তাহার বিশাল ফণাটি বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। এ সর্পের আর একটু বিশিষ্টতা ছিল এই যে, মানুষের গোঁফের মতো অনেকগুলি দীর্ঘ দীর্ঘ রোম তাহার মুখে ছিল। ইহাকে দেখিয়া মহারাজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার ধারণা হইল যে ইহা কখনও সর্প নহে, সর্পের বেশে কোনো মহাত্মা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। এইরূপ মনে হইতেই মহারাজ ত্রাটক মুদ্রা অবলম্বনপূর্বক এ সর্পের চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু সংযোগ করিলেন। ইহা করিতেই সাপটি ফণা সংকোচনপূর্বক ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

"অপর ঘটনাটি এইরূপ। মহারাজ নিম্নে ধুনির কাছে রাত্রিতে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। তখন শীতকাল, এজন্য একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে ছিল। রাত্রি আন্দাজ একটা দুটার সময় তিনি বোধ করিলেন যে, কে যেন তাঁহার গা হইতে কম্বলখানি ফেলিয়া দিল। ইহা করিতেই তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে, কম্বলখানি বাস্তবিকই ধুনির নিচে পড়িয়া আছে। এমন সময় দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ও তাঁহাকে পাহাড়ের উপরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। মহারাজ এ আহবানে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বা কেন ডাকিতেছে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার পিছনে পিছনে যেন একটা আবেশভরে উপরে চলিতে লাগিলেন। এরূপভাবে

উপরের গুহা পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গেল। গুহা দিনের বেলায় তালা বন্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহারাজের বেশ মনে ছিল। কিন্তু সেখানে যাইতে দেখিলেন গুহার দ্বার খোলা রহিয়াছে। যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে আগে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মহারাজ স্বপ্নাবিষ্টের মতো গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"গুহা অতিশয় অন্ধকারময় ছিল, এজন্য তখন পূর্বোক্ত আহ্বানকারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। গুহার ভিতর একটি নির্দিষ্টস্থানে মহারাজের দিয়াশলাই ও বাতি থাকিত এজন্য অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া উহাদের তল্লাস করিতেছেন, এরূপ সময়ে গুহাতে এক পরম উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ বিজলীর আলোর মতো আলো হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। এ আলো এত পরিষ্কার যে, মেঝেতে সূচ পড়িয়া থাকিলেও দেখা যাইত। পূর্বোক্ত আহ্বানকারীকে কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। মহারাজের চিন্তা আসিতে লাগিল যে, তিনি তখন জাগ্রত না স্বপ্নাবিষ্ট—এরূপ ভাবিতেই তিনি যেন সমাধিস্থ হইয়া গেলেন।

"সকালে নিচের ধুনিতে মহারাজকে না দেখিয়া প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল যে, মহারাজ বোধ হয় বেড়াইতে গিয়াছেন। অধিক বেলা হইলেও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া সকলে উপরের গুহায় গেল। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন বেলা। কিন্তু তাহারা যাইয়া দেখিল, মহারাজ তখনও ধ্যানস্থ। সকলের আহ্বানে তাঁহার ধ্যান ভগ্ন হইল ও তিনি রাত্রির বিবরণ প্রকাশ করিলেন।"

তপোবন পাহাড়ের এই তপস্যাময় জীবনেই জননী নর্মদামাঈর সহিত বালানন্দজীর সাক্ষাৎ হয়। দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রত্যাদেশে চল্লিশ বৎসর পর আবার মাতা-পুত্রের মিলন ঘটে। অতঃপর জননীর সেবা-পরিচর্যার শেষকৃত্যের মধ্য দিয়া বালানন্দজীর ব্যবহারিক জীবনের সব কিছু কর্ম ও কর্তব্যের অবসান ঘটিয়া যায়।

রামচরণ বসুর তিরোধানের পর তাঁহার পত্নী গুরুর জন্য এক আশ্রমভবন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন। এই ভক্তিমতী শিষ্যার আগ্রহাতিশয্যে ও অর্থানুকূল্যে করণীবাদের আশ্রমটি স্থাপিত হয়। তারপর এ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া যোগীবরের করুণাধারা দিকে দিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যদ্বয়, মৌজীগির ও পূর্ণানন্দ স্বামী, অতঃপর এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্ত সাধকদের আগমনের পর হইতে ধীরে ধীরে শিক্ষিতসমাজে বালানন্দজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বালানন্দজী কখনো ফাঁক বা ফাঁকির অবকাশ রাখিতেন না। তিনি কহিতেন—

চারো পরিক্রামে যব শিষ্য উতরে।
তব হী গুরু উসকো পাকা ঠহরে॥

তাঁহার এ চার পরীক্ষাকে তিনি বলিতেন—ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন ও তাড়ন। গুরুদেব যেন পাকা স্বর্ণকার, শিষ্যদের জীবন দ্বারা অলংকার তৈরী করিতেছেন। প্রথমে

পাথরে ঘর্ষণ করিয়া তিনি বুঝিয়া নেন—ধাতুটি প্রকৃত সোনা, না কোনো মেকি বস্তু। তারপর তাপন—ত্যাগ-তিতিক্ষার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া বুঝা যায়, খারাপ ধাতুর মিশ্রণ, ময়লা ও গলদ কতটা কাটিয়াছে। সবটা সহজে নিষ্কাশিত হয় না, তাই স্থল বিশেষে প্রয়োজন হয় ছেদনের। শেষটায় খাঁটি সোনা পরীক্ষার জন্য আসে হাতুড়ির আঘাত বা তাড়ন।

নিজ জীবনে যে কৃচ্ছ্রব্রত, তপস্যা ও ইষ্টনিষ্ঠা বালানন্দজী অনুসরণ করেন, এ যুগের সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নয়। একথা তিনি জানিতেন, তাই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদের জন্য কঠোরতর পক্ষপাতী হইলেও মুমুক্ষু গৃহস্থের জন্য সহজসাধ্য সাধনার কথাই তিনি বলিতেন। অপার স্নেহ ও সহানুভূতিভরা তাঁহার কল্যাণ হস্তটি তাহাদের সাহায্যে সদা প্রসারিত থাকিত।

বালানন্দজী সে-বার কলিকাতায় আসিয়া বরানগরে কিছুদিন বাস করেন। মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য বাসস্থানের সম্মুখে লোকের ভিড় লাগিয়াই আছে। এসময়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একদিন তাঁহার এক প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন। অনুরোধ জানান, বালানন্দজী যদি কৃপা করিয়া তাঁহার ভবনে একবার পদার্পণ করেন তিনি কৃতার্থ হইবেন।

যোগীবর পরিহাস করিয়া কহিলেন, "যতীন্দ্রমোহন যে 'মহারাজ' তা আমি শুনেছি। এদিকে আমাকেও আবার বহু লোক 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে। এক মহারাজের কাছে অপর মহারাজ এলে তাতে আর নিন্দা কি? মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে একবার এখানে এলেই তো ভাল হয়।"

উপরোক্ত কথা কয়টি বলিয়াই বালানন্দজী এক সিদ্ধ মহাপুরুষের গল্প উপস্থিত ভক্তদের শুনাইয়া দিলেন:

নগরের রাজপথে এক মহাত্মা সেদিন আসন বিছাইয়া বসিয়াছেন। এদিকে হঠাৎ হৈচৈ পড়িয়া গেল, বহু লোকলশকর সঙ্গে নিয়া সে অঞ্চলের অধিপতি সেখান দিয়া আসিতেছেন। সাধুটি একেবারে রাজপথের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অগ্রগামী রক্ষীদল তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল—এভাবে তাঁহার বসিয়া থাকা চলিবে না, রাজা আসিতেছেন।

চক্ষু উন্মীলন করিয়া সাধু সংক্ষেপে বলিলেন, "মহারাজকে বল, এখানেও এক মহারাজ বসে আছেন।"

মহা বিপদ। সন্ন্যাসীর নড়িবার যে কোনো লক্ষণই নাই। রক্ষীরা রাজাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনিও তাড়াতাড়ি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সেখানে পৌঁছিলেন।

সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "শুনলাম, প্রভু নাকি এক মহারাজা। কিন্তু আপনার ফৌজ কোথায়?"

"ফৌজের কি দরকার? কেউ তো আমার দুশমন নয়।"

রাজা কহিলেন, "খুব ভালো কথা, কিন্তু বলুন দেখি, আপনার তোষাখানা কোথায়?"

"কোনো খরচো বালাই নেই—তবে আর তোষাখানা দিয়ে কি কাজ? আমার যে 'স্বদেশং ভুবনত্রয়ং'—রাজত্বও আমার রয়েছে ত্রিভুবন জুড়ে, তাহলে মহারাজা নয় তো কি?"

মহাত্মার বাণীর মর্ম রাজা বুঝিলেন, অতঃপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাস্তার এক পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর গল্প বলা শেষ হইল। প্রেরিত কর্মচারীটি এবার ফিরিয়া গিয়া সবিস্তারে সকল কথা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য, এই বিবরণ শোনার পর মহারাজা কিছুটা লজ্জিত হন। এবার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিজেই তিনি বালানন্দজীর চরণতলে উপস্থিত হন।

যতীন্দ্রমোহন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মতো সংসারীর কর্তব্য কি? এত কিছু বন্ধনের জালে জড়িত রহিয়াছেন, মুক্তির জন্য কোন্ পন্থা নিয়া অগ্রসর হইবেন?

বালানন্দজী কহিলেন, "মহারাজ, আপ অব্ উলট যাইয়ে।"

কথাটির মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মহারাজ তাঁহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া আছেন। বালানন্দজী বুঝাইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এখন আপনার যা কিছু আছে সবই এমনি থাকবে, শুধু আপনার বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীটিকে বদলাতে হবে। 'সব মেরা' এ মনোভাবটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে করতে হবে—'সব তেরা'—অর্থাৎ নিজের অহংবোধটির স্থলে স্থাপিত করতে হবে ভগবানকে। আপনি যে মালিক—এ বোধটি ত্যাগ ক'রে হতে হবে ম্যানেজার। কোনো মাঈকে এ কথা বোঝাতে হলে, আমি তাঁকে বলতাম,—মাঈ, অব ঝি বন যাইয়ে।"

১৯০৬ সালের কথা বালানন্দজী গুরুধাম গঙ্গোনাথ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এ সময়ে মহাসমারোহে পর পর মহারুদ্র যজ্ঞ ও মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। একদিন হাসিতে হাসিতে তিনি বালানন্দজীকে কহিলেন, "বাবা, আমি নরদেহ এবার ত্যাগ করবো।"

"সে কি কথা গুরুজী—আপনি ইচ্ছা করলে আরও বহুকাল যে এ দেহ ধারণ করতে পারেন।"

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল. "আউর নহী বহুত পুরাণা হো গয়া।"

মাঘ মাসের পুণ্যতিথি। সেদিন প্রত্যূষকাল হইতেই নর্মদার বরপুত্র ব্রহ্মানন্দজী আপন কুটিরে ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন, এ ধ্যান আর তাঁহার ভাঙে নাই। আশ্রমের এক প্রান্তে নর্মদাতটে বসিয়া বালানন্দ জপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যে স্থানে আসন পাতিয়া বসেন তাহার সন্নিহিত কুটিরটি ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তারপর একটি অগ্নিশিখা চকিতে সে স্থান হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া দূর আকাশে মিলাইয়া গেল। বুঝিলেন, যোগীবরের জ্যোতিঃসত্তা চিরতরে নরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর আর সেখানে অবস্থান করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের তিনি প্রথম শিষ্য এবং প্রিয় শিষ্য। গঙ্গোনাথের গদি গুরুজী তাঁহাকেই দিয়া যান, কিন্তু গুরুভ্রাতা কেশবানন্দজীকে ঐ গদিতে স্থাপন করিয়া বালানন্দ দেওঘরেই প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে। করণীবাদ আশ্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যোগীবরের ভক্ত শিষ্যের সংখ্যাও কম বৃদ্ধি পায় নাই। আনন্দ ও কল্যাণের উৎসরূপে পবিত্র বৈদ্যনাথধামে বালানন্দ মহারাজ তখন অবস্থান করিতে থাকেন। অতঃপর ধীরে ধীরে একদিন এই জীবন-লীলানাট্য আসিয়া পড়ে তাহার শেষ দৃশ্যে।

১৩৪৪ সালের ২৬শে জ্যেষ্ঠের মধ্যরাত্রে যোগীবর পরমাত্মায় লীন হইয়া যান। নব বৎসর বয়সে উজ্জয়িনীর মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গের পাদপীঠ হইতে শুরু হয় যে মহাজীবনের অভিযাত্রা, বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের পরমসত্তায় সেদিন ঘটে তাহার পরিসমাপ্তি।

১৯০৪

স্বামী নিগমানন্দ

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। সুপারভাইজার নলিনীবাবুর দপ্তরের কাজকর্ম তখনও সমাপ্ত হয় নাই। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রগুলি সম্মুখে ছড়ানো, নিবিষ্ট মনে তিনি কয়েকটি জটিল বিষয়ের কথা ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহের বাতি একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

ব্যাপার কি! দৃষ্টি ফিরাইতেই নলিনীকান্ত সবিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী অদূরস্থিত টেবিলটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব! প্রায় তিন মাস পূর্বে স্ত্রীকে তিনি স্বগ্রামে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ আজ এ সময়ে সে এখানে কি করিয়া আসিবে? পরক্ষণেই বুঝিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্ত্রী সশরীরে এখানে উপস্থিত হন নাই, তাঁহারই এক অশরীরী মূর্তি আজ এখানে, কি জানি কেন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু এই ছায়ামূর্তিই বা তাঁহার সম্মুখে এভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন? দৃষ্টি বিভ্রমের জন্য এরূপ দেখা যায় নাই তো? বার বার দুই চোখ রগড়াইয়া আবার সেদিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মূর্তিটি কিন্তু তেমনি অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভ্রমই যদি তাঁহার হইবে, তবে এ ছায়ামূর্তি এমন স্থির হইয়া থাকিবে কেন? তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে হইল এ অশরীরী মূর্তির মুখটি বড় বিষাদাচ্ছন্ন।

হঠাৎ নলিনীকান্ত সজাগ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অন্তরে এক অজানা ভয়ের সঞ্চার হইল। 'কে তুমি, কে তুমি!'—বলিয়া তিনি উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভৃত্যটি পাশের কক্ষেই থাকে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া তখনি সে ছুটিয়া আসে। উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়া দেখিলেন। কই, কেহই তো কোথাও নাই। অশরীরী নারী ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

নলিনীকান্ত বড় চিন্তায় পড়িলেন। এ ছায়ামূর্তি তাঁহার প্রাণপ্রিয়া পত্নীর মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে নাই তো। চিঠিপত্রে অবশ্য এ কয়দিনের মধ্যে কোনো সংবাদ তিনি পান নাই। তাঁহার বর্তমান কর্মস্থানটির নাম নারায়ণপুর, উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। এখান হইতে তাঁহার স্বগ্রাম, নদীয়ার কুতুবপুর কম দূরের পথ নয়। চিঠি এখানে পৌঁছিবার পূর্বেও অনেক কিছু ঘটিয়া থাকিতে পারে। নলিনীকান্ত বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, তবে কি তিনি অবিলম্বে দেশে রওনা হইবেন?

কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া পারা যায়? জমিদারের কয়েকজন আমিনের কাজ তত্ত্বাবধানের ভার এখানে তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, কর্মদক্ষতা ও সততার জন্য তাঁহার উপর কর্তৃপক্ষের অগাধ বিশ্বাস। সর্বোপরি নলিনীকান্তের উপর আজকাল তাঁহারা বড় বেশী নির্ভর করিতেছেন। এ অবস্থায় হঠাৎ কাজকর্ম ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। তাছাড়া বিশ-বাইশ দিন পরেই দুর্গাপূজা আসিতেছে।

ভাবিলেন, হাতের কাজগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া পূজার সময়ই বরং একেবারে বেশী ছুটি নিয়া বাড়ি যাইবেন।

পরদিনের ডাকেই কিন্তু এক পত্র আসিল, নলিনীকান্তের স্ত্রী খুব অসুস্থ। সংবাদটি পাইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না, তবে কি ইতিমধ্যে স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে? মৃত্যুর পরেই কি তাই তাঁহার ছায়ামূর্তিটি এভাবে সেদিন দর্শন দিয়া গেল? কিন্তু পরলোক, পুনর্জন্ম, আত্মা প্রভৃতিতে তাঁহার মোটেই বিশ্বাস নাই। তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

নলিনীকান্ত স্ত্রীকে বড় নিবিড়ভাবে ভালোবাসেন। নিজেকে নিজে যতই তিনি বুঝান না কেন, দুশ্চিন্তার জ্বালা হইতে কোনো মতেই আর নিষ্কৃতি পাইতেছিলেন না। কাজকর্ম সব সমাপ্ত করিয়া পূজার ছুটিতে তিনি স্বগ্রাম কুতুবপুর রওনা হইলেন। কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন, জীবনসঙ্গিনী আর ইহজগতে নাই। পত্নীগত প্রাণ নলিনীকান্ত শোকে মূহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁর কর্মস্থান নারায়ণপুরে যে সময়ে তিনি স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শন করেন, কুতুবপুরের বাড়িতে উহার ঠিক চারদণ্ড পূর্বে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

ঐ অশরীরী মূর্তি আরও দুইবার এ সময়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরহবিধুর নলিনীকান্তের কাছে কোনো জাগতিক বস্তুর আকর্ষণই সেদিন আর নাই। কিন্তু পরলোকবাসিনী পত্নীর সহিত সাক্ষাতের জন্য, তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, অন্তর তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রেততত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ, মাদ্রাজের আদেয়ারে গিয়া থিয়োসফিস্টদের সাহায্যে প্রেতলোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন, ইত্যাদি অনেক কিছুই করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা, কোনো কিছুতেই শান্তি লাভ হইল না। মৃতা পত্নীর সহিত মিলনের তীব্রতা কেবলই বাড়িয়া চলিল।

নলিনীকান্ত এখন শুধু পরলোক ও অলৌকিক রাজ্যের তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য পাগল। দিবারাত্রি এই উদ্দেশ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান। কে তাঁহাকে সূক্ষ্মতম লোকের বার্তা আনিয়া দিবে, প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বহুবাঞ্ছিত যোগাযোগ সাধন করিয়া দিবে—কোথায় সেই শক্তিমান পথপ্রদর্শক? এই চিন্তায়ই তিনি সদা ব্যাকুল।

এ সময়ে একদিন কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংসের কথা শ্রবণ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্বাশ্রমে ছিলেন বিখ্যাত ডাফ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ বলিয়া এসময়ে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি। নলিনীকান্ত তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন।

সকল কথা শুনিয়া পূর্ণানন্দস্বামী সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, তুমি তোমার স্ত্রীকে পেতে ব্যস্ত হয়েছ, কিন্তু সেই স্ত্রী এবং বিশ্বের যে কোনো স্ত্রীলোক মাত্রেই যে আদ্যাশক্তির ছায়া। তুমি শুধু এ ছায়ার সন্ধানে যে শক্তি ব্যয় করবে তা দিয়ে

মহামায়াকেই তো লাভ করতে পারো। সিদ্ধি লাভ করলে দেখবে, সব কিছুই তোমার করায়ত্ত।"

মহাপুরুষের এই বাণী নলিনীকান্তের দগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া দিল। সকাতরে তিনি তাঁহার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী উত্তর দিলেন, "না বাবা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন। সময়মতো তুমি তাঁর দেখা পাবে।"

এবার গুরুলাভের জন্য নলিনীকান্তের মনে তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। যে করিয়াই হউক, সদ্‌গুরুর সন্ধান করিয়া দীক্ষা তাঁহাকে নিতেই হইবে। এসময়ে কার্যস্থল নারায়ণপুরে থাকিতেই লাভ করেন তিনি এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা।

তিনি নিজেই এ অভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন,—"সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। এক রাত্রিতে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, জানালা দরজা সব বন্ধ, ঘুম হয় নি, তন্দ্রা এসেছে মাত্র, এমন সময় এক জ্যোতির্ময় সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ আমায় ডেকে বললেন,—নাও বৎস, এই মন্ত্র নাও। তুমি মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছ, এই আমি তোমার জন্য মন্ত্র নিয়ে এসেছি ধর।' কি গম্ভীর সে স্বর! আমি হাত পেতে সেটা নিলাম। মহাপুরুষের অঙ্গজ্যোতিতে অন্ধকার গৃহ তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল—একটা পাতায় কি যেন লেখা আছে। কাছে দেশলাই ছিল, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখি, বিল্বপত্র রক্তচন্দনে লেখা একাক্ষরী এক মন্ত্র।

"এটি কি মন্ত্র, কেমন ক'রে জপ করতে হয়—তা জেনে নেবার জন্য যেমনি মন্ত্রদাতার উদ্দেশে মুখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি তিনি আর নেই। দিব্যমূর্তি অদৃশ্য হয়েছেন। ঘরের দরজা-জানালা সব পূর্ববৎ বন্ধ। দুয়ার খুলে পাতি পাতি ক'রে সব জায়গা খুঁজলাম, পেলাম না, অবাক্ হলাম, মন যেন কেমন হয়ে গেল। ঘরে এসে মেঝেয় পড়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলাম। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যেতে লাগল। আমার মনে হল—একি তবে স্বপ্ন? না—স্বপ্ন হলে বেলপাতা আসবে কোথা হতে? আর ঘরের দরজা যখন ভেতর থেকে বন্ধ, কি ক'রে তখন অন্যের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে? মনে হল—আমি কি অন্যায় করলাম! তখন বিল্বপত্রে কি লেখা আছে, তা জানতে ব্যাকুল না হয়ে, যিনি আমায় বিল্বপত্রটি দিলেন, তাঁকে ধরলাম না কেন?"

ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া নলিনীকান্তের মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, কাশীধামে বরং একবার যাইবেন। বহু সাধু মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে থাকেন, মন্ত্রপ্রাপ্তির রহস্য সেখানে হয়তো উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিবে। তাই কাশীতেই প্রথমে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু কোথাও প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

উৎকণ্ঠার আবেগে একদিন স্থির করিলেন, প্রাপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশ কাহারো কাছে না পাইলে এ জীবন আর রাখিবেন না, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবেন।

সেই দিনই গভীর নিশীথে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত এক ঋষিকল্প পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তুমি দিগ্বিদিকে কোথায় গুরু খুঁজে হয়রান হচ্ছো? তোমার গুরু তো তোমার দেশের নিকটেই রয়েছেন। বীরভূম জেলার তারাপীঠে তুমি যাও। সেখানে গিয়ে মহাতান্ত্রিক বামাক্ষেপার শরণ নাও, অভীষ্ট লাভের পথ তিনিই দেখিয়ে দেবেন।"

এ স্বপ্নাদেশ নলিনীকান্তের হৃদয়ে অমৃত-প্রলেপ বুলাইয়া দিল। অবিলম্বে তারাপীঠে উপনীত হইয়া ক্ষেপার চরণোপান্তে তিনি উপবেশন করিলেন। তারা-মায়ের সিদ্ধসাধক বামার অমোঘ আশীর্বাদ তাঁহার জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিল। ফলে নলিনীকান্ত উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করিলেন সমর্থ তন্ত্রসাধক নিগমানন্দ রূপে।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত কুতুবপুর। এক ধর্মপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণরূপে ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় এ গ্রামে পরিচিত ছিলেন। ইনিই নলিনীকান্তের পিতা। জননী মানিকসুন্দরী ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ও নিরন্নকে অন্নদানে এই মহীয়সী নারীর উৎসাহের সীমা থাকিত না। সে অঞ্চলের সবাই জানিত, কুতুবপুরের 'বামুন বাড়িতে' একবার উপস্থিত হইলে, এই করুণাময়ীর শরণ নিলে দুই মুষ্টি অন্ন মিলিবেই।

১২৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথি। চারিদিকে হরিধ্বনি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে মানিকসুন্দরীর অঙ্কে এক সুদর্শন শিশু আবির্ভূত হয়। পিতামাতা আদর করিয়া নাম রাখেন নলিনীকান্ত।

বড় হইয়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে বালক সদাই দৌরাত্ম্য করিয়া ফিরে কিন্তু বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যায় অন্য এক রূপ, তাহার মেধা বিস্মিত করে সবাইকে। তাছাড়া, পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কারও বেশ প্রবল—মাঝে মাঝে এ সংস্কার তাহার জীবনের দ্বারে আসিয়া উঁকি দেয়, উচ্চকিত করিয়া তোলে।

নলিনীকান্ত তখন বালক। অন্তঃপুর হইতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে চণ্ডীমণ্ডপে চলিয়াছে। হাতে একটি সাঁঝ-প্রদীপ, এই প্রদীপ দিয়া সেখানে আলো জ্বালাইতে হইবে। মণ্ডপে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য দেখিয়া সে কিন্তু হতবাক্ হইয়া যায়। অকস্মাৎ কি জানি কেন মেঝের উপর একস্থানে দপ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গেই এই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভূত হয় দশভুজার দিব্য মূর্তি। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বালক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়। হাতের প্রদীপটি ভূতলে ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ের কোলে।

এই বালক বয়সেই আর একদিন দেখা দেয় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নলিনীকান্ত সেদিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। গভীর নিশীথে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া যায়, চাহিয়া দেখে, শয়নগৃহের সংলগ্ন ছাদটি চাঁদের আলোয় একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আজ তো ঘোর অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠিবার তো কথা নয়। এবার বিপরীত দিকে চাহিয়া দেখে, সেদিকও যে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। বার বার

এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালনের পর বিস্ময় তাহার একেবারে চরমে পৌঁছিল। একি, এ আলোক যে তাহারই নয়ন হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নলিনীকান্তের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে সুতীক্ষ্ম নীতিবোধ ও পৌরুষ। সামাজিক কোনো অন্যায় বা অবিচার তিনি কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। ফলে মাঝে মাঝে নানা জটিলতার সৃষ্টিও হইত।

একবার নলিনীকান্ত কোনো প্রতিবেশীর বাড়ির সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন। বাহির হইতে এক বৃদ্ধার ক্রন্দনরব শুনিয়া তখনই তিনি অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন এক দুর্দান্ত তরুণী বধূ তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ধরিয়া নির্বিচারে প্রহার করিতেছে। নলিনীকান্ত এস্থলে কোনো ঔচিত্যবোধের ধার ধারিলেন না। বধূটিকে তখনই স্বহস্তে বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ফলে এ সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা আনীত হয়। কিন্তু অপর পক্ষ তাহাদের নিজেদের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া শেষটায় এ মামলা প্রত্যাহার করে।

সামাজিক অত্যাচার ও নানা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নলিনীকান্ত এভাবে প্রায়ই রুখিয়া দাঁড়াইতেন। এই ছেলেকে নিয়া তাই পিতা-মাতার স্বস্তি ছিল না।

পুত্র বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবার তাঁহার উপর সংসারের দায়িত্ব কিছুটা চাপানো দরকার। তাই ভুবনমোহন তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। সৎপাত্রী অতি সত্বরই মিলিয়া গেল। সুরূপা এবং সুলক্ষণা বধূ সুধাংশুবালাকে পরম সমাদরে তিনি গৃহে আনিলেন; পুত্রের বয়স এ সময়ে আঠারো বৎসর।

ওভারসিয়ারী পরীক্ষার পাস করার পর নলিনীকান্তের চাকুরী জীবন আরম্ভ হয় এবং পরবর্তীকালে বাসমণি এস্টেটের অধীনে তিনি এক কর্ম গ্রহণ করেন। এখানকার চাকুরীস্থল নারায়ণপুর হইতেই দেখা দেয় তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সূচনা। প্রিয়তমা পত্নীর অশরীরী আবির্ভাব সেদিন অন্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহাই একদিন উন্মোচিত করে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দ্বার।

স্বর্গতা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করা যায় কিনা, পরলোক তত্ত্ব কি এ সব নিয়া কিছুদিন অনুসন্ধান চালাইলেন নলিনীকান্ত। শান্তি মিলিল না। জানা অজানা সাধুসন্তদের কাছে কত ঘোরাঘুরিই না করিলেন। অতঃপর তাঁহার জীবনে উদ্গত হইল ঈশ্বর দর্শনের অভীপ্সা। স্বপ্নযোগে একদিন একটি বীজমন্ত্রও প্রাপ্ত হইলেন। এবার অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়া উপস্থিত হইলেন তারাপীঠের তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপার সকাশে।

দ্বারকার তটে বালুকাময় মহাশ্মশান। চারিদিক কঙ্কাল-করোটিতে সমাচ্ছন্ন। অর্ধদগ্ধ শবদেহ নিয়া চলিতেছে শকুনি ও শৃগালের কাড়াকাড়ি। অদূরে বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা তারামন্দির। নলিনীকান্ত ধীর পদক্ষেপে সেদিকে অগ্রসর হইলেন।

মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, করবী গাছের শাখাটি নোয়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এক উলঙ্গ অবধূত। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন অন্তর হইতে অস্ফুটস্বরে

তাকিয়া বলিল—'ওরে ইনিই যে তোর পথপ্রদর্শক—তারাপীঠের ভৈরব বামাক্ষেপা। তোর জন্যই যে ইনি অপেক্ষা ক'রে আছেন।'

কাহাকেও কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ আর রহিল না। উন্মত্তের মতো নলিনীকান্ত তাঁহার চরণ দুইটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। নয়নে তখন অঝোর ধারে নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা।

ভৈরবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এক করুণাঘন রূপ। পরম স্নেহে, হাতে ধরিয়া, তিনি এই ভূপতিত আগন্তুককে কাছে টানিয়া নিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে, তুই কি চাস?"

নলিনীকান্ত বিবৃত করিলেন তাঁহার শোকার্ত হৃদয়ের কাহিনী। কহিলেন, "বাবা, আপনি কৃপাময়। কৃপার ভিখারী হয়ে আমি এসেছি। তারামায়ের চরণতলে আমায় পৌঁছে দিন।"

দিব্য লক্ষণসমূহ সুদর্শন তরুণের সারা অঙ্গে। মুমুক্ষার সহজাত সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিতে সর্বজ্ঞ ক্ষেপার দেরি হইল না। আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "ওরে, আমার তারামায়ের মধ্যেই যে সব রয়েছে। তাঁর দেখা পেলেই সব পাবি। পরম ভাগ্যবান্ তুই, ইতিমধ্যেই যে তারামন্ত্র পেয়েছিস। তুই মায়ের ছেলে, তোকে আমি সাধন শিখিয়ে দেবো, ভাবিসনে।"

বামাক্ষেপার সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নলিনীকান্ত তন্ত্রসাধনার নানা নিগূঢ় ক্রিয়া-পদ্ধতি আয়ত্ত করিলেন। তারপর এক নিশীথ রাত্রে ক্ষেপা তাঁহাকে ইষ্ট দর্শনের জন্য তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসাইয়া দিলেন।

চারিদিকে নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার। শিমুল-শেওড়া-বনোদ্যানের ঘন অরণ্যে মাঝে মাঝে শুনা যায় শকুনি, গৃধিনী আর বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। কঙ্কাল, করোটি ও খর্পরের উপর দিয়া খস্‌খস্ শব্দে কাহারা যেন চতুর্দিকে নাচিয়া বেড়ায়। হি-হি-হি অট্টহাস্যে শ্মশানভূমি এক একবার প্রকম্পিত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে গায়ে আসিয়া লাগে তপ্ত নিশ্বাস। একি অশরীরী না ভয়াল শ্বাপদ সরীসৃপের বিচরণ ছন্দ্র।

মুদিতনেত্র ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া নলিনীকান্ত নিষ্ঠাভরে তারামন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে যখনই তিনি উচ্চকিত হন, মন টলিয়া উঠিতে চায়, অমনি কানে আসিয়া পশে মহাসিদ্ধ ক্ষেপাবাবার হুঙ্কার। তারা-তারা-তারা—উচ্চ আরাব অভয় মন্ত্রের মতো তাঁহার সমস্ত ভয় বিদূরিত করিয়া দেয়।

একদিকে তারাপীঠ ভৈরব বামার শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে তরুণ সাধকের একনিষ্ঠ জপের ক্রিয়া। মহিমময়ী তারামায়ের কৃপার ধারা তাই সেদিন ঝরিয়া পড়িল।

রাত্রির শেষ যামে ইষ্টদেবী তারা নবীন সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। নলিনীকান্ত নিজেই ইহার বিবরণ দিয়াছেন:

আমি দেখে বিস্মিত হলাম। বললাম, 'তুমি কে?'

সে উত্তর দিল, 'আমি তোমার ইষ্টদেবী।'

আবাব প্রশ্ন কবলাম—'এ মূর্তিতে কেন? এ মূর্তি তো এ সিদ্ধ পীঠেব অভিলষিত মূর্তি নয়।'

'সে মূর্তি দেখলে তুমি ভয খাবে, তাই।'

কি সুন্দব সে মূর্তি! দেবী অতঃপব বলিলেন—'বৎস, বব লও।'

আব আমি কি বব চাইব? আমাব তো চাওযাব কিছুই ছিল না, সেই মূর্তি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গিযেছিলাম। তাই বললাম—'যখন ইচ্ছে হবে, তখন যেন তোমাকে এইভাবে দেখতে পাই।'

'আচ্ছা তাই হবে'—বলে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন কবলেন। তাবপব তাঁর স্বরূপ মূর্তি দেখতে চাইলে, শেষে যাবাব সময তাঁব বিশ্বময মূর্তি দেখিযে দিয়ে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে আমি অচৈতন্য হযে পড়লাম। তাবপব জ্ঞান হলে চেযে দেখি—আমি বামাক্ষেপাব কোলে।

ইষ্টদর্শনেব পব নলিনীকান্ত তাবাপীঠ শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। এবাব তিনি স্পর্শমণিব ছোঁযায রূপান্তবিত। এ অবস্থায় চাকুবী কবাব অথবা সংসাবে বসবাস কবাব আব উপায বহিল না। কযেক মাসেব মধ্যেই তাঁহাকে ব্যবহাবিক জীবনেব সমস্ত কিছু ত্যাগ কবিতে হইল। কিন্তু ইষ্টদর্শনেব পবেও যে অন্তবে স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ আসিতেছে না। তাছাড়া, আত্মসাক্ষাৎকাবই বা তাঁহাব হইল কই? সাধক নলিনীকান্ত ব্যাকুলচিত্তে আবাব তাবাপীঠে ছুটিয়া আসিলেন। বামাক্ষেপাব চবণতলে পড়িয়া খেদোক্তি জানাইতে লাগিলেন, "বাবা, আমাব প্রতি কৃপা কি হবে না? আমি সিদ্ধকাম আজও হইনি। মনে হচ্ছে—আমি তো কিছু পেলাম না।"

ক্ষেপাবাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম, তোব কত কি হযে গেল। আব তুই শালা এখনো বলছিস তোর কিছুই এখনো মেলে নি। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া!"

পবদিন প্রভাতে ক্ষেপা তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, সদয় হইয়া কহিলেন, "ওবে, তুই এবাব সন্ন্যাস নে। নির্ধারিত গুরু তোর অচিবেই মিলবে। আব একটা কথা সর্বদা মনে বাখিস, মা তাবা তোকে দিযে অনেক কিছু কবাবেন।"

সংসাবত্যাগী হইয়া নলিনীকান্ত এবাব গুরুব অন্বেষণে দিবাবাত্র দুরদুবান্তে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুবিয়া বেড়ান। কোনো কোনো দিন একমুষ্টি আহার্য হয়তো জুটে, কোনোদিন কিছুটা বুনো ফল ও এক ঘটি জল খাইয়াই দিন অতিবাহিত হয়। এমনি চরম কষ্টেব মধ্য দিযা কিছুকাল পবে উপস্থিত হন আজমীড়ে।

শহবেব প্রান্তে সাড়ম্ববে সেদিন এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। নলিনীকান্ত দূব হইতে দেখিলেন—দীর্ঘবপু, দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী বেদীতে বসিয়া বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা কবিতেছেন। তাঁহাব চাবিদিকে বহু লোকেব ভিড়। নিকটে আসিযা এই মহাত্মাব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিতেই চমকিয়া উঠিলেন। এ কি? এই তো সেই মহাপুরুষ, স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যিনি তাঁহাকে একাক্ষবী মন্ত্র দান করিযাছিলেন।

"চিনেছি চিনেছি—আমাব গুরু পেয়েছি" বলিয়া ভাবাবিষ্ট নলিনীকান্ত তখনি

ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে পড়িলেন। এই সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের বহুজন বন্দিত মহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ পরমহংস।

ভূতলে পতিত সংবিৎহারা কে এই সুলক্ষণযুক্ত যুবক? সচ্চিদানন্দ পরমহংস একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতহাস্যে সেদিনকার ধর্মপ্রসঙ্গ বন্ধ করিলেন। নলিনীকান্তের বহুপ্রার্থিত আশ্রয় অবশেষে মিলিল। ইহার পর কিছুদিনের মধ্যেই আচার্যদেবের সহিত তিনি উপস্থিত হইলেন তাঁহার পুষ্কর আশ্রমে।

আশ্রমে জীবনের গোড়ার দিকটায় এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কাছে নলিনীকান্তকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ধুনির কাঠ সংগ্রহ ও কাঠ চেলাই হইতে শুরু করিয়া গুরুর পরিচর্যা, ঘাস কাটা, আশ্রমিকদের রন্ধন ও বিগ্রহের পূজা প্রভৃতি অনেক কাজ এ সময়ে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহার উপর ছিল সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর অশ্লীল গালাগালি ও গঞ্জনা। কোথাও সামান্যমাত্র ত্রুটি দেখিলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গর্জিয়া উঠিতেন—"শালা ভোগী, বাপ-মাকে ছেড়ে এখানে সুখ করতে এসেছ!"

কঠোর জীবনে নলিনীকান্ত একেবারে অনভ্যস্ত। এক একদিন তাঁহার মনে হইত —নাঃ আর নয়, এখান হইতে পালাইয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেদিকেই চলিয়া যাইবেন।

এ সময়ে প্রবীণ গুরুভাই ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিতেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে বুঝাইতেন, "দ্যাখো ভাই, সন্ন্যাস নিতে এখানে এসেছ, এ হচ্ছে জীবত্বের অবসান ঘটানো। গুরুদেবের এতকিছু শাসন তিরস্কার সবকিছুরই উদ্দেশ্য তাই। নির্যাতন ও কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মান-অভিমানের সংস্কার সমূলে উৎপাটন করতেই তিনি চাচ্ছেন। আরো কিছুদিন সহ্য ক'রে চলো, তখন বুঝতে পারবে গুরুজী কি গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন।

ঠিকই তাই। নলিনীকান্ত দেখিলেন- আশ্রমজীবনের কঠোরতায় যত বেশী তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন, সচ্চিদানন্দজীর রুক্ষতা ততই কমিয়া যাইতেছে। পূর্বেকার সে রুদ্রমূর্তি আর নাই, ক্রমেই তাহা কমনীয় হইয়া উঠিতেছে। কদর্য ভাষা প্রয়োগ এখন তিনি কমই করেন। সাধনকামী তরুণ শিষ্যকে লাঞ্ছিত করার মনোভাবও আর দেখা যায় না। সন্ন্যাসীর করুণাময় ও কল্যাণময় রূপটিই প্রধানত এখন আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

ঐ শুষ্ক বৈদান্তিককে নলিনীকান্ত কিন্তু ক্রমে বড় নিবিড়ভাবে ভালোবাসিয়া ফেলিলেন। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "আমি সচ্চিদানন্দকে বড় ভালোবেসেছিলাম। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, তাই তাঁর অকথ্য অত্যাচারও অনেক সহ্য করতাম। শিষ্যদের ভেতর আমিই ছিলাম ব্রহ্মচারী। কাজেই আশ্রমজীবনের শেষের দিকে প্রায়ই আমাকে রান্না করতে হত। একদিন উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে অদূরে থেকে আমি তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি বিভাসিত মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বসে আছি, রান্নার কথা মনেই নেই। এদিকে ভাত সবটা পুড়ে গন্ধ বার হয়ে গিয়েছে। তারপরই চলল গুরুজীর তিরস্কার। আমি আর তাঁকে মুখে কিছু বললাম না, শুধু মনে মনে বললাম—ওগো,

তুমি যদি জানতে কেন আজ ভাত পুড়ে গেল !…ঠাকুর যেমন আমায় অকথ্য ভাষায় গাল দিতেন, তেমনি আবার খুব আদরও করতেন। এমন ব্রহ্মজ্ঞানী বৈদান্তিক, জ্ঞানসাধনার সিদ্ধপুরুষ আর দেখলাম না।"[১]

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে এক নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক এক সময়ে তাঁহার সেবা পূজার ভার নলিনীকান্তের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু তরুণ সাধক তখন বেদান্ত পাঠ ও তত্ত্ব বিচারে নিমগ্ন। দেববিগ্রহের প্রতি তাঁহার তেমন ভক্তি বিশ্বাস নাই। রোজ পূজার ঘরে গিয়া দুই চারিটি পুষ্প নিবেদন করিয়া কোনোমতে কাজ সমাধা করিয়া আসিতেন।

শিষ্যের এই মনোভাব কিন্তু গুরু মহারাজের দৃষ্টি এড়ায় নাই। একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ও কিরে ? তুই কি যেমন-তেমন ক'রে তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে ঠাকুরের পূজা করিস নাকি ?"

নলিনীকান্ত উত্তর দিলেন, "ও আবার পূজার বস্তু কি, ওতো নিষ্প্রাণ—শুধু একটা ধাতু মূর্তি।"

সচ্চিদানন্দস্বামী ভর্ৎসনা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। নলিনীকান্তের অভিমানও কম নয়, তিনি ধাতুময় বিগ্রহকে আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তখনি উহার গালে কষিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "তোমার জন্যই তো মহারাজের এত গালাগাল আমায় সহ্য করতে হল।"

কিছুক্ষণ পরেই সচ্চিদানন্দ মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। তিনি স্মিত হাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তুই না বলেছিলি, বিগ্রহের প্রাণ নেই, তবে তখন অত কথা বলছিলি কার সঙ্গে ?" বুঝা গেল, সর্বজ্ঞ গুরুর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে কোনো কিছুই অজানা থাকে না। উভয়ের কথাবার্তা শুনিয়া আশ্রমিকেরা হাসিতে লাগিলেন।

নানা পরীক্ষা ও কঠোর শাসনের পর গুরু মহারাজ ক্রমে কোমল হইয়া উঠিয়াছেন। নলিনীকান্তও মাঝে মাঝে নিজের স্নেহের দাবি নিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ছাড়েন না। একদিন তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া দীক্ষার কথাটি পাড়িলেন।

স্বামীজী কিন্তু বলিয়া বসিলেন, পিতা মাতার অনুমতি না নিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন না।

নলিনীকান্ত এবার প্রমাদ গুণিলেন। তবুও সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়া কহিলেন, "এ আপনার কি রকম কথা, মহারাজ ? কোন্ পিতামাতা সহজ বা স্বাভাবিক ভাবে পুত্রকে সংসার ত্যাগের অনুমতি দেন ? স্বয়ং ব্যাসদেবও পুত্র শুকের সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে চান নি। আচার্য শঙ্করকে তো চতুরতা ক'রেই মাতার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে হয়েছিল। শাস্ত্রে বিধানের কথা আমি জানিনে, কিন্তু এসব নজীরের গুরুত্ব কোন্ অংশে কম ?"

১ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—শিশিরকুমার বসু।

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী এবার স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "আরে তুমকো সাথ বচনসে কোই নহী সাকেগা। আচ্ছা যাও, তুমহারা দীক্ষা ইঁহা মিল্ জায়গা।"

কিছুদিনের মধ্যে নলিনীকান্তের সন্ন্যাসদীক্ষা হইয়া গেল। নামকরণ হইল—নিগমানন্দ সরস্বতী। ভগবৎ কৃপায় তাঁহার বহুদিনের আশা এবার পূর্ণ হইয়াছে, আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন।

আশ্রমে বাস করার কালে স্বামী সচ্চিদানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নানা কাহিনী নিগমানন্দ এসময়ে শ্রবণ করিতেন। উত্তরকালে তাঁহার মুখে এ কাহিনী মাঝে মাঝে শুনা যাইত।

—বহুদিন পূর্বের কথা। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত ইংরেজ সরকারের তখন সংঘর্ষ বাধিয়াছে। লর্ড অকল্যাণ্ডের নেতৃত্বে বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনী যুদ্ধরত। সেদিন পেশোয়ারের অদূরে এক সেনাদলের ছাউনি পড়িয়াছে। চারিদিকেই সতর্ক পাহারা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। জনৈক দেশীয় হাবিলদার হঠাৎ একদিন দূর হইতে দেখিতে পায়, নিকটস্থ পাহাড়ের এক গুহা হইতে একটি আলোকবর্তিকা বার বার আন্দোলিত হইতেছে।

কে এই দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি? কি উদ্দেশ্য তাহার এই বিচিত্র আলোক-সংকেতের? সারা ছাউনিতে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাবিলদারটি তাহার ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন সঙ্গীসহ ঐ আলোর অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও এই রহস্যময় আলো বা গুপ্ত সংকেতকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

আর একদিন উৎসাহী হাবিলদারটি একাই বন্দুক কাঁধে করিয়া রহস্য ভেদ করিতে বাহির হইল।

আলোকবর্তিকা লক্ষ্য করিয়া কেবলি সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক উচ্চ পর্বতের গুহার কাছে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়ায়। সম্মুখে তাহার এক শীর্ণকায় প্রাচীন সাধু। লণ্ঠন হস্তে নীরবে তিনি বসিয়া আছেন।

হাবিলদারকে দেখিয়াই সাধু বলিতে লাগিলেন, "এসো বেটা! তোমার প্রতীক্ষাতেই যে আমি এখানে বসে আছি, জরাগ্রস্ত মরদেহটি ত্যাগ করতে পারি নি। তোমায় এ পর্বত গুহায় আনবার জন্যই প্রতিদিন আমি বার বার আমার এ আলোক-সংকেত পাঠাচ্ছিলাম। অবশেষে এবার তুমি এসে পড়েছ। বাচ্চা, আমার এ সিদ্ধাসন তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে। সৈনিকবৃত্তি আজ এখুনি ত্যাগ ক'রে তোমায় নিতে হবে সন্ন্যাস-দীক্ষা।"

পর্বতগুহার এ প্রাচীন সাধুটি ছিলেন এক বৈদান্তিক, শক্তিমান মহাপুরুষ। এই মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাবিলদারের জীবনে অধ্যাত্মরসের প্রবাহটি উন্মুক্ত হয়, এক নতুন মানুষে সে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। সেদিনকার এই ভাগ্যবান সৈনিকই উত্তরকালে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী—নিগমানন্দের দীক্ষাগুরু।

সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পরে গুরুজীর নির্দেশে নিগমানন্দ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির

হন। প্রথম পর্যায়ে বদরিকাশ্রম ও মানস সরোবর প্রভৃতি ভ্রমণকালে সচ্চিদানন্দ মহারাজ স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়কার কিছু কিছু অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা নিগমানন্দজীর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

একদিন মানস সরোবরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া নিগমানন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিসমক্ষে এক অপ্রাকৃতিক দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি দেখিলেন হ্রদের এক কোণে যেন অপরূপ রূপের মেলা বসিয়া গিয়াছে। আনন্দ-চঞ্চল একদল পরমাসুন্দরী তরুণী সেখানে জলবিহারে রত।

নিগমানন্দ কৌতূহলভরে গুরুজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ইয়ে কৌন সব আসমান করতে হেঁ?"

সচ্চিদানন্দ স্বামী উত্তর দিলেন, "আরে, তুমহারা আঁখ তো খুল গিয়া। দেখলো আওর ভী বহুৎ দেখনেকে চীজ হ্যায়। ইয়ে সব তো অপসরা হ্যায়।"

একবার পথিমধ্যে তাঁহারা একটি অতিকায় সর্পের সাক্ষাৎ পান। উহা তখন কুণ্ডলী পাকাইয়া পরম নিশ্চিন্তে সেখানে অবস্থান করিতেছে। তীর্থপরিক্রমাকারী সাধুদের অনেকেই তখন এই সর্পটিকে আটা ময়দা খাওয়াইতে ব্যস্ত। সর্পটি কিন্তু নিতান্ত নির্বিকার ও উদাসভাবে তাকাইয়া আছে—হিংসার লেশমাত্র নাই।

উহার এ শান্ত স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে নিগমানন্দ প্রশ্ন করিলে সচ্চিদানন্দজী উত্তর দিলেন, "আরে, বাচ্চা, তুম ক্যা দেখোগে আর ম্যয় ভী ক্যা বলুঙ্গা? -ইয়ে তো পরমহংস হো গিয়া।"

গুরুজীর এ কথা শুনিয়া নবীন সাধক নিগমানন্দের বিস্ময় সেদিন চরমে পৌঁছিয়াছিল।

এই পর্যটনের সময়ে সচ্চিদানন্দ মহারাজ শিষ্যকে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিনী মোহান্তের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। গৌরী মাতাজী নামে ইনি প্রসিদ্ধ। হিমালয়ের অরণ্যাঞ্চলে এক নিভৃত স্থানে ইঁহার আশ্রম। সাধুসন্তদের মধ্যে সে সময়ে এই মাতাজীর খুব প্রতিষ্ঠা। তরুণ সাধু নিগমানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি সচ্চিদানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছেন, "তোমার এ চেলা উচ্চতর সাধনার স্তরে এসে গেলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।"

উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের পর সচ্চিদানন্দ মহারাজ পুষ্কর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। পরিব্রাজক নিগমানন্দকে এবার একাকীই গুরুমহারাজের নির্দেশে অপর ধামগুলি দর্শনের জন্য যাত্রা করিতে হইল। এই সময়ে দ্বারকা, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র ও আরও বহুতর তীর্থে তিনি উপনীত হন এবং এই পরিভ্রমণের সময়ে জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতা তাঁহার লাভ হয়। উত্তরকালে এ সময়কার নানা বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ তিনি শিষ্যদের নিকট করিতেন।

একবার তিনি কিছুদিনের জন্য দ্বারকার এক মঠে অবস্থান করিতেছেন। এই মঠে সে সময়ে কোনো মোহান্ত নাই, এই প্রাচীনা সন্ন্যাসিনীর উপর পরিচালনার সমস্ত কিছু

ভাব অর্পিত রহিয়াছে। এ বৃদ্ধা কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নিগমানন্দকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনিও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা স্থির করিলেন, সাধননিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন এই তরুণ সন্ন্যাসীকেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া মঠের মোহান্তপদে বসাইয়া দিবেন। ফলে আদরযত্নে নিগমানন্দের দিনগুলি এখানে তখন বেশ আরামেই কাটিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন এই মঠে ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবীর আবির্ভাব হয়, রমণী পরমাসুন্দরী ও পূর্ণ যৌবনা, শাস্ত্রাদিতেও তাঁহার পারদর্শিতা যথেষ্ট। তাছাড়া, জানা গেল, তিনি সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের কন্যা, পূর্বাশ্রমের নিবাস যশোহর জেলায়।

প্রিয়দর্শন নিগমানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই তিনি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহার পর ক্রমেই এ মঠে তাঁহার গতায়াত বাড়িতে থাকে। তাঁহার দিকে তরুণ সাধু নিগমানন্দজীকেও একসময়ে বেশ কিছুটা ঝুঁকিতে দেখা যায়।

ভৈরবী নিগমানন্দকে প্রায়ই বুঝান, তন্ত্রমতে তাঁহাদের শৈববিবাহ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বার বার নানাভাবে তিনি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেও থাকেন।

তরুণ সাধক ইতিমধ্যে অনেকটা নরম হইয়া উঠিয়াছেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ প্রস্তাব মন্দই বা কি? বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তো তাঁহাকে এ মঠের মোহান্ত পদে মনোনীত করিয়াই ফেলিয়াছেন। এবার এই তরুণী ভৈরবীকে বিবাহ করিয়া নূতনভাবে ধর্মাচরণ করিতেই বা ক্ষতি কি? অতঃপর একদিন শৈববিবাহের শুভ দিনটি পাকাপাকি-ভাবে স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের পূর্বদিন গভীর রাত্রে নিগমানন্দ এক স্বপ্ন দেখিলেন—ভৈরবীর সহিত তাঁহার বিবাহ মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ আনন্দোৎসবের মধ্যে রূপসী তরুণী মনোরম বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক ছন্দোপতন ঘটিয়া গেল। স্বপ্নজড়িত অবস্থায়ই তিনি শুনিতে পাইলেন, অদূরে কাহার এক ভারী চিমটার শব্দ। চমকিয়া উঠিলেন। একি! এ যে গুরুমহারাজ সচ্চিদানন্দজীর সাড়ে চার সের ওজনের সেই চিমটার চিরপরিচিত শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা নববধূ ভৈরবীর সারা দেহটি একতাল মাখনের মতো গলিয়া গলিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহার পর অবশিষ্ট রহিল শুধু তাহার দেহের কঙ্কাল কয়েটি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এই কঙ্কালময় যুবতীই প্রেমভরে বাহু প্রসারিয়া নিগমানন্দজীকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে।

এ কি বীভৎস দৃশ্য! নিগমানন্দের নিদ্রা তৎক্ষণাৎ টুটিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত হইল তাঁহার জ্ঞাননেত্র। আর নয়, আসন্ন বন্ধনের ডোর এখনি ছিন্ন করিতে হইবে। আপন লোটা-কম্বল হাতে নিয়া তিনি মঠের দ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন।

বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়া তিনি পথরোধ করিয়া দাঁড়ান। কিন্তু বাধা দেওয়া কোনোমতেই সম্ভব হইল না, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া নিগমানন্দ ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসীজীবনের চরম বিপদটি গুরুকৃপার বলে সেদিন এমনি অদ্ভুতভাবে কাটিয়া গেল। নিগমানন্দজী বলিতেন, "সদ্‌গুরু অনেক সময়ে স্বপ্নের ভেতর দিয়েই আশ্রিত শিষ্যকে দিক নির্দেশ ক'রে দেন—প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করেন।

তীর্থভ্রমণের পর নিগমানন্দজী গুরুর আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। এ সময়ে গুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজ একদিন তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া বলেন, "বেটা, আমার কাছ থেকে যা হবার তা তোর হয়ে গিয়েছে। তোকে এবার যোগীসিদ্ধ গুরুর কাছে যেতে হবে, তবে তোর সাধনা পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

নিগমানন্দের নয়ন দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। পরমাশ্রয়দাতা গুরু সচ্চিদানন্দজীকে আজ ছাড়িয়া যাওয়া বড় মর্মান্তিক। আবার তাঁহার প্রদত্ত নির্দেশই বা তিনি অমান্য করেন কিরূপে? কিন্তু কে সেই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট যোগীগুরু? কোথায় তাঁহার সন্ধান মিলিবে? এসব কথা ভাবিয়া তিনি বড় চঞ্চল হইলেন।

সচ্চিদানন্দ আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ঘাবড়াও মত, বেটা, তুমহারা যোগীগুরু জরুর মিল্‌ জায়গা, বহুৎ তুরন্ত হী মিল্‌ জায়গা।"

আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল নিগমানন্দের পরিব্রাজন। এবার তাঁহার লক্ষ্য—যোগীগুরুর সন্ধান লাভ, আর অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণতম চরিতার্থ সাধন। গহন অরণ্য ও পর্বত প্রান্তর দিয়া দিনের পর দিন তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। তীব্র শীতাতপ মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, অনাহারে অনিদ্রায় চরম কষ্টের মধ্যে তাঁহাকে দিনের পর দিন এ সময় কাটাইতে হয়।

একবার রাজপুতনার অন্তর্গত কোটা রাজ্যের এক অরণ্য অঞ্চল দিয়া নিগমানন্দ স্বামী পথ চলিয়াছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। ক্ষুৎপিপাসায় তিনি তখন অত্যন্ত কাতর। হঠাৎ এক অপরিচিতা পথচারিণী, তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া কহিল, "দেখছি, তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছো। আরও আধ মাইল পথ এগিয়ে যাও, সামনেই একটি ছোট কুটির দেখতে পাবে। সেখানেই আজ বিশ্রাম নাও।"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর অরণ্য-আবাসটি দৃষ্টিগোচর হইল। এক রূপসী রমণী এই বিজন কুটিরে বাস করিতেছেন। স্বামী নিগমানন্দ পরে জানিয়াছিলেন, ইনি এক যোগসিদ্ধা সাধিকা। ঐ সময়ে গভীর দুর্গম বনে তাঁহাকে একাকিনী বাস করিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আহার ও বিশ্রামের পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিলেন, রূপবৃংগ লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিতা এই যোগসাধিকার বয়স প্রকৃতপক্ষে ষাটেরও বেশী। এক ব্রহ্মবিদ্‌ যোগীগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করার পর দীর্ঘকাল এই অরণ্যে তিনি সাধনারত রহিয়াছেন।

যোগিনী তাঁহাকে কহিলেন, "দ্যাখো, তুমি আর এখানে সেখানে বেশী ঘুরো না। এখন কলকাতায় ফিরে যাও। তারপর পূর্বাঞ্চলে যেতে হবে, সেখানে সাক্ষাৎ পাবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত যোগীগুরুর।"

নিগমানন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন, আবার সুদূরে কলিকাতায় তাঁহাকে ফিরিতে হইবে? কিন্তু হাতে যে একটি পয়সাও নাই।

যোগিনী যেন সর্বজ্ঞা। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওঃ তুমি টিকিটের টাকার কথা ভাবছো? সেজন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পরদিন দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া যোগিনী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া নিয়া চলিলেন। অনতিদূরেই এক রেল স্টেশন। নিগমানন্দের হস্তে টিকিট ক্রয়ের জন্যে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, ঐ রেল স্টেশনে দেখা যাচ্ছে, টিকিট কেটে কলকাতার দিকে এবার রওনা হয়ে পড়ো।"

এই রহস্যময়ী যোগসিদ্ধা নারী সম্বন্ধে নিগমানন্দজী বলিয়াছেন, "স্টেশনের কাছে এসে হঠাৎ ফিরে দেখি তিনি আর নেই। তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে মন যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হল—কি সর্বনাশ! তাঁর মতো এমন যোগসিদ্ধা ভৈরবীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম! তৎক্ষণাৎ আমি ছুটলাম সেই জঙ্গলের দিকে। গিয়ে দেখি সেই কুটিরও নেই, মেয়েটিও নেই! সবই যেন জাদুমন্ত্রবলে কোথায় উড়ে গিয়েছে! তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কে সেই মেয়ে!"

কলিকাতায় পৌঁছিবার পর নিগমানন্দ একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আসামের দিকে রওনা হন। সেখানে পৌঁছিয়া কামাখ্যা ও পরশুরাম তীর্থ দর্শনের পর কিছুকাল একাকী পার্বত্য অঞ্চলে তিনি পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

পাহাড়ী বস্তি ও অরণ্য অঞ্চল দিয়া স্বামী নিগমানন্দ এবার মনের আনন্দে অগ্রসর হইতে থাকেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করার পর একদিন তিনি পথ হারাইয়া ফেলেন। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসে। এ অবস্থায় পথ চলা অসম্ভব হইয়া উঠে। অগত্যা এক বিপুলকায় বৃক্ষের কোটরে তরুণ সাধক সে রাত্রির মত আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরের দিন ভোরবেলায় বৃক্ষকোটর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন এক গৌরকান্তি দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। একরাশ শুষ্কপত্র তাঁহার সম্মুখে ধুনির মতো জ্বলিতেছে। তিনি তাঁহার গাঁজা সাজিতে তখন নিতান্ত ব্যস্ত। ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়া নিগমানন্দ নিচে নামিয়া আসিলেন।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানোর পরও কিন্তু সন্ন্যাসীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। নীরবে গাঁজার কল্কেতে কয়েকটি টান দিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে সেটি নিগমানন্দজীর সম্মুখে ধরিলেন।

গাঁজা খাওয়া নিগমানন্দের অভ্যাস নাই, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতে সাহসে কুলাইল না। কোনোমতে দুই-একটি টান দিয়া কল্কেটি আবার তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিলেন।

শুকনো পাতার আগুন নিভাইয়া দিয়া সন্ন্যাসী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে কোনো কথা নাই। চলিতে চলিতে হাতছানি দিয়া নিগমানন্দকে নির্দেশ দিলেন তাঁহাকে অনুসরণের জন্য। দুর্বার এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর আকর্ষণ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিগমানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

মনে নানা আশঙ্কাও হইতেছে। এক একবার ভাবিতেছেন, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মতো ব্যাপার নয় তো? কাপালিক নবকুমারকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল —এই সন্ন্যাসীর অভিসন্ধিও তেমনি কিনা কে জানে? কিন্তু কি আশ্চর্য, নিগমানন্দের দিকে একটিবার চাহিয়াও দেখিতেছেন না। তিনি ঠিকমতো অনুসরণ করিতেছেন কিনা সেদিকে সন্ন্যাসী একটিবারও লক্ষ্য করিতেছেন না।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর সন্ন্যাসী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সানুদেশে গিয়া থামিলেন। কাছেই একটি স্নিগ্ধ পার্বত্য ঝরনা কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছে। নিগমানন্দ নিজেই তাঁহার সে সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন :

"এখানে এসে সে আমার দিকে তাকাল। কি সুন্দর তাঁর মূর্তি! উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ, বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট, ঘনকৃষ্ণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা আকর্ণবিস্তৃত চোখ, চোখ-মুখে যেন জ্যোতির ছটা বেরুচ্ছে। দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম।

"মন-প্রাণ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। কখন জানি না কেমন ক'রে আপনা হতে শরীর তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল।...তিনি আমায় সস্নেহে হাত ধরে উঠিয়ে, মধুর প্রাণ গলানো স্বরে বললেন,—বৎস, সহসা রাত্রি শেষে আমাকে গাছতলায় দেখে, আর তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বলায়—বোধ হয় আশ্চর্যান্বিত হয়েছ, ভয় পেয়েছ। আমি কিন্তু আগেই জেনেছিলাম তুমি কে, কি জন্য ঘুরছো, তোমার অভাব কি—কি জন্য গাছের উপরে ছিলে—আমার কাছেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে। তাই তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য আমি ঐ গাছতলায় গিয়ে বসেছিলাম।"

নিগমানন্দ তখন আনন্দে বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে।

ঐশী কৃপার ভাণ্ড হস্তে নিয়া আবির্ভূত সেদিনকার এই সন্ন্যাসীই নিগমানন্দের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট যোগীগুরু—সুমেরদাস মহারাজ।

পাহাড়ের উপরে খানিকটা উঠিয়া গিয়া মহাপুরুষ বৃহৎ একখানা প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া দিলেন। এটি ধীরে ধীরে অপসৃত হইলে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গহ্বর। উহার মধ্যে দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটিতে দণ্ড-কমণ্ডলু ও আসন রক্ষিত, অপরটিতে থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে তালপত্রে লিখিত বহু সংখ্যক পুঁথি। নিগমানন্দ শুনিলেন, সুমেরদাস মহারাজ গুরু পরম্পরায় এগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যোগীবরের পূর্বাশ্রমের বাস পাঞ্জাবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের ইনি ছিলেন অন্যতম অমাত্য। এক সময়ে কার্যব্যপদেশে প্রিন্স দলীপ সিংহের সহিত ইনি ইংলণ্ডেও গমন করেন। কিছুকাল পরে কোনো কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং একাকী রাশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিব্বতে অবস্থান করিবার সময় সৌভাগ্যক্রমে এক প্রাচীন সিদ্ধ যোগীর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। গুরুকৃপা ও পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার, এই দুইটি মিলিত হওয়ার ফলে উত্তরকালে তিনি পরিণত হন এক মহাসিদ্ধ যোগীরূপে।

এবার সুমেরুদাসজী নিগমানন্দকে উচ্চতর যোগসাধনায় ব্রতী করেন। প্রায় তিন মাস ব্যাপিয়া এই তরুণ প্রতিভাধর সাধককে তিনি নানা নিগূঢ় সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতে থাকেন।

কিছুদিন পর মহাপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "বেটা, এখন তুমি লোকালয়ে গিয়ে গভীরভাবে এই রাজযোগ সাধনায় রত হয়ে যাও। এ সাধনায় ঘি-দুধ খেতে হয়, পুষ্টিকর আহার্য না হলে চলে না। এর জন্য প্রয়োজন—লোকালয় আর ভক্ত গৃহীর সহায়তা। তা না হলে কাজ হবে না। এখানকার জঙ্গলের কচুসেদ্ধ খেয়ে এ যোগসাধন হয় না, বেটা!"

সুমেরুদাসজী আরও বলিয়া দিলেন, "তুমি মেদিনীপুরে চলে যাও, তোমার কাজে সাহায্য করার লোক সেখানে রয়েছে।"

গুরুর নির্দেশে নিগমানন্দ আবার বাংলাদেশের দিকে চলিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম। ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তাহারই উপকণ্ঠে স্থিত মন্দিরে আসিয়া তিনি রাত্রে আশ্রয় নেন।

প্রত্যূষেই একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যস্তসমস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নাম সারদাপ্রসাদ মজুমদার, এ গ্রামেরই জমিদার তিনি। নিগমানন্দজীকে দেখিয়াই সারদা-বাবু ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "দেখুন, গতরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি দীর্ঘকায় জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী আমায় বলছেন—'তোদের দেবালয়ে এক সাধু রাত্রি যাপন করছে। যোগসাধনার জন্য তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। তুই যথাসম্ভব সাহায্য কর। তোর কল্যাণ হবে।'—আপনিই কি সেই সাধু।"

নিগমানন্দ বুঝিলেন, সুমেরুদাসজীরই এই কাণ্ড, শিষ্যের যোগসাধনাকে সহজসাধ্য করিতেই তাঁহার এ অলৌকিক লীলা।

সারদাবাবুর গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে এক বাগান রহিয়াছে। নবাগত সন্ন্যাসীর জন্য এই নিভৃত স্থানে তিনি নূতন গৃহ তৈয়ারী করিয়া দেন। নিগমানন্দ এখানেই মগ্ন হন তাঁহার সাধনায়।

রাজযোগ অভ্যাসের উপকরণাদি যখন যেরূপ প্রয়োজন হইত এখান হইতে তাহা পাইতে আর তাঁহার কোনোই অসুবিধা হইত না। নিষ্ঠাভরে প্রায় এক বৎসর কাল এখানে তিনি যোগসাধনা অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। অতঃপর লোকের ভিড় ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য এস্থান তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

ইহার পর গৌহাটিতে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে নিতান্ত আকস্মিকভাবে একদিন তাঁহার পরিচয় ঘটে। এ ভক্তের গৃহে থাকিয়াও তিনি কিছুকাল নিবিড় যোগাভ্যাসে ব্যাপৃত থাকেন। এই স্থানে ও কামাখ্যা পাহাড়ে থাকার কালে নিগমানন্দজী বহু উচ্চতর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

উজ্জয়িনীতে সে বৎসর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মেলায় দীক্ষাগুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজের চরণ দর্শন করিতে তিনি বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মেলাক্ষেত্রে

পেঁাছিয়া দেখিলেন, ইহার এক প্রান্তে বৈদান্তিক সাধুদের প্রকাণ্ড এক জমায়েত বসিয়াছে। শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য বেদান্তী সাধুদের নেতারূপে জমায়েতের কেন্দ্রে তাঁবু ফেলিয়াছেন। সচ্চিদানন্দ মহারাজও সেখানে সমাসীন।

গুরুজীকে দর্শন করা মাত্র নিগমানন্দ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শঙ্করাচার্য সর্বোচ্চ আসনে বসিয়া উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের সহিত তত্ত্বালাপ করিতেছেন, কিন্তু তরুণ সাধক নিগমানন্দ তাঁহাকে লক্ষ্যই করিলেন না।

এ কোন্ শিষ্টাচার? একদল সন্ন্যাসী এ আচরণে রুষ্ট হইলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে জমায়েতের সন্ন্যাসীদের মধ্যে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যকেই সর্বাগ্রে সম্মান দেখানো উচিত। একটি সন্ন্যাসী অভিযোগের সুরে কহিলেন, শঙ্করাচার্য হচ্ছেন জগদ্‌গুরু বৈদান্তিক সমাজের মতে, তিনি তোমার গুরুরও গুরু। তাঁকে আগে প্রণাম করলে না, এ আবার কি রকম ব্যবহার?"

নিগমানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তা কি ক'রে সম্ভব? আমার গুরুর গুরু নেই। যদি গুরুর গুরু স্বীকার করা যায়, তাহলে গুরুতে অনবস্থা দোষ আসে—মদ্‌গুরু শ্রীজগতগুরুঃ।"

শঙ্করাচার্য এতক্ষণ নীরবে উভয় পক্ষের কথা শুনিতেছিলেন। এবার স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "বাচ্চা কিন্তু ঠিক কথাই বলছে, ওর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করবার তো জো নেই।" এই তরুণ সাধক যে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এ-কথা জানিয়াও তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। অধ্যাত্ম অনুভূতি সম্বন্ধে এ সময়ে তিনি নিগমানন্দজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উত্তর শুনিয়া প্রসন্নভাবে স্বামী সচ্চিদানন্দকে কহিলেন, "তোমার এ শিষ্যকে এখনো দণ্ডী রেখেছো কেন? এ তো পরমহংস হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।"

উপস্থিত সাধু মহাত্মাদের সম্মতি নিয়া সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে, সচ্চিদানন্দ মহারাজ সেদিন নিগমানন্দ স্বামীকে পরমহংস আখ্যা প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিগমানন্দ কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া সেদিন তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিয়াছেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীরূপে একাকী পরিব্রাজন করাই তাঁহার চিরাচরিত রীতি। হাতে অর্থাদি কোনো কিছুই নাই। তাছাড়া বারাণসী তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত। ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করিয়া করিবেন ইহাই তিনি ভাবিতেছেন। হঠাৎ মনে পড়িল, কাশীতে তো কেহ অভুক্ত থাকে না—এ যে অন্নপূর্ণার স্থান।

সংকল্প করিলেন, গঙ্গার ঘাটে বসিয়া এবার জোর ধ্যান লাগাইবেন। ক্ষুধার অন্ন এখানে সত্যসত্যই জুটে কিনা, অন্নপূর্ণার কৃপার এ মহিমা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিগমানন্দ ঘাটের এক প্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে অগণিত নরনারীর ভিড়। স্নানার্থী গৃহস্থ ভক্ত ও সাধুসন্ত পরিব্রাজকদের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক স্নানার্থিনী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকটি দেখিতে বড় কুৎসিত, বার্ধক্যের ভারে দেহটি ন্যুব্জ, পরিধানের বস্ত্র মলিন, ছিন্ন-ভিন্ন। হাতে তাহার একটি বড় শালপাতার ঠোঙা।

নিগমানন্দের পাশে এটি নামাইয়া রাখিয়া বৃদ্ধা সানুনয়ে বলিল, "বাবা, আমি চট্ ক'রে স্নানটা সেরে আসছি, এ ঠোঙাটা তোমার কাছেই রইল।" সম্মতি বা উত্তরের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া বৃদ্ধা সোপান বাহিয়া তখনই নিচে নামিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে নিগমানন্দের ধ্যানাবেশ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। বেলা গড়াইয়া গিয়া কখন যে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সেদিকে তাঁহার হুঁশই নাই। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বুঝিলেন, রাত্রি তখন নয়টার কম হইবে না। ইতিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসাও বড় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে লাগিলেন, রাত তো গভীর হয়ে গেল। কই, মা অন্নপূর্ণার কাশীতে আজ আমার খাবারের তো কেউ সংস্থান করল না।'

হঠাৎ পার্শ্বস্থিত শালপাতার ঠোঙার উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো, বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই এটি কিন্তু সেই একইভাবে সেখানে পড়িয়া আছে। যে বৃদ্ধা ইহা গচ্ছিত রাখিয়া গেল সে তো স্নানের পর আর ফিরিয়া আসে নাই!

ঠোঙাটি হাতে নিয়া খুলিতেই নিগমানন্দ দেখিলেন, একগাদা সুখাদ্য মিহিদানা-সীতাভোগ উহাতে রক্ষিত। ধ্যানভঙ্গের পর ক্ষুধার জ্বালা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তদুপরি সম্মুখে রহিয়াছে বাংলাদেশের এ বহুবিশ্রুত মিষ্টি। ঠোঙাটি উজাড় করিয়া ফেলিতে আর দেরি হইল না। ভোজন শেষে অঞ্জলি পুরিয়া গঙ্গাজল পান করিলেন, ছাড়িলেন তৃপ্তির নিশ্বাস।

সে রাত্রিতে একটি জীর্ণ, মনুষ্য-পরিত্যক্ত গৃহের বারান্দায় স্বামী নিগমানন্দ নিদ্রিত রহিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, জননী অন্নপূর্ণা রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা। মধুর কণ্ঠে জননী কহিতে লাগিলেন, "বাবা, এবার তো প্রত্যক্ষ করলে, আমার কাশীতে অভুক্ত কেউ কখনো থাকতে পারে না। উপাদেয় খাবারগুলো আমিই তোমায় দিয়ে এসেছিলাম।"

নিগমানন্দ উত্তর দিলেন, "কই মা, তুমি তো ওগুলো দাও নি। যে আমাকে দিয়েছে, সে তো এক বৃদ্ধা মানবী।"

"কেন বাবা, যিনি নির্গুণ তিনি কি সগুণে নামতে পারেন না? নিরাকারের ক্ষমতা কি সীমিত? যে কোনো আকার নিতে তাঁর আবার বাধে কোথায়?"

প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর শিষ্য নিগমানন্দ। সহসা তিনি এ তত্ত্বটি মানিয়া নিতে পারিলেন না, মনে নানা সন্দেহের ছায়াপাত হইল। দেবী এবার সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, "বাবা নিগমানন্দ, তোমার সাধনা কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনি। তুমি এবার ভাবের সাধনা, প্রেমের সাধনার দিকে অগ্রসর হও, লীলারহস্য আয়ত্ত করতে শুরু করো।"

স্বপ্ন ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে নিগমানন্দ উঠিয়া বসিলেন। অন্তরের ব্যাকুলতা এবং

যেন শতগুণে বাড়িয়া গেল। কোথায় সাধনজীবনের পূর্ণতার পথটি খুঁজিয়া পাইবেন, কোথায় তাঁহার পরম প্রাপ্তি মিলিবে—এই চিন্তায় তিনি অস্থির।

হঠাৎ স্মরণে আসিল তাঁহার গুরুদেবের কথিত, হিমালয়ের সেই সন্ন্যাসিনী মোহান্তের কথা। সে-বার উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের সময় স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে মহা-সাধিকা গৌরীমাতাজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, সাধনার শেষের দিকে নিগমানন্দকে তিনি একবার নিকটে আসিতেও বলিয়াছেন। এবার সেই উত্তরাখণ্ডের আশ্রমের দিকেই তিনি রওনা হইলেন।

প্রায় আড়াইশত বৎসর বয়স এই গৌরীমার, কিন্তু তবুও বয়সের কিছুমাত্র ছাপ তাঁহার মধ্যে পড়ে নাই। তারুণ্যমণ্ডিত দেহে অপরূপ দিব্যশ্রী ঝলমল করিতেছে। ইঁহার তৎকালীন শিক্ষায় ও কৃপাস্পর্শে নিগমানন্দের সাধনসত্তায় এক অপার্থিব আনন্দ ও প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া গেল।

ইহার পর তিনি চলিয়া আসেন আসামের গৌহাটি এবং গারো পাহাড় অঞ্চলে। এখানে একান্ত মনে আপন সাধনার গভীরে বেশ কিছুকাল অবস্থান করিতে থাকেন। এক অপার্থিব আনন্দের স্রোত এই সময়ে সর্বদা তাঁহার অন্তরসত্তায় বহিয়া চলিতে থাকে।

শুধু অন্তর্জীবনের নিগূঢ় সাধনা নিয়াই নিগমানন্দ এ সময়ে দিন অতিবাহিত করেন নাই, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়—যোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতির মাধ্যমে এবার জনসমাজে তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে। সারস্বত মঠ ঋষিকুল শিক্ষায়তন প্রভৃতির মধ্য দিয়াও এই শক্তিমান সাধকের সংগঠন নানাদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠে। শুধু আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যায়ই নয়, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের নানা অঞ্চলেও নিগমানন্দজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

কর্মময় বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে তাঁহার প্রেমাশ্রিত সাধনটি বহিয়া চলে,—ধীরে ধীরে ইহা উন্মোচিত করিয়া দেয় গুরু জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। নিগমানন্দের এখনকার এ সাধন-জীবনে মাধুর্য, কৃপালীলা ও যোগৈশ্বর্যে ভরপুর। সহজ প্রেম ও আন্তরিকতার স্পর্শেই সাধারণত তিনি ভক্ত ও শিষ্যদের আকর্ষণ করিতেন, শিক্ষার মাধ্যমে তাঁহাদের করিয়া তুলিতেন রূপান্তরিত। তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতিও শিষ্যদের সহিত আত্মিক যোগাযোগ-স্থাপনে, তাঁহাদের কল্যাণ সাধনে কম কার্যকরী হইত না।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার রাজার প্রাণে এক সময়ে অধ্যাত্মসাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। যোগসিদ্ধ এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অবশেষে একদিন তিনি দন্তিকেশ্বরের দেবীমন্দিরে ধর্না দেন। তাঁহার চিহ্নিত গুরুদেব কে, কোথায় গেলে তাঁহার সন্ধান মিলিবে—এ তথ্য জানিবার জন্য দেবীর চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইতে থাকেন।

এ সময়ে একদিন মন্দিরের মধ্যে আচম্বিতে দৈববাণী ধ্বনিত হয়, 'বৎস, তোমার গুরু হচ্ছেন বাংলার মহাসাধক নিগমানন্দ সরস্বতী, তাঁর আশ্রয় নিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।'

সুদূর মধ্যপ্রদেশে নিগমানন্দজীর নাম তখনও প্রচারিত হয় নাই। অখ্যাত ও অজ্ঞাত কে এই মহাপুরুষ? বাংলাদেশে লোকজন পাঠাইয়া বহু খোঁজ-খবর নিবার পর রাস্তার-রাজ স্বামী নিগমানন্দের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ও তাঁহার চরণোপান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর এই সিদ্ধপুরুষের কৃপাস্পর্শে তাঁহার অধ্যাত্মজীবন উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

ইন্দোরের শ্রীপাঠক রাজ-সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। সংসারের মায়াবন্ধন কাটাইয়া উঠিতে তিনি সেই সময়ে বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। কোন্ মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন, কাহার তত্ত্বনির্দেশে প্রকৃত শান্তি লাভ করিবেন, ইহা নিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার তখন অবধি নাই।

একদিন তিনি নদীতীরে বসিয়া সখেদে ভাবিতেছেন, তাঁহার জীবনে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শুভাগমন কি হইবে না? অন্তরে একসময়ে জাগিয়া উঠিল এক তীব্র আলোড়ন।

সহসা তাঁহার নয়নসমক্ষে আকাশের গায়ে এক দিব্যমূর্তি ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু কে এই মহাপুরুষ? ইহাকে তো তিনি কোনো দিনই দর্শন করেন নাই। অলৌকিক মূর্তিটি অতঃপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া উঠিল। অলৌকিকভাবে দৃষ্ট এই মহাত্মার চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই পাঠকজী আবার এক অলৌকিক নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। নদীতীরের সেই পূর্বের স্থানটিতেই তিনি সেদিন বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি শব্দ রূপায়িত হইয়া উঠিল—স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস। অতঃপর ভক্ত ও সাধুসন্তদের মহলে অনুসন্ধানের পর এই মুমুক্ষু ব্যক্তি নিগমানন্দজীর আশ্রয়লাভে সমর্থ হন।

শুধু অধ্যাত্মসাধনার পথেই নয়, সাংসারিক জীবনের আপদ-বিপদেও বহু ভক্ত সাধককে নিগমানন্দ মহারাজের অলৌকিক কৃপার আশ্রয় লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

ত্রিপুরার একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রামের যুবক অশ্বিনী। মাতা পত্নী এবং বালক পুত্রটি নিয়া তাহার ছোট একটি সংসার। উপার্জন অতি সামান্য, কোনোমতে দিন অতিকষ্টে চলে। পরিবারটি নিগমানন্দজীর আশ্রিত। কুটিরের এক কোণে পরম শ্রদ্ধাভরে ঠাকুরের চিত্র স্থাপন করা আছে, সকাল সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া প্রণতি জানায়।

আকস্মিক এক দুঃসাধ্য রোগে সেদিন অশ্বিনীর প্রাণবিয়োগ হয়। বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। শোকাচ্ছন্ন কুটিরের এক প্রান্তে গুরুদেবের ছবিটি স্থাপিত রহিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বৃদ্ধা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, যে ঠাকুর দুর্দৈবের দিনে এমন নীরব দর্শক হইয়া থাকেন তাঁহাকে ঘরে রাখিয়া কি লাভ? আজই তিনি এ ছবিটিকে পুকুরের জলে বিসর্জন দিবেন।

ছবিখানি বিসর্জিত হইতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে প্রাণগলানো সম্বোধন আসিল—মা!

বৃদ্ধা ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, গুরুদেব নিগমানন্দ ছলছল নেত্রে দণ্ডায়মান। চিঠিটি আর ফেলিয়া দেওয়া গেল না।

নিগমানন্দ করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "চল মা ঘরে যাই, আমিই তোমার ছেলে। আমি তোমায় মা বলে ডাকবো। অশ্বিনীর জন্য চোখের জল ফেলো না, সে আমার কাছেই আছে।"

কখন কোথা দিয়া স্বামী নিগমানন্দ টিপেরার এই অখ্যাত পল্লীতে আবির্ভূত হইলেন তাহা সত্যই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। গৃহের সকলকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কাটাইয়া আবার হঠাৎ কখন তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অন্তর্ধানের পরেই সকলের হুঁশ হইল। গুরুদেব যে অলৌকিক শক্তিবলেই তাহাদের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এ-কথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

আর একবারের কথা। একদল স্থানীয় দুর্বৃত্ত সেদিন অশ্বিনীর গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহার বিধবা পত্নীর উপর তাহারা অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। এই সংকটের দিনেও ঐ অসহায়া তরুণীর আর্ত ক্রন্দনে নিগমানন্দজীর অনুরূপ আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার তেজোদৃপ্ত হুংকার শুনিয়া দুর্বৃত্তদল সে স্থান হইতে পলায়ন করে। অতঃপর ভয়ার্ত পরিবারটিকে আশ্বস্ত করিয়া স্বামীজী গৃহের বাহিরে একটি গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া দেন। রাত্রিতে এই গণ্ডির ভিতরে অবস্থান করিলে কেহ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না—এ কথা বলিয়াই মহাপুরুষ হন অন্তর্হিত।

আশ্রিত শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার গুরুজীবনের ভূমিকাটি কি, একথা বুঝাইয়া দিতে নিগমানন্দজীর কোনোদিন ভুল হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহার বাণী ছিল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলিতেন, দ্যাখো, আমি অবতার-টবতার নই—সাধারণ মানুষ। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম ক'রে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার পর এ-জন্মে শ্রীভগবানকে আমি জেনেছি, সত্য লাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ার আমার ভেতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে, আমাকে তোমরা জগদ্‌গুরু বলে জেনে রেখো। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি—তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব এই আমার কাজ।"

জীবের পরিত্রাণের জন্য পরম আশ্বাস জানাইয়া তিনি কহিতেন, "দ্যাখো, জীবের আকুল ক্রন্দন আর ব্রহ্মাণ্ডপতির নিবেদন এ দু'টি একত্র হলে সচ্চিদানন্দ বিভু তাঁর অংশকে জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পাঠান, আর অন্যান্য দেবতাদের তাঁর সহায়তার জন্য জন্ম নিতে বলেন।...সদ্‌গুরুরাও জীবের দুঃখে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। আমি প্রার্থনা করছি—তিনি আসুন। বর্তমানে চারিদিকে যে বিরোধ আর অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তিনি না এলে, কেউ এর সমাধান করতে পারবে না। তিনি শিগ্‌গিরই আসবেন, বেশী দেরি নেই।"

শক্তিধর সাধকের আচার্য জীবনের শেষ অধ্যায়টি ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসে। এবার বাহির দুয়ারে কপাট লাগাইয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকেন তিনি অন্তর্মুখীন।

১৩৪২ সালের অপরাহ্ণে মহাসাধকের কৃপাঘন নরলীলার ধীরে ধীরে নামিয়া আসে চির যবনিকা। আশ্রিত শিষ্য ও ভক্তদের শোকসাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হন তিনি চির সমাধিতে।

পরম ভাগবত বেঙ্কটনাথ

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খলজির লুব্ধ দৃষ্টি এ সময়ে পতিত হইয়াছে দক্ষিণ ভারতের দিকে। এ অঞ্চল জয়ের জন্য বিরাট বাহিনী-সহ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন মালেক কাফুরকে। তাঁর বহুক্ষয়ী যুদ্ধের পর খলজি সেনাপতি এক একটি হিন্দু রাজ্য ছিনাইয়া নিতেছেন আর ছড়াইতেছেন অগ্নিদাহ, হত্যা লুণ্ঠন আর হিন্দু মন্দির ধ্বংসের বিভীষিকা।

মালেক কাফুর সে বার প্রবল বিক্রমে মাদুরার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিয়াছেন। পথেই পড়ে বহুলখ্যাত শ্রীরঙ্গমের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির। ঐতিহ্য, মর্যাদা ও ধনগৌরবে সারা দাক্ষিণাত্যে এ মন্দিরের জুড়ি নাই। এমন একটি মন্দির লুণ্ঠনের সুযোগ কাফুর ছাড়িতে রাজী নন, তাই দুর্ধর্ষ সমর বাহিনীকে চালিত করিয়াছেন সেই দিকে। কাবেরীর অপর তীরে, রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া ছাউনি ফেলিয়াছে খলজি বাহিনী। এবার যে কোনো মুহূর্তে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে এই তীর্থনগরের উপর।

কৃষ্ণপক্ষের নিশীথ রাত্রি। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। শ্রীমন্দিরে, বাজারে বা পথঘাটে দীপ নির্বাপিত, সর্বত্র বিরাজিত একটা থমথমে ভাব। আতঙ্কে অনেকেই নগর ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারাও আসন্ন আক্রমণের ভয়ে মুহ্যমান।

নগররক্ষী রাজসেনার সংখ্যা অল্প। এই প্রবল শত্রুর প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সংঘর্ষ শুরু হইলেই ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মতো তাহারা কোথায় উড়িয়া যাইবে। তারপরই যথারীতি শুরু হইবে খলজি সেনার নারকীয় তাণ্ডব।

এই সংকটের রাতে একান্তে আপন কুটীরে বসিয়া বৃদ্ধ আচার্য সুদর্শন ভট্ট একরাশ তালপত্রের পুঁথি গুছাইতে ব্যস্ত। সতর্ক হস্তে এগুলি তিনি ডোরবদ্ধ করিলেন, থরে থরে সাজাইয়া রাখিলেন একটি ঝুলির মধ্যে।

হঠাৎ কুটিরের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আচার্য যেন ইহারই অপেক্ষা এতক্ষণ করিতেছিলেন। ত্রস্তপদে উঠিয়া দরজা খুলিলেন, কহিলেন, "এসো বেঙ্কটনাথ। তোমার প্রতীক্ষায়ই আমি বসে আছি।

আগন্তুকের বয়স চল্লিশের কিছুটা উর্ধ্বে। দৃঢ় সমুন্নত দেহ, চোখে মুখে অপূর্ব প্রতিভার দীপ্তি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক চিহ্ন, গলায় পবিত্র তুলসীর মালা, দেখিলেই মনে হয় —ভক্তিসাধনায় উৎসর্গীত প্রাণ এক নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব।

বৃদ্ধ আচার্যের চরণে প্রণত হইয়া তিনি কহিলেন, "আমায় স্মরণ করেছেন। কি আদেশ বলুন?"

"বৎস, তোমাকে আজ আমার বড় প্রয়োজন। স্থির হয়ে আসনে ব'সো, বলছি।"

প্রদীপের আলো স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, সলতেটি বাড়াইয়া দিয়া আচার্য বেঙ্কট-

নাথকে কাছে ডাকিলেন। নিম্নস্বরে কহিলেন, "এখানকার পরিস্থিতি তো সব দেখছো। ইতিহাসে এমনতর দুর্দৈব আর কখনো আসে নি। খল্‌জি সেনা নদীর ওপারে ঘাঁটি স্থাপন করেছে, যে-কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই নগরের ওপর।"

"যে-কোনো উপায়ে এ নরপশুদের প্রতিরোধ করতে হবে। রক্ষা করতে হবে শ্রীবিগ্রহকে," দৃঢ় স্বরে বলেন বেঙ্কটনাথ।

"প্রভু রঙ্গনাথজীর জন্য ভাবনা নেই। তাঁর বিগ্রহ ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুলতানের সেনারা এবার মন্দির ও তীর্থনগর বিধ্বস্ত করবে, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীকে। আলাউদ্দীন খল্‌জি খল ও নৃশংস। তার সেনাপতি মালেক কাফুর ততোধিক। মাদুরা অধিকারের জন্য বিরাট সেনাদল নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ কে করবে? পাণ্ড্য-রাজারা নিজেরা গৃহযুদ্ধে দুর্বল, তাছাড়া, এ নগর রক্ষার জন্য খুব কম সংখ্যক রক্ষী তাঁরা রেখেছেন। এ অবস্থায় খল্‌জি সেনার দুর্বার গতিরোধ করা যাবে না।"

"প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের এই লাঞ্ছনা অপমান, তাঁর ভক্তদের ওপর এই নির্মম অত্যাচার চলবেই? এর কোনো প্রতিবিধান নেই? তবে কি অর্চাবতার রঙ্গনাথজীর এতকালের পূজা অর্চনা সব নিষ্ফল?" উষ্মা ও ক্ষোভ ফুটে ওঠে বেঙ্কটনাথের কথায়।

"তুমি শাস্ত্রবিৎ, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্ত। তোমার এ ক্ষোভ সাজে না বেঙ্কটনাথ। পুরাণ শাস্ত্রে কি দেখতে পাও? বার বার দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়েছেন দানবদের দ্বারা। অবতার পুরুষ শ্রীরামকে সীতা হরণের অপমান সইতে হয়েছে, রাক্ষসদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে কতবার বিপন্ন হতে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকেও শিশুপাল জরাসন্ধের হাতে কম লাঞ্ছনা সইতে হয় নি। ঈশ্বরের লীলায়, তাঁর মায়ার খেলায়, ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন তো থাকবেই, বৎস।"

"এখন আমাদের কর্তব্য কি তাই বলুন।" ব্যগ্রস্বরে নিবেদন করেন বেঙ্কটনাথ।

"সব বলছি, মন দিয়ে শোন। তার আগে জানতে চাই তোমার স্ত্রীপুত্রেরা এখন কোথায়?"

"তারা কিছুদিনের জন্য তীর্থদর্শনে বেরিয়ে গেছে।"

"অতি উত্তম কথা। শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। শোন এবার। শত্রুসেনা আজ শেষ রাত্রেই নদী পেরিয়ে আক্রমণ করবে, নৃশংস অত্যাচার শুরু হবে। তার আগে তুমি এ নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। তোমার তিনটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে, বেঙ্কটনাথ।"

"আপনার আজ্ঞা সতত শিরোধার্য।"

"তা আমি জানি, বৎস। তোমার বাল্যকাল থেকে আমি তোমায় চিনি। আমার গুরু বরদাচার্যের টোলে যখন আমি যেতাম, তখন তুমি বালক মাত্র, সেই টোলে বসে খেলা করতে। কিন্তু তোমার অমানুষী প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ জীবনের মহতী সম্ভাবনা আমার আচার্যদেব এবং আমাদের দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। অসামান্য শাস্ত্রবিৎ ও সাধক-রূপে ইতিমধ্যে তুমি গড়ে উঠেছ, অর্জন করেছো শ্রীরঙ্গমের ভক্ত ও বুধমণ্ডলীর প্রশংসা।

আমার প্রথম নির্দেশ, তুমি অবিলম্বে অন্যত্র চলে যাও। তোমার মূল্যবান প্রাণ রক্ষা করো। দেশের ভক্তসমাজ, বিশেষ ক'রে রামানুজ সম্প্রদায় ভবিষ্যতে তোমার সেবায় অশেষভাবে উপকৃত হবে।"

"কিন্তু আচার্যবর, আপনিও তো যাচ্ছেন আমার সঙ্গে?"

"না বেঙ্কটনাথ, আমি শ্রীধাম ত্যাগ করছিনে। প্রভু রঙ্গনাথের সেবায় একদল ভক্তকে যেমন প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, তেমনি আর একদলকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। ভক্তের মৃত্যুবরণ প্রভুর আসনকে টলিয়ে দেয়, আর ভক্তের কাতর প্রার্থনা ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁকে করে উদ্দীপিত। দুয়েরই প্রয়োজন আছে, বৎস। প্রাণদানের জন্য আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি, সে সংকল্প আর ত্যাগ করার উপায় নেই।"

বৃদ্ধ আচার্যের আনন দিব্যভাবের ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আয়ত নয়ন দুটি অর্ধ নিমীলিত। একদৃষ্টে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "আচার্যবর, এখনো সময় আছে, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর একবার আপনি চিন্তা করুন।"

"শোন বৎস, বৃথা বাক্য ব্যয় ক'রে একটি মুহূর্ত নষ্ট ক'রো না। আমার প্রথম নির্দেশটি তোমায় জানিয়েছি, শ্রীরঙ্গম ত্যাগ ক'রে নিজের প্রাণরক্ষা করো, নিজেকে নিয়োজিত করো প্রভুর নির্ধারিত সেবাকার্যে। আমার দ্বিতীয় নির্দেশ, আমার রচিত 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি রয়েছে এই ঝুলিতে। আমার গুরু বরদাচার্যের শ্রীমুখ থেকে প্রভু রামানুজের শ্রীভাষ্যের যে তাৎপর্য শুনেছি, তা থেকেই রচনা করেছি এই টীকা। ভক্তসমাজের কল্যাণের জন্য এটি রক্ষা করা প্রয়োজন।"

"এ গ্রন্থের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।"

"উত্তম বৎস। আমার তৃতীয় নির্দেশ, তুমি আমার বালক পুত্র দুটিরও ভার নাও। ওরা মাতৃহীন, আমার অবর্তমানে আর কেউ নেই ওদের দেখবার। পাশের ঘরে নিশ্চিন্ত ঘুমুচ্ছে, জানে না যে শিয়রে ওদের শমন দণ্ডায়মান। তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, এই টীকা গ্রন্থ ও বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।"

শাস্ত্রগ্রন্থের ঝুলি এবং বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়া বেঙ্কটনাথ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রণামান্তে আচার্যকে প্রশ্ন করিলেন, "অর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথজীর প্রিয় তীর্থের এই দুর্ভোগ আর কতদিন চলবে?"

প্রশান্ত কণ্ঠে আচার্য উত্তর দিলেন, "প্রভুর কৃপায় আমি জানতে পেরেছি, বৎস, প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল এ অঞ্চল অত্যাচারী বিধর্মীর কবলে থাকবে, তারপর হবে মুক্তির অরুণোদয়। তোমরা, ভক্ত সাধক শাস্ত্রবিদ্ যারা বেঁচে রইলে, তাঁদের নিত্যকার কাজ হবে প্রভুর কাছে সেই মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা।"

দ্রুতপদে নিঃশব্দে দীর্ঘ অন্ধকারময় পথ চলিয়া কাবেরীর তীরে আসিয়া দাঁড়ান বেঙ্কটনাথ। এক হাতে গ্রন্থের ঝুলি, আর এক হাতে বেষ্টন করিয়া আছেন বালক দুটিকে।

বালুকা সৈকতের সম্মুখেই পারঘাট। ঘাটে পৌঁছিয়াই বেঙ্কটনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। শত শত মৃতদেহ আশে পাশে ছড়ানো। তীর্থনগরের রক্ষী বাহিনীর একাংশ খলজি সেনার প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত ও হতাহত।

ঘাটে পারাপারের নৌকা একটিও নাই, সবগুলিই ওপারের দিকে রওনা হইয়াছে। বেঙ্কটনাথ বুঝিলেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। মালেক কাফুরের সেনার অগ্রাংশ নগররক্ষীদের প্রাথমিক প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করিয়া নিঃশব্দে মন্দির বেষ্টন করার জন্য ধাবিত হইয়াছে। আর ঘাটের নৌকাগুলি ওপারে গিয়াছে মূল সেনাবাহিনীকে আনয়নের জন্য।

বালক দুটিকে নিয়া ওপারে পৌঁছিবার কোনো উপায় নাই। নগরে ফিরিয়া গেলেও মৃত্যু অবধারিত। এখন কি করা যায়?

হঠাৎ বেঙ্কটনাথের মাথায় এক চিন্তা খেলিয়া গেল। সংকট হইতে উদ্ধারের এক উপায় তিনি উদ্ভাবন করিলেন। হ্যাঁ, চাতুর্যের আশ্রয় ছাড়া বাঁচিবার কোনো পন্থা নাই।

ক্ষিপ্র হস্তে রক্ষীদের মৃতদেহগুলি টানিয়া আনিয়া সেগুলি তিনি স্তূপীকৃত করিলেন। বালকদের কহিলেন, "ভয় পেয়ো না। আজ আমরা একটা নূতন লুকো-চুরি খেলা খেলবো। নিহতদের স্তূপের ভেতরে এসো আমরা সবাই ঢুকে পড়ি, মৃতের মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ওপার থেকে আগত খলজি সেনারা সবাই যখন মন্দিরের দিকে চলে যাবে, তখন আমরা চট্‌পট্‌ উঠে পড়বো। ওপারে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবো।"

তাড়াতাড়ি সবাই মৃতের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মূল খলজি বাহিনী এপারে আসিয়া উপস্থিত। তাচ্ছিল্যভরে মৃত শত্রুদের দিকে তাকাইয়া মন্দির আক্রমণের জন্যে সোল্লাসে তাহারা ধাবিত হইল।

ঘাট নীরব নির্জন হইলে বেঙ্কটনাথ বালকদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। নৌকা-যোগে কাবেরী পার হইয়া প্রবেশ করিলেন গহন অরণ্যে। অতিকষ্টে ক্রমাগত কয়েক দিন পথ চলার পর মহীশূরে অঞ্চলে হিন্দু রাজ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলেন, শুরু করিলেন নূতনতর সারস্বত জীবন, সাধনাময় জীবন।

পাণ্ডিত্য ও সাধনার, অমানুষী প্রতিভা ও পরাভক্তির যে বীজ রোপিত হইয়াছিল শ্রীরঙ্গমের নবীন পণ্ডিত বেঙ্কটনাথের আধারে অচিরে তাহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে।

সমকালীন ভক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ধারকবাহকরূপে, রামানুজ সম্প্রদায়ের অপ্রতি-দ্বন্দ্বী নেতারূপে কীর্তিত হন বেঙ্কটনাথ।

ত্যাগ বৈরাগ্যময় ভক্তিসাধনা, কবিত্ব, দার্শনিকতা, এবং তর্কপারঙ্গমতার জন্য শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, সারা ভারতে এ সময় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, বেদান্তদেশিক নামে সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

বেঙ্কটনাথের পিতার নাম অনন্তসূরী। ভক্তিমান্, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যের ধর্মজীবনের মর্মকেন্দ্র ছিল কাঞ্চী। শৈব

ও বৈষ্ণব ভক্ত সাধক ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্যদের পূজা অর্চনা ও তাত্ত্বিক বিতর্কে সদা মুখরিত থাকিত এই পুণ্যময়ী নগরী। অনন্তসূরী এখানকার পল্লীতে বাস করিতেন এবং কাঞ্চীর ভক্ত ও পণ্ডিতমহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আচার্য রামানুজ তাঁহার ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য চুয়াত্তর জন আদর্শ বৈষ্ণব পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন, ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন অনন্তসূরীর পূর্বপুরুষ।

বেংকটনাথের মাতা তোতারম্বার পিতৃগৃহেও ধর্মীয় ঐতিহ্য কম ছিল না। রামানুজের ঐ আদি প্রচারক গোষ্ঠীর অন্যতম আচার্যের বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব সাধিকা আর তাঁহার ভ্রাতা রামানুজ অপ্পুলার ছিলেন সমকালীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের অন্যতম।

এই ভক্তিপরায়ণ নৈষ্ঠিক পরিবারে বেংকটনাথ ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই অত্যাশ্চর্য মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। পুত্রের সারস্বত জীবনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া জনক জননী মহা আনন্দিত। অষ্টম বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর মাতুল অপ্পুলার তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব করেন, "বেংকটনাথের শিক্ষার দায়িত্ব তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' আমার টোলের পড়ুয়াদের অনেকেই খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ বলে গণ্য হয়েছে। বেংকটনাথ দৈবী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, আমার টোলে পাঠ সমাপ্ত করলে কালে সেও এক প্রখ্যাত আচার্য হয়ে উঠবে।"

অনন্তসূরী নিজে বৈরাগ্যবান্ পণ্ডিত। তাই নিজের টোলকে বড় করার জন্য কোনো দিনই তিনি উৎসাহী হন নাই। গুটিকয়েক ছাত্র পড়াইয়া কোনোমতে তাঁহার সংসার চলে। ভাবিলেন, রামানুজ অপ্পুলার নিজে ভক্ত সাধক, তাছাড়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রচারিত। তাঁহার টোলের ছাত্রেরা অনেকেই কৃতী পুরুষ। সেই টোলে নিজে যাচিয়া ভাগ্নেকে তিনি পড়াইতে চান, এ অতি উত্তম কথা।

স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপ্পুলারের প্রস্তাবে তিনি সায় দিলেন। মাতুলের প্রসিদ্ধ টোলেই শুরু হইল বেংকটনাথের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, কিশোর বেংকটনাথ তাহার অসামান্য প্রতিভার বলে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যাবত্তাকেও সে হার মানাইয়াছে অনায়াসে।

রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত বরদাচার্য এ সময় মাঝে মাঝে কাঞ্চীতে আসিয়া বাস করিতেন। সঙ্গে থাকিত শিষ্যপ্রধান সুদর্শন ভট্ট ও অন্যান্য তাঁহার ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ শিষ্য। বরদাচার্যের আলোচনা সভায় কাঞ্চীর অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কিশোর বেংকটনাথও এক একদিন উপস্থিত হইতেন। এই সময়কার আলোচনা ও বিতর্কে তাঁহাকে সোৎসাহে যোগ দিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি ও তত্ত্বালোচনায় পারদর্শিতা দেখিয়া বরদাচার্য বিস্মিত নয়নে চাহিয়া থাকিতেন।

এই কিশোর ভক্তিবাদী ছাত্রের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, বরদাচার্যের তাহা বুঝিতে

দেরি হয় নাই। একদিন শাস্ত্র বিতর্কের আসরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের দিকে তাকাইয়া তিনি বলেন, "বৎস, আমি আশীর্বাদ করি উত্তর জীবনে তুমি বেদান্তের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যায় সাফল্য অর্জন করো, প্রতিপক্ষকে করো পর্যুদস্ত। ধর্ম দেশ ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রে জীবন তোমার ধন্য হোক।"

প্রবীণ শিষ্য সুদর্শন ভট্টও সেদিন সেখানে উপস্থিত। আচার্যের এই আশিস্ যে অপাত্রে বর্ষিত হয় নাই এবং কিশোর বেঙ্কটনাথ যে একদিন দক্ষিণ ভারতের সারস্বত সমাজের অন্যতম স্তম্ভরূপে গণ্য হইবেন, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক ছিল।

পরবর্তী জীবনে শ্রীরঙ্গমে তরুণ আচার্য বেঙ্কটনাথের সহিত সুদর্শনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। বেঙ্কটনাথের জীবনে স্বীয় গুরুর আশিস্‌কে রূপায়িত হইতে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন, দিনের পর দিন তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন।

মুসলমান সেনা শ্রীরঙ্গম আক্রমণ করার প্রাক্‌কালে সুদর্শন ভট্ট তাঁহার এই বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ যুবক বন্ধুটিকে নিজের কুটিরে ডাকিয়া আনেন। তাঁহারই হাতে নিজের শ্রেষ্ঠ অবদান 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি ও পুত্রদ্বয়কে সঁপিয়া দেন, নিশ্চিন্তে করেন মৃত্যু বরণ।

বেঙ্কটনাথ কাঞ্চীতে প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন। এখন তিনি নবীন যুবা, এই বয়সেই নিজের অসাধারণ শক্তি বলে সর্ববিদ্যায় তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাস্ত্র শিক্ষাদানের এক টোল খুলিয়া বসেন। অল্পকাল মধ্যেই চারিদিক হইতে তাঁহার এই টোলে বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে থাকে।

জননী তোতাম্বার আনন্দের আর অবধি নাই। নবীন অধ্যাপক রূপে পুত্রের যশ তখন চারিদিকে। দলে দলে ছাত্র আসিয়া জুটিতেছে তাহার টোলে। অর্থাগমও বাড়িতেছে। এবার বেঙ্কটনাথের বিবাহ দিয়া একটি সুলক্ষণা বধূ ঘরে আনা দরকার।

প্রস্তাব শুনিয়াই পুত্র চমকাইয়া উঠি'লন। কহিলেন, "আমি আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রে ফেলেছি, মা। প্রভু রামানুজের দার্শনিকতা ও বৈষ্ণবীয় সাধন আমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি এবং তা রক্ষা করার জন্য জীবন সঁপে দেবো বলেও স্থির করেছি। কাজেই বিবাহ করার জন্য আমায় তুমি চাপ দিয়ো না।"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া মা কহিলেন, "সে কিরে, রামানুজপন্থী কত আচার্যই তো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা সবাই আদর্শ গৃহী, ঘরসংসার ক'রে শাস্ত্রচর্চা আর সাধনভজন করতে তো তাঁদের বাধে নি। এ তুই কি সব বলছিস্!"

"নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের জীবন যাপন করতে চাই আমি, নইলে শাস্ত্রচর্চা ও সাধনা কোনোটিতেই আমি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারবো না।" যুক্তি দেখান বেঙ্কটনাথ।

জননী উত্তেজিত হন, যুবক পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে থাকেন। অবশেষে বলিয়া উঠেন, "তোর বাবা উন্নত বৈষ্ণব সাধকের জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন, টাকাকড়ি

উপার্জন বা সঞ্চয়ে কোনোদিনই মন দেন নি। বেশ তো, বাবা, তুইও সেই পথে চলবি। ইচ্ছে হয়তো নৈষ্ঠিক অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণরূপেই তুই দিনাতিপাত করবি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা তুই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ কর্। বংশধারায় ছেদ পড়তে দিস্‌নে বাবা, দেখিস্ পিতৃপুরুষ যেন পিণ্ডজল পায়।"

মাতৃভক্ত বেঙ্কটনাথ জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নাই। অচিরে থুপ্পিলের নিকটস্থ গ্রামের এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারী হন।

পত্নী ছিলেন পতিব্রতা। তাই পতির ত্যাগপূত আদর্শকে তিনিও একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরেন। অযাচক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পরম আনন্দে উভয়ে পুত্র-কলত্রসহ দীর্ঘ গার্হস্থ্য-জীবন অতিবাহিত করেন।

কাঞ্চীর শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে আচার্য বেংকটনাথ তখন এক কৃতী পুরুষরূপে সম্মানিত। শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা বলিয়া সবাই যেমন তাঁহাকে জানেন, তেমনি সমাদর করেন ন্যায়, সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্তের মর্মজ্ঞ এবং প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতারূপে। এই অল্প বয়সেই 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' পণ্ডিত বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেঙ্কটনাথ এক নবীন বিদ্যার্থীর সহিত পরিচিত হন। বয়সে কনিষ্ঠতর হইলেও প্রতিভা ও প্রাণশক্তি তাঁহার বিস্ময়কর। এই বিদ্যার্থীর নাম মাধব সায়ন। সেদিনকার এই পরিচয় উত্তরকালে পরিণত হয় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে।

বেঙ্কটনাথ রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য। প্রধানত বিষ্ণুকাঞ্চীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বসবাস করিতেন। আর মাধব ছিলেন অদ্বৈতব্রহ্মবাদী গুরুর ছাত্র, শিবকাঞ্চীতে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উভয়ের মতবাদ ও জীবন পরিবেশে পার্থক্য প্রচুর, তবুও তাঁহাদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠিতে দেরি হয় নাই। তখনকার দিনে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু বেঙ্কট-নাথ ও মাধব ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। উভয়ে উভয়ের ত্যাগবৈরাগ্য ও প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিতেন, সনাতন ধর্ম ও স্বদেশের উজ্জীবনের স্বপ্ন উভয়েই দেখিতেন। এমনি করিয়া দুইটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব একে অন্যকে আকৃষ্ট করিত, গভীরভাবে ভালবাসিত।

উত্তরকালে বেঙ্কটনাথ সারা দাক্ষিণাত্যে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অপ্রতি-দ্বন্দ্বী নেতারূপে খ্যাত হন, শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে অগণিত ভক্তহৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করেন। আর মাধব কীর্তিত হন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য মুনি রূপে। শিষ্য হরিহর ও বুক্করায়কে প্রেরণা ও সাহায্য দিয়া তিনি গঠন করেন বিজয়নগরের হিন্দুসাম্রাজ্য, ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া যান। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে, সেই সুপরিণত বয়সেও বেঙ্কটনাথ ও মাধবাচার্য তাঁহাদের পুরাতন বন্ধুত্বকে এতটুকু ম্লান হইতে দেন নাই।

কাঞ্চীর জনতার ভিড় ও বিদ্যা-কোলাহল বেশীদিন বেঙ্কটনাথের ভাল লাগে নাই।

কিছুদিনেব জন্য নিজেব চতুষ্পাঠীকে তিনি কুড্ডালোবেব অন্তর্গত তিবুবাহিন্দ্রপুবে নিযা যান, সেখানকাব শান্ত নিভৃত পাবিবেশে চলিতে থাকে তাঁহাব সাধনা, শাস্ত্রগবেষণা ও শিক্ষাদান।

অতঃপব ঘনিষ্ঠ শিষ্যদেব আহ্বানে আচার্য তিবুক্কইলুব নামক স্থানে গিযা কিছুদিন অবস্থান কবেন। অবশেষে কাঞ্চীব বন্ধুবান্ধব ও শ্রীসম্প্রদাযেব বৈষ্ণব প্রধানদেব আহ্বানে আবাব তাঁহাকে সেখানে ফিবিযা আসিতে হয়।

ইতিমধ্যে বেংকটনাথ সংস্কৃত ও তামিল ভাষাব কতকগুলি দার্শনিক ও স্তোত্রগ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন। ভক্তিবাদেব ব্যাখ্যাতা ও বিচাবমল্লবূপে যেমন তাঁহাব প্রসিদ্ধি বটিযাছে, তেমনি তিনি দেশেব সর্বস্তবেব মানুষদেব কাছে ববণীয ও প্রিয হইযা উঠিযাছেন তাঁহাব কাব্যপ্রতিভাব জন্য। কাঞ্চীব জ্ঞানী-গুণী ও ভক্তসমাজে তখন তিনি অতিশয জনপ্রিয। চবিত্রেব শুচিতা ও স্নিগ্ধতাব গুণে বিবুদ্ধমতবাদী পণ্ডিতেবাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা কবিতেন, ভালবাসিতেন।

সনাতন ধর্মেব উৎসস্থান উত্তব ভাবত। বিশেষ কবিযা পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনাব তীবে তীবে এদেশেব শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলি গডিয়া উঠিযাছে। বেংকটনাথ স্থিব কবিলেন, এই সব তীর্থ দর্শন কবিবেন, প্রাণেব আশা মিটাইযা বিগ্রহসমূহেব পূজা অর্চনা কবিবেন।

একদল ভক্ত যাত্রী তিবুপতি হইয়া গয়া কাশী বৃন্দাবনে যাওযার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদেব সহিত বেংকটনাথ ভিডিযা পড়িলেন। অর্থেব কোনো সঙ্গতি নাই, সাবা পথে অবলম্বন কবিলেন আকাশ বৃত্তি। ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুব কৃপায় তাঁহাব এই দীর্ঘ তীর্থ পবিক্রমা কিন্তু সহজে ও নির্বিঘ্নে হয় এবং কযেক মাস পবে কাঞ্চীতে তিনি ফিবিযা আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেংকটনাথেব জীবনে ঘটে এক বিবাট পটপবিবর্তন। শ্রীবঙ্গম বামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদাযেব এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিছুদিন যাবৎ সেখানে এক দিগ্‌বিজয়ী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীব আগমন ঘটে। শাস্ত্রেব তীক্ষ্ম বিচাব বিশ্লেষণে, তর্ক যুদ্ধে বৈষ্ণব পণ্ডিতদেব তিনি প্রাযই কোণঠাসা কবিযা ফেলিতেছেন। এ বিপদে সেখানকাব ভক্তি-বাদী পণ্ডিতেবা বেংকটনাথেব সাহায্য চাহিযা পাঠাইলেন।

বেংকটনাথ সর্বশাস্ত্র পাবঙ্গম, 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মহাপণ্ডিত বলিযা চাবিদিকে তাঁহাব বিবাট খ্যাতি। অদ্বৈতবাদেব যুক্তি তর্কেব পদ্ধতি তাঁহাব ভালভাবে জানা আছে। সর্বোপবি শ্রীসম্প্রদাযেব ভক্তদেব বিশ্বাস, বেংকটনাথ অমানুষী প্রতিভাব অধিকাবী এবং রামানুজেব মতবাদেব পুষ্টি সাধনেব জন্যই ঈশ্ববেব কৃপায তিনি আবির্ভূত।

সম্প্রদাযেব আচার্যদেব আহ্বান বেংকটনাথ উপেক্ষা কবিতে পাবেন নাই। অচিবে তিনি শ্রীবঙ্গমে আসিযা উপস্থিত হন।

প্রভু শ্রীবঙ্গনাথেব দর্শন ও অর্চনাব শেষে আসিযা দাঁড়ান অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীব সম্মুখে।

উভয়েই অসামান্য শাস্ত্রবিদ, তীক্ষ্মধী ও কুশলী বিচাবমল্ল। কিন্তু এই তর্কযুদ্ধে

বেংকটনাথই অবশেষে জয়লাভ করেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে এই নবীন আচার্য ধন্য হন সর্বজনের অভিনন্দনে।

ভক্তিবাদী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে এবার তিনি বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভক্তসমাজ তাই এখন হইতে তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন বেদান্তদেশিক বেংকটনাথ নামে।[1]

মাত্র কয়েক দিনের জন্য কাঞ্চী ছাড়িয়া আসিয়াছেন বেংকটনাথ। কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ ও শ্রীরঙ্গমের ভক্তিময় পরিবেশ তাঁহার মন কাড়িয়া নিল। স্থির করিলেন, কাঞ্চীর বসবাস তুলিয়া দিবেন, সপরিবারে চিরদিনের জন্য এই তীর্থনগরীতেই গ্রহণ করিবেন আশ্রয়। শ্রীবিগ্রহের অর্চনা, শাস্ত্র রচনা ও বিদ্যাদান নিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের অবশিষ্ট কাল।

বেদান্তদেশিক বেংকটনাথের বয়স তখন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর। সৃষ্টিধর্মী রচনা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রেরণা তাঁহার জীবনে অফুরন্ত। সেই সঙ্গে রহিয়াছে দেশ ও ধর্মের কল্যাণ সাধনের প্রবল ইচ্ছা। ভক্তিরসের ধারাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দিবার ব্রতটি তিনি গ্রহণ করিতে চান।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব প্রধানেরাও একাজে তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। পিল্লাই লোকাচার্য, সুদর্শন সূরী প্রভৃতি একদিন কহিলেন, "বেংকটনাথ তুমি পরম ভাগ্যবান্। পিতা মাতা উভয় কুল থেকেই শ্রীবৈষ্ণববাদের সংস্কার তুমি পেয়েছো। তদুপরি আবির্ভূত হয়েছো ঈশ্বরদত্ত অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে। আমাদের ইচ্ছা, দুটি মহতী কর্ম তুমি সত্বর উদ্‌যাপন করো। তুমি সর্ববিদ্যায় বিশারদ, জটিল দার্শনিক রহস্যভেদে অদ্বিতীয়। সেই সঙ্গে তুমি অসাধারণ কাব্যপ্রতিভারও অধিকারী বটে। আমরা তোমার লেখনী থেকে দুই পর্যায়ের রচনা আশা করি।"

"আদেশ পালনে আমি সতত প্রস্তুত।' জোড়হস্তে সবিনয়ে উত্তর দেন বেংকটনাথ।

"মায়াবাদীরা শ্রীসম্প্রদায়ের উপর চারিদিক থেকে প্রবল আঘাত হানছে। অদ্বৈতবাদ নিরসনের জন্য তুমি কয়েকটি তাত্ত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করো। সহজভাবে ব্যাখ্যা করো প্রভু রামানুজের পরম তত্ত্ব। সেই সঙ্গে ভক্ত জনসাধারণের জন্য লিখতে থাকো ভক্তি রসাত্মক কাব্যগ্রন্থ এবং সুমধুর শ্লোকরাজী।

বৃদ্ধ সর্বজনমান্য আচার্যের নির্দেশ স্মরণ রাখিয়া বেংকটনাথ শুরু করিলেন তাঁহার নতুনতর সারস্বত জীবন। শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজা, আন্তর সাধনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যানে সর্বতোভাবে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু ঐশ বিধানে, অচিরে তাঁহার এই নবতর জীবনসাধনার উপর পতিত হইল এক প্রচণ্ড আঘাত। মালেক

১ দক্ষিণী শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, স্বয়ং প্রভু শ্রীরঙ্গনাথ বেংকটনাথকে বেদান্তদেশিক উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপাধি তাঁহাকে প্রদান করেন শ্রীরঙ্গমের বুধমণ্ডলী ও বৈষ্ণবমণ্ডলী।

কাফুবেব হিংস্র আক্রমণেব প্রাক্‌কালে পবম প্রিয় ইষ্টস্থান শ্রীবঙ্গম হইতে নিজেকে তিনি সবাইয়া নিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু শ্রীবঙ্গমেব এই বিপর্যয় এবং মুসলমান সেনার নাবকীয় তাণ্ডব বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে তাঁহাব জীবনসাধনা হইতে বিচ্যুত কবিতে পাবে নাই। দুর্দৈবেব দাবুণ আঘাত তাঁহাব মধ্যে সৃষ্টি কবে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াব। নিবলস লেখনী চালনা ও জীবনসাধনাব মধ্য দিবা দক্ষিণভারতেব ভক্তিবাদকে বেঙ্কটনাথ আবো প্রাণবন্ত কবিষা তোলেন। চবম দুঃখ, ভীতি ও হতাশাব দিনে জনগণকে শোনান তিনি আশা ও আশ্বাসেব বাণী, নবতব প্রেবণায় তাহাদেব উদ্বুদ্ধ কবিয়া তোলেন।

শ্রীবঙ্গম ছাডিয়া আসাব পব বেঙ্কটনাথ কিছুদিনেব জন্য মহীশূবেব সত্যকালম-এ আসিষা বাস কবিতে থাকেন। মালেক কাফুবেব সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলা ও ঘৃণ্য অত্যাচাবেব অনেক কাহিনীই ইতিমধ্যে তাঁহাব নিকট পেঁাছিয়াছে। লোকমুখে শুনিয়াছেন—রঙ্গনাথজীব মন্দিব শ্রীমন্দিব বিধ্বস্ত, শ্রীসম্প্রদাযেব বর্ষীযান্‌ আচার্য সুদর্শন সুবী সহ শত শত ভক্ত নবনাবী নিহত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এবাব মাদুবাব পতনও আসন্ন।

দীর্ঘ পথশ্রমে দেহ অবসন্ন, অন্তব বিষাদখিন্ন। কিন্তু যে গুবুদাযিত্ব বেঙ্কটনাথেব সম্মুখে পড়িবা আছে তাহা উপেক্ষা কবাব উপায় নাই।

সর্বপ্রথমে তিনি সুদর্শন সুবীব পুত্র দুইটিকে উপনযন সংস্কাব কবাইলেন। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেব আশ্রয়ে তাহাদেব শিক্ষাব ব্যবস্থা কবিযা কিছুটা স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তাবপব শ্রীসম্প্রদায়েব স্থানীয আচার্যদেব কাছে গচ্ছিত বাখিলেন সুদর্শন ভট্টেব বচিত 'শ্রুত প্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপিটি।

অল্পদিনেব মধ্যেই চাবিদিকে সংবাদ বটিয়া গেল, শ্রীবঙ্গমেব প্রসিদ্ধ আচার্য বেঙ্কটনাথ মুসলমান সেনাব বেষ্টনী এডাইবা শ্রীবঙ্গম হইতে চলিষা আসিষাছেন। নবীন ছাত্র ও ভক্ত বৈষ্ণবেবা তাঁহাব কাছে সমবেত হইতে লাগিলেন।

দেশেব সম্মুখে সংকটেব ঘন কালো মেঘ ঘনাযমান। একেব পব এক হিন্দু বাজ্য সুলতানী সেনাব সম্মুখে ভাঙিযা পড়িতেছে। বাজাদেব কোষাগার ও মন্দিবেব ধনৈশ্বর্য লুণ্ঠনেই আক্রমণকাবীদেব তাণ্ডব শেষ হইতেছে না, উন্মত্তেব মতো যেখানে যে দেব-বিগ্রহ দেখিতেছে তাহা ভগ্ন কবিতেছে, কলুষিত কবিতেছে। সম্মুখে পড়িলে ভক্ত বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও আচার্যদেব নিষ্কৃতি নাই, নির্বিচাবে কবিতেছে তাঁহাদেব শিবচ্ছেদ।

এই দুঃসহ অবস্থাব প্রতিকাব কি কবিয়া হইবে? কে কবিবে দুর্গতদেব পবিত্রাণ?

বিষ্ণুপূজা সমাপন কবিযা সেদিন ধ্যানে বসিষাছেন বেঙ্কটনাথ। সহসা কানে আসিল মৃদু মধুব দিব্য কণ্ঠস্বব, "বৎস, অনাদি অনন্ত কালচক্রেব আবর্তন যিনি নিযন্ত্রণ কবছেন, এ সংকটে তাঁব কৃপাব জন্য প্রার্থনা জানাও। অন্ধকাব যিনি দিযেছেন, তিনিই যে সম্ভাবিত কববেন নব অবুণোদয। তাঁব স্তব বচনা কবো তুমি, আব তোমাব সে স্তব হয়ে উঠুক নির্জিত আতঙ্কিত মানবেব কাছে কল্যাণকব অভযবাণী।"

এ প্রত্যাদেশ পাইষা নূতনতর আত্মিক বলেব সঞ্চাব হইল বেঙ্কটনাথেব মনে। পূজা-

কক্ষে বসিয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেই দিনই রচনা করিলেন রবাভয়-ভরা অপরূপ শ্লোকরাজী। এই শ্লোকের নাম দিলেন তিনি 'অভীতিস্তব'। অন্তরের আকুতি জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু রঙ্গনাথ, তোমার ভক্তদের মুক্ত করো কালির কলুষ সন্তাপ থেকে, যবন ভয় থেকে। হে করুণাসাগর, তোমার দিব্য করুণার মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাও সেই দনুজদের যারা কলঙ্কিত করছে তোমার সুমহান সৃষ্টিকে।'

এই অভীতিস্তব ক্রমে বিস্তার লাভ করে ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে। পরম ভাগবত বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেমন প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের চরণে নিবেদন করিতেন এই স্তবমালা, তেমনি সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর কণ্ঠেও উচ্চারিত হইত এই আর্তিময় বাণী।

কৌতূহলী বৈষ্ণবেরা বেঙ্কটনাথকে প্রশ্ন করিতেন, "আপনার এই স্তব তো নিত্যই পঠিত হচ্ছে দেশের দিকে দিকে, কিন্তু আপনার ইষ্টস্থান শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রের মুক্ত হবার লক্ষণ তো কই দেখছিনে।"

উত্তরে আশ্বাস দিতেন বেঙ্কটনাথ, "ভগবান্ করুণার উৎস, ভক্তাধীন। তোমাদের আর্তি পৌঁছেছে তাঁর কাছে, মুক্তির বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হচ্ছে। অর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথ তাঁর পুণ্যপীঠকে অবশ্যই কলুষমুক্ত করবেন।"

সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, খলজি সেনার আক্রমণের সম্মুখে খণ্ডিত ও দুর্বল হিন্দুরাজ্যগুলি একের পর এক পদানত হইলেও, খলজি শাসন দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী হয় নাই, শিকড়ও গাড়িতে পারে নাই কিন্তু হত্যা, অগ্নিদাহ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়া মালেক কাফুর দিকে দিকে বর্বর অভিযান চালাইয়াছে। ফলে হিন্দু রাজা এবং জনগণের মনোবল প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রামগিরির রাজা রামচন্দ্র ইতিপূর্বেই খলজি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ওয়ারেংগেলের শক্তিমান্ অধিপতি প্রতাপরুদ্রের পক্ষেও যবন সেনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন ভেট দিয়া সুলতান আলাউদ্দীন খলজিকে তিনি খুশী করিয়াছেন।[১] হয়শাল-রাজ তৃতীয় বল্লালও খলজি সেনার কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, পরিণত হইয়াছেন করদ নৃপতিরূপে।

এই সময়ে দ্বারসমুদ্র রাজ্যের ধনৈশ্বর্যের লোভে মালেক কাফুর বিরাট বাহিনী নিয়া সেখানে উপস্থিত হন এবং রাজ-কোষাগার লুণ্ঠনের পর অগ্রসর হন পাণ্ড্যরাজ্যের মালাবার ভূখণ্ডের দিকে।

সুন্দর পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্য এই দুই রাজতনয় তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। কাফুরের পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কিন্তু পাণ্ড্যরাজদের ধরা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না, সেনাদল সহ তাঁহারা অরণ্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, সুচতুর কাফুর তাঁহাদের পশ্চাৎ

[১] আমীর খুসরব্ লিখিয়াছেন, এইসব উপঢৌকনের মধ্যে এমন এক মহার্ঘ রত্ন ছিল, সারা পৃথিবীতে যার জুড়ি নাই। কাফী খান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে, এই রত্নটিই 'কোহিনূর' বা বাবরের বহুলশ্রুত হীরক এবং মালেক কাফুর এটি দক্ষিণ ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে নিয়া যান।

ধারনে বৃথা কালক্ষেপ করেন নাই। ব্রহ্মস্থপুরী বা চিদম্বরমের স্বর্ণমন্দির লুণ্ঠন করিয়া এটিকে তিনি ধূলিসাৎ করেন। অতঃপর বিরধুল ও কান্নানুর এর মন্দিরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া বিরাট বাহিনীসহ খলজি সেনাপতি ঝাঁপাইয়া পড়ে শ্রীরঙ্গমের তীর্থ-নগরীর উপর। অবশেষে মাদুরা ও শোক্কনাথের মন্দির তিনি লুণ্ঠন করেন।

কাফুর দক্ষিণ ভারতের যত রাজ্যই পদানত করুন আর যত প্রতাপ ও নৃশংসতাই দেখান না কেন, খলজি প্রাধান্যকে সেখানে তিনি স্থায়ী করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে দিল্লীর তুঘলক শাহীও এ কার্য সাধনে অসমর্থ হয়।[1]

অতঃপর ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে শুরু হয় হিন্দুশক্তির এক স্বর্ণযুগ। মহারাজা হরিহর রায় তুঙ্গভদ্রার তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এক ধর্মরাজ্য। বিজয়নগরের দুর্গশিরে সনাতন ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা হয়। এই সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পিছনে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই এক সর্বত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসীই বেঙ্কটনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু মাধব সায়ন, শৃঙ্গেরী মঠের বরীয়ান্ আচার্য এবং ইতিহাসের বহু কীর্তিত পুরুষ বিদ্যারণ্যস্বামী।[2]

বিজয়নগর বাহিনীর প্রতাপে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীরঙ্গম মুক্ত হয়। সারা দাক্ষিণাত্যের ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রাণে বহিয়া যায় অনাবিল আনন্দের জোয়ার।

মুসলমান উপদ্রুত স্থান এড়াইয়া বেঙ্কটনাথ এতদিন বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার সাধন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। এবার তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। এই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় যে তিনি আজো বাঁচিয়া আছেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে আবার তিনি বাস করিবেন, ইষ্টদেব রঙ্গনাথের নিত্য দর্শন ও পূজা ধ্যানে বাকী জীবনটি তাঁহার মধুময় হইয়া উঠিবে, এই আনন্দে তিনি তখন বিভোর।

খলজি সেনার ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে পূর্বেই সরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। নিরাপত্তার জন্য এতদিন কোথাও কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশীদিন রাখা যায় নাই। কখনো কোনো দুর্গম অরণ্য, কখনো বা জনমানবহীন কোনো শৈলগুহায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইত।

শেষ পর্যায়ে প্রভুর বিগ্রহকে রাখা হয় তিরুপতির পবিত্র তীর্থে। কিছুদিন পরে এখান হইতে তাঁহাকে জিনজীতে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা গোপ্পন তখন দুর্ভেদ্য দুর্গ জিনজীর শাসক, তাছাড়া এসময়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপেও তিনি অনেকের আস্থাভাজন। রঙ্গনাথ বিগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাপূজার ভার সানন্দে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগ্রহকে কোথায় কখন লুকাইয়া রাখা হইতেছে, শ্রীরঙ্গমের পরিস্থিতি কিরূপ, লুণ্ঠনকারী খলজি সেনাবাহিনী কখন কোন্ পথে তাহাদের বর্বর অভিযান চালাইতেছে, সব খবরই বেঙ্কটনাথের জানা ছিল। আরও জানা ছিল, শ্রীরঙ্গনাথের মহাপীঠ হইতে

১ আর্লি মুসলিম এক্সপ্যানশান ইন সাউথ ইণ্ডিয়া ঃ ডঃ বেঙ্কটরামনাইয়া।

২ হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল (দিল্লী সুলতানেট্) ঃ ডাঃ আর. সি মজুমদার।

যবন নিষ্কাশনের আর বেশী দেরি নাই। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়নগরের সেনাবাহিনী শ্রীরঙ্গম দখল করিল। এ সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্কটনাথ তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া পরমানন্দে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

জিনজীর দুর্গ হইতে শ্রীবিগ্রহকে সাড়ম্বরে প্রাচীন মন্দিরে নিয়া আসা হইল। অর্চক ও বৈষ্ণব নেতারা একবাক্যে বেঙ্কটনাথকে অনুরোধ জানাইলেন, "রামানুজের ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আপনি। আ[illegible] সাধনা ও শাস্ত্রজ্ঞানের গৌরবে [illegible] দক্ষিণ ভারত গৌরবান্বিত। পণ্ডিত ও ভক্তসমাজের মুখপাত্ররূপে আপনি সদলবলে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত থাকুন। আপনার নির্দেশ নিয়েই আমরা অর্চা বিগ্রহের অভিষেক ও পুনঃস্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন করবো।"

বর্ষীয়ান্ আচার্য, বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সেদিন আনন্দে মাতোয়ারা। বন্ধুমণ্ডলী ও ভক্তদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভাবাবেগ-কম্পিত দেহে প্রভুর অভিষেক উৎসবে তিনি যোগদান করেন।

মন্দিরের ভট্টার এসময়ে সবিনয়ে অনুরোধ জানান, "বেদান্তদেশিক, আজকের দিনের এই মহান্ পুণ্যকর্মে আমরা চাই আপনার কবিকণ্ঠের প্রাণউন্মাদনাকারী স্তবমালা। নিজ নগরে, নিজ বেদীতে প্রভুজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো, এই কাহিনীটি আপনার কণ্ঠ-নিঃসৃত স্তবের ভেতর দিয়ে কালজয়ী হয়ে থাকুক এই আমরা চাই।"

বেঙ্কটনাথ তখন দিব্য আনন্দরসে বিভোর। পুলকাঞ্চিত দেহে ভাবনিমীলিত নয়নে, যুক্তকরে তিনি গাহিয়া চলিলেন প্রভুর পুনঃপ্রতিষ্ঠার জয়গান।[1] সিদ্ধ বৈষ্ণব ও ভক্ত কবির এই স্বতোৎসারিত শ্লোকরাজী প্রভুর সেবকেরা পরম আগ্রহে লিখিয়া নিলেন। তারপর মন্দির পরিচালকদের নির্দেশে উহা খোদিত হইল মন্দিরস্থ শিলাপটে।

আজিও রঙ্গনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া ভক্ত বৈষ্ণব ও তীর্থচারীরা এই খোদিত স্তবলিপি শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে, হৃদয় তাঁহাদের দিব্য অনুভূতির রসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রামানুজের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ ছিল বেঙ্কটনাথের প্রিয় পরম বস্তু। সহজ ও সরস ভাষায় এই ধর্মের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহাকে জনমানসে জাগ্রত করিয়া তোলেন, শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হয় তাঁহার রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়া।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদূষণী, তত্ত্বমুক্তাকলাপ ও রহস্যসার গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বিস্তারিত করিয়াছেন। এই মতবাদ রামানুজেরই অনুরূপ। চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই বস্তুসমূহের স্বরূপ ও তত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। জীব অণু বিভু নহে, সে শ্রীভগবানের চির দাস—শরণাগতি ও

১ পরবর্তীকালে দোদ্দায় আচার্য 'বৈভব প্রকাশিকা' নামক পদ্যে রচিত বেঙ্কটনাথের যে জীবনকাহিনী রচনা করেন তাহাতে এই অপরূপ শ্লোক রচনার কথা বর্ণিত আছে। অন্নরের লিখিত 'সপ্ততিরত্নমালিকা' এবং মন্নাপ্পাংগার তামিল ভাষায় রচিত শতশ্লোকেও এ তথ্য সংক্ষেপে উল্লিখিত।

ভগবৎকৃপা ছাড়া তাহার অন্য গতি নাই—রামানুজের এই মতবাদই বেঙ্কটনাথ নানা নূতনতর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছেন, পরিবেশন করিয়াছেন সহজবোধ্য ও কবিত্বময় ভাষায়।

উপরোক্ত তাত্ত্বিক গ্রন্থ ছাড়া বহু সংখ্যক মূল্যবান ভক্তিরসাত্মক নাটক ও স্তবমালা রচনা করিয়াও তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ঈশ্বরীয় প্রেম-ভক্তির দীপশিখা। তাঁহার সংকল্প সূর্যোদয়, যাদবাভ্যুদয়, হংস সন্দেশ প্রভৃতি নাটক ও কাব্য চিরকালের ভক্তসমাজের পরম আদরের ধন। শতশ্লোকী সুমধুর স্তবমালা তিরভয়মলি আজো শত শত রামানুজপন্থী সাধক ভক্তিভরে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।[১]

ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রপত্তি এবং শুদ্ধাভক্তির ঔজ্জ্বল্যে ও তেজস্বিতায় সাধক বেঙ্কটনাথের সমগ্র জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ও মনীষী লেখক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁহার জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন

"তিনি মূর্তিমান বৈরাগ্য ও ভক্তিস্বরূপ। একাধারে তেজস্বিতা ও দীনতার অপূর্ব মিলন তাঁহাতে সাধিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার এই তেজস্বিতাকে অহংকারের ফল বলা যায় না। শ্রীরামানুজের মতের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাই এই তেজস্বিতার মূলে সঞ্চিত ছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া জানিতেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলিও ভগবচ্ছক্তির বিকাশ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তাকে শ্রীভগবানের দান বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অপর দিকে তিনি দার্শনিকতা ও কবিত্বেরও অপূর্ব সমন্বয় দেখাইয়াছেন। দেশিকের গ্রন্থগুলি যদি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ মনীষী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ধর্মোপদেষ্টার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাঁহাতে ছিল[২]।"

সরস্বতী মহারাজ এ প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন. "ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও কেবল গ্রন্থ বলেই তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী. তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতার প্রাণ ধর্ম। শ্রীরামানুজের প্রভাব প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্তি হইয়াছে। বরদাচার্যের (সুদর্শন সূরীর গুরু) প্রভাবও তাঁহার জীবনে ও দর্শনে পরিস্ফুট। রামানুজ হইতে এক বিষয়ে বেদান্তদেশিকের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভাষায়। রামানুজের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল নয়। কিন্তু দেশিকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পতি মিশ্রের ভাষার ন্যায় উদার। বিচারমল্লতায় রামানুজ ও দেশিক উভয়েই সমান। রামানুজের অন্তর্ধানের পরে দেশিকের প্রতিভায়ই শ্রীসম্প্রদায় সজীব রহিয়াছে।"

---

১ বেঙ্কটনাথের দার্শনিক ও ভক্তিরসাত্মক রচনার সংখ্যা প্রায় ১০৮। তাঁহার ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার লালিত্য যে-কোনো সমালোচকের প্রশস্তি অর্জন করিবে। অপর দীক্ষিতের মতো অদ্বৈতবাদী আচার্যও তাঁহার রচিত কৃষ্ণজীবনীমূলক মহাকাব্য যাদবাভ্যুদয়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসার মুখর হইয়াছেন।

২ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

একদিন রাত্রে রঙ্গনাথ মন্দিরের ভজন পূজন শেষে অর্চক, ভট্টার আচার্যেরা মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে একজন হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আজ রাত্রের ভেতর যদি কেউ প্রভু রঙ্গনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে ভাব সমৃদ্ধ এক সহস্র শ্লোক রচনা করতে পারেন তবে বুঝবো, তিনিই প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তিনিই উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক।"

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা পিলাই লোকাচার্যের ভাই পেরুমল নয়নার তখন সেখানে উপস্থিত। সুকবি ও ভক্ত-সাধক বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। সবিনয়ে তিনি কহিলেন, "প্রভুর চরণ-পদ্মের প্রশস্তি রচনা সমাপ্ত করতে হবে এক রাত্রের মধ্যে? বেশ তো আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।"

একদল বৈষ্ণব ভক্ত একসময়ে বেঙ্কটনাথকেও চাপিয়া ধরিলেন, "আচার্য, আপনার লেখনীর ভেতর দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথ এ যাবৎ সহস্র সহস্র সুমধুর শ্লোক উৎসারিত করেছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, ভক্তসমাজের কল্যাণে এ পুণ্যকর্মটি আপনিই সম্পন্ন করুন।"

বেঙ্কটনাথ সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, তিনি ও পেরুমল নয়নার দুজনেই নিজ নিজ কবিকল্পনা অনুযায়ী একাজ করিবেন।

সারা রাত্রির মধ্যে পেরুমল পাঁচশতের বেশী শ্লোক রচনা করিতে পারিলেন না। এদিকে মন্দিরের কোণে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক বেঙ্কটনাথ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রভুর চরণকমল উপলক্ষ করিয়া সমাপ্ত করিলেন তাঁহার 'পাদুকা সহস্র'। ভাব মাধুর্যে ভাষার লালিত্যে ও ভক্তিরসের উচ্ছলতায় এই শ্লোকরাজি অতুলনীয়।

পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রভুর মঙ্গলারতির পর সর্বসমক্ষে এই শ্লোকরাজি বেঙ্কটনাথ ভক্তিভরে পাঠ করিলেন। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সবাই মিলিয়া বৃদ্ধ বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে এক নূতন উপাধি দিলেন—কবি তার্কিক-সিংহ।

বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য এসময়ে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে। শাংকর বেদান্তী, রামানুজী বৈষ্ণব, রামাইৎ, পান্ধারপুরী ভক্ত সবাই সোৎসাহে জড়ো হইতেছেন রাজধানী হাম্পির রাজসভায়। রাজগুরু বিদ্যারণ্য-স্বামী সেই রাজসভার প্রাণপুরুষ। রাষ্ট্রীয় জীবন ও ধর্মান্দোলনের শক্তিকে, এই বীর সন্ন্যাসী পরিচালিত করিতেছেন। জনমানসে জাগাইয়া তুলিয়াছেন অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা।

বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, শৃঙ্গেরীর মঠাধীশের প্রধান ও প্রবীণ শিষ্য। কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতির নব আন্দোলনকে তিনি দেখিতেছেন এক উদার সার্বভৌম দৃষ্টিতে। তাঁহার নির্দেশে রাজকোষের সাহায্য সম্প্রদায় ও মতবাদ নির্বিশেষে আচার্য ও সাধু-সন্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। শুধু দক্ষিণ ভারতেরই নয়, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক, দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকেরাও আসিয়া ভিড় করিতেছেন হাম্পির রাজসভায়।

বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার শিষ্যদ্বয় রাজা হরিহর এবং তাঁহার

ভ্রাতা বুক্করায়কে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ধর্ম ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ধারক বাহকেরা বিজয়নগরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকুন। ইহার ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার যেমন বাড়িবে তেমনি বাড়িবে রাজসিংহাসনের গৌরব ও মর্যাদা।

শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা, বর্ষীয়ান্ শ্রীবৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথের উপর বিদ্যারণ্যের দৃষ্টি বহু বৎসর যাবৎ নিবদ্ধ। অনেকবারই তিনি ভাবিয়াছেন, বিজয়নগর রাজসভা অলংকৃত করার জন্য তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন। যে মহান্ হিন্দুরাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা বিদ্যারণ্য করিয়াছেন, যে রাজ্যকে ধর্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দুর্গরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর, সেখানে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের মতো দিক্‌পাল আচার্য না থাকিলে মানাইবে কেন? বেঙ্কটনাথ ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, ত্যাগ বৈরাগ্য ও চরিত্র নিষ্ঠায়ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ আছেন বলিয়া বিদ্যারণ্যের জানা নাই। যৌবনকাল হইতে এই সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌কে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। নিস্পৃহ নিষ্কিঞ্চন এই আচার্যকে কি হাম্পির রাজসভায় আনয়ন করা যায় না? একবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে দোষ কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিদ্যারণ্য বেঙ্কটনাথের কাছে এক পত্রী পাঠাইলেন। পত্রীর বাহক তাঁহার এক বর্ষীয়ান্ কৃতবিদ্য সন্ন্যাসীশিষ্য। বেঙ্কটনাথের সঙ্গে কোন্ কৌশলে কথা বলিতে হইবে, কিভাবে তাঁহাকে আমন্ত্রণের তাৎপর্য বুঝাইতে হইবে, সব কিছু বিশদভাবে এই সন্ন্যাসী দূতকে বলিয়া দিলেন।

বিদ্যারণ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অচিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন শ্রীরঙ্গমে। পত্রীসহ নিবেদন করিলেন স্বামীজীর বক্তব্য।

বেঙ্কটনাথ সসংকোচে কহিলেন, "কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি, উঞ্ছবৃত্তি করে যে বেঁচে আছে, কোনো মতে নিজের সংসার প্রতিপালন করছে, তাঁকে দিয়ে বিজয়নগরের নৃপতির কি কাজ, বলুন তো?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহাত্মন্, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ঐশ্বরীয় কৃপায়, ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্মযজ্ঞ উদ্‌যাপনের জন্য। সেই পুণ্যভূমিতে আপনার মতো মহাপুরুষ ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্যকেই তো চাই।"

"শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের এক কোণে আমি আমার আর্তি নিয়ে পড়ে আছি। আমার সাধনা ও শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবে ক'রে যাচ্ছি। রাজসভার কোলাহলের ভেতরে থেকে আমার কি লাভ বলুন তো?"

"লাভ যথেষ্ট, আচার্য।"

"বেশ তো আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

"আপনি রামানুজের পরম ভক্ত এবং তাঁর শ্রীসম্প্রদায়ের কল্যাণকামী, এটা তো ঠিক?"

"তা বটে।"

"তাহলে আমি আপনাকে বলছি, হাম্পির রাজসভায় গেলে রামানুজীয় তত্ত্ব প্রচারের পাবেন আপনি পরম সুযোগ, সারা ভারতের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা সেখানে আনাগোনা

করছেন। আপনার মতবাদ প্রচারের সেটাই যে উপযুক্ত স্থান। এর ফলে আপনার সম্প্রদায়ের যথেষ্ট কল্যাণও হবে বৈ কি।"

"সন্ন্যাসীবর, পুণ্যপীঠ শ্রীরঙ্গমে থেকে যে সাধনা ও শাস্ত্ররচনা আমি করেছি, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্ত বৈষ্ণবদের যে সেবা করতে পারছি, তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। রাজধানীর বহিরঙ্গ প্রচারের চাইতে আমার এই অন্তরঙ্গ সেবা অনেক বেশী কল্যাণপ্রদ।"

"রাজা ও রাজগুরু বিদ্যারণ্যের সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে আমি আপনার দ্বারে এসেছি। অন্তত একটিবারের জন্য আপনি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চলুন, রাজসভার বিরাট কল্যাণকর কর্মোদ্যোগ নিজ চক্ষে দেখে আসুন। স্বামী বিদ্যারণ্য একথাও আপনাকে জানাতে বলেছেন, ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ সাধক ও আচার্য বিদ্যানগরের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার গৌরব বাড়িয়ে গেছেন, আপনিও সেখানে একবার পদার্পণ করুন।"

"আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় যতিবর। রাজা ও রাজগুরুর সাদর আমন্ত্রণ আপনি নিবেদন করেছেন এজন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এবার আমার পরম বন্ধু বিদ্যারণ্য স্বামীর পত্রের উত্তর আমি আপনার হাতে দেব।"

পত্রটি সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "আমি দীনহীন কাঙাল বৈষ্ণব, রাজসভার নয়ন ধাঁধানো ঐশ্বর্যে আমার কি প্রয়োজন? স্বামী বিদ্যারণ্যকে বলবেন, তাঁর সদিচ্ছা ও সাদর আহ্বানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু শ্রীরঙ্গমকেই যে আমি আমার জীবনের পরম আশ্রয়রূপে আঁকড়ে ধরেছি। রাজার রাজা, পরম প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের দাস আমি, তেমনি দাস বিদ্যানগরের রাজা হরিহর রায়। তবে শ্রীরঙ্গনাথের এই সান্নিধ্য ও আশ্রয় ছেড়ে, বিদ্যানগর রাজের আশ্রয়ে আমি কেন যাবো, বলুন তো?"

সন্ন্যাসী দূত বিদ্যানগরে ফিরিয়া গেলেন। পত্রী পড়িয়া এবং সব কথা শুনিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বিদ্যারণ্য কহিলেন, "বৈরাগ্য ও শরণাগতির সাধনা সার্থক হয়েছে বেদান্ত-দেশিক বেঙ্কটনাথের। জীবনপ্রভু রঙ্গনাথকে প্রাপ্ত হয়েছে সে। তাই তো শ্রীরঙ্গম থেকে অন্যত্র আশ্রয় নেবার প্রশ্ন তাঁর কাছে আজ অবাস্তব।"

সিদ্ধবৈষ্ণব বেঙ্কটনাথ ছিলেন দৈন্য, পবিত্রতা ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ। আবার রামানুজীয় মতবাদের প্রতিপক্ষের সম্মুখে, শাস্ত্রীয় বিচার-সভায় দেখা যাইত তাঁহার ভিন্ন রূপ। যুদ্ধরত গাণ্ডীবীর মতো তিনি গর্জিয়া উঠিতেন, শাস্ত্রীয় তথ্য ও তত্ত্বের শরজালে অপর পক্ষের আচার্যদের করিতেন ধরাশায়ী।

আবার দেখা যাইত এই সব বিরুদ্ধ মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সঙ্গে সহাবস্থান করিতে বা ঘনিষ্ঠতা করিতে তাঁহার বাধিত না। সারা বিশ্বসৃষ্টি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে নিঃসৃত, এবং সৃষ্ট জীব তা সে ভক্তিপন্থী হোক বা জ্ঞানপন্থী হোক, স্বরূপত সেই শ্রীবিষ্ণুরই দাস তো বটে। তাই ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বেঙ্কটনাথের দিক হইতে কোনো সংকোচ ছিল না।

শাস্ত্রবিদ, তর্কশূর বেংকটনাথ আর বৈষ্ণবীয় দীনতার প্রতিমূর্তি বেংকটনাথ, এই দুই চিত্র অনেক সময়ে শ্রীরঙ্গমের কোনো কোনো আচার্যের মনে বিভ্রম জাগাইয়া তুলিত।

সেবার শ্রীরঙ্গমের কয়েকটি ঈর্ষাপরায়ণ আচার্যের মনে ইচ্ছা জাগিল, সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত বেংকটনাথকে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। দেখিবেন সত্য সত্যই তাঁহার জীবন হইতে অহংবোধ দূর হইয়াছে কিনা, ভক্তি ও প্রপত্তির সাধনায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন কিনা।

ঐ আচার্যদের একজন বেংকটনাথের কাছে গিয়া যুক্তকরে কহিলেন, "বেদান্তদেশিক, আমার মনের বাসনা আপনি একদিন আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন। কালই আপনি দয়া ক'রে আসবেন শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন গ্রহণ করবেন। আরো কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুপুরুষও আসবেন।"

বেংকটনাথ সানন্দে রাজী হইলেন, কহিলেন, "প্রভুর প্রসাদান্ন পাবো, সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা। জানেন তো সংসারে থেকেও, আকাশবৃত্তিই আমার একমাত্র অবলম্বন। ভালই হলো, প্রভু আপনার গৃহে কাল আমার অন্নের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।"

পরদিন মধ্যাহ্নে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া বেংকটনাথ বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, অন্যান্য সাধু ভক্তদের ভোজন শুরু হইয়াছে, শুধু তাঁহার জন্য এক ভিন্ন ব্যবস্থা। ঠাকুরঘর সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কুটিরে তাঁহার আহারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে আর সেই কুটিরের প্রবেশপথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে কয়েক জোড়া জীর্ণ পাদুকা। যে বৈষ্ণবেরা পাশের ঘরে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন, বুঝা গেল—এ পাদুকাগুলি তাঁহাদেরই।

নির্দিষ্ট কুটিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বেংকটনাথ একে একে প্রত্যেকটি পাদুকা টানিয়া নিয়া ভক্তিভরে নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য। পরম-প্রভুর ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা যেমন হয়েছে আমার জন্য, তেমনি রয়েছে প্রভুর নিজজন বৈষ্ণবদের পদরজ-লিপ্ত এই পাদুকাগুলো।"

নিমন্ত্রণকারী আচার্য এবং তাঁহার কুচক্রী সহযোগীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে বেংকটনাথের দিকে চাহিয়া আছেন। ভোজন কুটিরের প্রবেশ পথে পাদুকা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে বেংকটনাথকে অপমান করার জন্য। সর্বজনমান্য, অশীতিপর বৃদ্ধ বেংকটনাথ এ অপমানের ষড়যন্ত্র মুহূর্তে বুঝিয়া নিবেন এবং তাঁহার রোষবহ্নি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, ইহাই সবাই আশংকা করিয়াছিলেন। কার্যকালে দেখা গেল, ভিন্ন চিত্র। শ্রীসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ বেংকটনাথ আবেগভরে বার বারই পাদুকাগুলি মস্তকে স্পর্শ করাইতেছেন, আর ভক্তি-আবিষ্ট দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

চক্রান্তকারী আচার্যের অনুতাপের অবধি রহিল না, জোড়হস্তে মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন তাঁহার চরণে।

ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বেংকটনাথ কহিলেন, "যাঁর যেমনতর পথ পরমপ্রভু নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, সেই পথই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেউ আছেন কর্ম-

যোগের পথে, কেউ জ্ঞানযোগী বেদান্তী, কেউবা সাধনায় লিপ্ত রয়েছেন শ্রীহরির দাসানুদাস হয়ে। আমার মতো দীনভক্তের পথ হচ্ছে সেই 'দাস-আমি' সাধনার পথ। আপনারা বৈষ্ণব ভক্তদের পদরজ সমন্বিত পাদুকা এখানে আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখে আমার পরম কল্যাণ সাধন করেছেন।"

উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করিলেন, রামানুজীয় প্রপত্তির সাধনায় বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সত্যই অতুলনীয়।

বেঙ্কটনাথের কবিত্ব, দার্শনিকতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাঁহার সমকালীন আচার্যদের কাছে এক পরম বিস্ময়। যাদবাভ্যুদয় নাটকের ভূমিকায় শ্রী এ ভি. গোপালচারিয়ার তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন

"বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুর উৎসে এই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বিরাজমান। উচ্চস্তরের কবি যেমন তিনি ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিতর্কমূলক নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। প্রাঞ্জল ও সুমধুর কবিতা যেমন তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত তেমনি পাওয়া যাইত দার্শনিক জটিলতার মীমাংসা। বেঙ্কটনাথের ধর্মীয় ও দার্শনিক রচনার ভিত্তি ছিল ন্যায়ের নিখুঁত বিচারশীলতা, যে-কোনো মননশীল গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় বর্তমান রহিয়াছে এক মহান্ প্রতিভাধর পুরুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কবিত্ব এবং দার্শনিকতা দুই-ই যেন তাঁহার কাছে ছিল খেলার বস্তুর মতো, যে-কোনো মুহূর্তে এইসব অবলীলায় তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন।"

সাধনজীবনে বেঙ্কটনাথ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, প্রকৃত বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যকার প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই দেখা যায়, শতাধিক বৎসরের দীর্ঘ জীবনে এক দিনের তরেও বিরোধী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে নাই।

'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মহাপুরুষরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। সর্ব মত ও পথের সন্ধান তিনি জানিতেন, তাই শাস্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরম পুরুষের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহার ভুল হইত না। সকল জীবকেই ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিয়া সকলের সহিত একাত্মক হইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই দেখা যাইত, অদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী বা তেলেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন।

শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের স্থান কত উচ্চে ছিল, সমকালীন একটি ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সেবার বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে এক প্রতিভাধর বৈষ্ণব আচার্যের আগমন হইয়াছে। নাম তাঁহার অক্ষোভ্য মুনি। তর্ককুশল আচার্য ও দার্শনিক বলিয়া দাক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি।

রাজসভায় পৌঁছিয়া অক্ষোভ্য রাজা হরিহর রায়কে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বিষ্ণু উপাসক, দ্বৈতমতবাদের প্রচারক। বিজয়নগর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাম্রাজ্য,

এখানে ভক্তিধর্মের পতাকা আমি উত্তোলন করতে চাই। এজন্য তর্কদ্বন্দ্বে আহ্বান করছি রাজগুরু, শৃঙ্গেরী মঠের প্রবীণ নেতা, অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্য স্বামীকে।"

বিদ্যারণ্য সভাতে উপস্থিত। অক্ষোভ্যকে সংবর্ধনা জানাইয়া কহিলেন, "আচার্য, সানন্দে আমি আপনার তর্কযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করছি। আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আপনি আমায় পরাস্ত করতে পারেন, আমি আপনাকে জয়পত্র অবশ্যই লিখে দেবো।"

"তবে বিচার অবিলম্বে শুরু হোক।" দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন অক্ষোভ্য মুনি।

"আচার্য, আপনি মধ্বমতের শ্রেষ্ঠ আচার্য, শক্তিমান্ বিচারমল্ল বলেও আপনাকে সবাই জানে। আর আমিও শৃঙ্গেরী মঠের একজন বর্ষীয়ান্ সন্ন্যাসী, শাংকর বেদান্তের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতারূপে আমি দক্ষিণ ভারতে সুপরিচিত। আমাদের এই তর্কযুদ্ধের মধ্যস্থ করা হবে কাকে? বলুন, আপনি কাকে মনোনীত করতে চান?"

দুই জনেই শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও বিচারনিপুণ। সমপর্যায়ের কোনো প্রতিভাধর আচার্য ছাড়া কে তাঁহাদের শাস্ত্র বিতর্কের মূল্য নিরূপণ করিবেন? তাছাড়া, যিনি মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিবেন, সততা, নীতিজ্ঞান ও সর্বোপরি নিরপেক্ষতা থাকা চাই।

সহসা এমন কোনো লোকের নাম মনে আসিতেছে না। অক্ষোভ্য তাই সবিনয়ে কহিলেন, "যতিবর, এমন কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির নাম আমার জানা নেই। আপনি বরং ভেবে দেখুন এজন্য কাউকে পাওয়া যায় কিনা।"

"আমার তো মনে হয় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সারা দক্ষিণ ভারতে শুধু এক-জনেরই নাম করা যায়। তিনি হচ্ছেন বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ। রামানুজীয় ভক্তি-বাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবীণতম নেতা তিনি। সত্যনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যময় সাধনায় তিনি অতুলনীয়। তাছাড়া, সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। আপনার সমর্থন থাকলে তাঁকেই একাজের জন্য আহ্বান করা হোক।"

বিদ্যারণ্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই সভার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে গুঞ্জন ও প্রতিবাদ উঠিল। তাঁহারা কহিলেন, "বেঙ্কটনাথ তাঁহার দীর্ঘ সাধনজীবন কাটিয়েছেন ভক্তি ও প্রপত্তি নিয়ে, ভক্তিবাদী শাস্ত্রচর্চা নিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁহার শতদূষণী গ্রন্থে অজস্র শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ দিয়ে তিনি কি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বাতিল করতে চান নি? কাজেই বিচারে বসে অক্ষোভ্যমুনির বৈষ্ণববাদের সমর্থনেই তিনি বেশী ঝুঁকবেন। এবং এটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।"

বিদ্যারণ্য নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান, দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠেন, "বেঙ্কট-নাথকে আমি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থেকে দেখেছি। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা আমি জানি। ন্যায়নীতি ও সত্যনিষ্ঠা থেকে এই মহাপুরুষ কখনো এক চুল বিচ্যুত হন নি। এ তর্ক-দ্বন্দ্বে বাদী ও প্রতিবাদী যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থিত করবেন, শুধু তার ভিত্তিতেই বেঙ্কটনাথ স্থির করবেন তাঁর সিদ্ধান্ত। এই তর্কবিচারে তার চাইতে সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ আর কাউকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।"

প্রতিবাদকারী পণ্ডিতেরা চুপ করিয়া গেলেন। অক্ষোভ্যের মত নিয়া বিদ্যারণ্য সেই দিনই এক বিশেষ বার্তাবহকে বেঙ্কটনাথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

এবারও বেঙ্কটনাথকে বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে আনয়ন করা গেল না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন, উভয় তর্কশূরের আমন্ত্রণে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত মনে করিতেছেন। কিন্তু তাহার মতো কাঙাল বৈষ্ণবের পক্ষে রাজসভার আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ক্ষণেকের তরেও অবস্থান করা সম্ভব নয়।

অগত্যা বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যকে এক নূতন প্রস্তাব দিতে হইল। তাঁহারা লিখিলেন— বেশ, বেঙ্কটনাথ রাজসভায় আসিতে না চান, ভাল কথা, কিন্তু এই তর্ক-দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা তাঁহাকে করিতেই হইবে। উভয় পক্ষ তাঁহাদের যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্র প্রমাণ রাজপুরুষদের মাধ্যমে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিবেন। বেঙ্কটনাথ সেখানে বসিয়া তর্ক-যোদ্ধাদের বক্তব্যের মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং নিজ সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন পত্রযোগে।

এই বিচারদ্বন্দ্বে বেঙ্কটনাথ কাহাকে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে তথ্য স্পষ্টরূপে জানা যায় না। ভক্তিবাদী অক্ষোভ্য মুনির ভক্ত শিষ্যেরা দাবি করেন, বেঙ্কট-নাথ তাঁহাকেই জয়মাল্য দিয়াছিলেন। অপর দিকে অদ্বৈত বেদান্তীরা দাবি করেন, তাহাদের প্রতিনিধি বিদ্যারণ্যস্বামীর অনুকূলেই দেওয়া হয় বর্ষীয়ান্ মধ্যস্থ, মহান শাস্ত্রবিদ্, বেঙ্কটনাথের সিদ্ধান্ত।

তর্কযুদ্ধের ফলাফল যাহাই হোক, উপরোক্ত ঘটনা হইতে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে, আচার্য বেঙ্কটনাথকে সমকালীন মহাত্মা ও শাস্ত্রবিদেরা এক অনন্যপুরুষরূপেই দেখিতেন। তাঁহার সততা ও নিরপেক্ষতা ছিল সকল কিছু মতবিরোধ ও নিন্দা সমা-লোচনার ঊর্ধ্বে।

বেঙ্কটনাথ শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। সুপরিণত বয়সের এই সিদ্ধপুরুষ ও অসামান্য শাস্ত্রবিদ্ অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদী উভয় দলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তবে বিশেষ করিয়া রামানুজীয় ভক্তিবাদই তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া জনমানসে আরো প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

মাদুরার মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করার পর হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরিধি ও প্রভাব বিপুলভাবে বাড়িয়া যায়। এসময়ে বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার শিষ্য হরিহর ও বুক্ক রায় বাছিয়া বাছিয়া সুশিক্ষিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে থাকেন সামন্তরাজ ও শাসনকর্তারূপে।

সাম্রাজ্যের কয়েকটি সামন্ত আচার্য বেঙ্কটনাথেরই অনুরাগী হইয়া পড়েন, কেহ কেহ তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণও করেন। এই সামন্তদের, বিশেষ করিয়া রাজ-মহেন্দ্রীর সামন্তরাজ সর্বজ্ঞের অনুরোধে বেঙ্কটনাথ তাঁহার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করেন।[১] ফলে সাধারণ ভক্ত নরনারীর মধ্যে তাঁহার বাণী জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং অধ্যাত্ম-প্রভাবও অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়।

---

১ সুভাষিত নীতি, রহস্যত্রয়সার প্রভৃতি বেঙ্কটনাথ প্রকাশ করেন দেশীয় ভাষায়।

দাক্ষিণী বৈষ্ণবসমাজের এক ভাস্বর জ্যোতিস্করূপে শ্রীরঙ্গমের অধ্যাত্ম-আকাশে অর্ধ শতকেরও বেশী কাল বেঙ্কটনাথ দীপ্যমান থাকেন। তারপর ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে- একশত দুই বৎসরে পদার্পণ করার পর এই মহাপুরুষের জীবনে আসিয়া যায় চির বিদায়ের পালা।

জীবনদীপ নিভিবার আভাস সেদিন আসিয়া গিয়াছে। সিদ্ধ বৈষ্ণব এবার প্রস্তুত হইয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুত্রদের মধ্যে ভক্তিমান ও সুপণ্ডিত—বরদার্য আচার্য। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বেঙ্কটনাথ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "বৎস, আমার প্রিয় 'পাদুকা সহস্রম' আবৃত্তি করো। পরম প্রভুর চরণাশ্রয় নেবার জন্য এবার আমি যাত্রা করছি এই মরধাম থেকে।"

স্বরচিত প্রভু-প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত হইয়া আসে, তারপর মহাবৈষ্ণব প্রবেশ করেন নিত্যলীলা ধামে।

বল্লভাচার্য

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এক বৈশিষ্ট্যময় বিবর্তন-যুগরূপে চিহ্নিত। প্রেমভক্তির ভাবপ্রবাহে এ সময়ে দেশের দিকে দিকে উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে সমাজজীবনের সর্বস্তরে। এই ভাবপ্রবাহের উৎসমুখে আবির্ভূত দেখি এমন একদল মহাপুরুষকে, সাধন ও সিদ্ধির আলোকে জীবন যাঁহাদের সমুজ্জ্বল, আর্ত নিপীড়িত ও ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর জন্য চিত্ত যাঁহাদের করুণার্দ্র। এই মহাপুরুষদের মধ্যে রহিয়াছেন রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য—আরো রহিয়াছেন একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি। প্রেমভক্তি সাধনার নবতর ও সহজতর পন্থা ইঁহারা প্রবর্তন করিয়াছেন, আর অপার করুণাভরে আপামর জনগণকে সেদিকে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন।

ভক্তিসাধনার এই নব পথিকৃৎদের অন্যতম মহাত্মা বল্লভাচার্য। আপন জীবনের তপস্যা ও শাস্ত্র-ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়া এই দাক্ষিণী সাধক উত্তর ভারতের বহুস্থানে বিস্তারিত করেন কৃষ্ণউপাসনার ধারা, রচনা করেন শুদ্ধ অদ্বৈতবাদের এক সুমহান সৌধ।

বল্লভাচার্যের পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট ছিলেন ভক্তিমান দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁকড়খাড়। পত্নীর নাম বল্লামাগারু। গার্হস্থ্য জীবনের অধিকাংশ সময় লক্ষ্মণ ভট্ট পূজাপাঠ শাস্ত্র-চর্চা ও তীর্থদর্শনেই কাটাইয়া দিতেন। সংসারের কোনো কাজেই তাঁহার মন বসিত না। তিনটি পুত্রের জনক হওয়ার পর অন্তরে তাঁহার নির্বেদ জাগিয়া উঠে, ভাবাবেগে হঠাৎ একদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজনে বাহির হন, তারপর প্রেমাকরস্বামী নামক সন্ন্যাসী গুরুর কাছে গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা।[১]

কিছুদিন পরের কথা। লক্ষ্মণ ভট্টের পিতা সপরিবারে বাহির হইয়াছেন তীর্থ পর্যটনে। দেশান্তরী পুত্রের জন্য মন তাঁহার তখনো বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রায়ই ভাবেন, প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে হঠাৎ যদি কোথাও দেখা হয়, তবে আবার তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। আকস্মিকভাবে এই যোগাযোগ একদিন সত্যই ঘটিয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সবাই একদিন প্রেমাকরস্বামীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত।

ভক্তিমতী বল্লামাগারু স্বামীজীকে প্রণাম করিতেই তিনি আশীর্বাদ করিলেন, "সুখে থাকো মা, আনন্দে থাকো। একটি কুলপাবন পরম ভক্ত পুত্র তুমি লাভ কর।"

বল্লামা কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে শোকের অশ্রুধারা।

স্বামীজীকে জানানো হয়, আশীর্বাদ তিনি করিয়াছেন বটে কিন্তু এই বধূটির স্বামী নিরুদ্দেশ, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কোনো আশা নাই।

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রেমাকরস্বামী বলেন "মা, আমি যে আশীর্বাদ করেছি, তা [illegible]

---

১ পুষ্টিমার্গণো ইতিহাস।

বিফল হবার নয়। পুত্রবত্ন লাভ তোমাব হবেই। আব তোমাব স্বামীও ফিরে আসবে তোমাদেব কাছে।"

স্বামীজীব শিষ্য লক্ষ্মণ ভট্ট তখন আশ্রমেব কাজে বাহিবে কোথায় গিয়াছিলেন। ফিবিয়া আসিযা দেখেন এক বিস্ময়কব দৃশ্য। তাঁহাব বাবা, মা ও স্ত্রী স্বামীজীর সম্মুখে বসিযা আছেন, তিনিও পবমানন্দে নানা উপদেশ তাঁহাদেব দিতেছেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্মণকে এই আশ্রমে দেখিয়া আত্মপবিজনদেব আনন্দের অবধি নাই। তৎক্ষণাৎ সবাই তাঁহাকে ঘিবিয়া ধবেন, আকুতি জানাইতে থাকেন গৃহে প্রত্যাবর্তনেব জন্য।

এবার প্রেমাকরস্বামী তাঁহাব উদ্দেশে বলেন, "বৎস, তুমি ভাবেব উচ্ছ্বাসে ঘব-সংসাব ত্যাগ ক'বে এসেছো বটে, কিন্তু ঠিক কাজ কবো নি। সংসাব বাসনা তোমার ভেতব সূক্ষ্মরূপে যথেষ্ট বযে গিয়েছে, তাছাড়া বাকী বয়েছে সংসাব-আশ্রমেব কিছু কর্তব্য। আমি নির্দেশ দিচ্ছি তুমি আবাব গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ কবো। আবও একটা কথা জেনে বাখো, তোমাব ঘবেই অনতিকাল মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন এক ভক্তিমান্ মহাপুরুষ।"

লক্ষ্মণ ভট্টকে আবাব ঘব-সংসাবে ফিবিয়া আসিতে হয়। এ সময়ে তাঁহাব নিজ গ্রাম কাঁকড়ওযাড় ও সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ নিয়া নানা নিন্দা সমালোচনাও হইতে থাকে। তাই সপবিবাবে তিনি চলিযা আসেন কাশীধামে। সেখানে একটি ছোটখাটো টোল তিনি খুলিযা বসেন। এই বৃত্তিব মাধ্যমে পরিবাবেব ভবণপোষণ চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাশীতে শোরগোল পড়িযা যায, একদল মুসলমান সেনা এই প্রসিদ্ধ তীর্থনগবী লুণ্ঠন কবিতে আসিতেছে। সর্বত্র প্রবল আতঙ্কেব ভাব, বহু নবনাবী ঘববাড়ি ছাড়িযা দূবে গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে।

লক্ষ্মণ ভট্টেব স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা, এ অবস্থায কোথায কোন নিবাপদ আশ্রমে তাঁহাকে সবাইযা নেওয়া যায। আচার্য ভাবিযা কোনো কূলকিনাবা পান না। অবশেষে সবাই মিলিয়া স্থিব কবিলেন, মধ্যপ্রদেশেব রাযপুব অঞ্চলে চম্পাবণ্যে গিয়া তাঁহাবা কিছুদিন বাস কবিবেন। স্থানটি অনেকাংশে নিবাপদ, বাষ্ট্রীয বিপ্লব বা যুদ্ধ-বিগ্রহেব সম্ভাবনা সেখানে মোটেই নাই।

আব একটি কাবণ ছিল সেখানে আশ্রয় নিবাব। চম্পাবণ্যেব বাজমন্ত্রী লক্ষ্মণ ভট্টেব পূর্ব পবিচিত। ভট্টেব আশীর্বাদে কিছুদিন আগে তাঁহাব একটি পুত্রসন্তানও জন্মিযাছে। এজন্যে ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইযা বাজমন্ত্রী তাঁহাকে এক পত্রীও দিযাছেন। কাশীব বাস উঠাইয়া দিযা ভট্ট তাই বওনা হইলেন মধ্যপ্রদেশেব দিকে।

সপবিবাবে ঐ স্থানে যাইবাব কালে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে[১] ভট্টেব পত্নী চম্পাবণ্যের প্রান্তে

১ মতান্তবে, অর্থাৎ বল্লভেব পৌত্র যদুনাথজীব সম্প্রদায়েব মতে এই জন্মসাল—১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যান্য পৌত্র এবং শিষ্যগণ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দকেই সমর্থন কবিয়া থাকেন। দ্রঃ শ্রীবল্লভাচার্য (ইং)—ভাই মণিলাল পাবেখ।

এক চম্পকবনে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই ভারত-বিখ্যাত ভক্তিসিদ্ধ সাধক বল্লভাচার্য।

শ্রীভগবানের মাধুর্যতত্ত্বের প্রচার পুষ্টিমার্গীর সাধনা ও শুদ্ধঅদ্বৈতবাদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি নির্মাণ, এই তিনটি মহতী কর্মের মধ্য দিয়া বল্লভ এদেশে অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপেও সারা ভারতে হইয়াছেন তিনি অভিনন্দিত।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণ ভট্ট সংবাদ পাইলেন, মুসলমান সেনা কাশীর দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। সেখানকার সমাজজীবন আবার স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। মঠ-মন্দিরে শোনা যাইতেছে কাঁসর ঘণ্টার মধুর নিক্কণ ও স্তবগুঞ্জন। পূজার্চনায় ভক্ত নরনারী মাতিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে চলিতেছে তীর্থকামীদের স্নান-তর্পণ।

পলায়িত অন্যান্য কাশীবাসীর মতো লক্ষ্মণ ভট্টও সপরিবারে ফিরিয়া আসেন তাঁর প্রিয় তীর্থে। এখানে আসিয়া পূর্ববৎ শুরু করেন, চতুষ্পাঠীর কাজ, বিগ্রহ-সেবা আর সাধনভজন।

পুত্র বল্লভ অষ্টম বয়সে পদার্পণ করিলে ভট্ট তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করান। কিছু-দিন নিজের টোলে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিবার পর প্রেরণ করেন বিষ্ণুচিত্ত নামক এক অধ্যাপকের কাছে।

বালক বল্লভ অতিশয় মেধাবী এবং তীক্ষ্মধী। অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি পুরাণে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া সবাই চমৎকৃত হইয়া যান। অতঃপর কৈশোরে উপনীত হইলে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বল্লভ তিরুম্মল নামক দক্ষিণ দেশীয় এক প্রখ্যাত পণ্ডিতের শরণ নেন।

নারায়ণ দীক্ষিত ছিলেন সমকালীন বারাণসীর অন্যতম দিক্‌পাল পণ্ডিত। ইঁহার কাছেও বল্লভ ভট্ট জটিল দার্শনিক-তত্ত্বের মীমাংসা শ্রবণ করিতেন।

পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট ছিলেন সত্যকার নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক। বালগোপাল বিগ্রহ নিত্য তাঁহার গৃহে পূজিত হইতেন এবং এই বালগোপালের ধ্যান মননের ফলে তাঁহার অশেষ কৃপাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ ভট্ট ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। একদিন পুত্রকে নিজ সকাশে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস বল্লভ, শাস্ত্রচর্চায় তোমার নিষ্ঠা ও কুশলতা দেখে আমি তৃপ্ত। তুমি আমাদের বংশের কৃষ্ণভক্তির শুভ-সংস্কার নিয়ে জন্মেছো। কৃষ্ণ উপাসনায় তুমি আগ্রহী, এটাও আমি সানন্দে লক্ষ্য ক'রে আসছি। এবার তুমি আমার কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্র নাও, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণের সাধনভজন শুরু করো, এই আমি চাই।"

ভক্তিভরে পিতার চরণে প্রণাম জানাইয়া বল্লভ কহিলেন, "এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আমায় আপনি দীক্ষা দিন, আর আশীর্বাদ করুন কৃষ্ণচরণে চিরদিন যেন আমার মতি থাকে, আর কৃষ্ণলাভ যেন আমার হয়।"

কিশোর পুত্রকে লক্ষ্মণ ভট্ট দীক্ষা দিলেন, আর দিলেন বিগ্রহের সমস্ত কিছু সেবা পূজার ভার।

পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন ভট্ট, তারপর কহিলেন, "বৎস, তুমি অসামান্য প্রতিভাধর ছাত্র। বেদ বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় অনেক কিছুই ইতিমধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছো। এবার হতে একনিষ্ঠ হয়ে ভক্তিশাস্ত্রের চর্চা শুরু ক'রে দাও। বর্তমানকালে মাধবেন্দ্র যতি হচ্ছেন বৈষ্ণবশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। তুমি তাঁর কাছ থেকেও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নাও, তারপর নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত ক'রে তোল। আরো একটা কথা শুনে রাখো, আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো।"

"একি মর্মান্তিক কথা বলছেন, পিতা?" কিশোর পুত্র বল্লভের নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠে।

"হ্যাঁ বৎস। আমার জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। এবার স্বাভাবিক নিয়মেই তা হবে নির্বাপিত।" প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন লক্ষ্মণ ভট্ট।

অতঃপর আর বেশী দিন তিনি নরদেহে অবস্থান করেন নাই। পুণ্যময় কাশীধামে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

লক্ষ্মণ ভট্টের মৃত্যুর পর পত্নী বল্লামাগারু দিশাহারা হইয়া পড়েন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সবাই বাস করেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। কাশীতে বাস করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কোনো সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, পুত্র কন্যাদের নিয়া বিজয়নগরে গিয়াই বাস করিবেন। সেখানে তাঁহার এক ভ্রাতা একজন উচ্চ রাজকর্মচারী, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে সন্তানদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান কোনোমতে চলিতে পারিবে। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই বল্লভ ও তাঁহার মাতা সবাইকে নিয়া বিজয়নগরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পরিবারের সবাই স্থায়িভাবে বিজয়নগরে বসবাস করিতে থাকেন বটে, কিন্তু বল্লভ এখানে কয়েক বৎসরের বেশী অবস্থান করেন নাই। তবে এইটুকু সময়ের মধ্যে শাস্ত্রচর্চা, বিশেষত বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নের যে সুযোগ পান তিনি তাহা তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়।

কাশীতে বল্লভ বড় বড় অধ্যাপকের কাছে বেদ বেদান্ত, ষড়দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠের তেমন সুযোগ পান নাই। বিজয়নগরে আসার পর সে সুযোগ মিলিয়া গেল। রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের মতবাদী বহু বৈষ্ণব আচার্যের বাস ছিল এই শহরে। হরিহর ও বুক্কারের রাজধানী ছিল তখনকার দিনে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল। এখানে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদীরা যেমন পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেন, তেমনি পাইতেন বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সব সম্প্রদায়ের সাধক ও আচার্যেরা ভারতের নানা অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া জুটিতেন, শাস্ত্রচর্চা ও তর্ক বিচারের ধুম পড়িয়া যাইত। দর্শন ও শাস্ত্রচর্চার তরুণ ছাত্র বল্লভ এই

পরিবেশে বাস করিয়া অশেষভাবে উপকৃত হইলেন। নিজের জীবনে কিশোর বয়সে পিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব সাধনার দীক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন ও অন্যান্য দর্শনের জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করার অবকাশ তাঁহার নাই। এবার বিজয়নগরের সারস্বত জীবনে সে সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হইল।

রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের মতবাদ দ্বারা এই সময়ে কিছুটা প্রভাবিত হইলেও বেশী পরিমাণে তিনি ঝুঁকিয়া পড়েন বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের দিকে। কিন্তু দার্শনিকতার দিক হইতে বল্লভ ভট্ট বিষ্ণুস্বামীকে অনুসরণ করেন নাই, বরং নিজস্ব শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদকেই করিয়াছেন প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষণীয় যে, বল্লভাচার্য তাঁহার নিজের কোনো গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায় প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বরং ভাগবত পুরাণের টীকায় নিজের ব্যাখ্যাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন।[১]

কয়েক বৎসরের মধ্যেই বল্লভ ভট্ট বৈষ্ণবশাস্ত্রের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহার সৌম্য সুন্দর মূর্তি, ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভক্তিবাদের মধুর ব্যাখ্যানে বহু নরনারী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ধীরে ধীরে এই তরুণ আচার্যকে কেন্দ্র করিয়া একটি কৃষ্ণভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠে।

উত্তর ভারতের নানা তীর্থে, বিশেষ করিয়া কাশী, প্রয়াগ, ব্রজমণ্ডল, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে বল্লভ ভট্ট কয়েকবার পরিব্রাজন করেন, বিস্তারিত করেন তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি।

দক্ষিণী বৈষ্ণব তীর্থসমূহ পুরী, তিরুপতি, শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চী, মাদুরাই প্রভৃতি বল্লভ ভট্ট একাধিকবার দর্শন করিয়া বেড়ান। ভক্তিবাদী শাস্ত্রবিদ্ ও কৃষ্ণউপাসকরূপে এই নবীন আচার্যের খ্যাতি তখন চারিদিকে। এই সময়ে, বিশ বৎসর বয়সে বল্লভ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাশীর দক্ষিণী-পণ্ডিত দেব ভট্টের কন্যা মহালক্ষ্মী দেবীকে তিনি গ্রহণ করেন ধর্মপত্নীরূপে।

বিবাহের পর ছয়মাস বল্লভ কাশীধামে অবস্থান করেন, তারপর পূর্ব অভ্যাস মতো আবার বাহির হইয়া পড়েন পরিব্রাজন ও তীর্থপরিক্রমায়।

কুশলী শাস্ত্রবিদ্ ও তর্কযোদ্ধা ছিলেন বল্লভ ভট্ট, আবার মাধুর্যময় ভগবৎ-সাধনার উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। এই আস্থা ক্রমে আরো দৃঢ় হইয়া উঠে এবং পূর্বসূরী বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বের বৈষ্ণবীয় মতবাদের কিছুটা বর্জন ও কিছুটা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব এক বৈষ্ণববাদ তিনি গড়িয়া তোলেন।

এই মতবাদের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে নবীন তাত্ত্বিক বল্লভ ভট্টের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি ছিল না। দূর দূরান্তের মঠে মন্দিরে, রাজসভা বা বিদ্বানমণ্ডলীতে যখন

---

১ অনেকের ধারণা বিষ্ণুস্বামী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণববাদের প্রবর্তক। আর বল্লভাচার্য তাঁহার মতবাদের পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। এই ধারণার মূলে কোনো ভিত্তি নাই।

যেখানে শাস্ত্রবিচার বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হইত সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন। নিজস্ব ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্থাপনে উৎসাহী হইয়া উঠিতেন।

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ। নূতন হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের বিজয়কেতন তখন সগর্বে উড্ডীন রহিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের প্রতাপ ও যশ-সৌরভ তখন শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। রাজধানী বিদ্যানগরে মহারাজ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছেন। কৃষ্ণদেব নিজে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু তাঁহার পূর্বগামী রাজারা, হরিহর ও বুক্করায়, ছিলেন শৃঙ্গেরী মঠের অদ্বৈতবেদান্তী বীর সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের শিষ্য। সামন্তরাজদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন শ্রীবৈষ্ণব আচার্যদের দ্বারা দীক্ষিত। কাজেই কৃষ্ণদেবের ধর্মসভায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। দল মত নির্বিশেষে সকল শাস্ত্রবিদ্ ও সাধুসন্তকে তিনি আহ্বান জানাইতেন, ধর্মীয় আলোচনা ও বিচারের মধ্য দিয়া জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেন সত্যের আদর্শ ও নিহিতার্থ।

এই সময়ে বিদ্যানগরে ছয়মাসব্যাপী এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। উত্তর ভারতে কাশীর পণ্ডিত মহলেও এ সংবাদ পৌঁছে। নবীন আচার্য বল্লভ ভট্ট এই সভায় যোগদানের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। প্রভাবশালী শিষ্যেরা তাঁহার যাত্রার সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে চলিল কয়েকজন ভক্ত ও সেবক, আর রহিল পবিত্র শালগ্রাম শিলা, শ্রীমুকুন্দ বিগ্রহ এবং পবিত্র ভাগবত।

দক্ষিণের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ অবশেষে বিজয়নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই রাজধানীতে পূর্বে তিনি বাস করিয়াছেন, উচ্চতর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহারাজার দানশালার অধ্যক্ষ সম্পর্কে তাঁহার মাতুল। এই মাতুলের গৃহেই দলবল নিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন বল্লভ ভট্ট।

কৃষ্ণদেব রায় তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। শৌর্যে বীর্যে, ধনৈশ্বর্যে ও দাক্ষিণ্যে তাঁহার তুলনীয় তখন কেহ নাই।

এই হিন্দু রাজার সামরিক শক্তি গৌরব সম্পর্কে সিউএল লিখিয়াছেন, "নুনেজ ছিলেন বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের (অভ্যুদয় ষোড়শ শতক ১৫০৯-৩০) সমকালীন ঐতিহাসিক, তিনি সুস্পষ্ট লিখেছেন,—রায়চুড় দখলের যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতলক্ষ তিন হাজার পদাতিক সেনা। বত্রিশ হাজার ছয়শত অশ্ব এবং পাঁচশত একান্নটি সুশিক্ষিত হস্তী।[১]

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ বেংকটরমনাইয়া বিজয়নগর-রাজের বিদ্যোৎসাহ এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

---

১ সিউএল : এ ফরগটন্ এম্পায়ার

২ ডঃ রমেশ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত : হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল্ (ভল্যু ৬, দিল্লী, সুলতানেট্)

"কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিদ্যাবত্তার এক মহান্ পৃষ্ঠপোষক, তাঁর এই খ্যাতি সুপ্রচারিত ছিল দেশের দূরদূরান্তে। উৎসাহী জনসাধারণ তাঁর নামকরণ করেছিল—অন্ধ্র ভোজরাজ। আর তাঁর এই নামকরণের সঙ্গে সংগতি রেখে তিনিও উদার দাক্ষিণ্য-ভরে মর্যাদা ও অর্থ দান করতেন তাঁর রাজসভায় সমাগত প্রখ্যাত পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের। সংস্কৃত ও অন্যান্য সকল ভাষার লেখকদের সদাই তিনি পুরস্কৃত করতেন, কিন্তু তার বদান্য হস্ত সদা উন্মুখ থাকতো বিশেষভাবে তাঁর অন্ধ্রদেশের তেলুগু ভাষী লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবার জন্য। এর ফলে তাঁর সময়ে তেলুগু সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল। রাজা সালুভ নরসিংহম্-এর সময় থেকে তেলুগু সাহিত্যের যে উন্নতি শুরু হয়েছিল, তা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন কৃতী কবি—অমুক্তমাল্যদ নামক কাব্যগ্রন্থ তাঁরই রচিত। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভার এক বড় বৈশিষ্ট্য তাঁহার 'অষ্টদিগ্‌গজ' মণ্ডলী। আটজন শীর্ষস্থানীয় কবি-সদস্য সগৌরবে বিরাজ করতেন এই মণ্ডলীতে।"

সারা ভারতের দার্শনিক, ধর্মনেতা, সাহিত্যিক প্রভৃতি দ্বারা অলংকৃত ছিল বিজয়-নগরের রাজসভা। আচার্য বল্লভ ভট্ট তাঁহার ভক্তিবাদী-দার্শনিক মতবাদ এই সভায় উপস্থাপিত করিলেন। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল তাঁহার তর্কযুদ্ধ। ব্যক্তিত্বের প্রখরতা, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এবং বৈষ্ণব দর্শনের পারঙ্গমতায় বল্লভের তুল্য ব্যক্তি তৎকালে কমই ছিল। ফলে রাজসভায় তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তত্ত্ববিচারে উৎসাহী, ধর্মপরায়ণ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নবীন আচার্যকে খুশী করিলেন প্রচুর সম্মান ও অর্থাদি দিয়া।

বল্লভ-দিগ্বিজয়ম্-এ এবং ভক্তমালে লেখা আছে, আচার্য বল্লভ এসময়ে বিজয়নগর রাজসভার পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন এবং সেখানকার বৈষ্ণব আচার্যের পদে বৃত হন।

বল্লভ দিগ্বিজয়ম্ গ্রন্থের এই উক্তি তেমন যুক্তিসহ নয়।[১] কারণ, বিজয়নগরের রাজসভায় তৎকালে আসিয়া জড়ো হইয়াছেন সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং প্রবীণ দার্শনিক ও ধর্মাচার্যের দল। বিশেষত ভারতবিশ্রুত অদ্বৈতবেদান্তী অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা রঙ্গরাজাধ্বরি এবং পিতামহ অচ্চান দীক্ষিত তখনো জীবিত। শুধু জীবিতই নন, তাঁহারা বরেণ্য সভাপণ্ডিত এবং রাজা ও সামন্তদের কাছে তাঁহারা অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী।

সর্বোপরি কথা, অচ্চান দীক্ষিতকে কৃষ্ণদেব রায় দেবমানব জ্ঞানে পূজা করিতেন। সুকবি ও সুপণ্ডিত অচ্চানকে রাজা ভক্তিভরে নাম দিয়াছিলেন—বক্ষস্থল আচার্য। এই নামকরণের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি মনোরম কাহিনী।

---

১ বল্লভ দিগ্বিজয়ম্-এর রচনা বল্লভ ভট্টের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা একথা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে বহু অলীক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে।

সেবার এক যুদ্ধ জয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার প্রিয় রাজমহিষীকে সঙ্গে নিয়া কাঞ্চীতে তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছেন। কাঞ্চীর নিকটস্থ অড়য়প্পন পল্লীতে রাজপণ্ডিত অচ্চান দীক্ষিতের বাস। রাজা রানী ভক্তিভরে শ্রীবরদরাজের পূজা সম্পন্ন করিতে আসিয়াছেন, তাই পণ্ডিতবর অচ্চানও সেদিন সেখানে উপস্থিত।

রানী সৌন্দর্যে যেমন অতুলনীয়া, আবার তেমনি ভক্তিপরায়ণা। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রভু বরদরাজের চরণে বার বার তিনি পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, এমন সময়ে রানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবাবিষ্ট রাজপণ্ডিত অচ্চান রচনা করিলেন একটি অপরূপ শ্লোক।[১] এই শ্লোকের মর্মার্থ ঃ কাঞ্চনবর্ণা লক্ষ্মীসদৃশা এক রমণীকে তাঁর নয়নসমক্ষে আবির্ভূতা দেখে সংশয় জেগে উঠলো প্রভু শ্রীবরদরাজের মনে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন নিজের বক্ষস্থলে, লক্ষ্মী সেখানে বিরাজিত রয়েছেন তো?

রানী লক্ষ্মীর মতোই দিব্য সৌন্দর্যের অধিকারিণী—শ্লোকটিতে রহিয়াছে এই তত্ত্বেরই আভাস। অপূর্ব কাব্যরসাশ্রিত এই শ্লোক শুনিয়া রাজা কৃষ্ণদেব আনন্দে উৎফুল্ল। তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধেয় রাজপণ্ডিতকে পুরস্কৃত করিলেন, দান করলেন এক নূতন উপাধি—বক্ষস্থল-আচার্য। প্রভু বরদরাজের-বক্ষলগ্না লক্ষ্মীদেবীর তত্ত্বকে আচার্য আভাসিত করিয়াছেন তাঁহার অনুপম ঐ শ্লোকে, তাই রাজার আনন্দের যেন অবধি নাই।

অচ্চান দীক্ষিত রঙ্গরাজাধ্বরি ছাড়া আরো বহু কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী বিজয়নগরে সগৌরবে বাস করিতেন। তাছাড়া, সেখানে রামানুজী এবং মাধ্ব দার্শনিক ও সাধক যেমন প্রচুর সংখ্যায় বাস করিতেন, তেমনি ছিলেন ন্যায় ও সাংখ্যমতবাদী পণ্ডিতবর্গ। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া তরুণ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট তর্কযুদ্ধে জয়ী হন এবং তাঁহার প্রেমভক্তি রসাশ্রিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, একথা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়।[২] তবে বল্লভ যে নিজের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বলে রাজসভায় পুরস্কার ও অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যায়।

বিজয়নগরের বিদ্যাবিতর্কের পরিবেশে কিছুদিন অতিবাহিত করার পরে বল্লভ ভট্ট শিষ্যগণসহ উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে পুণ্যতোয়া শিপ্রানদীর তটে কিছুকাল অবস্থান করিয়া নিজস্ব ভক্তিবাদ তিনি প্রচার করেন। এই স্থানটি তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের কাছে বৈঠক নামে পরিচিত। আচার্য এখানে উপদেশ দান ও তত্ত্বালোচনায় ব্রতী হন, তাই তাঁহাদের চোখে এ স্থানটি অতি পবিত্র ও দর্শনীয়।

উত্তর ভারতে চুনারের কাছেও আচার্য এমনি আরেকটি বৈঠক স্থাপন করেন এবং এই প্রচার কেন্দ্রে বসিয়া বহু নরনারীকে তিনি তাঁহার ভক্তিপথের সন্ধান জ্ঞাপন করেন। এ স্থানের একটি প্রাচীন মঠ এবং আচার্যকূঁয়া এখনো বল্লভ ভট্টের পুরাতন স্মৃতির সংবাহকরূপে দণ্ডায়মান।

---

১ কাঞ্চিং কাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বীক্ষ্য সাক্ষাদিবশ্রিয়ম্।
বরদঃ সংশয়াপন্নো বক্ষস্থল মবৈক্ষতঃ॥

২ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ঃ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

ত্রিবেণী অঞ্চলে এক সময়ে বহু নরনারী বল্লভের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাদের অনুরোধে পবিত্র সঙ্গমের নিকটে আড়েল নামক গ্রামে আসিয়া তিনি সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

দুইটি প্রধান সংকল্প সাধনের জন্য বল্লভ ভট্ট এতকাল ধরিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন। প্রথমত শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া নিজস্ব শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ তিনি স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয়ত শ্রীশ্রীবালগোপালের উপাসনার এক প্রকৃষ্ট প্রণালী তিনি প্রবর্তন করিবেন। ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব নরনারীর কাছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে দার্শনিক মহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দরকার। তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে সাধারণ মানুষ তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে আসিবে কেন? তাই স্থির করিলেন, প্রচুর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য তিনি রচনা করিবেন। আর করিবেন শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিরসাশ্রিত একটি নিজস্ব টীকা রচনা। এই দুইটি কর্মকে বল্লভ ভট্ট জ্ঞান করিতেন ঈশ্বরীয় কর্ম বলিয়া তাই অচিরে এই দুরূহ ব্রত সাধনে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন।

আড়েলের নিভৃত পরিবেশে বসিয়া আচার্য তাঁহার শাস্ত্র ভাষ্য রচনায় ব্যাপৃত, এমন সময়ে অনতিদূরে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন এক নবীন সন্ন্যাসী। যেমন তাঁহার নয়ন-ভোলানো দিব্যরূপ তেমনি তাঁহার কীর্তনের মোহিনী শক্তি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া এই প্রেমিকপুরুষ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন, হাজার হাজার ভক্ত নরনারী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরে, হরিনামে সবাই উন্মত্ত হইয়া উঠেন।

সন্ন্যাসী যখন ভাবাবেশে অচেতন হইয়া পড়েন তখন দেখা যায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার জাগিয়া উঠে তাঁহার সারা দেহে। কৃষ্ণার্তি আর কৃষ্ণরতির এই বৈভব দেখিয়া জনসাধারণ মুগ্ধ হয়, প্রেমে উদ্বেল হয়। ঘন ঘন শোনা যায় হরিধ্বনি, আর প্রেমিক সন্ন্যাসীর জয়গানে আকাশ বাতাস হয় মুখরিত।

প্রয়াগে সন্ন্যাসীর এই অপরূপ প্রেমভক্তির কথা, সম্মোহনকারী উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তনের কথা, বল্লভ ভট্ট লোকমুখে শুনিয়াছেন। একদিন শিষ্যগণসহ প্রেমিক-সন্ন্যাসীটিকে দর্শন করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন, নাম তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পরম ভাগবত মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়াছেন, আর সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়াছেন কেশব ভারতী।

ত্রিবেণীর তীরে এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীচৈতন্য তখন অবস্থান করিতেছেন। গৌড় বাদশাহের কোষাধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিয়া মুমুক্ষু রূপ তখন প্রয়াগে আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন তাঁহার চরণতলে। সঙ্গে আছেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ দেব। দুই ভাই প্রভুর সম্মুখে দৈন্যভরে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভুকে দর্শন করিতেছেন আর ভাবসিন্ধু হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছে, নয়নের নীরে ভিজিয়া নিরন্তর জপিয়া চলিয়াছেন কৃষ্ণনাম।

শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পর বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান, "সন্ন্যাসীবর, একবার আড়েল গ্রামে আমার গৃহে পদধূলি দিন, সেখানেই গ্রহণ করুন বালগোপালজীর ভোগ প্রসাদ।"

সানন্দে সম্মতি দিলেন শ্রীচৈতন্য। সম্মুখে দণ্ডায়মান দুই দীন বৈষ্ণব রূপ ও তাহার অনুজের সঙ্গে ভট্টজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। কহিলেন, "ভট্টজী, এরা আমার পরম স্নেহের পাত্র। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে, ধনৈশ্বর্য ও রাজপদ ছেড়ে এরা আমার এখানে ছুটে এসেছেন। এরা দু'জনেও যাবেন আমার সঙ্গে, প্রসাদ পাবেন আপনার গৃহে।"

বল্লভ ভট্ট মহা আনন্দিত। দুই বাহু প্রসারণ করিয়া রূপকে আলিঙ্গন দিতে গিয়াছেন, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টজী, আপনি দূরে থাকুন, আমাদের দু'ভাইকে যেন স্পর্শ করবেন না। আমরা অস্পৃশ্য অতি দুরাচার।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য কপট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ভট্টজী, ওরা হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। ওরা হীন জাতি, আর আপনি হচ্ছেন উচ্চ বর্ণের যজ্ঞবিদ্ বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান। তাছাড়া, আচার্য হিসাবেও আপনি বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন। তবে, ওদের সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্যই বলতে পারি, ওরা দু'ভাই নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছে, আর ভাগ্যবলে আমি তা শুনে তৃপ্ত হচ্ছি।"

ভট্ট স্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন, "যতিবর, তা হলে আপনি এদের অধম বা হীন বলছেন কি ক'রে? যাদের মুখ থেকে সদাই ঝরে পড়ছে কৃষ্ণনামের সুধা, তারা যে সর্বোত্তম।"

প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীদের নিয়া ভট্ট নৌকায় উঠিয়াছেন, গৃহে নিয়া তাঁহাদের ভোজন করাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণনামরসে উন্মত্তপ্রায় প্রভুকে নিয়া বড় বিপদে পড়া গেল।

শ্রীচৈতন্য এসময়কার ভাববিকারের চিত্রটি ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে অমর হইয়া আছে:

যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হুংকার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥
ব্যস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥
যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হইল মন।
দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥
দেশ কাল পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য হইল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল॥

ভযে ভট্ট সঙ্গে বাহি মধ্যাহ্ন কবাইযা।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি কবিল প্রভুব পাদ প্রক্ষালন॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধবিল।
নূতন কৌপীন বহির্বাস পবাইল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্যেব মান্য কবি পাক কবাইল॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোসাঞি দুই ভাইব কবাইল ভোজনে॥ (চৈ-চবিতামৃত)

'দুর্বাব উদ্ভট' এই কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণার্তিব এই বিচিত্র প্রকাশ সেদিন আচার্য বল্লভ ভট্টের হৃদযমূলে নাড়া দেয, তাঁহাকে প্রভাবিত কবে অশেষভাবে।

প্রসাদান্ন ভোজনেব শেষে শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম কবিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে ত্রিহুতেব পবম বৈষ্ণব পণ্ডিত বঘুপতি উপাধ্যায আসিযা উপস্থিত।

প্রভুব চবণ বন্দনা কবাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব উপব আদেশ হইল, "উপাধ্যায়, কৃষ্ণ যখন কৃপা ক'বে তোমায এখানে এনে দিয়েছেন তো তোমাব বচিত কৃষ্ণের বর্ণনা আমায় শোনাও, এ জীবন সার্থক কবি।"

কৃষ্ণলীলাব সুমধুব শ্লোক বচনা কবিযাছেন বঘুপতি উপাধ্যায। সানন্দে প্রভুকে তাহা শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকেব মর্ম·

সংসাব ভযে ভীত হয়েছেন যাঁবা তাঁবা কেউ বা শ্রুতি, কেউ বা স্মৃতি, আব কেউ বা মহাভাবতেব উপদেশ অনুসারে চলতে থাকুন। এ কিন্তু একান্ত মনে বন্দনা জানাই নন্দকে, যাঁব অলিন্দে বাঁধা বযেছেন স্বয়ং পবব্রহ্ম!

প্রভু প্রেমেব উচ্ছ্বাসে উদ্বেল। গদ্‌গদ স্ববে কহিলেন, "ধন্য ধন্য তুমি উপাধ্যায়। কি পরম তৃপ্তিকব শ্লোক আমায় আজ শোনালে। উপাধ্যায, আবো, আবো লীলাকথা আমায শোনাও।" বলিতে বলিতে প্রভুব সাবা দেহে জাগিযা উঠিল সাত্ত্বিক প্রেমবিকাব। প্রেমের এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দেখিযা রঘুপতি উপাধ্যায় তো বিস্মযে হতবাক্‌। বল্লভ ভট্টও কৃষ্ণরতিব এই প্রকাশ ও ভাবশাবল্য দেখিযা নির্নিমেষে শ্রীচৈতন্যেব দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ উন্মাদনা তো কত বৈষ্ণব আসবেই দেখি—কিন্তু এমন দেবদুর্লভ তো কোথাও দেখি নাই·

একটু স্থিব হইযা উপাধ্যায়েব মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন শুরু কবিলেন :

প্রভু কহে উপাধ্যায শ্রেষ্ঠ মান কায।
'শ্যামমেব পবং রূপং' কহে উপাধ্যায॥

শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায।
'বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায।
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ স্বরে॥

প্রভু শ্রীচৈতন্যের মুখে এবার উচ্চারিত হইল তাঁহার ধ্যেয় পরমবস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব :

শ্যামমেব পরং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

বল্লভ ভট্টের উপাস্য বালগোপাল সন্ন্যাসীর মুখে ব্রজকিশোর নটবর কৃষ্ণের মাধুর্য ও শৃঙ্গার রসের প্রশস্তি শুনিয়া তিনি তখন চমৎকৃত, আত্মবিস্মৃত।

এ সময়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য আনন্দ-ধারা উথলিয়া উঠিল বল্লভ ভট্টের দেহে-মনে। ভাববিহ্বল হইয়া তিনিও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যের দিব্য মূর্তি ও প্রেমোচ্ছ্বাস ইতিমধ্যে সারা গ্রামের লোককে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। বল্লভ ভট্টের গৃহে বসিয়া গিয়াছে আনন্দের হাট। অনেকেই চাহিতেছেন, এই আনন্দঘন প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী আরো কয়েকদিন এখানে অবস্থান করুন, তাঁহাদের গৃহে কৃপা করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

বল্লভ ভট্ট প্রমাদ গণিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথি, ইঁহার রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহারই। প্রেমোন্মত্ত হইয়া কখন কোথায় তিনি পড়িয়া যান, যমুনার জলে কখন ঝাঁপ দেন, তাহার কোনো স্থিরতা নাই। ভক্ত সবাইকে সানুনয়ে কহিলেন, "সন্ন্যাসীকে আগে আমি তাঁর প্রয়াগের আবাসে ফিরিয়ে দিয়ে আসি, নিশ্চিন্ত হই, তারপর তোমরা সেখানে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ দাও।"

সেই দিনই তাড়াতাড়ি শ্রীচৈতন্যকে নিয়া ভক্ত প্রয়াগে উপস্থিত হন, তাঁহাকে স্বস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

আড়েল গ্রামে এক সাধারণ গৃহস্থ ও ভক্তিশাস্ত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করিতেন বল্লভাচার্য। গ্রামে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। ইঁহাদের সম্মুখে প্রতিদিন তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করিতেন, তাঁহার নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী করিতেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নূতন একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা তাঁহার মনে দীর্ঘদিন যাবৎ জাগিয়া আছে। ঐ ইচ্ছাকে রূপায়িত করার প্রস্তুতি পর্ব এবার অগ্রসর হয়।

তীর্থ দর্শন ও পরিব্রাজনে বল্লভ ভট্ট ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। সুযোগ পাইলেই

ভক্তবৃন্দসহ তিনি বৈষ্ণব তীর্থগুলি দর্শন করিতেন, বিভিন্ন পন্থী বৈষ্ণব আচার্য ও সাধকের জীবন সাধনা এবং দার্শনিকতার তাৎপর্য অনুধাবন করিতেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি তিনি কয়েকবার দর্শন করেন এবং সে সব স্থানের অভিজ্ঞতা ও সাধুসন্তদের অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে নিজের মতবাদকে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন।

নানা স্থানে পরিব্রাজন করিতে করিতে বল্লভ ভট্ট সেবার মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে আসিয়াছেন। এখানকার বিঠোবা মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার মানসিকতা ও জীবনদর্শনে এক নব রূপান্তর ঘটিয়া গেল।

পান্ধারপুরের বিঠ্‌ঠলজী এক জাগ্রত বিগ্রহ। এই বিগ্রহের আবির্ভাবরহস্য প্রাচীন সাধকদের মুখে শ্রবণ করেন বল্লভ ভট্ট।

প্রাচীনকালে পাণ্ডুরঙ্গ নামে এক যুবক ব্রাহ্মণ পান্ধারপুরে বাস করিত। একদিন শোনা গেল, একদল তীর্থকামী ভক্ত গঙ্গাতীরে কাশীধামে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে। পাণ্ডুরঙ্গ এই দলের সহিত ভিড়িয়া যায়।

আসলে ধর্মলাভ বা পুণ্যসঞ্চয়ের কোনো ইচ্ছা তাহার নাই, তীর্থচারীদের দলে আসিয়া জুটিয়াছে তাহার কুকার্য সিদ্ধির জন্য। সে জানে, দূরগামী সব যাত্রীর সঙ্গেই যথেষ্ট টাকাকড়ি থাকে, তাই মনে মনে অভিসন্ধি আঁটিল, পথে কোনো সুযোগে ঐ টাকাকড়ি সে অপহরণ করিবে।

যাত্রিদল কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাত্রে এক জায়গায় বিশ্রাম নিতেছে, এ সময়ে পাণ্ডুরঙ্গ সেখান হইতে সরিয়া পড়ে, নিকটস্থ এক অরণ্যে করে আত্মগোপন। উদ্দেশ্য, রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে হঠাৎ সে মারণাস্ত্র নিয়া তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করিবে, উধাও হইবে টাকাকড়ি ছিনাইয়া নিয়া। সঙ্গীরা ভাবিবে, স্থানীয় কোনো ডাকাত তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নিল।

ঘন অরণ্যের এক পাশে পাণ্ডুরঙ্গ লুকাইয়া আছে। হঠাৎ দেখা গেল সুবেশ-ধারিণী দুই রমণী বনপথ দিয়া সেদিকে আসিতেছে। হাতে তাহাদের জ্বলন্ত মশাল, আর মাথায় একটি করিয়া সুদৃশ্য মৃৎভাণ্ড।

পাণ্ডুরঙ্গ বড় কৌতূহলী হইয়া উঠে। এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া দুইটি নারী কোথায় চলিয়াছে?

সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করে, "তোমরা কে গো? এসময়ে এপথ দিয়ে কোথায় চলেছো? মাথায়ই বা কি বয়ে নিয়ে চলেছো?"

প্রথমা রমণী উত্তর দেয়, আমরা যে রোজই এসময়ে এ বনপথ দিয়ে যাইগো। আমার নাম গঙ্গা, আর আমার সঙ্গিনী—যমুনা। আমাদের যেতে হয় পান্ধারপুরে। সেখানে এক ভক্তসিদ্ধ ব্রাহ্মণতনয় রয়েছেন, তাঁকে এই দু ভাঁড় জল দিয়ে আসতে হয়।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে পাণ্ডুরঙ্গ।

"সে যে মহাপুণ্যবান্ গো। সারা জীবন ধরে একনিষ্ঠ হয়ে তার বৃদ্ধ বাবা-মার সেবায় প্রাণপাত করছে। শ্রীভগবান্‌কে জানিয়ে দিয়েছে, তীর্থস্নানে যাবার অবসর নেই, পিতামাতার চরণই তাঁর কাছে সর্বতীর্থের তুল্য। শ্রীভগবান্‌ও মেনে নিয়েছেন ভক্তের

এই সংকল্প। আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে, ব্রাহ্মণ তনয়কে আমরা যেন প্রতি রাতে দু'ভাঁড় ক'রে গঙ্গা যমুনার পুণ্যবারি পৌঁছে দিয়ে আসি। তাই তো রোজ আমাদের এই জল বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

"পিতামাতার সেবা কি এমনিতর পুণ্যকর্ম ? এমনি সর্বসিদ্ধিপ্রদ ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে পাণ্ডুরঙ্গ।

"হ্যাঁ গো তাই। রাম অবতারে ভগবান্ নিজেই তো তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন চোখে আঙুল দিয়ে। বাপ মায়ের সেবাতেই শ্রীভগবান্ তুষ্ট হন, সফল করেন সব অভীষ্ট।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে গঙ্গা যমুনা রূপিণী নারীদ্বয় বনের ভিতরে ঢুকিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

দৈবী উপদেশের ফল ফলিতে দেরি হয় নাই। পাণ্ডুরঙ্গের জীবনে ঘটিয়া যায় এক অভাবনীয় পট পরিবর্তন। এতকালের পাষণ্ডী এবার রূপান্তরিত হয় পরম ভক্তিমান্ পুত্ররূপে।

সেই রাত্রেই পান্ধারপুরে সে ফিরিয়া আসে। অনুশোচনার তীব্র দহন চলিতে থাকে তাহার অন্তরে। পিতা মাতার কোনো সেবা করা দূরে থাকুক, সারা জীবন সে তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়াছে, চৌর্য দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কোনো পাপানুষ্ঠানই সে বাকী রাখে নাই, নিজের জীবনকে নিক্ষেপ করিয়াছে নরকের কুণ্ডে।

এবার হইতে পরম নিষ্ঠাভরে পিতামাতার সেবায় সে ব্রতী হয়। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতামাতাই সর্ব দেবদেবীর মূর্ত বিগ্রহ, তাঁহাদের চরণেই সব তীর্থের পুণ্যফল।

বারো বৎসর ধরিয়া চলে তাঁহার এই একনিষ্ঠ তপস্যা। তারপর নয়নসমক্ষে উন্মোচিত হয় দিব্য চৈতন্যের আলো। এই আলোর সরণি বাহিয়া একদিন পাণ্ডুরঙ্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান প্রভু নারায়ণ। কুটির দুয়ারে আসিয়া করেন করাঘাত।

পাণ্ডুরঙ্গ তখন নিবিষ্ট মনে পিতৃদেবের পাদ সম্বাহন করিতেছেন। একটি হাত সেবাকার্যে লিপ্ত রাখিয়া অপর হাতে কুটিরের দ্বার কিছুটা উন্মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমি দুঃখিত, আপনাকে যে কিছুকাল বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। পিতা আপনারই মূর্ত বিগ্রহ, তাঁর চরণসেবা এখনও শেষ হয় নি। শেষ হলেই আপনার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবো, জ্ঞাপন করবো যথাযোগ্য সংবর্ধনা।"

স্নিগ্ধ মধুর হাসি ছড়াইয়া নারায়ণ তাঁহার প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, "বৎস পাণ্ডুরঙ্গ, তুমি তোমার সেবাকর্ম আগে শেষ করো, আমি বাইরেই তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।"

পাদ সম্বাহন শেষ হইলে পাণ্ডুরঙ্গ কুটিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর শুরু করেন প্রভুর স্তুতিগান, দুই কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে আনন্দাশ্রু।

প্রভু নারায়ণ প্রেমভরে কহেন, "পাণ্ডুরঙ্গ পিতৃসেবা আর ঈশ্বর-সেবাকে একীভূত ক'রে তুমি তপস্যার যে মহান্ পথ দেখিয়েছো, তা আমার ভক্তদের পথ দেখাবে চিরকাল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন। বল, তুমি কি বর চাও।"

করজোড়ে নিবেদন করেন পাণ্ডুরঙ্গ, "প্রভু, যদি বর দিতে চাও, তবে আমার এই

পিতৃসেবার ধর্মকেই তুমি জীবন্ত ক'রে রাখো। আমার এই সেবা-তপস্যার ফলস্বরূপ তুমি চির আবির্ভূত থাকো আমার গৃহে। আর তোমার শ্রীবিগ্রহ ধারণ করুক আমার মতো দীন পিতৃভক্ত পাণ্ডুরঙ্গেরই নাম।"

সানন্দে প্রভু কহিলেন, "তথাস্তু।"

সেইদিন হইতে পান্ধারপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রভুর শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার নামকরণ হয়—পাণ্ডুরঙ্গ বিঠ্‌ঠলনাথ।

বিঠ্‌ঠলনাথজীর এই লীলাকাহিনী আচার্য বল্লভ ভট্টের জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। গার্হস্থ্য জীবনকে দিব্য জীবনে, কৃষ্ণময় জীবনে পরিণত করা—এই তত্ত্বকেই তিনি তাঁহার সাধনজীবন ও দার্শনিকতায় আঁকড়াইয়া ধরেন।

জনশ্রুতি আছে, পান্ধারপুরে অবস্থান করার কালে বল্লভ ভট্ট বিঠ্‌ঠলনাথজীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন—"এবার বিবাহ ক'রে তোমায় সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে হবে, সংসারকে ক'রে তুলতে হবে শ্রীভগবানের সংসার।"

বিবাহের পর বল্লভ কিছুদিন কাশীধামে বাস করেন। ভাগবতের নূতনতর ব্যাখ্যা এবং তাঁহার নিজস্ব ভক্তিবাদ এসময়ে বহু লোককে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই সব ভক্তদের মিলনে বল্লভ ভট্টের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠে।

কিন্তু বল্লভের প্রচারিত বৈষ্ণবীয় মতবাদ কাশীর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মনঃপূত হয় নাই। নানাভাবে তাঁহারা এই নূতন মতবাদী আচার্যদের বিরোধিতা করিতে থাকেন।

বল্লভ বুঝিলেন, আর বেশীদিন তাঁহার কাশীধামে থাকা সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়েল গ্রামের কয়েকটি ভক্ত গৃহস্থ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের আমন্ত্রণে বল্লভ ভট্ট স্থায়িভাবে সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এসময়ে তাঁহার আচার্যজীবনের প্রধান কাজ ছিল প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভাগবত পুরাণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং ভাগবতের একটি নূতন টীকা রচনা করা। এই টীকাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সুবোধিনী টীকা। কালক্রমে ইহাই পরিণত হয় তাঁহার সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তিরূপে।

ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের জন্য বল্লভ ভট্ট আড়েল হইতে প্রায়ই বাহির হইয়া পড়িতেন। বিশেষ করিয়া ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলগুলিই এ সময়ে হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার জীবনের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু।

সে-বার বল্লভ ভট্ট কয়েকজন ভক্তসহ গোবর্ধন পরিক্রম করিতে আসিয়াছেন। এখানে আসার পর দৈবযোগে এমন এক ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহা বল্লভ ভট্টের সাধনজীবন ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।

এবারকার তীর্থ পরিক্রমাকালে বল্লভ ভট্ট গোবর্ধননাথজীর শ্রীবিগ্রহের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এবং এই শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার সুবিধার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বল্লভ সম্প্রদায়ের মতে, দেববিগ্রহ দেবতারই স্বরূপ, এবং এই স্বরূপের সেবা ও

অর্চনার মধ্য দিয়াই ভক্ত সাধকেরা কৃষ্ণের কৃপা ও সাযুজ্য লাভ করেন। ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখা যায়, গোবর্ধননাথজীর প্রাকট্য ও সেবার্চনার পর হইতে বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ধর্ম-জীবনে ইহা এক বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া বসে।

গোবর্ধননাথজীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁহার এক অত্যাশ্চর্য দৈবীলীলার মাধ্যমে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আজিও এ সম্পর্কে এক জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে।

গোবর্ধননাথের মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। দিব্য লাবণ্যে মণ্ডিত এই অপরূপ মূর্তির দক্ষিণ হাতটি বরাভয় দানের ভঙ্গিতে উত্তোলিত। দেবরাজ ইন্দ্রের রোষ হইতে ব্রজবাসীদের বাঁচানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত দ্বারা অবলীলায় গিরিগোবর্ধনকে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ধ্বংসকর বর্ষণ ও বজ্রের হাত হইতে গোপ-গোপীরা রক্ষা পাইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবেরা মনে করেন, গোবর্ধননাথজীর হস্ত উত্তোলনের মধ্যে ভক্ত-সংরক্ষণের সেই চিহ্নটি প্রকটিত।

জনশ্রুতি আছে, গিরিগোবর্ধনের গাত্র ভেদ করিয়া প্রথমে এই শিলাময় শ্রীবিগ্রহের একটি হস্ত প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমে শিলা-শরীরের অন্যান্য অংশ দৃশ্যমান হয়।

গোবর্ধন পাহাড়ের আড়ালে এই মূর্তি দীর্ঘকাল পড়িয়াছিল। নিকটেই আনিওরা গ্রাম। এই গ্রামের মানেকচাঁদ ও সদু পাণ্ডে নামক দুই ভক্তিমান্ গোয়ালা বাস করিত। ইহাদের একটি গাভী প্রতিদিন গোপনে আসিয়া নব প্রকাশিত বিগ্রহের মাথার কাছে দাঁড়াইত এবং কিছুটা পরিমাণ দুগ্ধ বাঁট হইতে ক্ষরিত হইলে নিজের গোয়ালে ফিরিয়া যাইত।

ঐ গাভীর দুগ্ধ হ্রাস পাইতে দেখিয়া গোয়ালাদের মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। তবে কি গোপনে কেহ দুগ্ধ চুরি করিতেছে?

একদিন দূর হইতে তাহারা দুই ভাই গাভীটিকে অনুসরণ করিতে থাকে, উপস্থিত হয় শিলা বিগ্রহের কাছে। গাভীর দুগ্ধদানের এই দৃশ্য দেখিয়া উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যায়।

সেইদিন রাত্রে প্রভু গোবর্ধননাথ মানেকচাঁদ ও সদু পাণ্ডেকে স্বপ্নযোগে আদেশ দেন, "তোদের ঐ গাভী নন্দরাজের গোয়ালার গাভীর বংশ থেকে উদ্ভূত। ওই দুধই আমার প্রিয়। তোরা প্রতিদিন নিজহাতে দুধ দুইয়ে আমার ভোগ দিলে আমি প্রসন্ন হবো।"

আদেশ মতো গোপভ্রাতৃদ্বয় প্রতিদিন এই শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে থাকে।

অতঃপর গোবর্ধন অঞ্চলে আবির্ভূত হন মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রপুরী। গোপ ভ্রাতাদের সেবিত শ্রীবিগ্রহের জন্য তিনি একটি কুটির নির্মাণ করান, বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠানযুক্ত সেবা পূজার প্রবর্তন করেন।

এই পবিত্র শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া বল্লভ ভট্ট আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। নিজ ভক্তদের মাধ্যমে গোবর্ধননাথজীর মাহাত্ম্য সর্বত্র তিনি প্রচার করেন এবং একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ঠাকুরকে করেন সংস্থাপন।

শ্রীবিগ্রহের পূজার ভার দেওয়া হয় গৌড়ীয় ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপর, আর বল্লভ ভট্টের

দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য, কৃষ্ণদাস ও কুম্ভনদাস নিয়োজিত হন ঠাকুর এবং তাঁহার মন্দিরের সেবাকর্মে।

কয়েক বৎসর পরে পূরণমল নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর উপর গোবর্ধননাথজীর স্বপ্নাদেশ হয়, "দেশ দেশান্তর থেকে এত ভক্ত আসছে আমার দর্শনে, অথচ তোমরা আজ অবধি আমার সেবা পূজার জন্য একটা বড় মন্দির নির্মাণ করতে পারলে না! তুমিই এ কাজের ভার নাও, আমার একটা নূতন বড় মন্দির স্থাপন করো।"

এ প্রত্যাদেশ পূরণমল সানন্দে গ্রহণ করে। এবং বহু অর্থব্যয় ক'রে সুদৃশ্য ও বৃহৎ এক মন্দির সে নির্মাণ করে গিরিগোবর্ধনের উপর। এই মন্দিরের কাজ পূর্ণ হয় প্রায় বিশ বৎসরের ব্যবধানে। ততদিন শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা বল্লভ ভট্টের নির্মিত মন্দিরেই সুসম্পন্ন হইতে থাকে।

ডঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের মতে, গোবর্ধননাথজীর আত্মপ্রকাশ ও শ্রীমন্দিরে সংস্থাপনের পর হইতেই বল্লভাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, বিশেষত ব্রজমণ্ডল, রাজপুতনা ও গুজরাটে তাঁহার মতবাদের প্রসার ঘটে।[১]

পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে গোবর্ধননাথজীর এই বিগ্রহ ব্রজমণ্ডলে রাখা সম্ভব হয় নাই। এটিকে সরাইয়া নিয়া স্থাপন করা হয় উদয়পুরের নিকটস্থ নাথদ্বারার নূতন মন্দিরে। আচার্য বল্লভ ভট্টের জীবিতকালেই ইহা করা হয়।

বল্লভের সাধনায় ও দার্শনিকতায় ভাগবত পুরাণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভাগবতের মধ্য দিয়াই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যেকার অচ্ছেদ্য জন্মসম্বন্ধের তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, বেদ বেদান্ত সংকলন করার পরও ব্যাসদেব তৃপ্ত হন নাই, তাই ভাগবত রচনা করিয়া, কৃষ্ণলীলারসের বিস্তার সাধন করিয়া জীবকে তিনি প্রকৃত পরম পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

ভাগবত সপ্তাহ বা ভাগবত পুরাণের সপ্তাহব্যাপী ব্যাখ্যান বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের এক অতি অবশ্য কর্তব্য। এই 'সপ্তাহ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বল্লভ ভট্ট এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে এক নিবিড় যোগসাধনা ঘটিতে দেখা গিয়াছিল।

ভাগবত, সপ্তাহ অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল—প্রবক্তা, তা তিনি বল্লভ ভট্ট নিজেই হোন বা তাঁহার যে কোনো ভক্ত শিষ্যই হোন, এই ঐশ্বরীয় কর্ম নির্বাহের জন্য কোনো অর্থাদি নিতে পারিবেন না।

বল্লভ ভট্ট সেবার একদল ভক্ত শিষ্য নিয়া কনৌজ গিয়াছেন। স্থানীয় এক ভক্তের গৃহে সাড়ম্বরে তিনি ভাগবত পাঠ শুরু করিলেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, ভাগবতের তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরম তত্ত্ব, ইহা ব্যাখ্যান করিতে গিয়া কেহ যদি কোনো অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাহা তিনি গুরুতর অপরাধ ও পাপ বলিয়া গণ্য করেন। কারণ, কৃষ্ণকথা বিক্রয় করা চলে না।

শ্রোতাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন পদ্মনাভদাস নামে এক বর্ষীয়ান পুরাণ-পাঠক।

---

১ ডঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর: বৈষ্ণবিজম্, শৈবিজম্ অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস্ সিস্টেমস্।

কনৌজের বিভিন্ন পল্লীতে পুরাণ পাঠ করিয়া কোনোমতে তিনি তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। বল্লভ ভট্টের কথা কয়টি তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া গেল। এইসঙ্গে বল্লভের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, যোগ দিলেন তাঁহার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে। অতঃপর পদ্মনাভদাস স্থির করিলেন, পূর্ববৎ পুরাণ পাঠ করিবেন বটে, কিন্তু এজন্য কখনও কোনো অর্থাদি শ্রোতাদের নিকট গ্রহণ করিবেন না।

পদ্মনাভ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ঘরে কোনো সঞ্চিত অর্থ নাই, আবার নিত্যকার পুরাণ পাঠের আসরে কোনো অর্থও তিনি গ্রহণ করিতেছেন না। এ অবস্থায় সংসার ও বিগ্রহ সেবা চালানো যায় কিরূপে?

পত্নী এবং বন্ধুবান্ধবেরা কেহই পদ্মনাভকে তাঁহার সংকল্প হইতে টলাইতে পারিলেন না। দীন ভিক্ষুকের জীবনই তিনি বরণ করিয়া নিলেন। অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সপরিবারে উপবাসী আছেন জানিয়া কেহ যদি কখনো দু-এক মুষ্টি চাল দিয়া যাইত, তাহাতেই চলিত দেবসেবা ও স্বামী স্ত্রীর উদরপূর্তি। এক একদিন ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুলও জুটিত না। সেদিন পদ্মনাভদাস তেলিদের কাছে গিয়া তিলের খোসা সংগ্রহ করিতেন। পূজার ঘরে বসিয়া ঠাকুরকে এই বস্তুই নিবেদন করিতেন পরম ভক্তিভরে। পতি ও পত্নী সেদিন অতিবাহিত করিতেন অনাহারে।

কিছুদিন পরে পদ্মনাভদাস তাঁহার নব উপদেষ্টা বল্লভ ভট্টের স্বগ্রাম অড়েল-এ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আচার্যের মুখে নিত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন আর বর্ষীয়ান পুরাণ পাঠকের গণ্ড বহিয়া ঝরিতে থাকে আনন্দাশ্রু। অথচ ঘরে পত্নীসহ প্রায়ই তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হয়।

সেবার এক ভক্ত পদ্মনাভের এই চরম দারিদ্র্য বরণের কথা বল্লভাচার্যের কানে তুলিলেন। বল্লভের জননী কাছেই দণ্ডায়মানা। এ সংবাদে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কিছুটা খাদ্য সামগ্রী পদ্মনাভের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু পদ্মনাভকে ঐ খাদ্য গ্রহণে রাজী করানো যায় কই? তিনি কহিলেন, "আমি তো জানি শিষ্যই দেবে তার গুরুকে, গুরুর গৃহ হতে তো তার কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়। এ খাদ্যবস্তু আমি নিতে পারিনে।"

অনশনে অর্ধাশনে দিনের পর দিন কাটিতেছে, শেষটায় পদ্মনাভ গৃহিণীর ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভাঙিয়া গেল। স্বামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "পুরাণশাস্ত্র পাঠ ক'রে তার পরিবর্তে টাকাকড়ি নেবে না। বেশ তো, একথা মেনে নিলাম। কিন্তু ঘরে ছেলেমেয়েরা উপবাসী থাকবে, এটাই বা কেমন কথা? তুমি বরং কোনো মন্দিরে পূজারীর কাজ নাও। তাহলে যদিবা অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে বাঁচানো যায়।"

পদ্মনাভদাস উত্তরে বললেন, "তা কি ক'রে হয় গো? আজ আমি যদি পুরাণ পাঠ ছেড়ে দিয়ে কোনো মন্দিরে গিয়ে পূজারীর কাজ নিই, লোকে বলবে বল্লভ ভট্টের ভক্তদলে ভাঙন ধরেছে। ভট্টজীর শিষ্য হয়ে তা আমি কি ক'রে করবো?"

ফলে সপরিবারে আকাশবৃত্তি গ্রহণই হইল পদ্মনাভদাসের একমাত্র অবলম্বন।

খোঁজখবর নিয়া কেহ কখনো দুই মুষ্টি তণ্ডুল দিলে তবেই সেদিন এই তিতিক্ষাবান্ পুরাণ পাঠকের গৃহে রন্ধনের হাঁড়ি উনুনে চাপানো হইত।

পদ্মনাভদাসের কৃচ্ছ্রসাধন ও আকাশবৃত্তির এই কাহিনী আজো প্রয়াগ অঞ্চলের এক সুপ্রচারিত জনশ্রুতি।

বল্লভ ভট্টের প্রথম ও প্রধান শিষ্য দামোদরদাস। এই দামোদর গোড়া হইতেই একাধারে ছিলেন তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত, তীর্থসঙ্গী এবং একান্ত সেবক।

সাধন-জীবনে বল্লভ কয়েকবার সর্বভারতের তীর্থ পরিক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব তীর্থের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতেন ব্রজমণ্ডলকে। এই ব্রজমণ্ডল তাঁহার প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ও অলৌকিক কত লীলা করিয়া গিয়াছেন,, তাই এখানকার অরণ্য প্রান্তর যমুনা ও গিরিগোবর্ধন সর্ব স্থানই ছিল তাঁহার কাছে পরম পবিত্র এবং কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক.

বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে লেখা আছে, ইষ্টদেবের লীলাভূমি এই ব্রজমণ্ডলেই বল্লভ ভট্টের আচার্য জীবন শুরু হয়। এখানে তিনি দীক্ষা প্রদান করেন তাঁহার প্রধান শিষ্য দামোদরদাসকে।

সে-বার বল্লভ গোকুলের এক নির্জন অরণ্যে নিভৃতে কিছুদিন বাস করিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন একান্ত ভক্ত এবং সর্বসময়ের সাথী দামোদরদাস।

হঠাৎ একদিন রাত্রে ধ্যান জপ করার সময় ইষ্টদেবের কণ্ঠস্বর ও সুস্পষ্ট আদেশ তিনি শুনতে পান। পাশেই আর এক কুটিরে অবস্থান করিতেছেন দামোদরদাস। বল্লভ তাঁহাকে কহিলেন, "দামোদর, তুমি কি দৈবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে?"

"হ্যাঁ, শুনেছি, প্রভু, কিন্তু স্পষ্টভাবে সবটা কথা আমি ধরতে পারি নি।" উত্তর দিলেন দামোদর।

"কৃষ্ণের আদেশ হয়েছে,—তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। হ্যাঁ, দামোদর এই আদেশের প্রতীক্ষারই আমি এতদিন ছিলাম। প্রভুর ব্রত উদ্‌যাপন করার যে সংকল্প গ্রহণ করেছি, আমার মনোমত বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করতে না পারলে সে সংকল্প সিদ্ধ হবে না। এই সম্প্রদায় গঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ আমি পেলাম। দেখছি, তোমাকে দিয়েই শুরু হতে যাচ্ছে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নির্ধারিত কর্মযজ্ঞ।"

দামোদরদাসের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণ-শরণাগতির মন্ত্র তিনি গ্রহণ করিলেন। দামোদর ছিলেন বল্লভ ভট্টের আদর্শ আত্মত্যাগী শিষ্য। পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার তেমন ছিল না, কিন্তু গুরুর প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি ও প্রপত্তির দিক দিয়া তিনি ছিলেন অতুলনীয়। পরবর্তীকালে বল্লভ সম্প্রদায়ে শাস্ত্রবিদ্ এবং প্রতিভাধর ব্যক্তি অনেক আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু গুরুভক্তি গুরুসেবা ও ত্যাগ তিতিক্ষার দিক দিয়া দামোদরকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বল্লভ নিজমুখে তাঁহার এই প্রিয়তম শিষ্যকে অনেক সময় বলিতেন, "দামোদর, তোমার জন্যই উদ্ভব ঘটেছে আমার এই নূতন কৃষ্ণসেবী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের।"

গুরুর মুখে শিষ্যের এই প্রশস্তি-বাণী শুনিয়া বল্লভ ভট্টের ভক্ত শিষ্যদের অনেকেরই বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা বল্লভের অতিশয় প্রিয় কর্মসঙ্গী বলিয়া গণ্য হইতেন তাঁহাদের তিনি ডাকিতেন সখা বলিয়া। এই 'সখা' কথাটির তাৎপর্য ছিল অতি গভীর। এই সব ভক্ত বা শিষ্য আচার্য বল্লভের সহমর্মী এবং সহকর্মীই শুধু নন, কৃষ্ণের মহান্ ঐশ্বর্যের কর্ম সাধনেরও তাঁহারা অংশীদার। তাই তাঁহারা বল্লভ ভট্টের জীবন সখা।

এই সখা তত্ত্বটি বল্লভ ভট্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আখ্যান হইতে। ইন্দ্রের রোষ, বজ্রপাত ও ঝটিকার তাণ্ডব হইতে গোপগোপীদের অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করেন বালক শ্রীকৃষ্ণ। অবলীলায় গিরিগোবর্ধনকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রের অত্যাচারে করেন প্রতিরোধ। এসময়ে গোপগোপীরা বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করেন, "হে অতুলনীয় প্রতাপবান্ কৃষ্ণ, সত্য ক'রে বল তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি। অবলীলায় যে অত্যাশ্চার্য কর্ম তুমি সম্পন্ন করলে, তা যে দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। যখন তোমার অলৌকিক শক্তির কথা ভাবি, তখন আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই, ভাবতে থাকি, তুমি কি কোনো পরাক্রমশালী মহান্ দেবতারূপে আমাদের মতো নিম্নবর্ণের গোপদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছ। অথবা তুমি আমাদেরই একজন, আমাদেরই একান্ত আপনজন? হে কৃষ্ণ, দয়া ক'রে উদ্‌ঘাটন করো তোমার প্রকৃত স্বরূপ।"

কৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কেন তোমরা ঔৎসুক্য প্রকাশ করছো। যদি তোমরা আমায় ভালবেসে থাকো, আমার কার্যকে প্রশংসার্হ বলে মনে করো, তাহলে আমাকে গণ্য ক'রে নাও তোমাদেরই একজন ভাই বলে, সখা বলে। আমি কোনো দেবতা নই, তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিমানও নই আমি। কাজেই আমার ওপর ঐ সব অলৌকিকত্বের আরোপ তোমরা ক'রো না।"

বালক শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজসখার সহজ ভাব, ভ্রাতৃত্বের সহজ ভাবটিই বল্লভাচার্য তাঁহার ভক্ত শিষ্য ও অনুরাগীদের সম্পর্কে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। একদল শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিষ্যকে তিনি চিহ্নিত করিয়াছিলেন সখা রূপে, বন্ধু রূপে।

তাহার এই 'সখা'দের মধ্যে ছিলেন, সুরদাস, পরমানন্দ, কুম্ভন, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি।

সুরদাস ছিলেন জন্মান্ধ। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংগীত সদা উৎসারিত ছিল তাঁহার কণ্ঠে। ভাবময় সংগীতগুলি তিনি নিজেই রচনা করিতেন, নিজেই সুর তাল সহযোগে গান করিতেন সহজ আনন্দে মত্ত হইয়া।

সুরদাসের ভক্তি সংগীত সারা উত্তরভারতে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আজো দেখা যায়, কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি ভক্তিসংগীত গাহিয়া বেড়ায়, তাহাকে ডাকা হয় সুরদাস নামে।

বল্লভ-সখা সুরদাসের জন্ম আগরা ও মথুরার মধ্যবর্তী গৌঘাটা নামক এক গ্রামে। সেখানেই এই জন্মান্ধ ভক্ত গায়ক আপন মনে তাঁহার স্বরচিত গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

তীর্থ পরিব্রাজন করিতে করিতে বল্লভ ভট্ট সেবার গৌঘাটায় পদার্পণ করিয়াছেন।

বহু দর্শনার্থীর সঙ্গে সুরদাসও সেদিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত। স্থানীয় প্রধানেরা বল্লভ ভট্টের সহিত সুরদাসের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বল্লভ তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "সুরদাস, তুমি ধন্য। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক গান তোমার কণ্ঠ দিয়ে সতত নিঃসৃত হচ্ছে। সখা, আমায় একবার তোমার সুমধুর গান শুনিয়ে ধন্য করো।"

সুরদাস গাহিলেন এক আর্তিমূলক গান। তাহার মর্ম : হে প্রভু, আমার প্রধান বৈশিষ্ট্য আমি পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন পাপীকে কে আর তরাবে তোমার মতো কৃপালু ছাড়া ?

পরম প্রভুর কাছে বার বার আর্তি জানাইয়া সুরদাস একান্ত মনে এ গান গাহিতেছেন আর অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

প্রেমপূর্ণ স্বরে বল্লভাচার্য কহিলেন, "সুরদাস, এই বিষাদের গান, আর্তিময় গান কেন শুনছি তোমার মুখে? আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যে মাধুর্যের প্রভু, আনন্দের প্রভু। তাঁর প্রশস্তি গাও প্রাণভরে, দিব্য আনন্দের ধারা উথলে উঠুক তোমার সারা দেহ মনে আত্মায়।"

"আচার্য প্রভু, আনন্দে উৎসারিত সেই গান তখনই গাইতে পারবো, যখন কৃপাময়ের কৃপা পেয়ে ধন্য হবে এ জীবন। আপনি কৃপাময়ের নিজ জন, আমায় আপনার আনন্দ মন্ত্রে দীক্ষা দিন, প্রভুর লীলারস উপভোগ করতে দিন, তবেই তো আনন্দের গান বেরুবে আমার কণ্ঠ দিয়ে।"

পরম ভক্ত সুরদাসকে দীক্ষা দান করেন বল্লভাচার্য। আনন্দময় অনুভূতিতে পরিপ্লাবিত হন সুরদাস। তারপর তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অপরূপ সংগীতলহরী। সুরদাসের রচনার আবেগ ও আনন্দ-স্পর্শ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে অগণিত কৃষ্ণভক্তের কণ্ঠে। বল্লভ সম্প্রদায় ভক্ত-সুরদাসের নব নামকরণ করেন সুরসাগর। ব্রজভাষায় রচিত সুরদাসের সংগীতমালা ভক্ত-হৃদয়ে আজো অক্ষমালার মতো আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

কনৌজী ব্রাহ্মণ পরমানন্দদাস ছিলেন একজন ভক্ত কবি। ভক্তি সংগীতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল যথেষ্ট। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কনৌজে একটি ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী এ সময় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একবার পরমানন্দদাস ত্রিবেণী সংগমে স্নান করিতে আসিয়াছেন। স্থির করিলেন, এই সুযোগে কিছুদিন প্রয়াগতীর্থে অবস্থান করিবেন। এই সময়ে প্রতিদিন নিজ বাসস্থানে বসিয়া তিনি ভক্তি-সংগীত পরিবেশন করিতেন। তাঁহার প্রেমাবেশ এবং মনোহর সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই সেখানে আসিয়া জুটিতেন।

পরমানন্দদাসের খ্যাতির কথা শুনিয়া বল্লভ ভট্টের অন্যতম শিষ্য কাপুর একদিন প্রয়াগে তাঁহার সংগীতসভায় উপস্থিত হন।

ভক্ত কবির হৃদয়ে সেদিন দিব্য ভাবের উদ্দীপনা জাগিয়াছে। পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সুবেলা কণ্ঠে একটির পর একটি গান তিনি গাহিয়া চলিয়াছেন। সবাই

মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই সংগীতের সুধা পান করিতেছেন। রাত্রি কখন গভীর হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে কাহারো হুঁশ নাই।

কাপুর ভক্তকবির সম্মুখে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য-জ্ঞানের কোনো লক্ষণ তাঁহার দেহে নাই। পরমানন্দদাস শুনিয়াছেন, কাপুর আচার্য বল্লভ ভট্টের একজন বিশিষ্ট শিষ্য, তাই তিনি সংগীত পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন।

রাত্রির শেষ যামে সংগীতসভা সমাপ্ত হইল, কাপুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সঙ্গীগণ-সহ নদীর ওপারে অড়েলে চলিয়া গেলেন।

শ্রান্ত দেহে পরমানন্দ এবার আপন কুটিরে শয়ন করিতে যান এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় হন অভিভূত। এ সময়ে তিনি এক মনোহর স্বপ্ন দর্শন করেন। আচার্য বল্লভ ভট্টের শিষ্য পরমানন্দদাসের ভাবময় মূর্তিটি তাঁহার অন্তরপটে ভাসিয়া উঠে। সবিস্ময়ে আরো লক্ষ্য করেন, ভক্তপ্রবর কাপুরজীর কোলে বসিয়া ইষ্টদেব বাল শ্রীকৃষ্ণ এক মনে পরমানন্দদাসের ভক্তিরসাত্মক সংগীত শ্রবণ করিতেছেন। আর তাঁহার বদন-কমলে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রসন্নমধুর হাসির আভা। ক্ষণপরে ইষ্টদেব কহিলেন, 'বৎস পরমানন্দ, তোমার ভাবময় সংগীত শুনে আজ আমি বড়ই তৃপ্তি লাভ করেছি।'

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন টুটিয়া গেল, ভক্ত পরমানন্দ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

অন্তরে তাঁর খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই অদ্ভুত স্বপ্নের মাধ্যমে কোন্ গূঢ় ইঙ্গিত আজ দিয়া গেলেন। তবে কি কাপুর পরম প্রভুর একজন চিহ্নিত ভক্ত এবং তাঁহার মাধ্যমেই পরমানন্দকে তিনি কৃপা করিতে চান?

আর কালবিলম্ব না করিয়া পরমানন্দদাস কাপুরের সন্ধানে ওপারে অড়েল গ্রামের দিকে ধাবিত হন। নদী পার হইবার পর দেখেন, প্রভাতের স্নান তর্পণ সারিয়া আচার্য বল্লভ ভট্ট বালুতটে বসিয়া কাপুর প্রভৃতি ভক্তদের কাছে কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন।

পরমানন্দ মনে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, এই মহাত্মাই তাঁহার সাধনজীবনের আলোকদিশারী। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যদি তাঁহার ভাগ্যে থাকে তবে তাহা ঘটিবে ইঁহারই কৃপাবলে। ভাবকম্পিত দেহে তখনি ছুটিয়া গিয়া তিনি আচার্য বল্লভের চরণ বন্দনা করিলেন, গ্রহণ করিলেন তাঁহার আশ্রয়।

উত্তরকালে সাধক পরমানন্দদাস বহুতর অনুভূতিলব্ধ ভক্তিসংগীত রচনা করেন। বল্লভ ভট্টের ভক্তসমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন পরমানন্দ-সাগর নামে। সুরদাসের তুল্য দিব্য অনুভূতি ও কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তা হয়তো পরমানন্দের রচনায় নাই, কিন্তু তাঁহার ভক্তি-সংগীতও উত্তর ভারতের ভক্তসমাজে জনপ্রিয়।

কুম্ভনদাস ছিলেন বল্লভ আচার্যের অপর এক বিশিষ্ট শিষ্য এবং 'সখা'। যমুনাবত্ত নামক গ্রামে তিনি বাস করিতেন। জাতিতে ছিলেন কুনবি, এই কুনবিরা বৃত্তিতে ছিল চাষী। পারসোলি অঞ্চলে কুম্ভনদাসের পিতৃপুরুষের কিছু জমি ছিল, তাহা চাষ করিয়াই কোনোমতে তাঁহার পরিবারের দিন চলিত।

গোবর্ধননাথজীব বিগ্রহ স্থাপনেব কিছুদিন পবেই কুম্ভন আচার্য বল্লভ ভট্টব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন এবং নিযোজিত হন শ্রীবিগ্রহেব সেবাকর্মে।

স্বভাবভক্ত কুম্ভনদাস গোবর্ধননাথজীব সঙ্গে এক সখ্যতাব সম্পর্ক স্থাপন কবিযা বসেন। জনশ্রুতি আছে, চিন্ময ঠাকুব কুম্ভনকে তাঁহাব অন্তবঙ্গ সখারূপে জ্ঞান কবিতেন, সখার মতোই পবমানন্দে তাঁহাব সহিত খেলাধূলা এবং আনন্দবঙ্গে বত হইতেন।

সে-বাব একদল মুসলমান সেনা ব্রজমণ্ডলেব দিকে অগ্রসব হয। সবাই জানে, তাহাবা মন্দিব ও জনপদ লুণ্ঠন কবিতেই আসিযাছে, তাই দিকে দিকে আতংক ও চাঞ্চল্য জাগিযা উঠে। শ্রীবিগ্রহ কি শেষটায বিধর্মীদেব দ্বাবা কলুষিত হইবে। মন্দিবেব পুবোহিতেবা ভাবিযা চিন্তিযা স্থিব কবিলেন, এটিকে পার্শ্ববর্তী অবণ্যে নিযা লুকাইযা বাখা হইবে।

কুম্ভনদাস এবং অন্যান্য ভক্তেবা তাড়াতাড়ি একটি মহিষ সংগ্রহ কবিযা আনিলেন এবং উহাব পিঠে চাপানো হইল গোবর্ধননাথ বিগ্রহটিকে। তাবপব তাড়াহুড়া কবিযা এই বিগ্রহকে দুর্গম বনেব অভ্যন্তবে স্থাপন কবা হইল। বনাঞ্চলটি কণ্টকবৃক্ষে পূর্ণ। পথ চলিতে সেবকদেব অনেকেই কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইলেন, বিগ্রহেব শবীবেও বার বার লাগিল কণ্টকেব আঘাত।

পবদিন প্রভাতে মঙ্গল-আবতিব পব ঠাকুবেব ভোগ নিবেদন কবা হইল। এবার ঠাকুব চিন্মষ রূপ ধবিযা তাঁহাব সখা কুম্ভনদাসেব হস্ত ধাবণ কবিলেন। আবদার ধরিলেন, "কুম্ভন, এবাব আমাব একটা নূতন গান শোনাও।"

আদেশেব সঙ্গে সঙ্গেই একটি গান বাঁধিযা ফেলিলেন কুম্ভনদাস। এ-গানে ফুটিযা উঠিল সখা গোবর্ধননাথজীব প্রতি বিদ্রূপেব সুর। যে গানটি তিনি গাহিলেন তাহাব মর্ম: কিবকমেব ঠাকুব তুমি, বলতো? ষাঁড়েব পিঠে চেপে ছুটে এসেছো এই বনে, চাবিদিক রযেছে কণ্টকে আবৃত। এই কণ্টকেব খোঁচা দেওযা আব খোঁচা খাওযাই বুঝি তোমাব ভাল লাগে? ক্ষুদ্র এক সেনাদল ঢুকে পড়েছে ব্রজমণ্ডলে। আব জগতের নাথ হযে তাবই ভযে তুমি ভীত। আশ্রয নিযেছো এই অবণ্যে। বলিহারি ঠাকুর তোমাব সাহস ও শক্তিব।

কথিত আছে, কুম্ভনদাসেব এই বিদ্রূপাত্মক গান বচনাব অব্যবহিত পবেই মুসলমান সেনা লুণ্ঠনেব লোভ ছাড়িযা কি এক অজ্ঞাত কাবণে ব্রজভূমি পবিত্যাগ কবে। অতঃপর শ্রীবিগ্রহকে পুনবায় গোবর্ধন পাহাড়েব মন্দিবে প্রতিষ্ঠিত কবা হয।

ভক্ত কুম্ভনদাসেব কাজ ছিল শ্রীবিগ্রহকে দুইবেলা সঙ্গ দেওযা, তাঁহাব জন্য পুষ্প উপচার সংগ্রহ কবা আব নূতন নূতন প্রেমবসাত্মক গান গাহিযা শোনানো।

তাঁহাব নিবেদিত গানেব সংবেদন ও আন্তবিকতা ভক্ত-মাত্রেবই প্রাণমন কাড়িযা নেয। নূতন নূতন যে সব গান প্রতিদিন তিনি বচনা কবিতেন, তাহা তড়িৎবেগে ছড়াইযা পড়িত বৃন্দাবন ও মথুবাব মন্দিবে মন্দিবে, ভক্ত সাধকদেব মণ্ডলীতে।

কথিত আছে, কুম্ভনদাসেব ভক্তিসংগীতেব খ্যাতি শুনিযা সম্রাট্ আকবব একবাব দূত পাঠাইযা তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান এবং রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আনযন কবেন।

আকবৰ কহিলেন, "শুনেছি আপনি একজন সত্যকাৰ ভক্ত এবং কবি। আমায় আপনাৰ স্বরচিত একটি ভক্তসংগীত গেয়ে শুনিয়ে দিন।"

কুম্ভনদাস নূতন এক গান বাঁধিলেন, সম্রাটেৰ সকাশে তাহা সুর-তাল-লয় যোগে গাহিয়াও দিলেন। এ গানেৰ মর্ম শ্রীভগবানেৰ ভক্ত বলে চিহ্নিত যে জন, সিক্রিৰ জৌলসময় দরবারে তাৰ কি কাজ, বলতো? দূর পথেৰ আসা যাওয়ায় পাদুকা দুটো আমার ছিঁড়ে গেছে। আর দরবারে যে মুখের দিকে চাইতে হচ্ছে, তাতে নেই কোনো আনন্দেৰ লেশ। হে কুম্ভনদাস, জেনে রেখো, প্রভু গিরিধারী ছাড়া আৰ কোনো কিছুতেই নেই কোনো সারবস্তু, নেই কোনো কল্যাণ।

আকবৰ বুদ্ধিমান এবং কৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট্। ভক্তেৰ অন্তরেৰ কথা ও তাহাৰ তাৎপর্য তিনি বুঝিলেন, সাদৰ অভিনন্দনের পৰ কুম্ভনদাসকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাৰ স্বস্থানে।

ব্রজভূমিতে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন কুম্ভনদাস, প্রভু গোবর্ধননাথজীৰ সঙ্গে এ-কয়দিন আনন্দরঙ্গ করিতে পারেন নাই। দিন কাটাইয়াছেন বিরহখিন্ন হৃদয়ে। তাঁহাৰ এসময়কাৰ রচিত সংগীতে বিরহেৰ আর্তি পরিস্ফুট। আচার্য বল্লভেৰ সম্প্রদায়ে কুম্ভন-দাসেৰ এই বিরহ সংগীতগুলি আজো অত্যন্ত জনপ্রিয়।

সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি, রাজা মানসিংহ সে-বাৰ ব্রজমণ্ডলে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়াছে। গোবর্ধননাথজীৰ সম্মুখে বসিয়া কুম্ভনদাস সেদিন তাঁহাৰ নিত্যকাৰ কর্মে ব্যাপৃত। নানা রঙের ফুলেৰ মালা প্রভুৰ জন্য গাঁথিতেছেন, আৰ আপন মনে নিবেদন করিতেছেন স্বরচিত ভক্তিসংগীত। মানসিংহ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলেন এই ভক্তকবিৰ প্রতি।

পরদিনই কুম্ভনদাসেৰ কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। মনেৰ অভিলাষ, ভক্ত-প্রবরকে কিছু অর্থ দান করিবেন।

কুম্ভনদাস তখন তাঁহাৰ পর্ণকুটিরে বসিয়া ঠাকুরের নাম কীর্তন করিতেছেন আর মালা গাঁথিতেছেন। বাড়িৰ লোকেৰা পৰম সমাদরে মানসিংহকে কুটিরেৰ বারান্দায় বসিতে দিলেন। কুম্ভন কিন্তু তাঁহাৰ সেবা নিয়াই ব্যস্ত। হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়া মহামান্য অতিথি মানসিংহ তাঁহাদেৰ কাছে উপস্থিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহাৰ দৃক্‌পাতই নাই। বহুক্ষণ পরে কুটিৰ হইতে বাহিরে আসিয়া করজোড়ে রাজাকে জানাইলেন সাদৰ সম্ভাষণ। কহিলেন, "মহারাজ আপনাকে আৰ একটু অপেক্ষা করতে হবে। প্রভু গোবর্ধননাথজীৰ মন্দিরে আমাৰ যাবাৰ সময় হয়েছে। তাৰ আগে, আমায় তৈরি হতে হবে, একটু প্রসাধন ক'রে নিতে হবে।"

এবাৰ কুটিরস্থ একটি বালিকাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে, আমাৰ আরশিটা তাড়া-তাড়ি বাইরে নিয়ে আয়, গোপীচন্দনেৰ তিলকচিহ্নটা দিয়ে নি।"

বালিকাটি উত্তরে কহিল, "আপনাৰ আরশি বাইরে নেব কি ক'রে? নিচেকার ফুটো দিয়ে সব জল যে ঝরে পড়ে যাচ্ছে।"

মানসিংহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, আরশিৰ সঙ্গে জলেৰ কি সম্পর্ক তাতো বুঝে উঠতে পারছিনে?"

ইতিমধ্যে মেয়েটি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। হাতে তাহাৰ শালপাতা দিয়া

তৈরী বাটির মতো একটি পাত্র। তাহাতে জল পূরিয়া রাখা হয় এবং ঐ জলেই নিজের প্রতিকৃতি দুবেলা দর্শন করেন কুম্ভনদাস, সম্পন্ন করেন তাঁহার গোপীচন্দনের প্রসাধন। এটিই তাঁহার আরশি।

মানসিংহের ইঙ্গিতে পরিচারকেরা তাঁহার হাতির হাওদা হইতে স্বর্ণখচিত আরশিটি লইয়া আসে, এটি স্থাপন করা হয় কুম্ভনদাসের সম্মুখে। রাজা বলেন, "আপনার প্রসাধনের কাজ এই আরশিটি দিয়ে ভালো চলবে। এইটি আপনি রেখে দিন।"

কুম্ভনদাস সহাস্যে উত্তর দেন, "সোনা বাঁধানো এই দামী আরশি দিয়ে আমার কোন্ প্রয়োজন, মহারাজ? তাছাড়া, এটি এই দীন দরিদ্রের কুটিরে থাকলে, আজ রাতেই ডাকাত পড়বে যে। না, এ আপনি নিয়ে যান।"

রাজা মানসিংহ এবার বাহির করেন তাঁহার মোহরের থলি। একরাশ স্বর্ণমুদ্রা কুম্ভনদাসের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া বলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা, এই অর্থ আপনি গ্রহণ করুন, আপনার মতো ভক্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামে নিযুক্ত থাকবেন, তা আমি চাইনে।"

কুম্ভনদাস উত্তর দেন, "মহারাজ, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম আমার নেই। বরং আমাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। আমার যে কয় বিঘা জমি আছে, তা দিয়ে কোনোমতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। তাছাড়া, মহারাজ, আমার লোভ নেই, অভাববোধও নেই। কাজেই আপনার এ অর্থ দিয়ে আমার কি দরকার? দয়া ক'রে এগুলো আপনি ফিরিয়ে নিন।"

মানসিংহ অনুরোধ জানান, "বেশ তো, আপনি সোনার মোহর নিতে না চান, কিছুটা জমি নিন, বা একটা গ্রাম আমার কাছ থেকে নিন।"

কুম্ভনদাসকে কোনো কিছুতেই রাজী করানো গেল না। রাজা মানসিংহ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতেছেন, প্রিয় প্রভু গোবর্ধনধারীর মন্দিরে যাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিতেছে, এজন্যে বরং তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ প্রশ্ন করিলেন, "দয়া ক'রে একবার আমায় বলুন, আমি কি করলে আপনি খুশী হবেন।"

"সত্য কথা বলতে কি, আপনার মতো মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিরা আমার কাছে না এলেই আমি খুশি হবো। আমার প্রিয় প্রভু আর আমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে কেউ ব্যবধান রচনা করুক, এ আমি চাইনে।" অকপটে বলেন কুম্ভনদাস।

ভক্তপ্রবরের মনের কথাটি মানসিংহ বুঝিলেন। বার বার তাঁহার প্রশস্তি জানাইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কুম্ভনদাসের নিজের পরিবারবর্গ ও আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। তাই সামান্য যেটুকু জমি ছিল তাহা চাষ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চলা ভার হইত। বল্লভ আচার্যের পুত্র, গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ, সে-বার তাঁহার দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করেন। বিঠ্ঠলনাথ একবার শিষ্যদের দর্শন দিবার জন্য ব্রজমণ্ডলের বাহিরে যাইতেছেন। কুম্ভনদাসকেও তিনি সঙ্গে নিলেন। উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষে ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট হইতে যে অর্থাদি

পাওয়া যাইবে, তাহার কিছুটা অংশ কুম্ভনদাসকে দিবেন এবং এভাবে তাঁহার দুঃখ মোচনে কিছুটা সহায়তা হইবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গোবর্ধন অঞ্চল ত্যাগ করার পর হইতেই কুম্ভনদাসের নয়নে নামিল অশ্রুর বন্যা। পরম প্রভু গোবর্ধনধারীর বিরহে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন শেষটায় আহার নিদ্রাও ত্যাগ করিলেন।

বিঠ্ঠলনাথ বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছেন। কুম্ভনদাসকে প্রভু গোবর্ধননাথের সঙ্গচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে ঠিক হয় নাই। প্রবীণ ভক্তেরা সবাই জানে, লীলাময় শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়রূপে প্রতিদিন কুম্ভনদাসকে দর্শন দেন, তাঁহার সঙ্গে লীলাখেলা করেন। সেক্ষেত্রে কুম্ভনের গোবর্ধন ত্যাগ প্রভু ও ভক্ত দুজনেরই সন্তাপের কারণ ঘটিয়াছে। শুধু কুম্ভনদাসই নয়, শ্রীবিগ্রহও বিরহ দহনে জর্জরিত হইতেছে।

এসব কথা চিন্তা করিয়া গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ সেইদিনই কুম্ভনদাসকে তাঁহার স্বস্থান গোবর্ধনে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

এই কয়দিনের বিরহ-দহনের চিহ্ন ভক্ত কুম্ভনদাসের কয়েকটি ভক্তি-সংগীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই সংগীতগুলি বল্লভ সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত।

কৃষ্ণদাস ছিলেন বল্লভ আচার্যের 'সখা' পর্যায়ভুক্ত অপর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত। ভাগ্যচক্রের গতি যেভাবে তাঁহাকে ঘর-সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, বল্লভের আশ্রয়ে টানিয়া নিয়া আসে, তাহা বড় বিস্ময়কর।

গুজরাটের এক জোতদারের পুত্র ছিল কৃষ্ণদাস। পিতা গ্রামের প্রধান বা পাটেল, যথেষ্ট অর্থবানও। কিন্তু তবুও তাঁহার অর্থ লালসার নিবৃত্তি ছিল না।

সে-বার এক বড় বণিক নানা ধরনের পণ্য নিয়া গ্রামে আসিয়াছে। কৃষ্ণদাসের পিতা ধনী ব্যক্তি এবং গ্রামের প্রধান। বণিকটি তাঁহার কাছে পণ্য বিক্রয় করিলেন, এবং মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন চৌদ্দ হাজার টাকা। অতঃপর কাজকর্ম সারিয়া সেই রাত্রেই তিনি অপর গ্রামের দিকে রওনা হইলেন।

কৃষ্ণদাসের পিতা ছিলেন অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ; অসাধু উপায়ে ধনার্জনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সে রাত্রেই তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী একদল ডাকাত ঐ বিদেশী বণিকের নিকট হইতে তাঁহার দেওয়া চৌদ্দ হাজার টাকা লুঠ করিয়া নিল।

পরদিনই ভোরবেলায় বণিকটি কৃষ্ণদাসের পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত। সখেদে এই ডাকাতির সংবাদ সে দিল, লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধারের জন্য চাহিল তাঁহার সাহায্য।

সাহায্য দেওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণদাসের পিতা বণিকের প্রতি গর্জিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি নিজে অত্যন্ত অসাবধান তাই টাকা লুঠ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা তার কি করতে পারি? বনে জঙ্গলে ডাকাতদের পিছু পিছু এখন কে ধাওয়া করতে যাবে। যাও, এখান থেকে এখন ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো।"

গ্রামের পাটেল যদি ডাকাতদের সন্ধান চালাইতে ইচ্ছুক না হয় তবে আর উপায় কি?

বিষণ্ণ মনে বণিকটি সেস্থান হইতে বিদায় নিল। কিন্তু গ্রামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল পাটেলের পুত্র বালক কৃষ্ণদাসের সঙ্গে। সে কহিল,

"শুনুন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই উর্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি। আমার বাবা একটি দুষ্ট চক্রের পাল্লায় পড়েছেন, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদেশীদের টাকা লুঠ করছেন আর নিজেদের মধ্যে ভাগ বখ্‌রা ক'রে নিচ্ছেন। তাঁর এ পাপকর্মের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আপনার টাকা উদ্ধারের জন্য আমি তাই সাহায্য করতে চাই।"

বণিক আশার আলো দেখিতে পায়। বালককে প্রশ্ন করে, "বল তো ভাই, কি ভাবে আমার টাকাগুলো আবার ফেরত পাওয়া যায়।"

আমার বাবা গ্রামের পাটেল। আপনি আমেদাবাদে গিয়ে সদরওয়ালার কাছে তাঁর নামে নালিশ রুজু করুন। আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব, ঘটনার আসল বিবরণ প্রকাশ করবো।"

"কিন্তু ভাই, কেন তুমি একাজ করতে যাচ্ছো, বল তো?"

'আমার বিশ্বাস, সত্য কথা প্রকাশ করলে, ডাকাতদের হাত থেকে আপনার টাকা উদ্ধার করা হবে, ভগবান্ সন্তুষ্ট হবেন। তাতে আমার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেমন হবে, তেমনি হবে তাঁর সত্যকার কল্যাণ।'

আমেদাবাদে আসিয়া বণিক তাহার মামলা দায়ের করে এবং কৃষ্ণদাসের পিতার উপর সরকারী পরওয়ানা জারী হয়। এই মামলায় সত্যভাষী বালক কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্যেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাসের পিতা ভীত হইয়া নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থ বণিককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

বালক কৃষ্ণদাসের অনুনয়ের ফলে কাজী তাহার পিতাকে মার্জনা ভিক্ষা দেন।

স্বগ্রামে পৌঁছিয়াই কৃষ্ণদাসের পিতা স্বমূর্তি ধারণ করেন, পুত্রকে বহিষ্কার করেন গৃহ হইতে।

নিঃসম্বল বালক ভগবানের নাম নিয়া এবার পথে বাহির হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর নানা তীর্থ ও মঠ মণ্ডলী দর্শন করিয়া সে অতিবাহিত করে। তারপর একদিন মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। আচার্য বল্লভ তখন ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ভাবময় ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয় তরুণ ভক্ত কৃষ্ণদাস, আশ্রয় নেয় তাঁহার চরণে। উত্তরকালে কৃষ্ণদাস আচার্য বল্লভের মঠ এবং মণ্ডলীর অন্যতম সংগঠক ও পরিচালকরূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

আচার্য বল্লভ এবং শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন প্রায় সমকালে। বয়সের হিসাবে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বল্লভ কিছুটা বড়। উভয়ে ধর্মনেতার ভক্তি-আন্দোলন পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিলেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য উভয়ে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

চৈতন্য ও বল্লভের প্রচারিত তত্ত্ব প্রধানত ভাগবত পুরাণের অনুসারী। কিন্তু চৈতন্য নিয়াছেন ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী বর্ণিত ব্রজকিশোর কৃষ্ণ ও ব্রজকিশোরী শ্রীরাধার তত্ত্ব। আর আচার্য বল্লভ তাঁহার সাধনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন, বালক শ্রীকৃষ্ণকে। বালগোপালের লীলাকে করিয়াছেন তাঁহার মণ্ডলীর প্রধান উপজীব্য।

মহাপ্রভু চৈতন্য ও আচার্য বল্লভের চিত্তাকর্ষক সাক্ষাতের বিবরণ আমরা পাই গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস তাঁহার ঐ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ গোস্বামীর মতো উচ্চকোটির বৈষ্ণব মহাত্মাদের নিকট হইতে। তাই তাঁহার এই বিবরণের প্রামাণিকতার উপর অনেকটা নির্ভর করা চলে।

প্রভু চৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া তখন বাংলা ও উড়িষ্যার ভক্তিপ্রেমের প্রবল বন্যা উৎসারিত হইয়াছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সর্বদর্শনবেত্তা বাসুদেব সার্বভৌম, প্রভুর চরণে শরণ নিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে বিরাজিত অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির মতো দিক্‌পাল মহাবৈষ্ণব। স্বয়ং উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি প্রভুর একান্ত বংশবদ। শুধু তাহাই নয়, পুরীধামে তৎকালে যে সব সাধু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্য তাঁহার দর্শনে আসিতেছেন, তাঁহারাই প্রভুর দিব্যকান্তি ও মহাভাবময় প্রেম দর্শনে জীবন সার্থক করিতেছেন, অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাহিতেছেন এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রশস্তি। বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়া রূপ ও সনাতন প্রভৃতি প্রতিভাধর বৈষ্ণবদের প্রেরণ করিয়াও শ্রীচৈতন্য এক প্রবল ভক্তিপ্রবাহ উৎসারিত করিয়াছেন।

আচার্য বল্লভ সে-বার শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীধামে আসিয়াছেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন সেই ধামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তাছাড়া, বল্লভ পূর্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যকে জানেন, বিপুল শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাঁহার প্রতি। কয়েক বৎসর আগে প্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ তাঁহাকে অড়েলে স্বগৃহে নিয়া গিয়া ভিক্ষা নির্বাহ করাইয়াছেন, প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্তন ও প্রেমবিকার দর্শনে ধন্য হইয় ছেন।

স্বভাবতই পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের পর আচার্য বল্লভ ভট্ট প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ মাত্র উভয়েই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন।

বল্লভ সহর্ষে কহিলেন, "পূর্ব ভারতে ও বৃন্দাবনে আপনি নামপ্রেমের যে বন্যা উৎসারিত করেছেন, তার তরঙ্গ প্রভাবিত করেছে সারা ভারতকে। স্পষ্টতই বুঝতে পারছি, কৃষ্ণের শক্তি নিহিত রয়েছে আপনার মধ্যে, তাই আপনার দর্শনে স্পর্শনে মানুষের এমন রূপান্তর ঘটছে।"

শ্রীচৈতন্য সবিনয়ে উত্তর দেন, "ভক্তজী, আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী, প্রেমভক্তির নিগূঢ় রহস্য আমি কি জানবো। হ্যাঁ, তবে কৃষ্ণের কৃপায় প্রকৃত বৈষ্ণবদের সৎসঙ্গ আমি পেয়েছি, তাই তাঁদের কাছ থেকে ভক্তি সাধনার তত্ত্ব কিছু কিছু শিখছি।"

রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর গৌড় হইতে ভক্তেরা পুরীতে আসিতেন। জগন্নাথ দর্শনের পর প্রভুর মধুময় সান্নিধ্যে কিছুদিন বাস করিয়া আবার তাঁহারা দেশে ফিরিতেন। ফলে প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্তদের একটা বিরাট সম্মেলন দেখা দিত পুরীধামে। এবারকার রথযাত্রায়ও অন্যান্য বারের মতো বহু গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রভু তাঁহাদের নিয়া প্রায়ই ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন।

বল্লভ ভট্ট প্রভু চৈতন্যকে ভালভাবেই জানেন। প্রভুর বিনয় বচনে মোটেই বিভ্রান্ত না হইয়া আবার তিনি তাঁহার প্রশস্তি শুরু করিলেন।

স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে চৈতন্য কহিলেন, "না ভট্টজী, আপনি আমার এই বৈষ্ণব বন্ধুদের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তাই বার বার আমার মতো অভাজনের প্রশংসা করছেন। এই দেখুন, এখানে রয়েছেন অদ্বৈত আচার্য, যাঁর প্রভাবে ম্লেচ্ছরাও কৃষ্ণভক্তি পেয়েছে। নিত্যানন্দ অবধূত তো সাক্ষাৎ ঈশ্বর। বাসুদেব সার্বভৌমের মতো দিক্‌পাল পণ্ডিত, ভক্তিসাধনার কত নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের শেখাচ্ছেন। আর রায় রামানন্দ? আহা রাগমার্গের ভজন তাঁর চাইতে আর কে জানে? আমি তো তাঁর কাছ থেকেই ব্রজরসের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি। ঐ দেখুন বসে আছেন হরিদাস ঠাকুর—নামের মহিমা যে লোকে তাঁর কাছ থেকেই শিখেছে। শুধু এঁরাই নয়, আরো কত বৈষ্ণব মহাত্মা এখানে রয়েছেন, এঁদের সঙ্গের ফলেই কৃষ্ণভক্তি উপার্জিত হয়েছে আমার মধ্যে।"

বল্লভ ভট্ট জানেন, এই বৈষ্ণবেরা সবাই প্রভুর ভক্তজন। তবে প্রভুর কথা হইতে ইহাও বুঝিয়া নিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি ভক্তি-সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন।

বল্লভ ভট্ট একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য। শুধু ব্রজমণ্ডলেই নয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহুস্থানে তাঁহার শিষ্য ভক্তেরা ছড়াইয়া রহিয়াছেন। বল্লভের রচিত শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মণ্ডলীর বাহিরের বহু বৈষ্ণবও উপকৃত হইতেছেন। কিন্তু আচার্য হিসাবে বল্লভের মনে কিছুটা সূক্ষ্ম অহংবোধ রহিয়াছে, ইহা চৈতন্যের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই বার বার ভক্তদের তত্ত্ব তাঁহার কাছে উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।

বল্লভ ভট্ট তখন তাঁহার ভাগবতের সুবোধিনী টীকা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন। ভাবিলেন, এই শক্তিধর বৈষ্ণবমণ্ডলীর যিনি অধীশ্বর সেই শ্রীচৈতন্যকে একবার তাহার টীকাটি পড়াইয়া শুনাইবেন। যদি এ হেন বৈষ্ণব নেতার প্রশংসা পাওয়া যায়, তবে সারা ভারতে ইহা অতি সহজেই প্রচারিত হইতে পারিবে।

বল্লভ একদিন শ্রীচৈতন্যকে ধরিয়া বসিলেন, "আমার অভিলাষ, আমার লিখিত ভাগবতের টীকা গ্রন্থটি আপনাকে একবার আমি পড়ে শুনাবো।"

প্রভু কহিলেন, "আপনার মতো মহৎ বৈষ্ণব ভাগবতের টীকা লিখেছেন, এতো অতি চমৎকার কথা। কিন্তু আমি নিজে ভাগবতের অর্থ তেমন বুঝতে পারি কই? সারাদিন কেবল কৃষ্ণনাম জপ করি, তাও আমার নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হতে চায় না।"

বল্লভ ভট্ট কহিলেন, "আমি কৃষ্ণনামের অর্থ নানাভাবে ব্যাখ্যান ক'রে লিখেছি, তা আপনি একটু শুনুন।

"কৃষ্ণনামের শুধু একটা অর্থই আমি জানি, তা হচ্ছে তিনি শ্যামসুন্দর এবং যশোদানন্দ, আর সব ব্যাখ্যা আমার কাছে অবান্তর। শুধু তাই নয়, আমার অধিকার জন্মায় নি অপর কোনো ব্যাখ্যা শোনবার।"

ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীচৈতন্যের অনিচ্ছা দেখিয়া ভট্ট বড় ম্রিয়মাণ হইলেন। ভাবিলেন, প্রভুর প্রধান প্রধান পার্ষদদের ঐ ব্যাখ্যা শোনানোর জন্য এবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় কই? সবাই প্রভুর নৃত্য কীর্তনে মজিয়া আছে, প্রভুময় হইয়া আছে। ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিবার ধৈর্য বা সময় কাহারো নাই। তাছাড়া, প্রভু শ্রীচৈতন্য নিজেই

যখন ভট্টের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, তবে আর শুধু শুধু কে তাঁহার এই বিদ্যার কচ্কচি শুনিতে যাইবে ?

কয়েকটি স্থানে বিরূপতা দেখিয়া বল্লভ ভট্ট শেষটায় শরণ নিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের। গদাধর শান্ত স্বভাবের লোক, হাঁ না কিছুই বলিলেন না। এই সুযোগে বল্লভ কৃষ্ণনামের যে সব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতকে শুনাইয়া দিলেন।"

চৈতন্যপ্রভুর সভায় গিয়া শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট এক একটি তত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, আর অদ্বৈত প্রভৃতি তাহা তৎক্ষণাৎ যুক্তি তর্কের বলে খণ্ডন করিয়া দেন।

বল্লভ ভট্ট বড় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, এই গৌড়ীয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহার চিন্তাধারাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না, বার বার সবার সমক্ষে তাঁহাকে হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্যকে একটি কূট প্রশ্নের প্যাঁচে ফেলিলেন। কহিলেন, "জীব হচ্ছে প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষ, তার স্বামী। আমরা সবাই তো জানি, যে নারী পতিব্রতা সে কখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। অথচ আপনারা অবাধে উচ্চ স্বরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ক'রে চলেছেন। বলতে পারেন, এটা করছেন কোন্ যুক্তির বলে ?"

অদ্বৈত আচার্য হাসিয়া কহিলেন, "আপনার সম্মুখে মূর্তিমান ধর্ম, মহাপ্রভু, বিরাজ করছেন, তাঁকেই বরং এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।"

বল্লভ ভট্ট এবার প্রভু চৈতন্যকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "সন্ন্যাসীবর, আপনিই বরং আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিন।"

চৈতন্য অবলীলায় বিতর্কের মীমাংসা করিয়া দিলেন—"আচার্য, আপনি প্রশ্নটি ভাল ক'রে তলিয়ে দেখেন নি। পতিব্রতার আসল ধর্ম হচ্ছে তাঁর স্বামীর আজ্ঞা পালন ক'রে চলা। জগতের স্বামী আজ্ঞা দিয়েছেন, নিরন্তর তাঁর নাম নেবার জন্য। জীবরূপে প্রকৃতি কি ক'রে তা লঙ্ঘন করে ? তাই তো নিরন্তর তাঁর নাম উচ্চারণ করছে। আর এ কর্মের যা শ্রেষ্ঠ ফল, তাও সে পেয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁর ভেতর উপজিত হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম।"

এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বল্লভ ভট্ট নিরুত্তর হইলেন।

আর একদিন শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে বসিয়া ভট্ট গর্বভরে, কহিতেছিলেন, "ভাগবতের সুবোধিনী টীকায় আমি শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করেছি, তাঁর অনেক কথা আমি তত্ত্বের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারি নি।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, "স্বামী যে না মানে সে তো ভ্রষ্টা বলে গণ্য হয়।"

বলা বাহুল্য, প্রভুর এ কথায় বল্লভ ভট্ট সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন, আর সভায় একটা চাপা হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

শ্রীধর স্বামীপাদের ভাগবত ব্যাখ্যা ছাড়া প্রভু শ্রীচৈতন্য আর কিছু সমর্থন করিতে

রাজী নন, একথা স্পষ্ট বুঝা গেল। অভিমানাহত বল্লভ ভট্ট যেন মরমে মরিয়া গেলেন, সেদিন আর তাঁহার মুখে বাক্স্ফূর্তি হইল না।

বল্লভ ভট্ট বিদ্বান এবং সৎস্বভাবের বৈষ্ণব, প্রভু তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই বুঝি ভট্টের আত্ম-অভিমানের কাঁটাগুলি এমনিভাবে একটি একটি করিয়া উৎপাটন করিতেছিলেন।

ঘরে ফিরিয়া রাত্রি যোগে বল্লভ প্রভুর আচরণ ও বাণীর মর্ম অনুধাবন করিতে লাগিলেন। যে প্রেমিক সন্ন্যাসী প্রয়াগে থাকা কালে ভট্টের এত আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন, সম্মান জানাইয়াছেন, পুরীতে দেখা যাইতেছে তাঁহার ভিন্ন আচরণ। বল্লভ উপলব্ধি করিলেন, নিশ্চয় তাঁহার অন্তরে পাণ্ডিত্যের অভিমান জাগিয়াছে, তাই চৈতন্য সে অভিমানের শিরে বার বার আঘাত হানিতেছেন।

পরদিন ভোরবেলায় বল্লভ চৈতন্যের সভায় গিয়া উপস্থিত। এবার তাহার পূর্বেকার বিদ্যাগর্ব নাই। প্রভুকে কহিলেন, "আপনার কথায় ও আচরণে আমার চৈতন্যোদয় হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, আমার কল্যাণ সাধনের জন্যই আপনি মাঝে মাঝে দিয়েছেন এমন রূঢ় আঘাত।"

শ্রীচৈতন্য এবার আন্তরিকতাপূর্ণ স্বরে বল্লভ ভট্টকে দান করিলেন তাঁহার উপদেশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব পর্বত॥
শ্রীধর-স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মানি, এত গর্ব ধর॥
শ্রীধর-স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
ভাগবদ্গুরু শ্রীধর-স্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি, ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষ্ণ সংকীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

বল্লভ ভট্টের অন্তর হইতে এবার বিষাদের মেঘ কাটিয়া যায়। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের তিনি তাঁহার নিজের আবাসে নিয়া সযত্নে ভিক্ষা গ্রহণ করান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিত ভট্টের ব্যবহার ও মেলামেশা আবার সহজ হইয়া উঠে।

বল্লভ চৈতন্য ও গৌড়ীয় ভক্তগোষ্ঠীর সহিত হৃদ্য সম্পর্ক রাখিলেন বটে, কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর দিগ্দর্শন অনুযায়ী শ্রীধরের ভাগবত ভাষ্য তিনি গ্রহণ করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের কথায় এবং গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গ প্রভাবে বল্লভ ভট্টের জীবনদর্শনের পরিবর্তন ঘটে। বালগোপাল ইষ্ট ছাড়িয়া কিশোর শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টের ভজনা তিনি শুরু করেন। কিন্তু একথার কোনো সমর্থন বল্লভের জীবনী বা রচনায় পাওয়া যায় না। আচার্য বল্লভ তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমক্ষে যে তত্ত্ব ও ভজনাদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অব্যাহতই থাকে। তবে শ্রীচৈতন্যের কল্যাণময় সান্নিধ্যের ফলে তাঁহার জীবনে ব্রজনন্দন কিশোর কৃষ্ণের ভাব-মূর্তিটি পূর্বাপেক্ষা হয়তো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

বল্লভাচার্য বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী, এই ধারণাটি বল্লভ সম্প্রদায়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বল্লভের মতবাদে তাঁহার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট, নিজের শাস্ত্রবিদ্যা, পুরাণশাস্ত্রের দক্ষতা ও প্রেম ভাবালুতা সহায়ে তিনি নূতনতর একটি ভাগবত ধর্মের প্রবর্তন করেন। অনেক স্থলে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া নিজস্ব মতবাদও তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আসলে বল্লভ আচার্যকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে কয়েকটি কারণে। সম্ভবত বল্লভের পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বল্লভ হয়তো তাঁহার প্রথম জীবনে ঐ সম্প্রদায়ের ভাব-ধারায় প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। একদল গবেষক ইহাও মনে করেন, কালক্রমে বিষ্ণু-স্বামী সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক বল্লভের সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারাই প্রধানত ঝুঁকিয়াছিলেন বল্লভকে বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন আচার্য হিসাবে দেখানোর জন্য।[১]

আচার্য বল্লভের রচিত গ্রন্থের অন্যতম তাঁহার 'অনুভাষ্য'। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চার অধ্যায়ের ভাষ্য দেওয়া আছে এবং ইহার মাধ্যমে বল্লভ শংকরের অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাগবতের ব্যাখ্যা 'সুবোধিনী'-তে আচার্যের দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত।[২] তাঁহার লিখিত আরও গ্রন্থ আছে বলিয়া সম্প্রদায় হইতে দাবি করা হয়। কিন্তু সেগুলি দুষ্প্রাপ্য।

আচার্য বল্লভ শংকরের 'জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ' নানা যুক্তি সহায়ে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রুতির প্রমাণ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন -এই জগৎ ব্রহ্মের রচিত, ইহা ব্রহ্মের কার্য, তাই ইহা ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য।

তিনি বলিয়াছেন মর্যাদা ও পুষ্টিভেদে ভক্তির পথ দুইটি। শাস্ত্র যে বৈধী ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাই মর্যাদা মার্গ, আর কৃষ্ণের অনুগ্রহলব্ধ যে ভক্তি তাহাই পুষ্টিমার্গ। ভাগবত পুরাণে শ্রীশুকের বাক্য রহিয়াছে—'পোষণং তদনুগ্রহঃ'—ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহাই হইতেছে পোষণ। এই পোষণ-এর ভিত্তির উপর বল্লভ দাঁড় করাইয়াছেন তাঁহার পুষ্টিমার্গের তত্ত্ব। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাগমার্গীয়

---

১ শ্রীবল্লভাচার্য (ইং) . ভাই মণিলাল পারেখ।

২ সিদ্ধান্ত রহস্য, ভাগবত-লীলারহস্য- একান্ত রহস্যও আচার্য বল্লভের রচিত।

সাধনেব মতো। বল্লভেব পুষ্টিমার্গে ভগবানেব অনুগ্রহ বা কৃপাব উপবই একান্তভাবে নির্ভব কবিতে বলা হইযাছে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' শ্রুতিব এই মন্ত্রেব উল্লেখ কবিযা বল্লভ দেখাইযাছেন যে, পবব্রহ্ম দ্বাবা যে ভক্ত বৃত হন, তিনিই হইতেছেন পুষ্টিমার্গেব পথিক। পুষ্টিভক্তি চাব প্রকাবেব, ইহাও বল্লভ বিশ্লেষণ কবিযা দেখাইযাছেন।

বল্লভেব জীবনদর্শন আলোচনা কবিলে দেখা যায, নৈতিবাদকে কখনো তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দার্শনিকতা ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-কে একসঙ্গে মিলাইযা নিয়াছে। শাস্ত্রেব ভিত্তিতে যে নূতনতব বৈষ্ণবীয দর্শন ও ভক্তিবাদ তিনি স্থাপন কবিলেন, তাহাব নাম দিলেন শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ।

সাধন ভজনেব ক্ষেত্রে বল্লভ ভট্ট কৃচ্ছ্র বা অত্যধিক ত্যাগ তিতিক্ষাব যৌক্তিকতা স্বীকাব করেন নাই।[১] সংসাব-জীবনে মধ্যপথ অবলম্বন কবা ও সদাই কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইযা কৃষ্ণমুখী হইযা থাকা, কৃষ্ণেব অনুগ্রহে বা পুষ্টিব আশায উন্মুখ থাকা এ সবেব উপবই তিনি অধিকতব গুরুত্ব আবোপ কবিযাছেন।

নিজেব ব্যক্তিগত জীবনেও বল্লভাচার্য এই মধ্যপথ এবং নিবন্তব কৃষ্ণ ভাবনাব পথ অবলম্বন কবিযা থাকিতেন। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও চৈতন্যেব পবে তাঁহাব মতো এত বড় শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণব ও ধর্মনেতা আব ভাবত ভূমিতে দেখা যায নাই। তৎসত্ত্বেও বল্লভ নিজেকে কোনোদিন অবতাব বা অবতাবপ্রতিম ধর্মাচার্য কবিযা তুলিতে চান নাই। নিজের প্রতিষ্ঠিত হাবেলী বা মন্দিবগুলিব কোথাও কৃষ্ণবিগ্রহেব পাশে নিজেব বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠা কবিতে দেন নাই।

অডৈলেব গৃহে অতি সাধাবণ একজন আচার্যেব অনাড়ম্বব জীবনই বল্লভ ভট্ট যাপন কবিতেন। উত্তব ভারতেব ভক্তসমাজে অসামান্য প্রতিপত্তি তাঁহাব ছিল, বহু অর্থ ও বিলাসেব দ্রব্য তিনি উপঢৌকনও পাইতেন, কিন্তু নিজে এগুলি কোনোদিন ব্যবহাব কবেন নাই। বাব বাব সাবা ভাবত তিনি পবিব্রাজন কবিযাছেন, কিন্তু পাযে কোনোদিন পাদুকা ছিল না, অঙ্গে শুধু থাকিত একটি পবিধানেব বস্ত্র, আব উড়ুনি।[২]

বল্লভ বৈষ্ণবীয সন্ন্যাস বা ভেক কখনো সমর্থন কবেন নাই। ঔপনিষদিক যুগ বা ঋষিযুগেব কল্যাণময গার্হস্থ্য আশ্রমকেই তিনি অনুসবণ কবিতে চাহিযাছেন। তাদেব মতে, সাধক তখনই শুদ্ধ সন্ন্যাস গ্রহণ কবিবে, যখন শ্রীভগবানেব বিবহ-দহন তাঁহার জীবনে চবমে আসিযা পেঁছিযাছে। এই সন্ন্যাসেব পবই নরদেহেব বিনাশ হয়, কৃষ্ণ সাযুজ্য ঘটে, ইহাই তাঁহাব বক্তব্যেব নির্যাস।

আচার্য বল্লভ ভট্টেব নিজ জীবনেব শেষ পর্যাযে তাঁহাব সন্ন্যাসতত্ত্বেব এই নিজস্ব ব্যাখ্যাকেই রূপাযিত হইতে দেখি।

---

১ এই মতবাদেব ছিদ্র দিয়া উত্তবকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বল্লভাচাবী ধর্মনেতাদেব জীবনে দুর্নীতি ও অনাচাব প্রবেশ কবিতে দেখা গিযাছে।

২ ভাই মণিলাল পাবেখ · শ্রীবল্লভাচারিযা।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আচার্য বল্লভ ভট্টের বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর। এ সময়ে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের এক প্রত্যাদেশ আসে তাঁহার কাছে—'সময় হয়ে গিয়েছে, এবার তুমি সংসার ত্যাগ করো, চলে এসো আমার সন্নিধানে।'

সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বল্লভের দেরি হইল না। মাতা ও পত্নীকে তিনি সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিলেন, অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বুঝাইয়া দিলেন এই দৈবাদেশের তাৎপর্য।

ভক্ত দামোদরদাস বল্লভ ভট্টের চির পার্শ্বচর, চির অনুগত। তিনি কহিলেন, তিনিও আচার্যের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন সন্ন্যাস-আশ্রম। অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের নিরস্ত করা হইল, সন্ন্যাস আশ্রমে বল্লভ ভট্টের নব নামকরণ হইল, পূর্ণানন্দ স্বামী। মস্তক মুণ্ডন ও দীক্ষা গ্রহণের পর সাত দিন সাত রাত্রি তিনি নিজেকে ভজনকুটিরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, একান্তভাবে নিবিষ্ট রহিলেন ইষ্টধ্যানে। তারপর কাশীধামের উদ্দেশে শুরু হইল তাঁহার পদযাত্রা।

যাত্রাপথের স্থানে স্থানে, পবিত্র বৈঠক ও হাবেলীতে আচার্যের ভক্ত শিষ্যদের ভিড় লাগিয়া গেল। সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আঠারো দিন পরে পৌঁছিলেন কাশীধামে।

গঙ্গাতীরে হনুমান ঘাটের প্রান্তে আচার্যের জন্য এক পর্ণকুটির তৈরী করা হয়। স্থির করা হয়, এখানে সাতদিন তিনি অবস্থান করিবেন, ভক্ত শিষ্যদের এখান হইতেই বিদায় উপদেশ দিবেন, তারপর মগ্ন হইবেন শেষ পর্যায়ের তপস্যায়।

একদল ঘনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্যসহ পুত্র গোপীনাথ এবং বিঠ্‌ঠলনাথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। করজোড়ে সবাই প্রশ্ন করেন, "আপনার অবর্তমানে আমরা কোন আদর্শ সম্মুখে রেখে অগ্রসর হবো, কৃপা ক'রে তা আমাদের বলুন।"

আচার্য তখন মৌনী হইয়া আছেন। ঘাটের এক প্রস্তরখণ্ডে তিনটি শ্লোক এই জিজ্ঞাসুদের উদ্দেশে তিনি লিখিয়া দিলেন। এই শ্লোকের মর্ম:

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে করবে জীবন ধারণ,
আঁকড়ে থাকবে তাঁর চরণ অহর্নিশি।
তাঁর থেকে বিচ্যুত হলেই জেনো—নিশ্চিত বিনষ্টি,
তোমার দেহ, মন ও নশ্বর যে যে বস্তু দ্বারা তুমি বেষ্টিত,
তা গ্রাস করে ফেলবে তোমার আত্মাকে।
শ্রীভগবান্ আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ,
কভু এই মরজগতের নন,
মরজগতের কোন কিছুতেই নেই তাঁর দৃষ্টি।
হে জীব! নিরন্তর কর তাঁর স্মরণ মনন
মর ও অমর দুই জগতের প্রভু জ্ঞানে।
গোপীভর্তা সেই মাধুর্যময় কৃষ্ণে রাখো মতি,
নিঃশেষে তাঁর চরণে বিলিয়ে দাও দেহ, মন, প্রাণ—

সৎবস্তু আর শাশ্বত আনন্দ মিলবে শুধু
সেই পরম প্রভুরই অপার কৃপায়।

এবার আচার্য প্রকাশ করিলেন তাঁহার চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত। ঘোষিত হইল, ইষ্ট বিরহের চির অবসান এবার তিনি ঘটাইবেন, গঙ্গার পবিত্র স্রোতে নবদেহ দিবেন বিসর্জন।

নির্দিষ্ট লগ্ন উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী ও তীর্থচারী দর্শকের সম্মুখে আচার্য বল্লভ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিলেন। আশ্রিত শিষ্য ও অনুরাগীদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল শোকের আর্তি ও হাহাকার।

জনশ্রুতি আছে, উপস্থিত জনসাধারণ এ সময়ে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান। আচার্যের নবদেহ গঙ্গায় বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান হইতে একটা শুভ্র জ্যোতির ধারা উত্থিত হয়, ধীরে ধীরে আকাশমার্গে মিলাইয়া যায়। ঘাটের জনতার ভিতর হইতে মুহুর্মুহু উঠিতে থাকে মহাসাধক বল্লভাচার্যের জয়ধ্বনি।

শিখগুরু অমরদাস

গঙ্গাস্নান আর গঙ্গাপূজা ছিল ভক্ত গৃহস্থ অমরদাসের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। অমৃতসর অঞ্চলে তাঁহার বাস, গঙ্গা সেখানে হইতে বহু দূরে। তবুও প্রতি বৎসর অমরদাস কোনো একটা পুণ্যযোগ উপলক্ষে গঙ্গায় গিয়া অবগাহন করিতেন, তারপর পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেন স্বগ্রামে।

সেবারও স্নান তর্পণ সারিয়া দেশের দিকে রওনা হইয়াছেন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া গেল। গ্রীষ্মের গরমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত, ক্ষুৎপিপাসায়ও কাতর। পথের পাশে এক বটগাছের ছায়ায় ঝুলিটি নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুরু হইল রন্ধনের উদ্যোগ।

পরিব্রাজনরত এক সাধুও আশ্রয় নিয়াছেন ঐ বৃক্ষতলে। অমরদাস করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, অনুমতি করেন তো, আপনার ভিক্ষা নির্বাহের ব্যবস্থা আমার এখানেই করি।"

আলাপ পরিচয়ে সাধু শুনিলেন, অমরদাস এক ভক্তিপরায়ণ ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা সারিয়া পাঞ্জাবে স্বগ্রামের দিকে চলিয়াছেন। গঙ্গামৃত্তিকার তিলক তখনো শোভিত রহিয়াছে তাঁহার কপালে। সাধু সম্মতি দিলেন, কহিলেন, "বেটা দেখছি, তুমি সজ্জন, ভক্তিমান্। বহুত আচ্ছা, আজ তোমার রসুইকরা খানাই গ্রহণ করবো।"

ভোজনের পর দুজনের বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে সাধু প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, তোমার গুরুকরণ হয়েছে কোথায়?"

"বাবা, সে সৌভাগ্য আর হলো কই?" সখেদে জানান অমরদাস। "মনোমত গুরু আজো মেলে নি। দীক্ষা গ্রহণও তাই ঘটে ওঠে নি। দেখা যাক, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা।"

সাধু চমকিয়া উঠিলেন। রোষ ও বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তাহলে অদীক্ষিত? ছিঃ-ছিঃ। একথা আগে বলো নি কেন? হায় পরমাত্মা! কেন আমি আজ এর হাতে অন্ন গ্রহণ করলুম। দীক্ষা না নিলে যে দেহশুদ্ধি হয় না। অশুচি রসুইয়ের রান্না খেয়ে যে আমি পাপ সঞ্চয় করলুম।"

"বাবা মহারাজ, আমায় মাপ করুন। আমি এত সব জানতুম না। তবে এটা ঠিক, আমি স্নান তর্পণ সেরে এসে রসুই করতে বসেছি, আপনার অন্ন ভক্তিভরেই তৈরি করেছি।"

"না বেটা, তোমার কোনো দোষ নেই। দোষ আমার। আমারই আগে থেকে এ খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তুমি বয়স্ক ব্যক্তি, ভক্তিমান্, নিষ্ঠাভরে তিলক কেটেছো, আমি ধরে নিয়েছিলাম, তুমি অবশ্যই কোথাও দীক্ষা গ্রহণ করেছো। যাক্, যা হবার তো হয়ে গিয়েছে। আবার আমায় গঙ্গার ধারে ফিরে যেতে হবে। গঙ্গা স্নানে শুচি হবে প্রায়শ্চিত্ত ও পুরশ্চরণ করতে হবে।"

"বাবা মহারাজ, আমারই দোষে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।"

সাধু ইতিমধ্যে কিছুটা শান্ত হইয়া আসিয়াছেন। কহিলেন, "বেটা, শুধু দেহ-শুদ্ধির জন্যই গুরুকরণের প্রয়োজন তা নয়, পরমপ্রাপ্তির জন্যও চাই গুরুকৃপা, গুরু হচ্ছেন সূর্য, তাঁর কৃপার আলোয় স্নান করলে তবেই তো শিষ্যের জীবন-কমল ফুটে উঠবে। মুক্তি মিলবে যে গুরুরই কৃপায়। তবে হ্যাঁ, সদ্‌গুরু পেতে হবে, তিনিই সফল করতে পারেন সর্ব অভীষ্ট।"

তল্পিতল্পা গুটাইয়া সাধু আবার ফিরিয়া চলিলেন গঙ্গার দিকে।

অমরদাস তখন বিষাদখিন্ন হৃদয়ে নীরবে বসিয়া ভাবিতেছেন। সাধুর কথা তো মিথ্যা নয়। জীবন ভরিয়া যত কিছু সৎ কাজ ও ধর্মাচরণ তিনি করিয়াছেন, তার সব কিছুই যে নিরর্থক। গুরুকরণ ও দীক্ষার অভাবে যাহার দেহশুদ্ধিটি হয় নাই, মুক্তির কথা, পরমপ্রাপ্তির কথা তো তার কাছে সুদূরপরাহত।

নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন অমরদাস। কিন্তু মন তাঁহার ভারাক্রান্ত, বেদনাহত। সাধুর কণ্ঠে সেদিন যে অপ্রিয় সত্য উচ্চারিত হইয়াছে, বার বার তাহারই অনুরণন চলিয়াছে অন্তরে।

সেদিন অতি প্রত্যূষে জপ ধ্যান সারিয়া, বাড়ির ছাদের এক কোণে নীরবে বসিয়া আছেন অমরদাস, হঠাৎ কানে আসিল সুমধুর নারীকণ্ঠের এক অপূর্ব স্তবগান। এ গানের সংবেদন উত্তাল করিয়া তুলিল সমগ্র সত্তাকে। গুরুকৃপার সুধানিষিক্ত এই স্তব-গানের প্রতিটি পদ তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন

পরম প্রভু বসে আছেন তাঁর সিংহাসনে
অমৃত স্বরূপ হয়ে—
কি ক'রে পৌঁছুবে তাঁর চরণ তলে
না মিলে যদি সদ্‌গুরুর কৃপার হাওয়া ?
কোন ভেলা কোন খেয়া তরীই পৌঁছুবেনা ওপারে।
স্বর্ণময় প্রাচীরে বেষ্টিত আমার প্রভুর প্রাসাদ,
ভেতরে রয়েছে তার মণিমুক্তো হীরের পাহাড়,
কি ক'রে পৌঁছুবে সেথায় গুরুদত্ত মই ছাড়া ?
গুরু-ধ্যানের ভেতর দিয়ে চলে যাও প্রভুর সকাশে,
গুরুর আলোকে দর্শন কর তাঁকে।
সদ্‌গুরু ছাড়া জানেনা যে আর কেউ
খেয়া পারাপারের কৌশলী সন্ধান।
গুরু-রূপী তরণী সহায়ে ঘটবে তোমার উত্তরণ।
পাবে তোমার চিরদিনের ধ্যেয় সেই পূর্ণ স্বরূপকে।

এই স্তবগানের সঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে মধুনিষ্যন্দী রবাব—সুর তাল লয়ের অপরূপ এক মোহজাল বিস্তারিত হইয়াছে চারিদিকে।

প্রাণ গলানো স্তবগাথার ভিতর দিয়া কে ছড়াইতেছে এই স্বর্গীয় আনন্দধারা? অমরদাস তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেলেন, খোঁজ নিয়া জানিলেন, এই ভজনসংগীত গীত হইতেছে তাঁহারই ভ্রাতার গৃহে। কিছুদিন পূর্বে ভ্রাতার এক পুত্র শিখগুরু অঙ্গদের কন্যা বিবি অমরো-কে বিবাহ করিয়াছে, সেই নববধূর কণ্ঠেই শোনা গিয়াছে এই অপরূপ স্তবগান। অভ্যাসমতো প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া বরার সহযোগে সে এই স্তবগান সম্পন্ন করে, তারপর শুরু করে গৃহকর্ম।

মেয়েটির সহিত তখনি সাক্ষাৎ করেন অমরদাস। প্রশ্ন করেন, "মা, বল তো কার কাছে শিখেছো তুমি এই অপূর্ব সংগীত?"

"আমার বাবার কাছে, গুরু অঙ্গদের কাছে," সলজ্জভাবে উত্তর দেয় সে।

কোন্ এক দিব্য আনন্দের স্রোতে অমরদাসের মনপ্রাণ উদ্বেল। সেই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের জন্য তিনি এত ব্যগ্র হইয়াছেন, সেই গুরু অঙ্গদ ছাড়া আর কেউ নয়। ঈশ্বর চিহ্নিত এ মহাপুরুষের চরণেই করিবেন তিনি আত্মসমর্পণ, যাত্রা করিবেন পরমা মুক্তির পথে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিবি অমরো-কে সঙ্গে নিয়া অমরদাস উপস্থিত হন গুরু অঙ্গদের ধর্মসভায়? দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নূতনতর চেতনা, নূতনতর প্রত্যয়—এই যে তাঁহার সদ্‌গুরু, তাঁহার ইহলোক পরলোকের ঈশ্বরচিহ্নিত মহান্ কাণ্ডারী, এই কাণ্ডারীর হাতেই জীবন-মরণের সকল কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

গুরু অঙ্গদের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা। এতদিন পরে উত্তর সাধকের দর্শন তিনি পাইয়াছেন, শিখমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ নেতা দৈবযোগে আসিয়া ধরা দিয়াছেন তাঁহার কাছে। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া গুরু মহারাজ আলিঙ্গন দিলেন অমরদাসকে, চিরতরে দিলেন তাঁহাকে আশ্রয়। উত্তরকালে এই অমরদাসেরই অভ্যুদয় আমরা দেখি শিখ সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরুরূপে।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির যে আলো অমরদাস তাঁহার তপস্যাপূত জীবনে প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা অগণিত শিখ সাধককে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, পৌঁছাইয়া দিয়াছে মুক্তির তোরণ-তলে।

অমৃতসরের নিকটবর্তী বসরকা গ্রাম। এই গ্রামে, ভল্ল শ্রেণীর এক ক্ষত্রিয় বংশে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অমরদাস ভূমিষ্ঠ হন। পিতার নাম তেজভান্, মাতা—ভক্ত কাউর।

পিতার তিনি প্রথম সন্তান। কৃষির জমি ও পৈতৃক ব্যবসায় হইতে যে আয় ছিল তাহা দিয়া বেশ সচ্ছলভাবেই সংসারের ব্যয় নির্বাহ হইত। অমরদাসের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। নিষ্ঠাবান্ ভক্তগৃহ তাঁহাদের। পত্নী মনসাদেবীসহ অমরদাস দৈনন্দিন জীবনে বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

দুই পুত্র, দুই কন্যা ও অন্যান্য আত্মপরিজনসহ ধনে জনে পূর্ণ ছিল তাঁহাদের গৃহ। এই গৃহের দরজায় আসিয়া অতিথি ও দুঃখী মানুষ কখনো ফিরিয়া যাইত না।

বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাধু-সন্তদের সাহায্যদানে অমরদাস ও তাঁহার পত্নীর উৎসাহের সীমা ছিল না।

সে-বার গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার পথে দীক্ষা গ্রহণের যে আকুতি অমরদাসের অন্তরে জাগ্রত হয়, ঘটনাচক্রে তাহাই তাঁহাকে টানিয়া নিয়া যায় গুরু অঙ্গদের সকাশে। নূতনতর সাধনপথে শুরু হয় তাঁহার অভিযাত্রা।

খাদুরে আসিয়া গোড়াতেই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটে অমরদাসের। গুরু অঙ্গদের বসুইকুঠির খ্যাতি তখন সকলেরই জানা ছিল। সম্প্রদায়ের প্রথামতো ভক্ত শিষ্যেরা এই কুঠিতেই একসঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আর সবার জন্য রন্ধন করা হইত একই রকমের খাদ্য।

সেদিন বসুইকুঠিতে মাংস রান্না করা হইতেছে। সবার জন্যই সেদিন মাংস রুটির ব্যবস্থা। কথাটি নবাগত ভক্ত অমরদাসের কানে গেল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, 'চিরজীবন আমি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের জীবন যাপন করে এসেছি। মাছ মাংস কোনোদিন স্পর্শ করি নি। গুরুর এখানে এসে আজ শেষটায় কি আমায় মাংস খেতে হবে? গুরু তো শুনেছি অন্তর্যামী। তিনি কি বুঝবেন না যে আমি নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত? আমি নূতন এসেছি, আমার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করবেন না?'

তাঁহার এ মনোভাব গুরু অঙ্গদের অজানা রহিল না। তখনি বসুইকুঠিতে খবর পাঠাইলেন, "অমরদাসের খাওয়া সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা রাখো। তার জন্য থাকবে নিরামিষ ডাল রুটি।"

এবার অমরদাসের মনে উদিত হইল নূতন চিন্তা—"আচ্ছা, গুরু তো সব কিছু জেনে শুনেই আমার আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিশ্চয় তাঁর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। আমার সংস্কার ও চিরাচরিত অভ্যাসকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে হয়তো নূতন মানুষ তিনি করতে চাইছেন আমায়। মূর্খের মতো আমি তাতে বাধা দিচ্ছি। নাঃ যে আশ্রয়ে এসেছি, সেখানকার রীতিনীতিই আমি গ্রহণ করবো।"

বসুইয়াদের জানাইয়া দিলেন, আমিষই তিনি গ্রহণ করিবেন। আহারের সময় গুরু লক্ষ করিলেন, অমরদাস তাহার পূর্ব সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইলেন এই নবীন শিষ্যের দিকে। অমরদাসের মন ততক্ষণে হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে। হাঁফ ছাড়িয়া তিনি বাঁচিয়াছেন।

পরের দিন গুরু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "সবাইকে ভাগ করে দেবার মতো যে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, সব শিখেরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসে তা খাবে, তাই আমাদের রীতি। নিরামিষ আমিষের বিচার বড় নয়, বড় হচ্ছে সেই বিচার যা নির্দেশ দেয়—সদাই পরিহার করো পরের ধন সম্পদ, পরনারী, পরনিন্দা, ঈর্ষা লোভ আর অহংকার।

অমরদাসকে গুরু ভাঙিয়া চুরিয়া নিলেন কয়দিনের মধ্যে। তারপর নিজের অনেক কিছু সেবার ভার, শিখদের ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন এই নবাগত শিষ্যের উপর।

অমরদাসও মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন গুরুসেবার মহান্ ব্রত। উপলব্ধি করিলেন, এই সেবাব্রতের মধ্য দিয়াই আত্মাভিমান তাঁহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে, গুরুসত্তার উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে তাঁহার সর্ব অস্তিত্বে। তবেই জন্মিবে গুরুর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণের, মুক্তি অর্জনের অধিকার।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অমরদাস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন একজন একনিষ্ঠ সাধকরূপে, গুরু এবং শিখ সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে। শুধু গুরুরই নয়, প্রবীণ শিখ সাধকদেরও গভীর আস্থা ও স্নেহ অর্জন করিলেন অমরদাস।

গোবিন্দ নামে এক ভক্ত সেবার গুরু অঙ্গদের কাছে তাঁহার এক সমস্যা নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গোবিন্দ ধনবান্ ব্যক্তি, খাদুরের কিছু দূরেই এক বিস্তৃত অঞ্চলের সে অধিকারী। দীর্ঘদিন যাবৎ শরিকদের সহিত ভূসম্পত্তি নিয়া জটিল মামলা চলিতেছিল। গোবিন্দের সংকল্প ছিল এই মামলায় জয়ী হইলে গুরু অঙ্গদ ও তাঁহার শিখদের উপযোগী একটি জনপদ সে গড়িয়া তুলিবে। মামলায় জয় তাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু সংকল্প অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হয় নাই, নূতন জনপদ নির্মাণের জন্য যখনই প্রাচীর নির্মিত হইতেছে, রাত্রি যোগে কে যেন তাহা ভাঙিয়া দিতেছে। গোবিন্দের প্রার্থনা, গুরু তাঁহার বিভূতির বলে এই বাধা বিঘ্নকে দূর করিয়া দিন, একবার সেখানে পদার্পণ করুন।

উত্তরে গুরু অঙ্গদ কহিলেন, "গোবিন্দ, তোমার রচিত এই জনপদ হবে শিখদের এক উত্তম সাধনকেন্দ্র। এর নির্মাণকার্য তো ব্যাহত হবার নয়। আচ্ছা, তোমার অভিষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা আমি এখনি করছি।"

অমরদাস সম্মুখেই করজোড়ে দণ্ডায়মান। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গুরু কহিলেন, "আমার প্রতিনিধি হবে অমরদাস বাস করবে তোমার সঙ্গে। তার উপস্থিতিতে সব বাধা বিপত্তি তোমার দূর হয়ে যাবে।

সভায় সমবেত শিখেরা সবাই বিস্মিত, সকলেই এ উহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন। এই তো সেদিন মাত্র অমরদাস গুরুর আশ্রয় নিয়াছেন, সাধনভজন করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এত বড় একটা স্বীকৃতি গুরু তাঁহাকে দিতেছেন।

গুরু অঙ্গদ এবার স্মিত হাস্যে নিজের পবিত্র রূপোয় বাঁধানো যষ্টিটি অমরদাসের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। কহিলেন, "বৎস, আজ থেকে এইটি তোমার রক্ষা করবে, আর শক্তি যোগাবে। গোবিন্দের আরব্ধ কাজ অবশ্যই সুসম্পন্ন হবে।"

গোবিন্দ ও অমরদাসের চেষ্টায় সুরম্য একটি শিখ উপনিবেশ অচিরে গড়িয়া উঠিল। নির্মাণকার্য শেষ হইলে অমরদাস ইহার নামকরণ করিলেন গোবিন্দোয়াল। তারপর উভয়ে খাদুরে আসিয়া প্রণত হইলেন গুরুর চরণে। কহিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা আপনি এই নূতন জনপদে গিয়ে সব শিখ শিষ্যদের নিয়ে স্থায়িভাবে বাস করুন। এখন থেকে সেটি হয়ে উঠুক আপনার প্রধান কেন্দ্র।"

গুরু এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। কহিলেন, "আমি খাদুর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না। গোবিন্দ, তুমি আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, আমায় তুমি নিজের আরও কাছে

পেতে চাচ্ছো, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার প্রিয় শিষ্য অমরদাসই স্থায়িভাবে বাস করবে গোবিন্দোয়ালে। অমরদাসের সঙ্গ পেয়ে তোমার যেমন কল্যাণ হবে, তেমনি তোমাদের ঘিরে এই নূতন জনপদে একটা বড় শিখগোষ্ঠীও গড়ে উঠবে।"

গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া, তাঁহার সেবা পরিচর্যা ছাড়িয়া, অমরদাস আর একটি দিনও অন্য কোথাও থাকিতে চান না। অশ্রুসজল নয়নে কহিলেন, "আমার প্রতি এমন নির্দয় হবেন না, গুরু। আমায় আপনার কাছে রাখুন, সাধনভজনের পথ সুগম ক'রে দিন।"

"অমরদাস, আমি ভেবে রেখেছি, খাদুর ও গোবিন্দোয়ালে দুই স্থানেই তুমি থাকবে। রাত্রে থাকবে গোবিন্দোয়ালে, আর দিনে খাদুরে আমার সেবাকর্মে। এই দুই স্থানে ছুটাছুটি ক'রেও তোমার সাধনভজন ও গুরুসেবা অব্যাহত থাকে কিনা, তার পরীক্ষাও এবার হবে, বৎস।"

গুরুর এই ব্যবস্থা অমরদাস শিরোধার্য করিয়া নিলেন। রাত্রে গোবিন্দোয়ালে নিজের সাধনভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন, আর ভক্ত শিখদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন। পরদিন প্রত্যূষেই ছুটিতেন খাদুরের পথে, সেখানে আপ্রাণ প্রয়াসে করিতেন গুরুসেবা।

তাঁর এসময়কার দিনচর্যার এক মনোজ্ঞ চিত্র দিয়াছেন শিখধর্মের গবেষক এম. এ. ম্যাকলিফ্[১]

"অমরদাস প্রবীণ ভক্ত, তখন প্রায় বার্ধক্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছেন। এসময়ে ভক্তি ও আত্মোৎসর্গের এক দিব্য বিভা যেন ছড়িয়ে থাকতো তাঁর চারিদিকে। শেষ রাত্রে, ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে গোবিন্দোয়ালে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। ভজন কৃত্যাদি সেরে ছুটে যেতেন পুণ্যতোয়া বিপাশা নদীতে। সেখানে এক বৃহৎ ভাণ্ডে গুরুর নিত্যকার স্নানের জল সংগ্রহ করতেন। তারপর ছুটে চলতেন খাদুরের দিকে। "অর্ধেকটা পথ অতিক্রান্ত হবার সময় জপজীর স্তবগুলো তাঁর শেষ হয়ে যেতো। খাদুরে পৌঁছে গুরুকে স্নান করিয়ে 'আশা কি ওয়ার' ভজন সংগীত ভক্তিভরে তিনি শ্রবণ করতেন।

"তারপর শুরু হতো শিখ ভক্তদের বসুইকুঠি সংক্রান্ত কাজের পালা। রান্নার জন্যে কুয়ো থেকে জল তুলতেন ভারে ভারে, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনতেন পাশের বন থেকে, বাসনপত্র মেজে ঘষে করতেন পরিষ্কার।

"বিকেলে ধর্মসভায় বসে পবিত্র 'সোদর' তিনি শ্রবণ করতেন। তা সমাপ্ত হলে যোগ দিতেন শিখ ভক্তদের সান্ধ্য প্রার্থনায়। তারপর গুরুর পাদ-সম্বাহন করতেন বহুক্ষণ ধরে এবং তাঁকে বিশ্রামাগারে পাঠানোর পর, রাত্রিযোগে আবার পদব্রজে ফিরতেন নিজের বাসস্থান গোবিন্দোয়ালে। পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকতো গুরুর স্মরণ মনন, জপ এবং ভজনসংগীত। প্রতিদিন ভোরে গোটা পথের মাঝামাঝি স্থানে এসে যেখানে প্রায়ই তিনি তাঁর জপজী সমাপ্ত করতেন সে স্থানটিকে ভক্ত শিখেরা বলতেন, দমদমা, অর্থাৎ যেখানে সাধক অমরদাস তাঁর দম ছাড়বার একটু অবকাশ পেতেন। পবিত্র

১ ম্যাক্স আর্থর ম্যাকলিফ্: দ্য শিখ রিলিজিয়ন, ভল্যু-২

স্থানটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্যে পরবর্তীকালে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। আজো বহু ভক্তিপরায়ণ শিখ নরনারী দমদমার ঐ মন্দির দর্শন করেন, সিদ্ধ সাধক অমরদাসের পবিত্র স্মৃতি করেন অনুধ্যান।"

সাধক অমরদাসকে কেন্দ্র করিয়া এসময়ে গোবিন্দোয়ালে একটি সুসম্বদ্ধ শিখগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। অমরদাসের গুরুনিষ্ঠা ও জীবনসাধনা তাঁহাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে।

অমরদাস অতঃপর তাঁহার স্বগ্রাম বসরকার বাস উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে গোবিন্দোয়ালেই বাস করিতে থাকেন।

সে-বার পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা চলিয়াছে। নদী নালার জল কমিয়া গিয়াছে। পুকুরগুলি শুষ্ক, কৃষি জমির মাঠ ফাটিয়া চৌচির। ঘাস-পাতার অভাবে গরু মহিষ মরিতেছে, দুঃস্থ জাঠ কৃষকদের মধ্যে উঠিয়াছে হাহাকার।

খাদুরের অনতিদূরেই তপা নামক এক সাধুর বাস। নিম্ন শ্রেণীর কাহিরা জাঠেরা তাহাকে কিছুটা ভয় ভক্তি করে। এ মহা বিপদে তাহারা সাধুর শরণ নেয়, বলে, সাধুজী ক্ষেতের শস্য সব পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। গরু মোষ তো অনেক মরেছে, এবার মানুষও মরবে না খেতে পেয়ে। আপনি তো অনেক তুক্‌তাক্ জানেন। যদি পারেন শিগ্‌গীর বৃষ্টি নামিয়ে দিন, আমাদের প্রাণ বাঁচান।"

তপাসাধু অনেক দিন যাবৎ গুরু অঙ্গদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এবার অঙ্গদকে জব্দ করার সে একটা ফন্দী আঁটিয়া বসে। বলে, "বৃষ্টি আমি নামাতে পারি, তা ঠিক। কিন্তু তোরা তো আমার মূল্য বুঝিস নি এতদিন। আমি এত উপবাস, যোগ তপ করছি, মাথায় জটা রেখেছি, তবু তোরা আমায় মান্য করিস না। তোরা ভিড় করিস গুরু অঙ্গদের সভায়। সেখানে রসুইখানার সামনে গেলেই খেতে পাওয়া যায়, আর সভায় রয়েছে কত আলো রোশনাই হাসি গান। তাই ঐ দিকেই তোদের ঝোঁক। বেশ তো, অঙ্গদকে বল, সে তোদের জন্য বৃষ্টি নামিয়ে দিক। আর যদি সে না পারে আমিই নামাচ্ছি। কিন্তু তার আগে গুরু অঙ্গদকে এখান থেকে দূরে চলে যেতে হবে।"

মূর্খ কাহিরা জাঠেরা উল্লসিত হইয়া উঠে। বলে, "বেশ আমরা গুরু অঙ্গদের কাছে গিয়ে এখনি একথা বলছি।"

তপা সাধুর শর্ত, "গুরু অঙ্গদ এস্থান ত্যাগ করুক। তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই আমি বৃষ্টি নামিয়ে দেব তোদের জন্য।"

জাঠেরা দল বাঁধিয়া খাদুরে উপস্থিত হয়, অঙ্গদকে জানায় সকল কথা।

অঙ্গদ উত্তর দেন, "এ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে ভগবান্ আমাদের পরীক্ষা করছেন। তাঁর বিধান উল্টে দেবার চেষ্টা কেন আমি করতে যাবো? বেশ তো, তপা সাধু যদি তা পারে তাহলে সে করুক। আর আমি এখান থেকে চলে গেলে যদি বৃষ্টি নামে, তোমাদের সবার কল্যাণ হয়, তবে আমি সানন্দে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

প্রবীণ শিখ নেতা ভাই বুধা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "তপা সাধু এই গরীব

নিবক্ষব জাঠদেব যা ইচ্ছে তাই বোঝাচ্ছে। এটা চলতে দেওয়া যায না। এখনি এব প্রতিবিধান আমবা কববো।"

ক্ষমাসুন্দব দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুবু অঙ্গদ স্নিগ্ধস্ববে বলেন, "ভাই বুধা, তুমি বিজ্ঞ ও প্রবীণ। জানো তো, আমাদেব ধর্মেব প্রধান উপদেশ হলো, পাপী আব অপবাধীকে মার্জনা কবা।"

শিখদেব দিকে তাকাইযা গুবু কহিলেন, "আমি আমাব সিদ্ধান্ত স্থিব কবে ফেলেছি। আমি এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ ক'বে চলে যাচ্ছি। তোমবা সব শান্ত হযে থেকো।"

গুবু তৎক্ষণাৎ খাদুব ছাড়িযা চলিয়া যান, দূবে পাহাড়েব কোলঘেঁষা এক অবণ্যে গ্রহণ কবেন আশ্রয।

এদিকে ভণ্ড সাধু তপাব তপোবল বুঝা গেল। বৃষ্টি নামানোব দাবি পর্যবসিত হইল হাস্যকব ব্যর্থতায।

পবদিন প্রভাতে খাদুবে উপস্থিত হইযা ভক্ত অমবদাস দেখেন, গুবু সেখানে নাই, দূব অবণ্যে নিজেকে সবাইযা নিযাছেন।

ক্ষোভে ক্রোধে অমবদাস গর্জিযা উঠিলেন। জাঠদেব ডাকিযা কহিলেন, "তোবা শুধু মূর্খই নয, কাণ্ডজ্ঞানও তোবা হাবিযেছিস। ঐ ভণ্ড তপা সাধুব ভাঁওতায ভুলে তোবা গুবু অঙ্গদেব মতো মহান্ পুবুষকে হাবিয়েছিস। ওবে মাটিব প্রদীপ আব সূর্যেব তফাতও তোবা বুঝতে পাবিসনে? এমনিতেই কর্মদোষে তোবা দুর্দিনে পড়েছিস, এবাবকাব এই কুকর্মেব ফলে আবো দুর্গতি নেমে আসবে তোদেব ওপব।"

জাঠেবা উত্তেজিত হইযা ছুটিযা যায তপা সাধুব কাছে, বলে, "তোমাব চক্রান্তে ভুলে আমবা গুবু অঙ্গদকে হাবালাম। দুর্দিনে তাঁব বসুইখানায গিযে দুমুঠো খেতে পেতাম, সে সুযোগও বইল না। এদিকে তোমাব বৃষ্টি নামাবাব ক্ষমতাও আমবা বুঝে ফেলেছি।"

তপা তাহাদেব বুঝাইযা সুঝাইযা সময নেয, বৃষ্টি নামানোব জন্য অনেক কিছু তুকতাক সে কবিতে থাকে।

এবাব জাঠদেব সবাইকে ডাকিযা অমবদাস বলেন, "তপা যদি তপোবলে বৃষ্টিই নামাতে পাবুবে, তবে সে তোমাদেব দুযাবে দুযাবে ভিক্ষে ক'বে বেড়ায কেন? তাব অহমিকা, কাম ক্রোধ কিছুই আজো যাযনি, ভণ্ডামি নিযে পড়ে আছে। এ হেন লোকেব কুহকে ভুলে তোমবা গুবু অঙ্গদেব মতো মহাত্মাকে দূবে সবে যেতে দিযেছো!"

উত্তেজিত জাঠেরা এবাব তপা সাধুকে ধবিযা মাবপিট কবে, খাদুব হইতে তাহাকে তাড়াইযা দেয। অতঃপব জাঠ ও শিখদেব এক মিলিত দল গুবু অঙ্গদেব অবণ্য আবাসে গিযা উপস্থিত হয, ক্ষমা প্রার্থনা কবে তাঁহাব কাছে, খাদুবে ফিবিযা আসাব জন্য বাব বাব মিনতি জানায।

তপা সাধুব শাস্তিব কথা শুনিযা গুবু ক্ষুব্ধ হন। অমবদাসেব দিকে তাকাইযা বলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও আমাব সাধনাব মূল কথা তোমবা এখনো হৃদয়ঙ্গম কবো নি। সে মূল কথাটি হচ্ছে—শান্তি, সহনশীলতা এবং

ক্ষমা, দেখতে পাচ্ছি প্রকৃত সাধনার ফলে এবং দুঃসহ দুঃখের দহনে যে সহনশীলতা আসে, তা তোমার জীবনে এখনো আসে নি। তপা সাধুর ভণ্ডামি দমন করতে গিয়ে যে কাজ তুমি করেছ তার পেছনে রয়েছে একদল মূর্খ জনতার কাছে বাহবা নেবার গোপন ইচ্ছা। প্রকৃত শিখ সাধককে আরো পরিশুদ্ধ হতে হবে, অমরদাস।"

গুরুর চরণে পতিত হইয়া অমরদাস বার বার মাগিলেন ক্ষমা ভিক্ষা। করজোড়ে কহিলেন, "এবারকার মতো এ দাসকে ক্ষমা করুন গুরুজী। এর পর থেকে চেষ্টা করবো আপনার উপদেশকে জীবনে রূপায়িত করতে।"

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, "অমরদাস, ধৈর্য ও সহনশীলতার ধরিত্রীর মতো হও। দুঃখ কষ্টের ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকো পর্বতের দৃঢ়তা নিয়ে। হৃদয়ে সদাই সঞ্চয় ক'রে রাখবে ক্ষমার ঐশ্বর্য, আর তোমার প্রতি যে যত অন্যায় করুক না কেন তার কল্যাণ সাধনে থাকবে সতত উন্মুখ। সত্যকার সাধকের দৃষ্টিতে থাকবে সমদর্শিতা,- সোনা আর ধূলি মুষ্টিতে পার্থক্য সে করবে কেন? নম্রতার ভেতর দিয়েই হয় জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। হীরে আর মুক্তো, দেখতে কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তার মূল্য কি বিপুল! বৃক্ষের একটা ক্ষুদ্র বীজ কি বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয় দেখেছো তো?"

অমরদাস প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া গুরু অঙ্গদ আবার খাদুরের দিকে রওনা হইলেন। পথে পড়িল ভইরো নামক এক গ্রাম। এই গ্রামে গুরু অঙ্গদের এক পুরাতন বন্ধু বাস করিতেন, নাম তাঁহার খিওয়ান। গুরুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন, পরম সমাদরে নিয়া গেলেন তাঁহার নিজের ভবনে। অতিথিদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হইল।

এই সময়ে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অমরদাস সহসা বলিয়া উঠিলেন, "খিওয়ানের মতো হৃদয়বান ব্যক্তি বড় কম দেখা যায়। তদুপরি তিনি আমাদের গুরুর পূর্বতন বন্ধু। কিন্তু দেখছি, তাঁর কোনো পুত্র-সন্তান নেই। আহা, দুর্ভাগ্য তাঁর দূর হোক, অচিরে একটি পুত্ররত্ন তিনি লাভ করুন।"

সঙ্গী শিখ ভক্তেরা সবাই চমকিয়া উঠিলেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড অমরদাসের। গুরু এখনো জীবিত, শুধু জীবিত নয় সশরীরে সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান। আর অমরদাস কিনা তাঁহারই কাছে দাঁড়াইয়া খিওয়ানকে বর দিতেছেন—একটি পুত্র লাভ হোক তাঁর। তবে কি গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অভিলাষ তাঁহার হইয়াছে? এ অহমিকা তো ভালো নয়!

ইতিমধ্যে অমরদাসেরও হুঁশ আসিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছেন গুরুর সাক্ষাতে এ ধরনের উক্তি করা শোভন হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, গুরুর উপদেশের অবমাননাই তিনি করিয়াছেন। এখনো প্রকৃত সংযম তাঁহার জীবনে আসে নাই।

করজোড়ে গুরুর কাছে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে গুরু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "অমরদাস শান্ত হও, এতে তোমার কোনোই দোষ নেই। হাঁ, তাহলে সর্ব সমক্ষেই আমাকে আসল কথাটি বলতে হচ্ছে। আমার আলো তোমার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়েছে, বৎস। এখন থেকে মাঝে মাঝে তোমার ভেতর দিয়ে আমার

কথা, আমার তত্ত্ব ফুটে বেরুবে। কাজেই, কোনো কিছু বলার সময় তুমি হুঁশিয়ার থেকো।"[১]

খাদুরে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে গুরু অঙ্গদ একদিন অন্তরঙ্গ সহচরদের কাছে অমরদাসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "তোমরা দেখবে, উত্তরকালে অমরদাস বহু মুক্তিকামী নরনারীকে উদ্ধার করবে। তার স্বরূপ আমি বুঝে নিয়েছি। তার চোখ দুটো ধন্য, তা দিয়ে সে দর্শন করে সদ্‌গুরুকে। হাত দুটো নিরত করেন গুরুসেবা। তার চরণযুগল ধন্য, তা সদাই তাঁকে বহন ক'রে নিয়ে যায় উচ্চকোটির মহাত্মাদের কাছে। তার কান দুটো ধন্য, তা দিয়ে শ্রবণ করে ভগবানের পুণ্যময় প্রশস্তি। তার জিহ্বা ধন্য, তা দিয়ে নিরন্তর সে উচ্চারণ ক'রে চলেছে নানকজীর মধুময় স্তব।"

পাশে দাঁড়ানো প্রবীণ ভক্তেরা গুরুর মুখের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। সাধক অমরদাসের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে সেদিন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গুরু অঙ্গদের একটি প্রথা ছিল—প্রতি ছয় মাস অন্তর মন্ডলীর শ্রেষ্ঠ শিখ ভক্তকে তিনি একটি সম্মানসূচক জোব্বা দান করিতেন। অমরদাসের ভাগ্যে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইত এই বিশেষ সম্মান। যে সব জোব্বা তিনি পুরস্কার পাইতেন সবগুলিই পরম পবিত্রজ্ঞানে মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। এভাবে ক্রমে তাঁহার মাথায় জমিয়া উঠে পরিচ্ছদের এক বৃহৎ স্তূপ। ঈর্ষাপরায়ণ ভক্তরা কহিত, "অমরদাসের সব কিছুই উদ্ভট। মাথাটা আজকাল ওঁর খারাপ হয়েই গিয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে গুরুগত কৃপায় গুরুগতপ্রাণ অমরদাস ধীরে ধীরে পরিণত হইতেছেন এক উচ্চকোটির সাধকে। বাসনামুক্ত, সংযতমনা, বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিতেছে তাঁহার আন্তর বিবর্তন। এসময়ে সাধনার গভীরে সতত থাকিতেন নিমজ্জিত, আর বহিরঙ্গ জীবনে গুরুসেবা, আর্তত্রাণ আর জনসেবায় তিনি সদা নিরত।

একবার দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর গুরু অঙ্গদের পায়ে একটি মারাত্মক ঘা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে সেটি পাকিয়া যায়। গুরুর পদসেবা করিতে বসিয়া এ অবস্থাটি অমরদাসের নজরে পড়ে। প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলেন, "হয়তো এ ঘায়ে পুঁজ জমে উঠেছে, তাঁর বেদনায় কয়েক রাত যাবৎ আমার ঘুমও হচ্ছে না।"

তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম কি করিয়া করা যায় অমরদাস ভাবিতে লাগিলেন। তারপর পন্থা স্থির করিতে দেরি হইল না। ঘায়ের মুখে নিজের মুখটি লাগাইয়া সবটা পুঁজ রক্ত শুষিয়া নিলেন। ব্যথা তখনই কমিয়া গেল আরাম পাইয়া গুরু নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এমনি অনায়াস এবং স্বতঃস্ফূর্ত ছিল নিষ্ঠাবান শিষ্য অমরদাসের গুরুসেবা।

পরদিন প্রসন্নমনে গুরু বলেন, "অমরদাস, সেবানিষ্ঠা দিয়ে তুমি আমায় কিনে নিয়েছ। তুমি আমার কাছ থেকে তোমার ইচ্ছামতো বর চেয়ে নাও।"

উত্তরে অমরদাস বলেন, "গুরুজী, আমি জানি আপনি বিপুল যোগবিভূতির

---

১ এম্ এ. ম্যাকলিফ : দ্য শিখ রিলিজিয়ন, ভল্যু ২

অধিকারী। আমি চাই আপনি নিজের দেহে এসব দুঃসহ রোগ আর ভোগ করবেন না। আপনি শক্তি বলে দেহ থেকে রোগকে করবেন নিষ্কাশিত। আপনার রোগভোগ আর কাতরোক্তি আমি কোনোমতেই সহ্য করতে পারিনে।"

"তা হয় না অমরদাস। দেহের সুখ ও অসুখ দুই-ই ভগবানের দান। এ দুটোই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে তাঁর হাত থেকে। বরং অসুখের জ্বালাকে আমি উপকারী বন্ধু বলে মনে করি, তা বেশী ক'রে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উদ্ধারকারী ভগবানের কথা।"

জরা ও ব্যাধির আক্রমণে গুরু অঙ্গদের দেহ কিছুদিন যাবৎ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। একদিন তিনি অন্তরঙ্গ শিষ্য ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "সিদ্ধ সন্তেরা যেন ভগবান্ প্রেরিত মেঘমালা। নানা আকারের দেহ ধারণ ক'রে তাঁরা কল্যাণ বর্ষণ করেন জনসমাজে। তারপর একদিন বিলীন হয়ে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচ্ছদ বদলানোর মতো দেহটি বার বার তাঁরা বদলান বটে, কিন্তু আত্মা থাকেন নির্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়। এবার কিন্তু আমার এ জীর্ণ পরিচ্ছদটা বদলে নেওয়া দরকার। কিন্তু তোমরা ভেবো না, এই আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার যোগবন্ধনে যাঁরা বাঁধা পড়েছেন, তাঁরা আমায় সব সময়েই পাবেন তাঁদের পাশে।"

শিষ্যরা বুঝিলেন, গুরুর বিদায় আসন্ন। স্বভাবতই মন তাঁহাদের বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

গুরুর দেহান্তের পরে কে তাঁহার সাধন-ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হইবেন, কে এই ক্রমবর্ধমান শিখমণ্ডলীকে পরিচালিত করিবেন, এই প্রশ্ন তখন অনেকেরই মনে উদিত হইতেছে।

গুরু অঙ্গদ কিন্তু নিজে মনে মনে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াই রাখিয়াছেন। তিনি জানেন, সাধনার সাফল্য, চরিত্রবল এবং ঔদার্যের গুণে অমরদাসের জুড়ি কেহ নাই। কিন্তু গুরুর প্রয়াণের পর মণ্ডলীর সবাই কি তাঁহাকে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিবে? তাঁহার নিজের পুত্রদ্বয় এবং আরও কয়েকজন প্রবীণ শিখ অমরদাসকে তাঁহার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দিতে তেমন রাজী নয়। তাই ইঁহাদের দৃষ্টি সমক্ষে অমরদাসের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনে তিনি প্রয়াসী হইলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরম চলিতেছে। ইঁদারা ও পুষ্করিণীতে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। ভোরবেলায় বিপাশা নদী হইতে ভাঁড়ে করিয়া ভক্তেরা যে জল বহন করিয়া আনে, দিন ভরিয়া তাহাই সবাই পান করে। সেদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল, পানীয় জলের ভাণ্ড একেবারে শূন্য। হঠাৎ কাহারো তৃষ্ণা পাইলে জল সররাহের কোনো উপায় নাই।

গভীর রাতে দেখা দিল এক প্রচণ্ড ঝড়। বৃষ্টিপাতও চলিল বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। এতদিন পরে ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, সেবক ও ভক্তেরা সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এমন সময়ে গুরু অঙ্গদ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, দুই পুত্রকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া

কহিলেন, "আমার প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে। এখন কি করা যায়? ঘরে তো দেখছি, এক ফোঁটা পানীয় নেই। এই গভীর রাতের অন্ধকারে কে বিপাশা থেকে জল আনতে পারবে, বল তো?"

পুত্রেরা আরামে নিদ্রা দিতেছেন, ডাকাডাকির পর পাশ ফিরিয়া শুইলেন। জল আনা বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করিলেন না।

অমরদাসের ঘুম ইতিমধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি গুরুর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার চরণের দাস যে এখানে হাজির রয়েছে। আপনি অপেক্ষা করুন, এখনই বিপাশা থেকে আমি জল নিয়ে আসছি।"

তখন মধ্য রাত্রি। ঝড় বাদলে সারা পথ প্রান্তর অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জলের ভাণ্ড মাথায় নিয়া বিপাশা হইতে জল সংগ্রহ করা বড় সহজ কাজ নয়।

গুরু কহিলেন, "না অমরদাস, তুমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছো। এ বয়সে এই রাতে বিপজ্জনক রাস্তায় তোমার যাওয়া ঠিক নয়।"

"প্রভু, আপনার তৃষ্ণার জল আনতে হবে, একথা শোনামাত্রই যে আমার বয়স কমে গিয়েছে, যুবকের শক্তি ও সাহস এসে গিয়েছে আমার দেহে। আমি এক্ষুনি জল নিয়ে আসছি।"

দ্রুতপদে বিপাশার তীরে গিয়ে উপস্থিত হন অমরদাস। গুরুর জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডটি কাঁধে তুলিয়া নিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে জপজী গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চলিলেন খাদুরে।

নগরের উপান্তে একদল জোলার বাস। তাহাদের ঘরের পাশে বহুসংখ্যক গর্ত, এগুলিতে পা রাখিয়া তাহারা তাঁত বোনে। বৃষ্টিতে এই গর্তগুলিতে জল জমিয়া গিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে গর্তস্থিত একটি বাঁশের খুঁটিতে অমরদাসের পা সজোরে ধাক্কা খায় আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও জলের ভাণ্ডটি তিনি ছাড়েন নাই, কোনোমতে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

এত রাত্রে কিসের শব্দ? চোর ডাকাত কেউ নয় তো? জোলারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। নিকটে আসিয়া দেখে, এ যে গুরু অঙ্গদের বর্ষীয়ান চেলা অমরদাস, পানীয় জলের ভাঁড় নিয়া আশ্রমে ফিরিতেছে।

পরিচিত এক জোলা রমণী বলিতে থাকে, "যাক, বাঁচা গেল, চোর ডাকাত কেউ নয়। এ সেই বুড়ো অমরু, দিনরাত পাগলের মতো গুরুর আশ্রমের জল টানছে, লাকড়ি নিয়ে আসছে। অথচ নিজের স্ত্রীপুত্রের দিকে এতটুকু নজর নেই, ক্ষেতি আর কারবার চুলোয় গিয়েছে। কি অদ্ভুত মানুষ এই অমরু! বুড়ো বয়েসে বিশটা জোয়ান মানুষের কাজ একহাতে ক'রে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর তার গুরুই বা কম অদ্ভুত কি? বাড়িতে এক লঙ্গরখানা তৈরি করেছে, দিনরাত চলেছে নিষ্কর্মাদের হৈ-হুল্লোড।"

যতক্ষণ অমরদাসের সম্বন্ধে নিন্দা সমালোচনা হইতেছিল তিনি নীরবে তাহা শুনিয়াছেন, একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু গুরুর সম্পর্কে জোলাপল্লীর তাচ্ছিল্য-

ভরা উক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি পাগল হয়ে গিয়েছো, তাই দেবতুল্য গুরু সম্পর্কে এমন আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছো।"

বাক্‌সিদ্ধ অমরদাসের কথা কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফলিয়া উঠে। জোলা-গিন্নি উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করিয়া দেয়।

অমরদাস আশ্রমে ফিরিয়া আসেন, তৃষ্ণার্ত গুরুকে সযত্নে পান করান বিপাশার জল। তারপর হৃদয় তাঁহার শান্ত হয়।

পরের দিন একদল জোলা সেই উন্মাদ রমণীকে নিয়া অঙ্গদের সভায় আসিয়া হাজির। কাতর কণ্ঠে করজোড়ে তাঁহারা নিবেদন করে, "গত রাতে অমরদাস একে গাল দিয়েছে পাগল বলে, তারপর থেকেই এর মাথা গেছে বিগড়ে। ওঝা, কবরেজ কত কিছু দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। উন্মাদ রোগ কেবল বেড়েই চলেছে। আপনি এক্ষুণি এর একটা বিহিত করুন।"

অন্তরঙ্গ শিখ ভক্তেরা গুরুর চারিদিকে বসিয়া আছেন, সকলেরই চোখে মুখে কৌতূহল ও বিস্ময়ের ছাপ। গুরু তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিতে থাকেন, "অমরদাসের সাধনা, তার গুরুসেবা সফল হয়েছে। সিদ্ধির আলোয় আজ সে আলোকিত। সাধকের এই অবস্থায় প্রকৃতি আপনা হতে তার কাজ সুসম্পন্ন ক'রে দেয়, তার ক্ষীণতম ইচ্ছাটি এক মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করেছে এই রমণী সম্পর্কে তাই তৎক্ষণাৎ ঘটে উঠেছে। এতে কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই। অমরদাস বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, তার কথা তো ফলতেই হবে।"

শিখ ভক্তশিষ্যেরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমরদাসের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর জোলাদের মুখপাত্রটি গুরুর কাছে বার বার মিনতি জানাইতেছেন, "আপনি একবার কৃপা দৃষ্টি দিন, এই মেয়েটির ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হয়েছে, এবার সে সুস্থ হয়ে উঠুক।"

এবার উন্মাদ নারীর দিকে নিবদ্ধ হয় গুরু অঙ্গদের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ মা, তুমি এখন যেতে পারো, তোমার রোগমুক্তি ঘটেছে। আর কোনো চিন্তার কারণ নেই।"

শিখ শিষ্য ভক্তদের দিকে তাকাইয়া গুরু সহাস্যে কহিলেন, "অমরদাসের গুরুসেবার এই কাহিনীটিকে কিছুদিন জনমানসে জাগরূক রাখা ভাল। কি বল তোমরা? হ্যাঁ জোলাদের পল্লীতে যে শালের খুঁটিতে অমরদাসের পা ধাক্কা খেয়েছিল, সেই শুকনো 'খুঁটিটি আবার বেঁচে উঠবে, সেটি পরিণত হবে এক সজীব ও পুষ্পিত শালবৃক্ষে। আরো তোমরা জেনে রেখো, আপনভোলা বৈরাগ্যবান্ অমরদাসকে অনেকে গৃহহীন, ছন্নছাড়া পাগলাটে মানুষ বলে ভাবে বটে, কিন্তু একদিন এই অমরদাস আশ্রয় দেবে সহস্র মানুষকে, নিঃস্বকে দেবে খাদ্য আর বস্ত্র, দুর্বলকে দেবে শক্তি, মুক্তিকামী মানুষকে দেবে দিব্যজীবনের আস্বাদ।"

গুরুর চোখে মুখে খুশীর উচ্ছলতা। প্রিয় পার্ষদদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "অমরদাসের প্রস্তুতির পালা সমাপ্ত। সাধনা তার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। এবার

আমার কাঁধের ভার চাপাতে চাই তার ওপর। কারণ, আমার এদেহে আর থাকবার প্রয়োজন নেই।"

আদেশ পাওয়া মাত্র সেবকরা একটি নারিকেল, পাঁচটি তাম্রমুদ্রা এবং একটি নূতন জোব্বা আনিয়া দেন। নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গুরু অঙ্গদ প্রিয় শিষ্য অমরদাসকে অভিষিক্ত করেন, উপবেশন করান গুরুর আসনে। দরবার মুখর হইয়া উঠে নূতন ধর্মনেতা অমরদাসের জয়ধ্বনিতে।

অঙ্গদের ইঙ্গিতে সব ভক্ত শিষ্যেরা অমরদাসের চরণ বন্দনা করেন। নূতন গুরুর অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন শহরের এবং দূর দূরান্তের ভক্ত নরনারী। অঙ্গদ প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি কয়েকদিনের ভেতরেই এ মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে গুরুর আসনে, পরমগ্রন্থের নানকজীর আসনে, উপবেশন করিয়ে গেলাম গুরু অমরদাসকে। যে শিখ অনন্যভাবে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, ইহজগতে পাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর পরলোকে পাবে পরমা মুক্তি।"

অমরদাসকে ঘিরিয়া শুরু হয় শিখ সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর সাদর সম্ভাষণ ও সংবর্ধনা।

পূর্ব নির্ধারিত দিনে অঙ্গদের তিরোধান ঘটে, তিরোধানের পূর্বে অমরদাসকে বলিয়া যান, "তুমি গোবিন্দোয়ালে গিয়ে স্থাপন করো গুরুর আসন, এবার থেকে সেখানেই গড়ে উঠুক শিখধর্মের প্রধান কেন্দ্র।"

গুরু অঙ্গদের প্রয়াণে ভক্ত শিষ্যরা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এসময়ে প্রাজ্ঞ নেতা ভাই-বুঢ্ঢা সবাইকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত করিতে থাকেন। সবার শেষে নূতন গুরু অমরদাস দান করেন তাঁহার আন্তরিক ভাষণ।

গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনার পর তাঁহার মুখে শোনা যায় আত্মার অবিনাশিত্বের দৃপ্ত ঘোষণা। উদ্দীপিত স্বরে তিনি বলেন, "গুরু অঙ্গদ অমর, অবিনশ্বর। মানুষের দেহ যেমন জন্মলাভ করে তেমনি আবার তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের আত্মার কোনো বিনাশ নেই, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা অনাদি অনন্ত। সাধু মহাপুরুষেরা নরজীবনকে দেখেন নিতান্ত অস্থায়ী বস্তু বলে। পক্ষী সাময়িকভাবে বৃক্ষের নীড়ে আশ্রয় নেয়, ডিম পাড়ে, খাদ্য আর খড়কুটো নিয়ে ছুটোছুটি করে। তারপর উড়ে চলে যায় আর এক কুলায়ে। আত্মার নরদেহ আশ্রয়ও ঠিক এমনি অস্থায়ী। জীবন যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, এই শিক্ষাটি পাওয়া যায় সিদ্ধ মহাপুরুষদের কাছে। তাঁদের এই শিক্ষাকে তোমরা জীবনে ও আচরণে রূপায়িত করো। অমরলোকে, সূক্ষ্মলোকে, দিব্য চেতনার যে ধারা প্রবাহিত তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করো, তবেই সংসারের ভয় ও সংশয় ঘুচবে, অভয় রাজ্যের সন্ধান পাবে, মুক্তি পাবে দেহান্তরে ঘুরে মরবার দুঃখ থেকে।"

অমরদাসের গুরু-জীবনের গোড়াতেই দেখা দিল এক বিরাট পরীক্ষা। গুরু অঙ্গদের পুত্র দাতু তাঁহার বিরুদ্ধে স্থাপন করিলেন নিজের দাবি। খাদুরীস্থিত গুরুর গদি অধিকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "পিতার আসনে পুত্রেরই স্বাভাবিক অধিকার।

আমি আমার পিতার গদিতে উপবেশন করেছি এবং শিখমণ্ডলীর দায়িত্বও নিয়ে নিয়েছি। এখন থেকে ভক্তেরা আমার সভায় উপস্থিত হবে, আমার কাছে ধর্মকথা শুনবে, আমাকেই ভেট দেবে।"

"তোমার পিতা গুরু অঙ্গদ যে অমরদাসকেই গদির উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।" বলেন এক প্রবীণ শিখ।

তাচ্ছিল্যভরে দাতু উত্তর দিলেন, "অমরুর কথা বলছেন ? সে তো অকর্মণ্য, বৃদ্ধ। আমাদের পাকশালার জন্য এতদিন জল আর জ্বালানি সে টেনে আনতো। এতবড় একটা শিখমণ্ডলীর গুরু হবার যোগ্যতা তার কই ?"

বিতর্ক ও সংঘর্ষের পথে না গিয়া শিষ্যেরা সবাই গুরু অমরদাসকে নিয়া স্থানত্যাগ করিলেন, উপস্থিত হইলেন গোবিন্দোয়ালে। এখানে রীতিমতো শুরু হইল নিত্যকার ধর্মসভার অধিবেশন ও সদাব্রতের অনুষ্ঠান।

ওদিকে খাদুরে বসিয়া দাতু শুরু করিয়াছেন তাঁহার গুরুগিরি। একদিন দূর অঞ্চল হইতে কয়েকটি ভক্ত শিখ খাদুরে আসিয়া উপস্থিত। গুরু অমরদাসের কাছে ধর্ম উপদেশ শুনিতে তাঁহারা আসিয়াছে, সঙ্গে আনিয়াছে নানা ভেটদ্রব্য। অমরদাস যে স্থানত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদ তাহাদের জানা ছিল না। অতঃপর তাহারা গোবিন্দোয়ালে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান।

আগন্তুকেরা চলিয়া গেলে দাতুর এক পার্শ্বচর কহিল, "দেখলেন তো অমরদাসের সভা কেমন জমজমাট হয়ে উঠেছে। নানা অঞ্চল থেকে শিখ ভক্তেরা এসে তার কাছে জুটেছে। দিচ্ছে অজস্র উপহার দ্রব্য। তার ওখানে লোকজনের ভিড় আর খানাপিনা লেগেই আছে। আপনার ভক্তের যে প্রভাব প্রতিপত্তি, তার এতটুকু আপনার নেই। যান, একবার গোবিন্দোয়ালে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন অমরদাসের কি প্রতাপ।"

ঈর্ষা আর রোষে দাতু অধীর হইয়া উঠেন, সেইদিনই একদল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে।

সোহিলা ধর্মসংগীত গীত হইবার পর গুরু অমরদাস তখন প্রশান্ত কণ্ঠে সমবেত শিখভক্তদের উপদেশ দিতেছিলেন।

দাতু তাঁহার লোকজন নিয়া চড়াও হইলেন, গর্জিয়া কহিলেন, "এই সেদিন অবধি আমার ঘরে তুমি জলটানা চাকরের কাজ করেছো, আজ এখানে এসে অধিকার ক'রে বসেছো আমার বাবার গদি। হতচ্ছাড়া বুড়ো, বেরোও এখান থেকে।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ দাতু পদাঘাত করিয়া বসেন বৃদ্ধ সর্বজনশ্রদ্ধেয় অমরদাসকে।

অমরদাস একটি ইঙ্গিত করিলেই শিষ্যরা দাতুর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনো ক্রোধ বা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি একেবারে ধীর স্থির সমাহিত। শান্ত স্বরে শুধু কহিলেন, "এবার ক্ষান্ত হও। পায়ে চোট লাগে নি তো তোমার ? বেশ তো তুমিই উপবেশন করো এই পবিত্র গদিতে। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

সভা ছাড়িয়া তখনকার মতো গৃহের দোতলার এক নিভৃত কক্ষে অমরদাস চলিয়া গেলেন। ভক্ত শিষ্যদের কহিলেন, "দাতু দুরাত্মা বলে আমাদের তো কাণ্ডজ্ঞানহীন হলে চলবে না। গুরু নানকের, গুরু অঙ্গদের পবিত্র গদির মর্যাদা ও শুচিতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের ওপর। দাতুর সঙ্গে সংঘর্ষ বা কলহে লিপ্ত হলে তাঁদের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হবে। লোকে হাসবে আর বলবে, "দ্যাখো গুরু নানক আর গুরু অঙ্গদের কি শিক্ষা। এর ভেতরেই গদি নিয়ে নির্লজ্জ কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে শিষ্যদের।"

উত্তেজিত শিখভক্তেরা একথায় কিছুটা শান্ত হইলেন। কিন্তু এ সংকটের একটা সমাধান তো করা চাই। সবাই স্থির করিলেন, পরের দিন ধীরেসুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া দাতুকে দমন করার একটা উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

এদিকে গভীর রাত্রে শয্যায় বসিয়া গুরু অমরদাস স্থির করিলেন, 'গুরুর গদি নিয়ে কোনোমতেই লজ্জাকর দ্বন্দ্বে আমি প্রবৃত্ত হবো না। গুরুর কাছে যে উপদেশ পেয়েছি তার মূল কথা—সহনশীলতা, আত্মসমর্পণ ও নামজপ। সেই মূল তত্ত্বকেই আমি ধরে থাকবো। এসব যা কিছু এখন চলেছে, সবই তো গুরুরই পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। হ্যাঁ, আজ এখনি আমি গোবিন্দোয়াল ত্যাগ করে চলে যাবো কোনো নিভৃত স্থানে। সেখানে অজ্ঞাতবাসে থাকবো, আর দিন কাটাবো নিরন্তর জপ ধ্যান ক'রে।'

গোবিন্দোয়াল ত্যাগ করিলেন অমরদাস। শেষ রাত্রে ঘন অন্ধকারের আড়ালে, উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে দ্রুতপদে চলিলেন বহুদিনের ছাড়িয়া আসা নিজের গ্রাম বসরকার দিকে।

ভোরবেলায় গ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটিল পূর্ব-পরিচিত এক কৃষকের সঙ্গে। এ অবস্থায় অভাবনীয়রূপে অমরদাসকে দেখিয়া সে বিস্মিত হয়, বলিয়া উঠে, "অমরদাস, বহুদিন পরে আপনার দর্শন পেয়ে বড় খুশী হলাম।"

"হ্যাঁ ভাই, তোমাকে দেখে আর দেশে ফিরে এসে, আমারও কত আনন্দ হচ্ছে।'

"দেশপ্রসিদ্ধ শিখগুরু আপনি। আজকাল সবার মুখে শুনি, আপনি গুরুর গদি পেয়েছেন। আপনার সিদ্ধির কথা প্রতিপত্তির কথাও সর্বত্র রটে গিয়েছে। কিন্তু এসময়ে একলাটি এভাবে আপনি কোথা থেকে আসছেন? শুনেছি কত ভক্ত শিখ সদাই আপনাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ দেখছি সঙ্গে নেই।"

"হ্যাঁ ভাই, একলাটিই এসেছি। তা তুমি আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?"

"কেন পারবো না? বলুন কি আপনার দরকার। আপ্রাণ চেষ্টায় আমি তা যোগাড় করবো।"

"ভাই, তোমার বাড়ির একটা ক্ষুদ্র ঘরে আমায় কিছুদিনের জন্য স্থান দাও। সেখানে থেকে একান্ত মনে আমি কিছুদিন সাধনভজন করবো।"

"এ আর একটা বেশী কথা কি? আপনি আমার সঙ্গে চলুন সে ব্যবস্থা অবশ্যই হবে।"

"কিন্তু একটা শর্ত আছে, ভাই।"

"দয়া ক'রে তা খুলে বলুন।"

"হ্যাঁ, বাড়ির একটি নিরালা ঘর আমায় দেবে। আর তার দরজাটা ইটের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ করে দেবে, শুধু একটা ফোকর থাকবে হাওয়া ঢুকবার জন্য। কোনোমতে কারুর সঙ্গে আমি দেখা সাক্ষাৎ করবো না, কথা বলবো না। আর আমার ঘরের সামনে পরিষ্কার ক'রে লিখে রাখবে, যে কেউ এই ঘরের দরজা খুলবে ও ভেতরে ঢুকবে, সে আমার শিখ নয়, আমিও তার গুরু নই।"

কৃষক হাসিয়া বলে, "বুঝেছি এ আপনার এক নূতন খেলা। বেশ তো, আপনার শর্ত আমি মেনে চলবো। আপনি আপনার স্বেচ্ছামতোই গোপনে বাস করবেন আমার বাড়িতে।"

গুরু অমরদাস আশ্রয় নিলেন তাহার নিভৃত কক্ষে। এবার অন্তরে বিরাজিত অপার শান্তি ও দিব্য আনন্দ। গুরুর অনুধ্যান আর জপজী আবৃত্তি করিয়া দিন রাতের অধিকাংশ সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

এদিকে দাতু গোবিন্দোয়ালের গাদিতে বসার পর অধিকাংশ ভক্ত শিখই সেস্থান হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছেন। কেউ বাহির হইয়াছেন পরিব্রাজন ও তীর্থ দর্শনে, কেউ বা লিপ্ত হইয়াছেন নিজস্ব সাংসারিক কাজকর্মে।

দাতুর ধর্মসভায় ভজন গায়কেরা কেউ আজকাল আর আসে না, শ্রোতাদের ভিড়ও তাই নাই। ভক্তদের ভেট ও অর্থাদি দানও বন্ধ হইয়াছে, ফলে রন্ধনশালা ও ভোজনাগার প্রায় শূন্য।

শিখ ভক্তদের এই উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য ও অপমান সহিয়া দাতু আর কতদিন সেখানে বসিয়া থাকিবেন? গোবিন্দোয়ালের আশ্রমে যা কিছু টাকা-কড়ি ও মূল্যবান তৈজসপত্র ছিল সব একটি উটের পিঠে চড়াইয়া, ক্ষুণ্নমনে তিনি পিতার আদি ধর্মকেন্দ্র খাদুরে ফিরিয়া চলিলেন।

এবার পথিমধ্যে দেখা দেয় এক আকস্মিক বিপদ। মারণাস্ত্র নিয়া একদল কুখ্যাত ডাকাত দাতুর দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, দামী উটটি এবং উহার পিঠে রক্ষিত অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুটিয়া নিয়া তাহারা চম্পট দেয়। সংঘর্ষের সময় দাতুর পায়ে বিদ্ধ হয় বর্শার এক তীক্ষ্ন ফলা। অতঃপর তাঁহার পায়ের ক্ষত পাকিয়া উঠে এবং শয্যাশায়ী থাকিয়া দীর্ঘদিন তাঁহাকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আহত ঐ পা দিয়াই উদ্ধত দাতু আঘাত করিয়াছিলেন দেবপ্রতিম গুরু অমরদাসকে।

এদিকে দাতু সেখান হইতে চলিয়া গেলে শিখেরা আবার গোবিন্দোয়ালে আসিয়া সমবেত হয়। দাতুর শাস্তি ভগবান্ নিজেই দিয়াছেন, আর কখনো সে এ-মুখো হইবে না। এবার গুরু অমরদাসকে নিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহারা ইষ্টগোষ্ঠী করিতে পারেন, আবার বসাইতে পারেন ভক্তজনের আনন্দের হাট। কিন্তু গুরু অমরদাস কোথায়? নির্মমভাবে নিজেকে তিনি কোনো গোপন স্থানে সরাইয়া নিয়াছেন। বনে জঙ্গলে,

বিপাশার তীরে তীরে বহু অনুসন্ধান চালানো হইয়াছে, কিন্তু সবই হইয়াছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

বরাবরই জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে সবাই প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ শিখ ভাই-বুধার শরণ নেন। এবারও তাহাই করা হইল। ভক্তেরা কহিলেন, "ভাই-বুধা, একবার গুরু অঙ্গদকে তুমি বার ক'রে এনেছিলে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে, এবার গুরু অমরদাসকেও এনে দাও, ও শিখধর্মকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা করো।"

ভাই-বুধা পড়েন উভয় সংকটে। নিষ্ঠাবান্‌ গুরুগতপ্রাণ, ভক্ত শিষ্যেরা সবাই মিলিয়া তাঁহার শরণ নিয়াছেন, তাঁহাদের নিরাশ করা সম্ভব নয়। আবার গুরু অমরদাসকে খুঁজিয়া বাহির করিলে পড়িতে হইবে তাঁহার রোষের মুখে। তবে উপায়? অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, গুরুকে আবার গদিতে আনিয়া বসাইতেই হইবে, নানকজীর পবিত্র ধর্মকে তো কোনোমতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া যায় না।

ভাই-বুধা কহিলেন, "বেশ, গুরুর সন্ধান আমি এনে দিচ্ছি। যে অশ্বটিতে গুরু সওয়ার হন, তোমরা তাড়াতাড়ি সেটিকে সুসজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো। উদ্যোগ করো পদযাত্রার।"

অশ্বটি আনীত হইলে ভাই-বুধা চক্ষু মুদিয়া ভক্তিভরে সোহিলা ও জপজী সমাপ্ত করিলেন। তারপর কহিলেন, "এবার অশ্বটিকে স্বেচ্ছামতো চলতে দাও, আর এসো, আমরা সবাই অনুসরণ করি এটিকে। গুরুর গোপন আবাসের খোঁজ অবশ্যই পাওয়া যাবে।'

অশ্বটি কিন্তু একবারও পথ ভুল করে নাই। অনুসন্ধানী শিখদের নিয়া অচিরে উহা উপস্থিত হয় বসরকায় সেই কৃষকের গৃহে, যেখানে গুরু নিভৃতে রহিয়াছেন তপস্যারত।

কিন্তু নির্দিষ্ট কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সবাই থমকিয়া গেলেন। দেওয়ালে লেখা রহিয়াছে এক কঠোর সতর্কবাণী। যে কেউ দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিবে, শিখ বলিয়া সে গণ্য হইবে না। অমরদাসকে সে পাইবে না তাহার গুরুরূপে।

ভাই-বুধা এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন, কহিলেন, "দরজা খুলতে নিষেধ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু দেওয়াল ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে তো গুরু মানা করেন নি। তোমরা ইটের দেওয়ালে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে ফেল, গুরুকে করো সবার সামনে প্রকাশিত।"

নির্দেশমতো কাজ করা হইল। গুরু অমরদাসের দর্শন লাভে ভক্ত সাধকেরা উচ্চ স্বরে করিয়া উঠিলেন জয়ধ্বনি।

অমরদাস ধ্যানস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। কলরব শুনিয়া চোখ মেলিলেন। শান্ত দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ লেখা রয়েছে ঘরের সম্মুখে। তোমরা কি ভেবে তা অগ্রাহ্য করলে! এতো মোটেই আমার অভিপ্রেত নয়।"

সাশ্রু নয়নে ভক্তেরা নিবেদন করেন তাঁহাদের মর্ম ব্যথার কথা। মিনতি জানান বার বার বাহিরে আসার জন্য।

ভাই-বুধা এবার সবার পুরোধারূপে সুকৌশলে তাঁহার বক্তব্য রাখেন, "গুরু,

আপনি নানকজীর ও অঙ্গদজীর গদিতে উপবিষ্ট। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম, তাঁদের শিষ্য-বর্গ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে আপনারই উপর। এটা তো শুধু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পূর্ব-গুরুদের এবং সারা শিখমণ্ডলীর ব্যাপার এটা। আপনি সবার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কি অসহায়রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। এদের কল্যাণে আবার আপনাকে গোবিন্দোয়ালে ফিরতেই হবে, বসতে হবে গুরুর পবিত্র গদিতে। নতুবা নানকের ধর্ম ধরাতল থেকে লোপ পেয়ে যাবে।”

অমরদাস করুণায় বিগলিত হইলেন, সংকল্প টলিয়া গেল, কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাশ্রুনেত্রে সবাইকে দিলেন সপ্রেম আলিঙ্গন। 'ওয়াগুরু' রবে ও উল্লাসধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

অচিরে গোবিন্দোয়ালে প্রত্যাবর্তন করিয়া অমরদাস আবার গ্রহণ করেন শিখমণ্ডলীর পূর্ণ দায়িত্ব। তাঁহার ধর্মসভা ও লঙ্গরখানা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। শত শত ভক্ত ও দর্শনার্থীর আগমনে গোবিন্দোয়ালের শিখ জনপদ প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠে।

উত্তর ভারতের সর্বত্র শিখগুরুর খ্যাতি বিস্তারিত হয়। শুধু শিখেরাই নয়, অন্যান্য ধর্মের সমর্থকেরাও তাঁহার দরবারে আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। যে সমস্যা ও যে প্রশ্ন নিয়াই দর্শনার্থীরা আসুন না কেন, অমরদাস অতি সহজে এবং অবলীলায় ত্যহার মীমাংসা করিয়া দেন। সবাই আনন্দিত মনে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।

অমরদাসের নিয়ম ছিল, তাঁহার দর্শনার্থীরা আগে লঙ্গরখানায় পঙ্‌ক্তি ভোজন শেষ করিবেন, তারপর করিবেন তাঁহাকে দর্শন। সামাজিক উদারতা ও শুভবুদ্ধি যাহার নাই, তাঁহার সহিত অযথা বাক্যালাপ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না।

গোবিন্দোয়ালের লঙ্গরখানায় রাজা প্রজা ধনী নির্ধন, উচ্চ এবং নীচ বর্ণ সবাই একসঙ্গে আহার করিতেন। প্রতিদিনকার অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যারও কোনো স্থিরতা ছিল না। অজস্র সংখ্যক লোক এখানে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু এ খাদ্যবস্তু কি করিয়া সংগৃহীত হইত, কে অর্থ যোগাইত, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

শিখ ভক্ত ও দর্শনার্থীরা বলিতেন, এই বিরাট লঙ্গরখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে গুরু অমরদাসের ঋদ্ধি সিদ্ধির গুণে।

গোবিন্দোয়ালের দর্শনার্থীর সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি বাড়িতেছে স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা। পরিচালকেরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি নূতন ঘরবাড়ি নির্মাণ না করিতে পারিলে শিখ পরিবারগুলির দুর্গতির সীমা থাকিবে না। কিন্তু একাজ সম্পন্ন করিতে হইলে প্রচুর কাঠের দরকার। তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে।

ভক্তেরা সবাই নিরুপায় হইয়া সমস্যাটি গুরু অমরদাসের গোচরে আনিলেন।

গুরু কহিলেন, “এজন্য তোমরা ভেবো না। সওবান্ মল্‌-কে এখানে ডেকে আনো। এ দুরূহ কাজের দায়িত্ব সে-ই শুধু নিতে পারে।”

সওয়ান্ মল্ সম্পর্কে অমরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু তাঁহার বড় পরিচয়, নবীন

শিষ্যদের মধ্যে তিনি অগ্রণী, সাধনার দিক দিয়াও প্রভূত উন্নতি করিয়াছেন। গুরু ও শিখধর্মের জন্য প্রাণপাত করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই।

সওয়ান্ মল্ তৎক্ষণাৎ গুরু সকাশে হাজির হইলেন। গুরু কহিলেন, "বেটা, শিখমণ্ডলীর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তোমায় কাংড়ার পার্বত্য অঞ্চল হরিপুরে যেতে হবে। সেখানে প্রচুর সেগুন আর দেওদার কাঠ মিলে, এগুলো সংগ্রহ করতে হবে প্রচুর পরিমাণে, তারপর তা ভাসিয়ে আনতে হবে বিপাশা নদীর স্রোতে, ভাটিতে।"

"কিন্তু গুরুজী, একাজে যে প্রচুর অর্থের দরকার।" সসংকোচে বলেন সওয়ান্ মল্। "আমাদের কোনো সঞ্চিত ধন নেই, সদাব্রত চলে ভক্তদের দানে। যেদিন যা পাওয়া যায়, তাই খরচ করা হয়, পরের দিনের জন্য কিছু থাকে না। এই তো আমাদের হাল।"

"বেটা, তুমি ভুলে যাচ্ছো, নানকজীর পবিত্র গদি থেকে এ আদেশ আমি তোমায় করছি। অগৌণে তুমি হরিপুরে চলে যাও। অন্তরে বিশ্বাস রেখে কাজ শুরু করো। ভয় নেই যথাকালে তোমার ভেতরে শক্তি সঞ্চারিত হবে।"

সওয়ান্ মল্ হরিপুরে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে রটিয়া গিয়াছে শক্তিধর গুরু অমরদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য কাংড়া পরিব্রাজনে আসিয়াছেন। অসামান্য যোগ-শক্তির তিনি অধিকারী, আর্ত ও ভক্তিকামী মানুষের প্রতি তাঁর কৃপার সীমা নাই।

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিতে থাকে সওয়ান্ মল্-এর কাছে। দেখা যায় সত্যই গুরুকৃপায় বিপুল যোগবিভূতি তাঁহার করায়ত্ত। যাহাকে যে আশীর্বাদ করিতেছেন তাহাই ফলিতেছে। ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী তাঁহার সকাশে আসিয়া পাইতেছে স্বস্তি এবং শান্তির আস্বাদ। সওয়ান মলের কুটিরপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে জপজী আর সোহিলার পবিত্র সংগীতে।

হরিপুরের রাজা নিজেও চমৎকৃত হইলেন, অমরদাসের এই নবীন শিষ্যের যোগশক্তি দর্শনে। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা চলিল দুজনের মধ্যে। ফলে রাজা সওয়ান্ মলের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে গুরুর নির্দেশের কথাটি ভাঙিয়া বলিলেন সওয়ান্ মল্। রাজা তো শুনিয়া মহা উৎসাহিত। কহিলেন, "গুরু অমরদাসের ভক্তদের জন্য এখানকার জঙ্গল থেকে কাঠ দিতে হবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

তখনই রাজকীয় আদেশ জারী করা হয়। অজস্র সংখ্যক কাঠ ভাসাইয়া দেওয়া হয় নির্মীয়মান শিখ উপনিবেশের গৃহ নির্মাণের জন্য। বিপাশার তীরে শত শত গৃহ সমন্বিত এক নূতন গোবিন্দোয়াল শহর গড়িয়া উঠে।

হরিহরপুর-রাজ এবার গুরু অমরদাসকে দর্শনের জন্য মহাব্যগ্র। অনুমতি অচিরে মিলিয়া যায়। রাজার সঙ্গে চলেন তাঁহার কয়েকজন রানী এবং উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ। হস্তী, অশ্ব ও তাঞ্জামের রাজকীয় মিছিলটি গোবিন্দোয়ালের উপকণ্ঠে পৌঁছিলে অমর-দাস বলিয়া পাঠান, "রাজা আমাদের উপকারী বন্ধু, তাঁকে স্বাগত জানানো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু একটা কথা তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে, এখানকার রীতি অনুযায়ী

গুরুদর্শনের অনুমতি সেই পায়, শিখদের লঙ্গরখানায় যে সবার সঙ্গে বসে পঙক্তি ভোজন সম্পন্ন করে।”

রাজা সানন্দে একথা মানিয়া নিলেন এবং ভোজন শেষে লাভ ক'রলেন অমরদাসের দর্শন। গৃহের দ্বিতলের এক কক্ষে বসিয়া রাজা ও তাঁহার রানীদের সঙ্গে গুরু সানন্দে ধর্মালোচনা করিতেছেন, নানা উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার লক্ষ্য পড়িল রাজার নব পরিণীতা রানীর দিকে। এই রানী অদূরে বসিয়া আছেন, নিবিষ্ট মনে গুরুর কথা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলটি রহিয়াছে ওড়নায় আবৃত।

গুরু তাঁহার ভাষণ হঠাৎ থামাইয়া দেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকেন রানীর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সদা উৎফুল্ল আননে নামিয়া আসে বিষাদের ছায়া। প্রশান্তস্বরে রানীকে বলেন, “মায়ী, তুমি কি উন্মাদ হয়েছো? যদি গুরুকে দর্শনই না করবে, তবে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছো কেন বল তো?”

প্রত্যুত্তরে রানীর দিক হইতে কোনো সাড়া শব্দ নাই। ক্ষণপরেই দেখা গেল তাঁহার অতি অদ্ভুত আচরণ। ওড়নার আবরণে পূর্ববৎ মুখখানি ঢাকিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। উচ্চ কণ্ঠে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া উন্মাদের মতো নিচে নামিয়া গেলেন, তড়িৎবেগে প্রবেশ করিলেন নিকটস্থ অরণ্যে।

এমন একটা কাণ্ড সম্মুখে ঘটিয়া গেল, কিন্তু অমরদাসের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য বা ভাবান্তর নাই। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো নিজ আসনে তিনি বসিয়া আছেন।

রাজা ও পাত্র-মিত্রেরা সবাই ব্যাকুলভাবে নিচে ছুটিয়া গেলেন। নূতন রানী যে প্রকৃতিস্থা নন, যে কোনো কারণেই হোক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেরই চিন্তাশক্তি স্তব্ধ, এ সংকটে কি করা কর্তব্য, কাহারো তাহা মাথায় আসিতেছে না।

গুরু এবার সভা-প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন, রাজার আর্ত প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, “এ সবই রানীর কর্মফলের ভোগ। কয়েকদিনের ভেতরে আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং উন্মাদ রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই আসবেন। যে জন্য এখানে আসা, সেই দর্শনই যে এখনো বাকী রয়েছে। আপনি শান্ত হোন, ভয়ের কোনো কারণ নেই।”

সকলেই চাহিতেছেন, তাড়াতাড়ি রক্ষীদল পাঠানো হোক অরণ্য অঞ্চলে, উন্মাদিনী রানীকে ধরিয়া আনার ব্যবস্থা করা হোক।

প্রশান্ত স্বরে অমরদাস কহিলেন, “এ সময়ে এই উন্মাদিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলে সকল চিকিৎসার বাইরে তিনি চলে যাবেন। গোবিন্দোয়ালের মৃত্তিকা ও আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে আছে গুরু নানকের প্রাণসঞ্জীবনী নাম। এই নামের পুণ্য স্পর্শ রানী পেয়ে গেছেন। নামের শক্তি তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনবেই।”

সওয়ান্ মল্ এবং অন্যান্য ভক্তেরা রাজাকে প্রবোধ দিলেন, “রানীর উন্মাদরোগের ভোগ ও মৃত্যুযোগ গুরু স্বল্প দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন। মহারাজ, আপনি ধৈর্য ধারণ ক'রে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। গুরু অমরদাসের কৃপাশক্তির

ইন্দ্রজাল আমরা এখানে বসে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। এবার আপনিও তার কিছুটা পরিচয় পাবেন।"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজা হরিপুরে চলিয়া গেলেন। গুরুর আদেশে সওয়ান মলকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল।

সাচন্‌সাচ্ নামে একটি মূর্খ ও সরল প্রকৃতির ভক্ত অহর্নিশি গুরু অমরদাসের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিখ লঙ্গরখানায় সে ভোজন করে এবং গুরুর ফুট-ফরমায়েস খাটিয়া, আর শিখদের ডাকে-হাঁকে ছুটাছুটি করিয়াই তাহার দিন কাটে। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই গায়ে তাহার জড়ানো থাকে একটি কালো কম্বল। কেউ কোনো কাজ করিতে বলিলে, কেউ কোনো মন্তব্য করিলে, তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠে, সাচ্, সাচ্। তাই সবাই বিদ্রূপ করিয়া তাহার নাম দিয়াছে—সাচন্‌সাচ্। এই সাচন্‌সাচ একদিন লঙ্গরখানার জ্বালানী কাঠ আনিতে গভীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে অতর্কিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এক অর্ধনগ্ন উন্মাদিনী নারী। আঁচড় কামড়ে সাচন্‌সাচ্‌কে সে অস্থির করিয়া তোলে, ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় ও হিঁচড়িয়া টানিয়া নিতে থাকে। এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া সাচন্‌সাচ্ কোনোমতে গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া আসে, গুরুর সম্মুখে বসিয়া হাঁপাইতে থাকে।

আঁচড় কামড় ও মাটিতে ঘর্ষণের ফলে বেচারীর শরীর একেবারে ক্ষতবিক্ষত। একি দুর্দশা তাহার? কৌতূহলী হইয়া সবাই প্রশ্ন করিতে থাকে।

একটু সুস্থ হইয়া সাচন্‌সাচ্ যে বিবরণ দেয় তাহার মর্ম: সেদিনকার পাগলী রানীকে সে বনের মধ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে। আচার আচরণ তাহার একেবারে পিশাচবৎ। কোনোমতে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সে প্রাণে বাঁচিয়াছে।

অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া অমরদাস নিম্নস্বরে কহিলেন, "কর্মভোগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রানী এবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরতে পারবেন।"

পায়ের একপাটি পাদুকা খুলিয়া নিয়া গুরু সাচন্‌সাচের হাতে দিলেন, কহিলেন, "এটি তুমি তোমার কম্বলের ভেতর লুকিয়ে রেখে দাও। কাল আবার যখন বনে কাঠ কুড়ুতে যাবে, রানী আবার এসে করবেন তোমায় আক্রমণ। তখন এই পাদুকাটি কোনোমতে স্পর্শ করাবে তাঁর গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠবেন পূর্বের মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক।

পরদিন অমরদাসের ভবিষ্যৎ-বাণী হুবহু মিলিয়া যায়। প্রহারে উদ্যত উন্মাদিনী রানীর গায়ে পাদুকার ছোঁয়া লাগায় পরমুহূর্তেই তিনি থমকিয়া যান। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে প্রাপ্ত হন নিজের স্বাভাবিক মানসিকতা। মাথার কেশরাশি এলোমেলো এবং জটপাকানো, পরনের শাড়ি ছিন্নভিন্ন, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় তিনি আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, নিকটস্থ ঝোপের আড়ালে করেন আত্মগোপন।

সাচন্‌সাচ্ তাড়াতাড়ি তাহার কম্বলটি চিরিয়া দু'খণ্ড করিয়া ফেলে। লজ্জা নিবারণের জন্য একটি খণ্ড ছুঁড়িয়া দেয় রানীর দিকে।

গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া আসিলে দেখা যায় রানী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর গুরু অমরদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি করিতে থাকেন স্তুতিগান। ভক্তির আবেগে দরদর ধারে ঝরিতে থাকে নয়নবারি।

সিদ্ধসাধক অমরদাসের জীবনে এবার দেখা দেয় গুরুমহিমার মহত্তর প্রকাশ। চিহ্নিত শিষ্য ভক্তের দল একের পর এক আসিতে থাকেন তাঁহার চরণোপান্তে। সাধন-জীবনের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁহাদের সমক্ষে, গুরুকৃপার মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হন।

ভাই-পারো এই ভাগ্যবান্ ভক্তদের অন্যতম। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্ধর অঞ্চলে তাঁহার বাস। তাঁহার অভ্যাস ছিল, একদিন অন্তর গুরুকে দর্শন করতে আসা। এই দীর্ঘ পথটি তিনি অতিক্রম করিতেন অশ্বপৃষ্ঠে। মাঝখানেই পড়ে বিপাশা নদী, আরোহী ও অশ্ব উভয়কেই প্রতিদিন এই নদী পার হইতে হইত সন্তরণ করিয়া। স্থানীয় নবাবের এক পুত্র সেদিন শিকারে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়ে ভাই-পারো এবং তাঁহার অশ্বের সন্তরণ দৃশ্য। তখন ভরা বর্ষাকাল। সে সময়ে খরস্রোতা দুকূলপ্লাবী এই নদী পার হওয়া মহা দুঃসাহসের কাজ। এ পারে পৌঁছানোর পর নবাবপুত্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "ভাই, বর্ষার সময় এভাবে জীবন বিপন্ন ক'রে নদী পার হচ্ছো কেন, বলতে পারো ? প্রায়ই যে তোমায় এই বিপজ্জনক কাজ আমি করতে দেখি।"

ভাই-পারো ভাঙিয়া বলেন তাঁহার এই সন্তরণের প্রয়োজনের কথা। গুরু অমরদাসের চেলা তিনি, একদিন অন্তর গুরুকে না দেখিলে স্থির থাকিতে পারেন না। গুরুর স্নেহ ভালবাসার আকর্ষণ তাঁহার কাছে এমনই দুর্বার।

গুরুর মাহাত্ম্য ও নানা কাহিনী শুনিয়া নবাবজাদা কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ভাই-পারোর সঙ্গে একদিন গিয়া উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে। গুরু অমরদাস সেখানকার ধর্মসভায় শিখদের মধ্যমণিরূপে বিরাজিত। চোখে মুখে তাঁহার দিব্য আনন্দের দীপ্তি। ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ যেন চৈতন্যময়, শ্রোতাদের অন্তরে ভাবরাজ্যের জ্যোতির্ময় পর্দা একটির পর একটি উন্মোচিত করিতেছে। নবাবজাদা উপলব্ধি করিলেন, ইনি এমন এক অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ যাঁহার কৃপার ধারা মানুষকে উজ্জীবিত করিতে পারে, দিতে পারে অমৃতলোকের পরম আস্বাদ।

অমরদাস সস্নেহ আহ্বানে নবাবজাদাকে আপন করিয়া নিলেন, খুশীর উচ্ছল আবেগে করিলেন তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাঁহার কৃপায় এই মুসলমান তরুণ নূতনতর অধ্যাত্ম-জীবনের আস্বাদ লাভ করেন। কিছুদিন পরে পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি গুরু অমরদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, দীক্ষিত হন শিখধর্মে।[১]

ভাই-লালো ছিলেন ভাই-পারোর স্বগ্রাম ডাল্লার একজন ধনী অধিবাসী। পারোর মুখে গুরুর অপার মহিমা ও শক্তি বিভূতির কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার দর্শনে অত্যন্ত

---

১ ম্যাকলিফ্: দা শিখ রিলিজিয়ান, ভলুম ২

আগ্রহী হইয়া পড়েন। তারপর কয়েকবার গোবিন্দোয়ালে যাওয়া-আসা করার পর অমরদাসের অনুরক্ত হইয়া উঠেন।

লালোর পিতা ছিলেন গ্রামের একজন ধনী সাহুকার। টাকা লগ্নী করিয়া বহু অর্থ তিনি অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর লালোও পৈতৃক ব্যবসার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তরুণ বয়স হইতেই তিনি ভক্তিপরায়ণ এবং দানশীল, লোকের দুঃখকষ্ট দেখিলেই তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত এবং অকাতরে তাহাদের অর্থ বিতরণ করিতেন।

পাঞ্জাবী ভাষায় লালো শব্দের অর্থ—রক্তবর্ণ মূল্যবান চুনী পাথর। গুরু অমরদাসের সভায় প্রথম যেদিন লালো উপনীত হন, সেইদিনই গুরুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় তাহার উপর। বার বার এই সুদর্শন ধর্মপ্রাণ যুবকের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, "লালো হর রং বঙ্গিয়া গয়া", অর্থাৎ, লাল চুনী বস্তুটি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়া সকল রকম রং-এ—সমদর্শিতা আসিয়াছে, লালোর জীবনে, সবাকার সঙ্গে আপনাকে সে মিশাইয়া দিয়াছে, এই তত্ত্বটিই অমরদাস সেদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ শিখ ভক্তদের বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

গুরুর কাছে নামদীক্ষা নিবার পর ভাই-লালো সাধনভজনের গভীরে নিমজ্জিত হন, সাধনরাজ্যের মূল্যবান চুনীরত্নেই হন তিনি রূপান্তরিত। শুধু গুরু সেবাতেই ভাই-লালো তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য ঢালিয়া দেন নাই, শিখমণ্ডলীর অন্যতম সেবক ও রসদদার রূপেও অচিরে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

সে-বার এক বিশেষ পুণ্যদিনে ভাই-লালো গুরুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রণাম নিবেদন করিতেই গুরু অমরদাস সকলের কাছে তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকার-বৃত্তির প্রশস্তি বার বার উচ্চারণ করিতে থাকেন। তারপর ভাই-লালোকে নিকটে ডাকিয়া নেন, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একটি অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার ললাট স্পর্শ করেন। আনন্দভরে বলিয়া উঠেন, "ভাই-লালো, তোমার আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে। তাই ললাট স্পর্শ ক'রে আজ তোমার ভেতরে রোপণ ক'রে দিলাম চৈতন্যময় বীজ। আশীর্বাদ করি, এবার থেকে আত্মার গভীরে তুমি নিমজ্জিত হও।"

সেদিনকার বিদায়ই ভাই-লালোর শেষ বিদায়। অতঃপর আর তিনি গুরু দর্শনে গোবিন্দোয়ালে আসেন নাই। নিজগৃহের নিভৃতিতে বসিয়া ধ্যান জপে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন, পরিণত হন এক অসামান্য শিখ সাধকে।

ক্ষমা, সহনশীলতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শটি অমরদাস তাঁহার অনুগামীদের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। শিখদের আচার আচরণে এই গুণগুলি যাহাতে সর্বদা ফুটিয়া উঠে, সে বিষয়েও সতত জাগ্রত ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু এই আদর্শ এবং মানসিকতার জন্য তাঁহার নবগঠিত শিখসমাজকে কম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই।

গোবিন্দোয়াল তখনকার দিনে একটি ক্রমবর্ধমান শহররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। শিখ ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকও এখানে আসিয়া বসবাস শুরু করিতেছে। নবাব সরকারের কয়েকটি উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী এবং মুসলমান ব্যবসায়ীও এ সময়ে এই বর্ধিষ্ণু

নগরের বাসিন্দা হইয়া পড়েন। ইহাদের কয়েকজন শিখদের উপর উপদ্রব শুরু করিয়া দেন। শিখেরা গুরুর লঙ্গরখানার জন্য কুয়া হইতে জল তুলিতে যায়। এ সময়ে দুষ্ট ছেলেদের লেলাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের বিরুদ্ধে। ইঁট ছুঁড়িয়া মাটির কলসীগুলি তাহারা ভাঙিয়া দিতে থাকে।

শিখেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, সবাই মিলিয়া গুরু অমরদাসের কাছে তাহাদের অভিযোগ জানায়। গুরু শান্ত স্বরে কহেন, "ধর্মান্ধ কুচক্রীদের দণ্ড বিধান করবেন ভগবান্, এ দায়িত্ব তোমরা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাও কেন? আমি বলি, তোমরা কুয়ো থেকে জল তোলবার জন্য মাটির কলসী ব্যবহার না ক'রে এখন থেকে বরং চামড়ার মশক ব্যবহার করো।"

তাঁহার পরামর্শই লঙ্গরখানার কর্মীরা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবু দুর্বৃত্তদের হাত এড়ানো গেল না। দূর হইতে তাহারা তীর ছুঁড়িয়া চামড়ার মশক ছিন্নভিন্ন করিতে থাকে। জল সংগ্রাহকদের দুর্গতি উঠে চরমে।

গুরু এবার পরামর্শ দেন পিতলের হাঁড়িতে জল আনার জন্য। কিন্তু তাহাতেও কোনো কাজ হয় না। কুচক্রীরা এবার প্রকাশ্যে সবাসরি আক্রমণ শুরু করে, লোহার ডাণ্ডা দিয়া বহু শিখ কর্মীর মাথা ফাটাইয়া দেয়।

অতঃপর ভক্ত শিষ্যেরা অধীর হইয়া উঠে। দুর্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ উত্তেজিত হইয়া গুরুকে প্রশ্ন করে, "আর কতকাল কর্মীরা এভাবে এক তরফা অত্যাচার সহ্য ক'রে চলবে? এবার সময় হয়েছে পাল্টা আঘাত হানবার।"

প্রশান্ত কণ্ঠে অমরদাস উত্তর দেন, "উচ্চতর আদর্শ তোমরা জগতে প্রচার করছো, এজন্য চরম ত্যাগ স্বীকার না করলে চলবে কেন? অত্যাচার ও বর্বরের আঘাত নিয়তই আসবে, আর তার ফলেই ত্বরান্বিত হবে শিখদের আত্মিক শক্তির উদ্বোধন। আমরা সাধনা ও সিদ্ধির পথে চলেছি, সৎশ্রী আকালের পবিত্র পথ অনুসরণ করছি, প্রতিশোধের মনোভাব আমাদের শোভা পায় না। জেনে রেখো, ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো তপস্যা আর নেই। সর্ব অবস্থায় সন্তোষকে ধরে থাকবে, তবেই লাভ করবে প্রকৃত সুখ। লোভের মতো বড় পাপ আর কিছু নেই, তেমনি ক্ষমার মতো নেই কোনো পুণ্য। এই ক্ষমাই শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র যা শত্রুকে পরিণত করে পরম মিত্রে। আরও একটা কথা তোমাদের বলে রাখি—যে বীজ তোমরা রোপণ করবে, উত্তরকালে প্রাপ্ত হবে তারই ফল। দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃখের বীজ রোপণ করলে ফলরূপে তাই একদিন আবার ফিরে আসবে তোমাদের জীবনে। বিষ বপন করার পর কি ক'রে তোমরা আশা করো যে তার ফল হবে অমৃত?"

অমরদাসের উচ্চারিত প্রতিটি কথায় ধ্বনিত হইতেছিল সত্যকার আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শনিষ্ঠা। ভক্ত সাধকদের হৃদয়ে এই কথাগুলি চিরতরে গ্রথিত হইয়া গেল, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এবার প্রশমিত হইল।

কিছুদিন পরে পরিব্রাজনরত একদল নাগা সন্ন্যাসী গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত

হয়। এই নাগারা ত্রিশূলধারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী,[১] দলবদ্ধ হইয়া হিমালয় ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে, ধুনী জ্বালাইয়া শান্তিময় পরিবেশে নিজেদের সাধনভজনে ইহারা রত থাকে। কিন্তু কেহ ইহাদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিলে বা কোনো অনিষ্ট করিলে আর রক্ষা নাই, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর উপর চরম প্রতিশোধ নেয়। গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইবার পর হঠাৎ সেখানে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে নাগারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

শিখ লঙ্গরখানার কর্মীরা সেদিন কূপ হইতে জল সংগ্রহ করিতেছে, এমন সময়ে উপদ্রবকারী মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর নাগা সন্ন্যাসীদের নেতার চক্ষুতে গিয়া বিঁধে এবং চক্ষুটি নষ্ট হয়। নাগারা ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে, অস্ত্রাদি নিয়া মুসলমানদের আক্রমণ করে। ফলে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং সংঘর্ষে শিখ বিরোধী কয়েকটি দুষ্ট মুসলমান নিহত হয়। শিখদের ধারণা হয়, ভগবানের বিধানেই নাগাদের মাধ্যমে অত্যাচারীরা এভাবে সেদিন নির্জিত হয়।

দুর্বৃত্তদের অদৃষ্টে আরো কিছুটা শাস্তির বিধান ছিল। একদল মুঘল সেনার পাহারায় বাদশাহের কোষাগারের কিছু ধন-সম্পত্তি সে-বার লাহোর হইতে দিল্লীতে সরানো হইতেছিল। স্বর্ণমুদ্রার থলিগুলি চাপানো ছিল একদল খচ্চরের পিঠে। গোবিন্দোয়ালের সন্নিহিত সড়ক দিয়া পথ চলিতেছে, এমন সময়ে স্বর্ণমুদ্রাবাহী একটি খচ্চর সবার অলক্ষ্যে শহরের এক গলিতে ঢুকিয়া পড়ে। অঞ্চলটি ছিল মুসলমানদের অধ্যুষিত। স্থানীয় একদল দুর্বৃত্ত তাড়াতাড়ি ঐ খচ্চরটি বাড়ির ভিতরে লুকাইয়া ফেলে।

কিছুক্ষণ পরেই রক্ষীদলের অধ্যক্ষ টের পাইলেন, একটি খচ্চর দলভ্রষ্ট হইয়াছে। কোতোয়ালের সাহায্যে জোর তল্লাস চালানো হয় গোবিন্দোয়ালের প্রতি মহল্লায়। অবশেষে রক্ষীরা মুসলমান পল্লীতে উপস্থিত হইবার পর খচ্চরটি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। লুকানো স্থান হইতে এটিকে বাহির করিতে গেলে দুর্বৃত্তেরা সবাই মিলিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাধা দেয়। কিন্তু সরকারী রক্ষীদলের সম্মুখে তাহারা টিকিবে কতক্ষণ? অচিরে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাদশাহের অর্থ লুণ্ঠনের এই অপচেষ্টা ও সংঘর্ষ দুর্বৃত্তদের চরম বিপদ ডাকিয়া আনে, গোবিন্দোয়াল শহর হইতে তাহাদের সবাইকে বহিষ্কৃত হইতে হয়।

ভক্ত শিখ ও লঙ্গরখানার কর্মীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পথে যে বাধা এতদিন ছিল তাহা এবার দূরীভূত হয়।

গুরু অমরদাস সেদিন তাঁহার সভায় ভক্ত শিষ্যদের বলেন, "ভগবানের উপর নির্ভর

১ মুঘল আমলে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমান হিন্দুতীর্থে সাধু-সন্ন্যাসীর উপর নানা অত্যাচার ও জুলুম শুরু করে, সে সময়ে কাশীর বাঙালী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতীর নেতৃত্বে একটা বিরাট প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। প্রধানত আচার্য মধুসূদনের প্রেরণা ও নির্দেশে ত্রিশূলধারী নাগা সাধুরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয় এবং অত্যাচারীদের শাস্তি বিধান করিতে থাকে।

ক'রে থাকলে, ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখালে, এমনিভাবেই দুঃখ তাপের নিবৃত্তি ঘটে, ধর্মের চক্র আবর্তিত হয়ে সাধন করে দুষ্টের দমন। আশু ফলপ্রদ না হলেও ঈশ্বর-নির্ভরতার এই পথই হয়ে ওঠে সত্যকার শান্তি ও সুখের পথ।"

কয়েকজন শিখ শিষ্য একবার অমরদাসকে প্রশ্ন করেন, "গুরুজী, প্রকৃত সাধু ও ভগবদ্‌ভক্তের লক্ষণ কি, আমাদের একটু বলুন।"

উত্তরে তিনি বলেন, "প্রভু অলখ্ নিরঞ্জনের নাম যার হৃদয় কন্দরে সদা ধ্বনিত হচ্ছে, ব্যক্তিসত্তা ও আত্ম অভিমানের মূল যে উৎপাটন করতে পেরেছে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত সাধু। এই বিনাশশীল দেহ ত্যাগ করলে সে লাভ করে অবিনাশী জ্যোতির্ময় দেহ। যে সাধক মন থেকে বাসনার বীজ নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত সমর্থ সাধক, জীবন্মুক্তি অবশ্যই হয় তাঁর করায়ত্ত। সিদ্ধ সাধকেরা স্বতন্ত্রপুরুষরূপে এ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান, তাদের ভেতর দিয়ে ভগবান্ সাধন করেন জীবের অশেষ কল্যাণ। জীব জগতের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, যুক্ত থেকেও এই সাধকেরা থাকেন তার বাইরে, নির্লিপ্ত ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্যক্‌রূপে বজায় রাখতে তাঁরা সক্ষম হন।"

একদল কানফাট্টা যোগী সে-বার ঘুরিতে ঘুরিতে গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হন। ইহাদের শিরে জটার ভার, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কানে হাড়ের কুণ্ডল। যোগীনেতা কিঙ্গুরিনাথের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গুরু অমরদাসের নানা আলোচনা হয়। কথা-প্রসঙ্গে সাধু-সন্ন্যাসীর বাহিরের বেশ অপেক্ষা তাঁহাদের তপস্যা ও ভগবানের সহিত যোগসাধনার উপরই অমরদাস অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এসময়ে শিখগুরু যে ভজন সংগীতটি রচনা করেন, এখনো রামকেলি রাগে শিখ ভক্তেরা তাহা গাহিয়া থাকে। এ সংগীতের মর্ম:

নম্রতা হোক্, হে যোগী, তোমার কানের কুণ্ডল—
করুণা হোক্ তোমার দেহের আচ্ছাদন।
পুনর্জন্মের বন্ধন ভয়কে স্মরণ রাখো অহর্নিশ,
এ ভয়ের বিভূতি লেপন কর সারা অঙ্গে।
হে যোগী, এমনিতর শিঙ্গা বাজাতে শেখ
যা থেকে নির্গত হবে অনাহত নাদ,
আর ভগবৎ-প্রেমের সূক্ষ্ম সুমধুর নিক্কণ।
ধৈর্য হোক তোমার কাঁধের ঝুলি,
সত্যকে ক'রে তোল তোমার ভিক্ষা-পাত্র,
থরে থরে তাতে সাজিয়ে রাখো নামের সুধা—
পান করো তা পরাণ ভরে।
মনকে বিছিয়ে দাও ভগবানের চরণে,
এবং তাই হোক তোমার যোগাসন।
দেহের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াও ভিক্ষাপাত্র হাতে,
নামের ভোগান্ন করো গ্রহণ। হে যোগী,

শুধু তানপুরার সুর ঝংকারে পাবেনা তোমার প্রভুকে—
প্রেম আর ভক্তি হোক দুটো সুরেলা তার,
আর তা বেঁধে দাও তোমার দেহ-তানপুরায়।
সার্থক যোগীর হৃদয়-গবাক্ষের পথ বেয়ে
নেমে আসে পরম প্রভুর কল্যাণময় বাণী,
ছিন্ন হয় তার সর্ব সংশয়, মুমুক্ষার দ্বার যায় খুলে,
চিরতরে যুক্ত হন যোগী তাঁর পরমাত্মার সাথে।
কিন্তু, দুরন্ত বাসনার রোগ থেকে কে দেবে ভাই নিষ্কৃতি,
যদি না ঘটে কৃপালু গুরুর আবির্ভাব?
সদ্‌গুরু রোপণ করবেন সৎনামের বীজ,
তবে তো দূর হবে ভবরোগ, জ্বলে উঠবে মোক্ষের আলো।
জীবন তানপুরায় ওঠাও সেই অনাহত ঝংকার,
হে যোগী, যা শুনে মানুষ হয় অমৃতময়।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অমরদাস একদিন পথ চলিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছে কয়েকজন ভক্ত শিষ্য। শহরের প্রান্তে একটি জীর্ণ দেওয়ালের পাশ ঘেঁষিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। বৃষ্টিতে ঐ দেওয়ালে প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়া গিয়াছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটি ধসিয়া পড়িতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই গুরু তড়িৎবেগে অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া নিলেন, ত্রস্তব্যস্তে সরিয়া গেলেন এক নিরাপদ স্থানে।

জনৈক ভক্ত সঙ্গীর মনে খটকা বাধিল। এ বড় আশ্চর্যের কথা। ভাঙা দেওয়ালের ভয়ে গুরু অমরদাস এমন সন্ত্রস্ত! আশ্রমে ফিরিয়াই এ প্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করিলেন। কহিলেন, "গুরুজী, আপনি তো প্রায়ই বলিয়া থাকেন, ভগবানের কল্যাণময় নাম আশ্রয় ক'রে যে থাকে, সে হয় মৃত্যুঞ্জয়ী। তাছাড়া, আপনাকে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর ভয় বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র আপনার মনের ভেতর নেই, সেই সঙ্গে নেই কোনো বাঁচবার আগ্রহ। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্য করলাম, জীর্ণ প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে আপনাকে চাপা দেবে এই ভয়ে আপনি ক্ষিপ্রবেগে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। এর রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলুন।"

গুরু সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা এটা লক্ষ্য করেছো দেখে আমি খুশী হয়েছি। এ আচরণের ভেতর দিয়ে একটা তত্ত্ব আমি তোমাদের বোঝাতে চেয়েছি। বহু পুণ্যের ফলে মানবজন্ম লাভ হয় এবং এই মানবজন্মের জন্য দেবতারাও লালায়িত থাকেন, কারণ মানব-দেহের সাধনাই এনে দেয় প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও মুমুক্ষা। তা হলে আমাদের কি উচিত নয় এই মূল্যবান এবং পরম সম্ভাবনাময় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা? এই দেহ দিয়ে তোমরা জীবের বহু কল্যাণ সাধন যেমন করতে পারো, তেমনি পারো নিজের মুক্তি সাধন করতে। কাজেই ভগবান্‌প্রদত্ত এ দেহের একটু দেখা শুনা করা দরকার বৈ কি।"

অমরদাসের সভায় এদু একদিন অত্যধিক জনসমাগম হইত। এ জনতার বেশীর ভাগ ছিল অর্থার্থী ও আর্তভক্ত। কেউ আসিতেছে আর্থিক দুর্গতিতে ক্লিষ্ট হইয়া, কেউ বা আসিতেছে রোগ শোকের হাত হইতে ত্রাণ লাভের জন্য।

জনতার এই ভিড় দেখিয়া গুরু সেদিন হঠাৎ রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নশ্বর দেহের দুঃখ কষ্ট নিবাই সবাই অস্থির। কই, সংসার বন্ধন মোচনের বা ভগবদ্ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়া তো কেহ তাঁহার কাছে আসে না।

অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া অমরদাস কহিলেন, "দ্যাখো, আমি স্থির করেছি, গোবিন্দোয়ালের এই ভিড় আর আমি সহ্য করবো না। কাছাকাছি কোনো একটা নির্জন অরণ্যে গিয়ে বাস করবো। আপন মনে ধ্যানভজন আর নামজপ করবো। এ ঝকমারি আর মোটেই আমার ভাল লাগছে না।"

সংকল্প করিলেন, সেই দিনই মধ্যরাত্রে গোপনে ত্যাগ করিবেন গোবিন্দোয়াল। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার দুই পুত্র, মোহরি এবং মোহন, আর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যাপারটি জানিয়া ফেলেন। অমরদাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় তাঁহারাও নীরবে করিলেন তাঁহার অনুসরণ।

বনের মধ্যে এক কুটির বাঁধিয়া একান্তে জপ ধ্যানে নিরত হন অমরদাস। সঙ্গীরা কিছুটা দূরে অবস্থান করিতেছেন, খুঁজিতেছেন তাঁহার সেবা পরিচর্যার সুযোগ। কয়েক দিন বাদে সেখানে উপস্থিত হয় এক অল্পবয়স্ক মেষপালক, জাতিতে মুসলমান, নাম বহলুল্। গুরু অমরদাসকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে সে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে-তাঁহার সেবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। প্রতিদিন রং-বেরঙের অজস্র ফুল বনের তরুলতা হইতে সে সংগ্রহ করে, নিবেদন করে এই নবাগত মহাত্মার চরণে। দুই বেলা সে দুই ভাঁড় দুধ দিয়া যায়, তাহা পান করিয়াই অমরদাস দিনাতিপাত করেন, পরমানন্দে জপ তপে মগ্ন থাকেন। বনের ভিতর হইতে রোজই প্রচুর ফলমূলও বহলুল্ নিয়া আসে, গুরুর ভক্তদের ভোজনের জন্য রাখিয়া যায়।

ভক্ত সঙ্গীদের নিকটে ডাকিয়া গুরু একদিন বলেন, "ভগবানের লীলা কি বিচিত্র, দ্যাখো। এই জনমানবহীন বনে অবস্থান করতে এসে বহলুলের মতো রত্ন আমরা কুড়িয়ে পেলাম।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইয়া আছেন, ভাবিতেছেন, বহলুল্ এক দুঃস্থ সম্বল-সম্পদহীন রাখাল, তাহার মধ্যে গুরু কোন্ মহার্ঘ বস্তু দর্শন করিলেন কে জানে?

অমরদাস এবার পরিষ্কার ভাষায় কহিলেন, "বহলুল্ অতি পবিত্রমনা যুবক, শুদ্ধ সত্ত্ব আধার। সাধনায় ব্রতী হলে ভগবৎ-কৃপা পেতে তার বিলম্ব হবে না।"

সেদিন দুগ্ধ ভাণ্ডটি গুরুর কাছে রাখিয়া প্রণাম জানাইতেই গুরু বহলুলকে কহিলেন, "বৎস, তোমার প্রতি আমি খুব প্রসন্ন হয়েছি। তোমার মনে যদি কোনো বিশেষ প্রার্থনা থাকে, আমায় জানাও। আমি তা পূরণ করবো। অর্থ মান যশ, কি তুমি চাও?"

সেলাম জানাইয়া বহলুল্ নিবেদন করে, "ছোটবেলায় বাপ-মাকে আমি হারিয়েছি।

তাদের মৃত্যুর সময় কত কেঁদেছি, কিন্তু তাঁদের তো ধরে রাখতে পারি নি। শুধু আমার মতো গরিবরাই যে অসহায় তা নয়, অসহায় বড় লোকেরাও। এই তো সেদিন তিরখান গ্রামের জমিদার ঘোড়ার পিঠ থেকে পা হড়কে পড়ে মারা গেল। কেউ বাঁচাতে পারলো না। দেখছি, এই দুনিয়ার সবটাই একটা খেলা, একটা তামাশা। এই খেলার মালিক তো একজন ঠিকই রয়েছেন। আমি সেই মালিককে, সেই খোদাকে দেখতে চাই, তাঁর আশ্রয় পেতে চাই। সেই আশ্রয়ই একমাত্র বস্তু, যা চিরদিন থাকবে বর্তমান। আমায় আপনি দয়া করুন, সেই আশ্রয়টি দিন।"

গুরুর আননে আনন্দের আভা। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দ্যাখো পরম প্রভুর বিচিত্রলীলা! নিরক্ষর, স্বল্পবুদ্ধি, সহায়সম্পদহীন মেষপালককে ক'রে তুলেছেন মহাভাগ্যবান্। এই অল্প বয়সেই তাঁর অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন চৈতন্যের বীজ। সে বীজ এবার অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে।"

সস্নেহে বহলুলের দিকে তাকাইয়া অমরদাস কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি নাম দেবো, নিষ্ঠাভরে তা জপ করো। তোমার জীবনের সাধ পূর্ণ হবে, এ আশীর্বাদ আমি করছি।"

এই মেষপালক বহলুল অমরদাসের কৃপায় উত্তরকালে এক সিদ্ধপুরুষরূপে গণ্য হইয়া উঠে।

সে-বার অমরদাস কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্য সঙ্গে নিয়া পাঞ্জাবের কাসুর অঞ্চলে গিয়াছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরমে চারিদিক উত্তপ্ত, আগুনের হল্কার মতো বহিতেছে 'লু'র হাওয়া, সঙ্গীদের কণ্ঠতালু শুকাইয়া উঠিয়াছে। এবার কাছাকাছি কোনো একটা বনের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়া উপায় নাই।

একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল, বৃহৎ কূপ সমন্বিত একটি অতি মনোরম ফল-ফুলের বাগিচা। খোঁজ নিয়া জানা গেল, শহরের শাসনকর্তা এটির মালিক। অমরদাস ভাবিলেন, এই বাগিচায় তাঁবু ফেলিয়া সবাই স্নানাহার সারিবেন, দুপুরবেলা, রৌদ্র-তপ্ত আবহাওয়ায় এখানেই বিশ্রাম নিবেন। তখনি এক ভক্তকে পাঠান হইল কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য।

নগরের শাসক একজন পুরী-শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। অমরদাসের নাম শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমি তোমাদের গুরুকে জানি, ভাল্লা-শ্রেণীর ক্ষত্রিয় সে। এই তো সেদিনের কথা, বসরকা গ্রামে একটা সাধারণ মানুষরূপে সে বাস করতো। হঠাৎ দেখছি, সে এক মস্ত গুরু হয়ে উঠেছে। চারিদিকে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি। কিন্তু আসলে সে চূড়ান্ত অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সবাইকে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, আর জাত মারছে উচ্চ বর্ণের। এমন অনাচারী লোককে তো আমি আমার বাগিচায় স্থান দিতে পারবো না।"

ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়া সবিস্তারে সব কথা গুরুকে নিবেদন করেন। গুরু কিছু-কাল গম্ভীর হইয়া থাকেন। তারপর দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "বটে! তাহলে আমিও

জানিয়ে রাখছি, তার কথিত আমার এই জাতপাতহীন অনাচারী শিখরাই একদিন গঠন করবে এক স্বাধীন রাজ্য, একজন শিখ হবে এই কাসুর শহরের শাসক। আর আজকের ঐ আত্মম্ভরী শাসনকর্তার বংশীয় লোকেরা হবে তার পরিচারক।"

উত্তরকালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আক্ষরিকভাবে ফলিয়া গিয়াছিল।

সেদিন শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত ভক্তদের নিয়া অমরদাস কাসুরের উপকণ্ঠে এক গরীব পাঠানের গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। ঐ পাঠান অতিথিদের পরম সমাদরে তার ঘরে নিয়া বসায়, শীতল জল ও পাখার বাতাসে তাহাদের শ্রান্তি দূর করে।

সবিনয়ে নিবেদন করে, "আমি দরিদ্র লোক। আপনাদের মতো মেহমানের সেবা করার সাধ্য আমার কই?"

অমরদাস আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, যা কিছু সামান্য বস্তু তোমার ঘরে আছে, তাই দাও, তাতেই আমাদের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হবে।"

স্নান আহার সমাপনের পর গুরু সেখান হইতে বিদায় নিলেন। বলিয়া গেলেন, "ভগবানের সৃষ্ট জীবের সেবা এমনিভাবে ক'রে যাও বন্ধু। তাঁর কৃপা অবশ্যই তুমি পাবে। অচিরে এই সমৃদ্ধ কাসুর নগরের তুমিই হবে শাসনকর্তা।"

দরিদ্র পাঠান সেদিন গুরু অমরদাসের এই কথার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে সত্যই একদিন সে গ্রহণ করে নগরের শাসনভার।

সমকালীন কাসুরের ঐ ক্ষত্রিয়-শাসনকর্তা এবং তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা অতঃপর নানা অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ বাদশাহ্‌ তাহাদের সবাইকে করেন পদচ্যুত এবং সে স্থলে নূতন করিয়া নিয়োজিত করেন পাঠানদের। অমরদাসের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পাঠানটি এ সময়ে একটি সরকারী কাজ গ্রহণের সুযোগ পায়, তারপর নিজের দক্ষতাবলে উন্নীত হয় শাসনকর্তার পদে। এই পাঠানবংশের শাসকেরা বেশ কিছুদিন কাসুর শহরে বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তীকালে শিখ নৃপতি রণজিৎ সিং পাঞ্জাবের এক বৃহৎ অংশের অধিপতি হন। কাসুরের শাসনভার তখন পতিত হয় শিখদের উপর।

গুরু অমরদাসের একটি চমকপ্রদ বিভূতিলীলার কথা শিখ ভক্তদের রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সেদিন গুরু তাঁহার দ্বিতল শয়নকক্ষে নিদ্রিত রহিয়াছেন, হঠাৎ শেষ রাত্রে নারী কণ্ঠের আর্ত ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিলেন। নিকটস্থ মহল্লায় কোনো বিপদ ঘটিয়াছে। ব্যাপার কি জানার জন্য দুইটি সেবককে তাড়াতাড়ি তিনি পাঠাইয়া দেন।

সেবকদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়—দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিয়া একটি যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ মর্মভেদী চীৎকার তাঁহার শোকার্তা জননীর। কোনোমতেই তাহার ক্রন্দন ও আর্তি থামানো যাইতেছে না।

একথা শোনার পর অমরদাস নয়ন মুদিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন, তার পরে অস্ফুট স্বরে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানালেন মৃত যুবকটির পুনর্জীবন লাভের জন্য। সেবক দুটিকে কহিলেন, "মৃতের সামনে বসে তোমরা ভক্তিভরে জপজীব প্রথম

পৌরি আবৃত্তি করো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখবিবরে কিছুটা জল ঢেলে দাও। ভয় নেই, প্রভুর কৃপায় সে পুনর্জীবন লাভ করবে।"

আদেশ পালন করিতে গিয়া ভক্ত সেবকেরা চিন্তা করিল, "এই মৃত যুবকের দেহে গুরু প্রাণ সঞ্চারিত করবেন তাঁর বিভূতির বলে। আমরা উপলক্ষ মাত্র। জপজী আবৃত্তি ক'রে আর মুখে জল দিয়ে আমরা কীই বা করতে পারি। বরং মৃত যুবকটিকে সোজাসুজি গুরুর সম্মুখে এনে উপস্থিত করি, যা কিছু করবার তিনি নিজেই করবেন।"

কালবিলম্ব না করিয়া মৃতদেহটি গুরুর ভবনেই তাহারা নিয়া আসে। সঙ্গে আসিয়া জড়ো হয় বহু কৌতূহলী নরনারী। গুরু তখনো ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আসনে বসিয়া আছেন। শোকার্তা জননীর কান্না তাঁহাকে সজাগ করিয়া তোলে। তাড়াতাড়ি মৃতের সম্মুখে আসিয়া তিনি উপবেশন করেন, মন্ত্রপূত বারি বার বার সিঞ্চন করিতে থাকেন প্রাণহীন দেহে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, যুবকটির চোখের পাতা ও ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, দেহে দেখা দিয়াছে প্রাণের সঞ্চার। অতঃপর কিছুটা জল পান করিয়া উঠিয়া বসে। এই অত্যাশ্চর্য বিভূতিলীলা দর্শনে ভক্ত শিষ্য ও কৌতূহলী জনগণ আনন্দে কলরব করিয়া উঠে। মৃত যুবকের জননী সাশ্রুনয়নে, আবেগভরে, লুটাইয়া পড়েন গুরু অমরদাসের চরণতলে।

আল্লাইয়ার খান নামে এক ধনী মুসলমান বণিক দিল্লীতে ঘোড়া আমদানির ব্যবসা করিতেন। আরব হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঘোড়া ক্রয় করা হইত, আর দিল্লীতে আনিয়া বিক্রয় করা হইত বাদশাহের সেনা বিভাগের কাছে। আল্লাইয়ার সে-বার প্রায় পাঁচশত আরবী ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। বিপাশা নদীর দুকূল প্লাবিত করিয়া তখন বন্যার স্রোত নামিয়াছে। আল্লাইয়ার নদীর তীরে আসিয়া মহাবিপদে পড়িল। এতগুলি ঘোড়া নিয়া এই স্ফীতকায়া নদী পার হইবেন কিভাবে? ঘাটে কিছু সংখ্যক নৌকা রহিয়াছে বটে, কিন্তু পার্বত্য বর্ষার ঢল নামায় নদী যেরূপ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মাঝিরা যাইতে সাহস করিতেছে না। বিশেষত বৃহদাকার আরবী ঘোড়ার ভারে নৌকা উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা প্রবল। বেশী টাকার প্রলোভনেও মাঝিরা ওপারে যাইতে রাজী নয়।

এমন সময়ে আল্লাইয়ার খান দেখিলেন একটি যুবক ঘোড়াসহ নদীর স্রোতে ঝাঁপ দিলেন, সন্তরণ করিয়া উপস্থিত হইলেন এপারে। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন, শুনিলেন, তাঁহার নাম ভাই-পারো, তিনি একজন নবদীক্ষিত শিখ।

"ভাই, আপনার সাহসের বলিহারি যাই। এই বন্যার সময়ে জলের ঘূর্ণিপাক থাকে, তাতে কত লোক তলিয়ে যায়। আপনি কি জীবনের পরোয়া করেন না?" সবিস্ময়ে মন্তব্য করেন তিনি।

"হ্যাঁ ভাই, ঠিকই বলেছেন আপনি। ভয় সংকোচ আমার জীবন থেকে দূরে চলে গিয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে আমার গুরু অমরদাসজীর কৃপায়। আমি তাঁর

আশ্রিত শিষ্য। গুরু অমরদাসের বিভূতি অঘটন ঘটাতে পারে, তাঁর কৃপা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। একটিবার তাঁকে দর্শন করুন, আপনার সব ভয়, সব বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। যাবেন তাঁকে দর্শন করতে? দেখবেন, শত শত লোক তাঁর সংস্পর্শে এসে নতুন জীবন লাভ করেছেন।"

আল্লাইয়ার নীরবে একটু ভাবিয়া নিলেন। এতগুলি ঘোড়া পার করার ব্যবস্থা করিতে দুই একদিন সময় লাগিবে, এজন্য বৃহৎ ও দৃঢ় গঠনের নৌকা সংগ্রহ করা দরকার। ইতিমধ্যে অত্যাশ্চর্য শক্তিধর সাধুটিকে একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি?

পর দিনই ভাই-পারোর সঙ্গে গোবিন্দোয়ালের ধর্ম-দরবারে গিয়ে তিনি উপস্থিত।

অমরদাসকে দর্শন করা মাত্র কি এক দুর্বার আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গেলেন আল্লাইয়ার। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, তাঁহার ইহ-পরকালের পথ-প্রদর্শক এই মহান্ পুরুষ, ইঁহার আশ্রয় লাভের জন্য এ সংসারের সব কিছু আকর্ষণ ও বিত্তবিভব অনায়াসে ত্যাগ করা যায়।

পরম স্নেহে এই মুসলমান বণিককে অমরদাস আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিজের জন্য রক্ষিত ফলমূল মিষ্টান্ন হইতে কিছুটা তাহাকে ভোজন করিতে দিলেন।

নবাগতের নামটি গুরু দু'একবার উচ্চারণ করিলেন। তারপর স্মিতহাস্যে কহিলেন "ভাই, তোমার নাম হচ্ছে—আল্লাইয়ার, আল্লার বন্ধু। আল্লার বন্ধুস্থানীয় হওয়া বড় কঠিন কথা, ভাই। তবে তোমার আমি অবশ্যই আল্লার দাস ক'রে দিতে পারি। আল্লা হবেন তোমার প্রভু আর তুমি হবে তাঁর দাস, তাঁর একান্ত সেবক।" গুরু অমরদাসের কৃপায় ও উপদেশে এই মুসলমান ব্যবসায়ীর জীবনের স্রোত বদলাইয়া গেল, এক নূতন মানুষে তিনি পরিণত হইলেন।

আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, "আল্লাইয়ার, শুধু নিজের সাধনভজন ও মুক্তির প্রচেষ্টা নিয়া থাকলেই চলবে না। মানুষ বড় অসহায়, ত্রিতাপের জ্বালায় সদা জর্জরিত। তাদের তুমি সাহস দেবে, শান্তি দেবে, আর দেবে, আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান। হিন্দু মুসলমান শিখ সবাইকে তুমি বিতরণ করবে তোমার অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির ফল।"

গুরুর আদেশ আল্লাইয়ার খান করিলেন শিরোধার্য। দিল্লীতে গিয়াই ঘোড়ার ব্যবসায়ে ছেদ টানিয়া দিলেন। বিত্তবিষয় ও ঘরসংসার চিরতরে ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন ত্যাগী দরবেশের জীবন।

গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া গুরু অমরদাসকে প্রশ্ন করিলেন, "এবার কৃপা ক'রে বলুন, কোথায় আমি বাস করবো, আর শুরু করবো আমার জীবনতপস্যা।"

গুরু নির্দেশ দিলেন, "তুমি জলন্ধরের কাছে ডাল্লা গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করো। সেখানে ভাই-লালো, ভাই-পারো প্রভৃতি আমার সাধননিষ্ঠ শিষ্যেরা রয়েছে। তুমি তাদের কাছ থেকে আত্মিক জীবনের প্রভূত সাহায্য পেতে পারবে। ওখান থেকে সর্বজাতি ও সর্ব সম্প্রদায়ের কল্যাণে তুমি ব্রতী হও, এই আশীর্বাদ আমি করছি।"

নবাগত শিষ্য অমরদাসের কথা সানন্দে মানিয়া নেন। ডাল্লা গ্রামে গিয়া কুটির

বাঁধিয়া বাস করিতে থাকেন, নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরে। ঐ অঞ্চলের সকল মানুষের প্রতি আপনজনরূপে, দিক্‌দিশারী শক্তিধর ফকীররূপে, উত্তরকালে তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সহস্র সহস্র মুসলমান ভক্ত নরনারী তাঁহাকে ডাকিতেন আলা শাহ্‌ নামে। অমরদাসের গড়িয়া-তোলা এই মুসলমান সাধকের অত্যাশ্চর্য সিদ্ধাইর কাহিনী দীর্ঘদিন জলন্ধর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

গিরিধারী নামে এক দক্ষিণ দেশীয় বণিক সে-বার একটি বিশেষ প্রার্থনা নিয়া অমরদাসের আশ্রমে উপস্থিত হয়। এযাবৎ তাহার কোনো পুত্রসন্তান হয় নাই, প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হওয়ায় দ্বিতীয়বার সে বিবাহ করে, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীরও কোনো সন্তানাদি হইল না। অমরদাসের যোগশক্তির খ্যাতি গিরিধারী শুনিয়াছে। তাঁহার আশীর্বাদে কোনো কোনো বর্ষীয়সী মহিলার বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়াছে, এসংবাদও তাহার অজানা নয়।

গোবিন্দোয়ালে অমরদাসের আশেপাশে কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর অন্তরের প্রার্থনাটি সে জ্ঞাপন করে। প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু উত্তর দেন, "দ্যাখো, জন্মের সময়ই বিধাতা জাতকের ললাটে তার ভাগ্যলিপি এঁটে দেন, মানুষ তা খণ্ডাবে এমন শক্তি তার কই? ঘরে ফিরে গিয়ে ভক্তিভরে ভগবানের নামজপ করো, লোকের কল্যাণ করো আর ভগবানের যা অভিপ্রেত সেই সব পবিত্র কর্তব্য পালন করো। একটি পুত্রসন্তানের জন্য তুমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছো কিন্তু একবারও ভেবে দেখছো না, এই পুত্র আসলে হয়ে উঠবে তোমার সব চাইতে বড় বন্ধন। ইচ্ছে করে বন্ধন বা ফাঁস কে গলায় পরে বল তো?"

গিরিধারী বুঝিল, তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে, গুরুর কৃপা আর মিলিবে না। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া অশ্রুসজল চক্ষে দরবার হইতে সে বিদায় নিল।

দুয়ারের সম্মুখে অমরদাসের একনিষ্ঠ ভক্ত, শক্তিধর সাধক ভাই-পারোর সঙ্গে তাহার দেখা। ভাই-পারো প্রশ্ন করেন, "কি ভাই, তুমি যে চলে যাচ্ছো? গুরুর কৃপা মিলেছে তো? তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে?"

"না ভাই-পারো, আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, তাই বুঝি গুরুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলাম। সন্তানের মুখ দেখা এ-জন্মে আর হলো না।"

গুরু তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও গিরিধারী ভাই-পারোকে সবিস্তারে জানায়।

ভাই-পারো বলেন, "দ্যাখো, গুরুর যোগবিভূতির সীমা নেই, তেমনি নেই তাঁর কৃপার অন্ত। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কেউ বিফল হবে, এ আমার পক্ষে অসহ্য। না ভাই, তুমি হতাশ হ'য়ো না, অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলো না। আচ্ছা বেশ, তুমি গুরুর ওপর ভক্তি বিশ্বাস রাখো, আমি বলছি—তুমি পাঁচটি পুত্রের জনক হবে। সন্তানের জ ্য কোনো খেদ তোমার থাকবে না।"

গিরিধারী কিছুটা আশ্বস্ত হইলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে সে স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়।

অতঃপর ভাই-পারোর আশীর্বাদ কিন্তু ফলিয়া যায়। গিরিধারীর গৃহে পরপর একের পর এক পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এই পুত্রদের নিয়া সে-বার সে অমরদাসের সন্দর্শনে আসিয়াছে। সভায় প্রবেশ করিয়াই গদিতে সমাসীন গুরুর পদপ্রান্তে এই পুত্রসন্তানদের সে শোয়াইয়া দেয়, নিজে ভক্তিভরে নিবেদন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

অন্তর্যামী অমরদাস সব কিছুই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু না জানার ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "গিরিধারী, সে-বার তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করতে পারি নি, ক্ষুণ্নমনে তুমি বিদায় নিয়ে গিয়েছ। এখন দেখছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, পাঁচটি পুত্র তুমি ইতিমধ্যে লাভ করেছো। ভাবছি, কি ক'রে এটা সম্ভব হলো?"

করজোড়ে গিরিধারী উত্তর দেয়, "গুরুজী, আপনার অনুগত শিষ্য ভাই-পারোর কৃপায় আমি এদের লাভ করেছি। আপনার কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি দেখে আমার প্রতি তাঁর দয়া হয়েছিল, আমায় তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন।"

স্মিতহাস্যে অমরদাস ভাই-পারোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ধীর কণ্ঠে বলেন, "ভাই-পারো, এ সৎকাজের জন্য আমার অভিনন্দন নাও। দেখছি, প্রকৃতির বিধান তুমি উল্টে দিয়েছ। ক'জনার এ শক্তি আছে? আমার নিজেরই তো নেই।"

একি গুরুর শ্লেষ বাক্য? ভাই-পারো সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আমার হচ্ছেন রাজরাজেশ্বর, আমরা আপনার চাকর, আপনার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দু' একটা শক্তিকণা কুড়িয়ে নিই আমরা। আসল কথাটি তা হলে বলি। আপনার কৃপা না পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এই দুর্ভাগা চলে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, আপনার ভাণ্ডারে কৃপার ঐশ্বর্য তো অফুরন্ত, তারই এক কণা সংগ্রহ ক'রে একে ভিক্ষে দেই না কেন? সত্যিই তো, আমাদের প্রভু যিনি, তাঁর ভাণ্ডারে এত রয়েছে, দুঃখী ভিখারী মানব কেন তা থেকে বঞ্চিত হবে?"

"তোমার মনোভাব বুঝতে আমার ভুল হয় নি ভাই-পারো," গুরু উত্তরে বলেন ঃ "কিন্তু, এটা যে কলিযুগ, অগণিত লোক সদাই আসছে তাদের কামনা বাসনার ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে। তাদের কৃপা করতে হলে, তা কিন্তু করতে হবে ভেবে-চিন্তে, এবং বিচার বিশ্লেষণ ক'রে।"

একটু মজা দেখার জন্য অমরদাস আবার বলিলেন, "ভাই-পারো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার হৃদয়ে প্রচুর করুণাধারা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বেশ তো এখন থেকে তুমি কল্পতরু হয়ে যাও।"

ভাই-পারো জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইয়া গুরুকে প্রশ্ন করেন, "সেটা কি রকম, তাতো বুঝতে পারছিনে।"

"অর্থাৎ, যে সব প্রার্থীরা আমার কাছ থেকে বিফল মনোরথ হবে, তুমি নির্বিচারে তাদের ঢেলে দাও তোমার করুণা। ভাই-পারো, তুমি সিদ্ধ সাধক, তাতে সন্দেহ নেই। তুমি আমারই দ্বিতীয় স্বরূপ। বেশ তো, আমি তোমায় জগদ্‌গুরু বানিয়ে দিচ্ছি, এবার থেকে পরমানন্দে তুমি তোমার শক্তি বিভূতির প্রকাশ দেখিয়ে বেড়াও সর্বত্র।"

গুরুর চরণ দুটি ধারণ করিয়া কম্প্রকণ্ঠে ভাই-পারো কহিলেন, "আমি আপনার দীন ভৃত্য মাত্র, আমার আপনার চরণের আশ্রয়েই থাকতে দিন। জন্মান্তরও যদি গ্রহণ করতে হয়, তবুও যেন পরজন্মে আপনারই চরণ সেবার অধিকার আমি পাই। চিরকালের গুরুরূপে আপনিই বিরাজ করতে থাকুন, আমি থাকবো আপনার একজন নগণ্য ভক্তরূপে।"

অমরদাস এবার গম্ভীর কণ্ঠে কহেন, "ভাই-পারো, তুমি যদি সত্যই আমার সেবক হয়ে থাকতে চাও, তবে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে চলে যাও তোমার নিজ গৃহে। ভগবান্ অলখ্-নিরঞ্জন তোমায় ক্ষমা করেছেন। কৃপার পূর্ণকুম্ভ হস্তে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। যাও তা গ্রহণ ক'রে ধন্য হও।"

গুরুর কথার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিলেন ভাই-পারো। স্বগ্রাম ডাল্লায় ফিরিয়া নিজের বিত্তবিষয় নিকট আত্মীয় ও দীন দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। গুরু অমরদাসের ব্যবহারের জন্য দান করিলেন তাঁহার নিজের প্রিয় অশ্বটিকে। গুরুর শিখ-মণ্ডলী ও সদাব্রতের জন্যও দান করিলেন পর্যাপ্ত অর্থ। তারপর পবিত্র ভোগান্ন রন্ধন করিয়া ভক্তিভরে নিবেদন করিলেন শ্রীভগবানের উদ্দেশে। এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করার লগ্ন সমাগত, এ কথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এবার নিজের সিংহাসনে জপের মালাটি হাতে নিয়া উপবেশন করেন, নয়ন দুটি চিরতরে নিমীলিত করিয়া প্রয়াণ করেন পরম ধামে।

গুরু অমরদাসের আর এক অধ্যাত্মসৃষ্টি তাঁহার প্রবীণ শিষ্য ভাই-লালো। ভাই-পারোর প্রয়াণের পর ভাই-লালোও স্থির করিলেন, এই মরজীবনের লীলায় এবার ছেদ টানিয়া দিবেন।

শিখ ভক্তদের কাছে সেদিন কথা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্য করা গেল, এ সময়ে তাঁহার নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। শিখ ভক্তেরা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "ভাই-লালো, আপনি গুরুর অন্যতম প্রবীণ ভক্ত, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ। দেহত্যাগের কথাপ্রসঙ্গে আপনার চোখে জল দেখছি কেন? সবাই জানে সকল ঐহিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে আপনি চলে গিয়েছেন। তবে?"

ভাই-লালোর আননে ফুটিয়া উঠে হাসির আভা। শিখদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "না ভাই, তোমরা আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারো নি। জান তো, আমার বাবা সাহুকারের ব্যবসায়ে অজস্র বিত্ত-সঞ্চয় ক'রে গিয়েছেন, আমিও বহু অর্থ উপার্জন করেছি। এই বিপুল সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পরে অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের ভোগে লাগবে। একথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন ঠিক করেছি, দেহান্তের আগে আমার বিরাট অট্টালিকায় শিখদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেবো, আর গুরুর সেবার জন্য দিয়ে যাবো অর্থের একটা বড় অংশ। বাকীটা থাকবে পরিজনদের জন্য।"

ভাই-লালোর এই উদার সংকল্প সাধনে তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা কোনো বাধা জন্মান নাই, বরং তাঁহার সহায়তাই করিয়াছেন। বিত্ত বিলি করার পর প্রবীণ সাধক নিশ্চিন্ত

হন আপন সাধনার গভীরে, তারপর একদিন গুরুদত্ত নাম জপিতে জপিতে প্রসন্ন বদনে ছিন্ন করেন মরজগতের বন্ধন। সমকালীন প্রবীণ শিখেরা ভাই-লালোর দেহান্তের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—সাপের খোলস ত্যাগের মতোই সহজ ও অনায়াস ছিল ভাই-লালোর দেহত্যাগ।

সাধারণভাবে অমরদাস গৃহীদের ত্যাগ তিতিক্ষা বাসনা ক্ষয় ও জনকল্যাণকর কর্মের উপদেশ দিতেন। কিন্তু নিজের জ্ঞাননেত্র দিয়া যাহার জীবনে পরম প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিতেন, তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন ভগবানের পরমসত্তাকে। 'ভক্তি, প্রপত্তি ও আত্মোসর্গের সংকল্প নিয়া ভগবৎ-চিন্তা আর ভগবৎ নামজপে নিবিষ্ট হও' এই তত্ত্বের বীজই রোপণ করিতেন তাঁহার অন্তরে।

সে-বার এক শিখ বণিক অমরদাসের নিকট গিয়া বলে, "গুরুজী, সারা- জীবন আমি মানুষের কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছি, দীন-দুঃখী আর সাধু সন্তদের ভিক্ষা দিয়েছি, হাসপাতাল ও ধরমশালা তৈরী করেছি, তীর্থ ভ্রমণও কম করি নি। কিন্তু কই জীবনে শান্তি তো মিলে না? কি ভাবে কোন্ পথে চললে সংসারচক্র থেকে মুক্তি পাবো, ভগবানের দর্শন পাবো। তাও তো বুঝতে পারছিনে।"

অমরদাস উত্তর দিলেন "পুণ্যকর্ম আর ভগবৎদর্শন বা মোক্ষ তো এক নয়, ভাই। বিষয় বাসনা ছেড়ে, দেহবুদ্ধি ছেড়ে ভগবান্‌কে—ভগবানের সেবাকে, দুহাতে আঁকড়ে ধর তবেই পাবে ভগবৎ-দর্শন, মিলবে অভীষ্ট পরমবস্তু।"

অধ্যাত্ম-সাধনার পথে ভগবানের নামজপ এক শ্রেষ্ঠ পাথেয়। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ এই জপের কল্যাণকারিতা বার বার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সেই সুরে সুর মিলাইয়া অমরদাস কহিলেন, "নাম সাধন বিনা মানবের মুক্তি নেই। চার যুগে সন্তেরা এই নামের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে গিয়েছেন। কলিযুগের মানুষের কাছে এটাই হচ্ছে সাধনা ও সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ।"

এ কথা বলিতে বলিতে ভগবৎ-উদ্দীপনায় গুরু তন্ময় হইয়া পড়েন। গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে থাকেন তাঁহার এক নব রচিত স্তব:

সেবাকর্ম যদি করিতেই হয়
তবে করো সেই পরম পুরুষ অলখ্ নিরঞ্জনের সেবা,
তাতেই সিদ্ধ হবে অভীপ্সা, হবে তুমি আপ্তকাম,
আর সব কর্মের মাধ্যমে আসবে তোমার চরম ব্যর্থতা।
প্রেম স্বরূপ আমার শ্রীভগবান্
আত্মার জয়যাত্রার পথে প্রেরণা-তিনি,
আবার সেই তিনি ফুটে রয়েছেন ধ্রুবতারা রূপে।
ভগবান্‌ই আমার স্মৃতি, পুরাণ, শাস্ত্র,
ভগবান্‌ই আমার পরম আত্মজন
ভগবানের যে ক্ষুধায় সদা রয়েছি আর্ত হয়ে,

তার নিবৃত্তিও যে রয়েছে তাঁরই নামসুধায়
এই দেহ আর ইহলোক ছেড়ে যেদিন চলে যাবে,
শুধু ভগবৎ-সাধনার পরম সম্পদ ছাড়া
আর কোনো সম্পদই পাববে না সঙ্গে নিয়ে যেতে।
হে নানক[১] শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে সকল কিছু,
সেই পরম ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দাও তোমার সুর।

ভক্ত শিখদের দৃষ্টিতে সুলতানপুরের গায়ক-কবি ভাই-ভিখার স্থান খুব উচ্চে। অল্প বয়স হইতেই ভগবৎ-বিরহের আগুন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু কোন্ সাধন-পথ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবেন তাহা তাঁহার জানা নাই। তাই হৃদয়ে আর্তি নিয়া দীর্ঘদিন ঘুরিয়া বেড়ান তীর্থে তীর্থে আর সাধু মহাত্মাদের মণ্ডলীগুলিতে। কিন্তু কোন্ মহাত্মাকে বরণ করিবেন গুরুরূপে, কোন্ সাধনপথে হইবেন অগ্রসর, তাহা স্থির করিতে পারেন না। হৃদয়ের জ্বালা তাঁহার দিনের পর দিন শুধুই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তরের অন্তস্তল হইতে শুধুই জাগিয়া উঠে অতৃপ্তির হাহাকার। স্বরচিত বহু বিরহ সংগীত আর ভজনের মধ্য দিয়া ভাই-ভিখা ভগবানের চরণে নিবেদন করেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কই, যাঁহার জন্য তাঁহার এই প্রাণের কান্না, তিনি তো একটি-বারও সাড়া দিতেছেন না। মনোবেদনা ও নৈরাশ্যে তিনি মুষড়িয়া পড়েন।

অবশেষে হঠাৎ একদিন আসিয়া যায় ঐশ্বরীয় ইঙ্গিত। দৈবী কণ্ঠের নির্দেশ আসে, 'এত হা হুতাশ না ক'রে তুমি গোবিন্দোয়ালে চলে যাও, সাক্ষাৎ করো অমরদাসের সঙ্গে। অভীষ্ট তোমার তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হবে।"

আর কালবিলম্ব না করিয়া ভাই-ভিখা অমরদাসের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তখন ভক্তদের উপদেশ দান করিতেছেন। ভিখার সারা দেহে মনে জাগিয়া উঠে দিব্য আনন্দের ঢেউ। একদৃষ্টে মহাত্মার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকার পর লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর ভাই-ভিখা অমরদাসকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি সংগীত রচনা করেন, সভাস্থ সকলকে তখনি এটি তিনি গাহিয়াও শুনান। শিখ সাধকমহলে এ সংগীতটি এখনো গীত হইতে শুনা যায়। ইহার মর্ম :

গুরুর দিব্য জ্ঞানের নেই কোনো তুলনা,
সাধন-মগ্ন মানুষকে তা ঠেলে দেয় ভগবৎ-চরণে।
সত্য বস্তুরূপে ভগবান্ রয়েছেন চির বিরাজিত—
এই সত্যে নিবদ্ধ করো তোমার জীবন সাধনা,
জীবন হয়ে উঠুক সত্যময়, অমৃতময়
ভাগ্য বলে গুরুর দর্শন যদি যায় মিলে,

১ অঙ্গদ, অমরদাস প্রভৃতি শিখগুরুরা স্বরচিত স্তবে নিজেদের নাম সংযোজন করেন নাই, সর্বত্র নানকের ভণিতাই দিয়াছেন।

তাঁর কৃপাবলে মানুষ পেঁাছে সেই পরম সত্যে,
জীবন হয় ধন্য, সার্থক, আলোকময়।
সদ্গুরুর সন্ধানে ঘুরে মরেছি কতকাল,
দেখেছি তপোনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও পণ্ডিত—
নেভাতে কেউ পারেনি আমার অতৃপ্তির আগুন,
হাত বাড়িয়ে তোলেনি কেউ আমায় দিব্য সরণীতে।
হে মোর ভগবান্, এবার পেয়েছি পথ-সন্ধান,
এবার পেয়েছি আমার আলোকদিশারী গুরুকে।

এই স্তবগাথা শ্রবণ করিতে করিতে অমরদাস ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ভাই-ভিখাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়া বসান, কপালে স্পর্শ করান পুণ্যহস্ত। তখনি নাম মন্ত্র প্রদান করেন এই মুমুক্ষু গায়ক-কবিকে।

ভাই-ভিখার জীবনে এবার নামিয়া আসে আত্মপ্রত্যয় এবং প্রশান্তি। গুরুর কাছে থাকিয়া কিছুদিন তিনি সাধনভজনে ব্রতী হন, নানা নিগূঢ় উপদেশ গ্রহণ করেন। তারপর নিজের শহরে ফিরিয়া গিয়া নিরত হন ধ্যান জপ ও নামমন্ত্রের অখণ্ড সাধনায়।

উত্তরকালে ভাই-ভিখা এক শিখ সিদ্ধপুরুষরূপে পাঞ্জাবের সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন।

ভাই-মলহন, ভাই-দীপা প্রভৃতি তরুণ শিখেরা একদিন মহাত্মা অমরদাসকে অনুরোধ করেন, "গুরুজী, উচ্চ স্তরের শিখ সাধকেরা সাক্ষাৎভাবে আপনার কাছ থেকে নিগূঢ় সাধনার প্রণালী শিখতে সক্ষম হন, নিষ্ঠাভরে তা অনুসরণ ক'রে তাঁরা সাফল্য অর্জনও করেন। কিন্তু বহু শিখ গৃহস্থভক্ত আছেন যাঁরা আপনার সান্নিধ্যে বেশীদিন থাকতে পারেন না। ঐসব ভক্তের জন্য আপনি সাধারণভাবে কিছু নির্দেশ দিন যা তাঁরা সহজে গ্রহণ করতে পারে আর প্রচারকর্মে গিয়ে আমরাও তাদের এগুলো জানাতে পারি।"

গুরু উত্তরে জানাইয়া দেন, "প্রত্যেক গৃহস্থ শিখের প্রতি আমার উপদেশ: ধর্মান্ধতা ও অহংকার ত্যাগ করো। ব্রতী হও সাধু-মহাত্মাদের সেবায়। আমাদের সম্প্রদায়ের রীতি অনুসরণ ক'রে নিজ নিজ আহার্য তৈরি করো। অনাহারে যে ক্লিষ্ট তাকে খাদ্য দাও। পরিচ্ছদ কেনার মতো সঙ্গতি যার নাই, তাকে দান করো তোমার পরিচ্ছদ। রাত্রি অবসানের আগে নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, শুচি হয়ে আবৃত্তি করো পবিত্র জপজী। উচ্চ স্তরের সাধকদের পুণ্যময় সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করো, শব্দ বা অনাহত নাদ শ্রবণের জন্য হও ধ্যাননিরত। তোমার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করো শ্রীভগবানের সেবায়। শিখধর্মের অনুশাসন ও উপদেশ শ্রদ্ধাভরে করো অনুসরণ। গুরুদেব রচিত পবিত্র স্তবগাথা আবৃত্তি ক'রে যাও সারা জীবন। এই সীমাহীন জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র আরাধ্য ভগবান্,—এই তত্ত্বে হও বিশ্বাসী। এই সংসার হচ্ছে এক তরঙ্গ-সংকুল মহাসমুদ্র, এই সমুদ্রে তোমার জীবনতরী যদি অত্যধিক সাংসারিক বোঝা নিয়ে চলে, তবে তা হবে নিমজ্জিত; আর যদি সে বোঝা কম হয়,

তবে তরী তোমার সহজে ভেসে থাকবে, আর তুমিও সহজে পৌঁছাবে এ-কূল থেকে ও-কূলে।"

একদিন অতি প্রত্যুষে গুরুর ধর্মসভায় শিখ ভক্তরা 'আসা কি উয়ার' আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময়ে গুরু গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

ধ্যানাবস্থায় পরম গুরু নানকজী কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন, কহিলেন, "শিখমণ্ডলী দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়ে চলেছে, এবার এই মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য একটি তীর্থ তুমি প্রতিষ্ঠা করো। একটি পবিত্র বাওয়ালি—কূপ—তুমি খনন করাও। সবাই তার জল স্পর্শ ক'রে ধন্য হোক।"

এই প্রত্যাদেশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অমরদাস তাঁহার আশ্রমের নিকটে কিছুটা জমি ক্রয় করেন। শুভ সংকল্প ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাওয়োলি খননের কাজ শুরু হইয়া যায়। শিখ ভক্ত ও শিষ্যেরা সবাই মিলিয়া পরম উৎসাহে এ কার্য সাধনে ব্রতী হন।

শত শত লোক এজন্য উদয়াস্ত পরিশ্রমে রত। কেহ কোদালি দিয়া খনন চালাইতেছে, কেহ ঝুড়িভর্তি মাটি টানিয়া নিয়া উপরে ফেলিতেছে, কেহ সোপান নির্মাণে ব্যস্ত, আবার কেহ বা নিয়াছে কর্মীদের স্নানাহারের ব্যবস্থার ভার। এইভাবে ভক্ত শিষ্যদের শ্রমদানের মধ্য দিয়া বাওয়ালির কাজ পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, এবং শিখ সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে ইহা পরিচিত হয়।

এ সময় লাহোর শহরের চুনীমান্ডীতে হরিদাস নামক এক ধর্মপ্রাণ সোঁধি ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী দয়া কাউরও ছিলেন অতিশয় ভক্তিমতী। এই ক্ষত্রিয় দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন সুলক্ষণযুক্ত এবং রূপলাবণ্যময় এক শিশু। নামকরণ করা হয়—রামদাস। পিতামাতার প্রথম সন্তান, এজন্য সবাই তাহাকে ডাকিতেন জেঠা বলিয়া। এই জেঠা বা রামদাস উত্তরকালে গুরু অমরদাসের আশ্রয় লাভ করেন, গণ্য হন তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে।

কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করেন জেঠা কিন্তু পড়াশুনার বা সাংসারিক কাজ-কর্মে তাঁহার তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। দিনরাত উদাসীনভাবে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। সাধুসন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিলে সারাদিন অতিবাহিত হয় তাঁহাদেরই পিছে পিছে। মাতা পিতা উভয়েই তাহাকে নিয়া বড় দুশ্চিন্তায় পড়েন। কোনো বৃত্তি গ্রহণ না করিলে, কিছু উপার্জন না করিলে, এ ছেলে কি করিয়া ঘর-সংসার করিবে?

মায়ের গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া জেঠা একদিন কহিলেন, "বেশ, এখন থেকে আমি রোজগারের চেষ্টা শুরু করবো। তুমি আমায় কিছু ছোলার ঘুগনি তৈরি ক'রে দাও, তাই ফিরি ক'রে বেড়াবো। তারপর দেখি ধীরে ধীরে একটা খাবার তৈরির ব্যবসায় দাঁড় করানো যায় কিনা।"

ঘুগনি তৈরি হইল, একটি ঝুড়িতে এগুলি তুলিয়া নিয়া জেঠা নদীর পারঘাটার দিকে

চলিলেন। ভাবিলেন, 'এখান দিয়া বহু লোক যাতায়াত করে, দেখা যাক, খদ্দের জুটে কি না।'

ঘাটের কাছে পেঁৗছিয়া দেখেন, একদল সাধু নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তীরে উঠিতেছে। আলাপ করিয়া বুঝিলেন, বহু দূর হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন, সবাই শ্রান্ত ক্ষুধার্ত। জেঠা ইঁহাদের সেবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত। বিক্রয়ের জন্য ঝুড়িভর্তি যে খাদ্যবস্তু আনিয়াছেন তাহার সবটা দিয়া পরিতোষ সহকারে সাধুদের ভোজন করাইলেন।

সাধুরা মহাখুশী, তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন, "বেটা, তুমি ভক্তিমান্ এবং সাধু-সেবায় তৎপর, পরমাত্মা অবশ্যই তোমার মঙ্গল করবেন।"

বলা বাহুল্য, সেদিন বাড়িতে ফিরিবার পর জেঠাকে মায়ের তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হয়।

কয়েকদিন পরের কথা। জেঠা দেখিলেন, শহরের রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে ভক্ত শিখদের একটি মিছিল। শিঙ্গা করতাল ও ভেরী বাজাইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে সোৎসাহে তাহারা পথ চলিতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ইহারা সবাই গোবিন্দো-য়ালের যাত্রী। একজন শিখ আবেগভরে জেঠাকে কহিলেন, "ভাই, আমরা চলেছি গুরু অমরদাসের দর্শনে। তাঁর দর্শন আর আশীর্বাদে ইহলোকে পাবে মঙ্গল, আর পরলোকে পাবে মুক্তি। যাবে তাঁর দর্শনে? তবে চল আমাদের সাথে।"

জেঠা এই মিছিলের সঙ্গে ভিড়িয়া পড়েন। তারপর উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে অমরদাসের সকাশে।

শিখগুরু তাঁহার দরবারে সমাসীন। পশ্চাৎভাগে আশাসোটা ও চামর নিয়া দণ্ডায়মান তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যের দল। আর সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন শত শত ভক্ত ও দর্শনার্থী। স্তব, ভজন সংগীত ও সোহিলা আবৃত্তির পর গুরু শুরু করিলেন তাঁহার নিত্যকার ধর্মউপদেশ। এ উপদেশের এক একটি বাণী যেন চৈতন্যময়। তরুণ ভক্ত জেঠার হৃদয়ে এই বাণী প্রবল আলোড়ন তুলিয়া দিল। ভক্তি আনত শিরে অমরদাসকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

গুরুর প্রশ্নের উত্তরে জেঠা কহিলেন, "প্রভু, সংসারের স্পৃহা আমার নেই, তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি এক অজানা আকর্ষণে। আপনার কাছে এসে অবধি মনে হচ্ছে, আপনার চরণই আমার পরম আশ্রয়। আপনার এখানে আমায় আপনি স্থান দিন, প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের পথে আমায় চালিত করুন।"

গুরুর নয়ন দুটিতে প্রসন্নতার আভা। ইতিমধ্যেই তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, এই যুবক তাঁহার চিহ্নিত উত্তর সাধক। অজানিতভাবে ঐশ্বরীয় ইঙ্গিতে চালিত হইয়া, সে আজ গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইয়াছে, মাগিতেছে তাঁহার পরমাশ্রয়।

স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি কহিলেন, "বৎস, যদি সত্যকার বৈরাগ্য তোমার জেগে থাকে, সত্যসত্যই যদি ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে এখানে এসে থাকো, তবে আশ্রয় এখানে অবশ্যই মিলবে। শুধু তাই নয়, যে পরম বস্তু পেয়ে মানুষ আপ্তকাম হয়, প্রকৃত স্বতন্ত্র পুরুষ

হয়ে ওঠে তা পেতে হলে শুধু ঘর-সংসারই নয়, ছাড়তে হয় ইহলোকের অনেক কিছু। ভগবানের সেবায় ও জপধ্যানে নিজেকে বিলিয়ে দাও, আত্মাভিমানকে নিশ্চিহ্ন করো, তবেই তো তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। ভগবানের দরবারে পেঁছিতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি। এখানকার কাজকর্ম ও ধ্যান ভজনের মধ্যে দিয়ে এই প্রস্তুতি তুমি শুরু ক'রে দাও।"

দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুর সেবায় ও শিখমণ্ডলীর কর্মে জেঠা তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, অল্পকাল মধ্যে গণ্য হন এক ত্যাগী কর্মী ও সাধকরূপে।

অমরদাসের দ্বিতীয় কন্যা বিবি ভানি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ভক্তপ্রবর জেঠার (রামদাসের) সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পরও জেঠার সাধনজীবনের গতিকে মন্থর হইতে দেখা যায় নাই, গুরুর সেবা এবং গুরুর লঙ্গরখানার কর্ম পূর্ববৎ নিষ্ঠা নিয়া তিনি সম্পন্ন করিতে থাকেন।

গুরুগত প্রাণ এই শিষ্য সম্পর্কে ম্যাকলিফ লিখিতেছেন, "জেঠা প্রাণপাত করিয়া যতই গুরুর সেবাকে আঁকড়াইয়া ধরেন, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম তাঁহার ততই বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে বিস্তারিত হইতে থাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেম। মানুষ মাত্রেই, তা সে যে ধর্ম বা সম্প্রদায়েরই হোক, হইয়া উঠে তাঁহার একান্ত আপনজন। এই মানসিকতার ফলে তাঁহার সাধনজীবন হয় দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা বোধহয় এমনিভাবে সোনায় পরিণত হয়। গুরু অমরদাসের ব্যক্তিগত সেবা ও মণ্ডলীর কাজকর্ম ছাড়াও এই সময়ে জেঠা গুরুর পবিত্র বাওয়ালি খননের কাজে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকেন। দেহের ক্লান্তির দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি কূপের তলদেশ হইতে শত শত ঝুড়ি মাটি তুলিতেন। সঙ্গীরা এই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের জন্য অনেক সময় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রুক্ষেপমাত্র করিতেন না। এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষা গুরুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, দেহবুদ্ধি ত্যাগ করার জন্য জেঠা প্রাণপণে যুঝিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সাধনার প্রস্তুতিপর্ব এবার প্রায় সমাপ্ত। স্বভাবতই এ সময়ে গুরুকৃপা অকৃপণভাবে তাঁহার জীবনে বর্ষিত হইতে থাকে, এক উচ্চকোটির সাধকে তিনি পরিণত হন।

শিখ ধর্মগ্রন্থে বৈরাগী মইদাসের গুরুকৃপা প্রাপ্তির এক মনোরম আখ্যান রহিয়াছে। গুরু অমরদাসের ঋদ্ধি সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়া এই ভক্ত বৈষ্ণব একদিন গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হন। অমরদাসের নিয়ম—অভ্যাগতেরা আগে লঙ্গরখানায় বসিয়া সবার সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করিবে, সব মানুষকে সামাজিকভাবে এক বলিয়া গ্রহণ করিবে, তবেই লাভ করিবে গুরুকে দর্শনের অধিকার। কিন্তু বন্ধন ও ভোজনের এ ব্যবস্থা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব মইদাসের মনঃপূত হইল না। গুরুর দর্শন-আকাঙ্ক্ষা তিনি বিসর্জন দিলেন, রওনা হইলেন দ্বারকা তীর্থের দিকে।

পথ চলিতে চলিতে সেদিন গুজরাটের এক গহন বনে আসিয়া পেঁছিয়াছেন। রাত্রিকাল, নিকটে কোথাও জনমানব নেই। এমন সময়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হইল,

তাড়াতাড়ি এক বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নিলেন মইদাস। কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে রাত্রি কোনোমতে ভোর হইল।

দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঘন অরণ্যের মধ্যে কোথাও কিছু দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। কয়েকদিন ক্রমাগত পদব্রজে পথ হাঁটার পর মইদাস অতিশয় পরিশ্রান্ত। তদুপরি রহিয়াছে ক্ষুধার জ্বালা।

দেহ প্রায় অবসন্ন, বন হইতে বাহির হইবেন সে সামর্থ্যই নাই। এ ঘোর বিপদে কৃষ্ণ ছাড়া আর কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে। মনে মনে বার বার তাঁহারেই স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হন জটাজুট সমন্বিত এক বর্ষীয়ান্ সাধু, হস্তে তাঁহার খাদ্যের থালা—ভাত, ডাল, তরকারী তাহাতে সাজানো রহিয়াছে। আহার্য বিষয়ে মইদাসের স্পর্শ বিচার আছে। ভাবিলেন, কোন্ জাতির লোক এসব রান্নাবান্না করিয়াছে তাহার কিছু ঠিক নাই। তবে কি করিয়া এই খাদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন?

সাধু বুঝিলেন, এই অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব মইদাসের মন সায় দিতেছে না। থালাটি নিয়া তিনি এক বৃক্ষের আড়ালে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই আবার সেখানে ফিরিয়া আসিয়া সহাস্যে মইদাসের সম্মুখে রাখিলেন লুচি ও মিষ্টি দিয়া সাজানো একটি নূতন পাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই সাধু অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

ঘৃতপক্ক লুচি ও মিষ্টিতে মইদাসের তেমন আপত্তি রহিল না। এবার এগুলি তিনি উদরস্থ করিলেন। আহারের শেষে একটু সুস্থ হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন সেই সাধুটিকে, খাদ্য দিয়া যিনি তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। তাই তো, চট্ করিয়া কোথায় তিনি সরিয়া পড়িলেন?

এবার মইদাস ভাবিতে বসিলেন। সাধুটি প্রথমবার তাহাকে যে সব রান্না করা খাদ্য দিয়াছিলেন, এই দুর্গম অরণ্যে তাহা সংগ্রহ করা তো সহজ কাজ নয়। পরক্ষণেই তিনি আনিলেন লুচি মিষ্টির থালা। এ যে ভোজবাজীর মতোই বিস্ময়কর। এ সাধুর অন্তর্ধানও বড় রহস্যময়। এদিকে সেদিকে মইদাস অনেক ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না।

এবার তাঁহার ধারণা জন্মিল, এই আগন্তুক কোনো সাধু বা সন্ন্যাসী নয়, আসলে মইদাসের প্রাণ রক্ষার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে কৃপা করিয়া যান।

জোড়হস্তে আবেগ কম্পিত স্বরে, মইদাস বার বার জানাইতে থাকেন তাঁহার প্রার্থনা, "হে কৃষ্ণ, হে প্রভু বাসুদেব, কৃপা ক'রে এই অধমের প্রাণ যখন বাঁচিয়েছো, এবার তাকে একবার দেখা দাও।"

দৈবী কণ্ঠের এক প্রত্যাদেশ শোনা গেল এইসময়ে "মইদাস, তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরু হচ্ছেন অমরদাস। বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে অবিলম্বে তাঁর কাছে যাও, তাঁর আশ্রয়ে থেকে তুমি সাধনভজন করো।"

মইদাস আবার ফিরিয়া চলিলেন, গোবিন্দোয়ালে। নৈষ্ঠিকতার যে সংস্কার ও

অহংবোধ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ছিল, এবার তাহা নির্জিত হইয়া আসিয়াছে। অমরদাসের লঙ্গরখানায় সবার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া তিনি আহার করিলেন। তারপর লাভ করিলেন গুরুর দর্শন।

পরম স্নেহে অমরদাস এই নবভক্তকে গ্রহণ করেন, আশ্বাসভরা কণ্ঠে কহেন, "মইদাস, আমি জানি তুমি শুদ্ধসত্ত্ব সাধক, ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে তোমার ওপর। নাম-দীক্ষা নেবার পর আমার সান্নিধ্যে আটদিন তুমি বাস করো, তারপর তোমার সাধন-প্রণালী সম্পর্কে আমি তোমায় সব বলবো।"

অমরদাসের পরিকল্পিত পবিত্র বাওয়ালি খননের কাজ সেসময়ে অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশ হইতে জলধারা তখন অবধি উৎসারিত হয় নাই। খনন-কারী শিখেরা পড়িয়াছেন এক মহা সংকটে। বাওয়ালির সর্বনিম্ন স্তরে দেখা দিয়াছে একটা বিরাট পাথরের স্তর। এটিকে তাড়াতাড়ি ভেদ না করিতে পারিলে, জল উঠিবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

কর্মীরা সমস্যাটি অমরদাসের গোচরে আনিলেন। সব শুনিয়া তিনি কহিলেন, "পাথরের একটি বিশেষ স্থান আমি চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছি। নিচে নেমে তোমাদের কেউ একটি লৌহ কীলকের সাহায্যে সেখানটায় ছিদ্র ক'রে দিক। ছিদ্র করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তর স্তরটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, জল উঠতে থাকবে প্রচণ্ড বেগে। কিন্তু একটা বিপদ আছে একাজে। বাওয়ালির নিম্নপ্রদেশে দাঁড়িয়ে যে এই লৌহ কীলক প্রবিষ্ট করাবে তার জীবন কিন্তু বিপন্ন হবে। ক্ষিপ্রবেগে উত্থিত ঐ জলপ্রবাহ তাকে সজোরে আছড়ে ফেলবে।"

গুরুর কথা শুনিয়া সকলেই শঙ্কিত। তিনি এবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে যাবে একাজে এগিয়ে, আপন প্রাণ বিপন্ন ক'রে কে এই বাওয়ালির কাজকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলবে?"

কেহই কোনো কথা কহিতেছেন না, সকলেই একেবারে চুপচাপ। এমন সময়ে গুরুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য মানকচাঁদ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া আসেন, বলেন, "গুরুজী, একাজের দায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনার ও শিখমণ্ডলীর আরব্ধ পুণ্যকাজ সমাপ্ত করতেই হবে, তাতে বিপদের ভয় করলে চলবে কেন?"

বৃহৎ একটি লৌহ কীলক নিয়া মানকচাঁদ বাওয়ালির নিম্নদেশে নামিয়া গেলেন, সেটিকে প্রোথিত করিয়া দেন, সেই পাথরের স্তরে। পাথর ভাঙিয়া যায়, শোঁ-শোঁ করিয়া উদ্‌গত হয় রুদ্ধ জল স্রোত, মানকচাঁদের দেহটিকে আছড়াইয়া ফেলে কূপের সুদৃঢ় বেষ্টনীর গাত্রে। ক্ষণপরেই তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ উপর দিকে ভাসিয়া উঠে, শিষ্য ভক্তদের মধ্যে হায়-হায় রব পড়িয়া যায়।

মানকচাঁদের মাতা ও স্ত্রী এ সংবাদ পাইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিয়া আসেন, বাওয়ালির পাশে দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে গুরু অমরদাসের কাছে এই দুঃসংবাদটি পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাওয়ালির ধারে তিনি ছুটিয়া আসেন। ভক্ত মানকচাঁদের ভাসমান দেহের দিকে

কিছুক্ষণ তাঁহাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে দেখা যায়। অতঃপর তাহার জননী ও স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলেন, "মানকচাঁদের মৃত্যু কি ক'রে হবে গো? সে যে জীবিত থেকে বহুলোককে উদ্ধার করবে। ভগবান্ অবশ্যই তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবেন।"

এবার কূপের ভিতর প্রবেশ করিয়া গুরু উচ্চ স্বরে ডাকিয়া বলেন, "মানকচাঁদ, তুমি ওভাবে জলের ওপর পড়ে আছো কেন? তুমি যে আমার জীয়র[১] ছেলে, এক্ষুনি চোখ মেলে চাও আমাদের দিকে। দেখছো না তোমার মা তোমার শোকে কেঁদে সারা হচ্ছেন। এবার উঠে এস তুমি আমাদের কাছে।"

এবার সর্বজনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল অমরদাসের এক অত্যাশ্চর্য বিভূতি-লীলা। দেখিতে দেখিতে মানকচাঁদের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। বাওয়ালির সোপানের কাছে আসিয়া তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গুরুর দরবারে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। ভক্ত শিখদের উল্লাসভরা কণ্ঠের 'ওয়াগুরু' রবে দশদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার পরের দিন অমরদাস তাঁহার নূতন শিষ্য মইদাসকে নিকটে ডাকাইলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "গতকাল নিজের চোখে তুমি মানকচাঁদের আত্মোৎসর্গের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছো। জেনে রাখবে, সে শুধু গুরুগতপ্রাণ শিষ্যই নয়, গুরুর সাধন-শক্তিও অনেকাংশে তার ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছে। মানকচাঁদ একজন প্রচ্ছন্ন সিদ্ধ সাধক, বহু লোককে উদ্ধার করার মতো সামর্থ্য রয়েছে তার। তুমি তার কাছ থেকে নিগূঢ় সাধনার প্রণালী জেনে নাও, নিমজ্জিত হও জপ ধ্যানের গভীরে। তারপর এই সাধনার ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত ক'রে দাও।"

মানকচাঁদের কাছ হইতে সাধন নিবার পর মইদাস তাঁহার স্বগ্রামে চলিয়া যান। সেখানে একান্তে বসিয়া দীর্ঘ সাধনার ফলে লাভ করেন বহুতর সাধন ঐশ্বর্য। উত্তর-কালে শিখধর্মের এক বিশিষ্ট প্রচারকরূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

শিখ ধর্মনেতাদের সম্পর্কিত হিন্দি জীবনীগ্রন্থও সুরযপ্রকাশ-এ গুরু অমরদাস ও আকবরের মিলনের এক কাহিনী বর্ণিত আছে। দিল্লী হইতে আকবর সে-বার লাহোর যাইতেছিলেন, অমরদাসের সাধনঐশ্বর্যের খ্যাতি পূর্ব হইতেই তাঁহার শুনা ছিল, এবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। বিপাশা নদী পার হইয়া একটু ঘুর-পথে সম্রাট্ গোবিন্দোবালে গিয়া পৌঁছিলেন।

আকবর ধর্মগুরুদের মান রাখিতে জানিতেন। তাই অমরদাসের আশ্রমের কাছে গিয়া তিনি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন, অগ্রসর হইলেন পদব্রজে।[২]

গুরু অমরদাসের দর্শন লাভ করিতে হইলে, আগে তাঁহার লঙ্গরখানার খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, সম্রাটকে একথা জানানো হইল। তৎক্ষণাৎ এ নিয়ম তিনি রক্ষা করিলেন।

---

১ জীয়র শব্দের অর্থ জীবন্ত। আজ অবধি গুরুকৃপাপ্রাপ্ত মানকচাঁদের উত্তর পুরুষদের শিখেরা জীয়র বংশের সন্তান বলে অভিহিত করেন।

২ সুরযপ্রকাশ রাস ২ অধ্যায় ২০

বসুই গৃহের সামান্য একটু খাদ্য মুখে পুরিয়া নিয়া উপস্থিত হইলেন গুরুর ধর্মসভায়।

কুশল প্রশ্ন ও আলাপ আলোচনার পর আকবর কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনার লঙ্গর-খানায় দেখছি প্রচুর জনসমাগম হয়। আপনার এই বিপুল ব্যয়ভারের কিছুটা অংশ আমায় বহন করতে দিন। কয়েকখানা গ্রাম আমি আপনার নামে লিখে দিচ্ছি, এর আয় থেকে আপনার খাদ্য বিতরণের কাজে সাহায্য হবে।"

অমরদাস সহাস্যে উত্তর দিলেন, "সম্রাট্, আমার স্রষ্টা শ্রীভগবান্ আমাকে অনেক কিছু তো নিজ থেকেই দিচ্ছেন। আমার ভক্ত শিখেরা যে যা পাবে সাধ্যমতো আমার এখানে ভেট দেয়, তাই দিয়ে লঙ্গরখানার কাজ অব্যাহত থাকে। যে দিন যা ভাণ্ডারে আসে তা সেদিনই খরচ ক'রে ফেলা হয়—এই এখানকার নিয়ম। পরের দিনের জন্য সঞ্চয় কিছু রাখা হয় না। এভাবেই হাজার হাজার লোককে আমরা আহার্য দিতে সক্ষম হচ্ছি। ভগবানের উপরই আমরা নির্ভর ক'রে আছি, তাই যেন শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি।"

আকবর বুঝিলেন গুরুকে গ্রামদান গ্রহণ করানো যাইবে না। অথচ এই বিরাট কর্ম-যজ্ঞে কিছু সাহায্য দিতে না পারিলে তিনি স্বস্তি পাইবেন না। অবশেষে অমরদাসের অনুমতি নিয়া তাঁহার কন্যা বিবি ভানির নামে আকবর গ্রাম কয়টি লিখিয়া দিলেন।

পারস্পরিক প্রীতি সম্ভাষণের পর সম্রাট্ বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং বিদায়কালে গুরু অমরদাস তাঁহাকে একটি মূল্যবান জোব্বা উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন।

সে-বার একজন ধনী শেঠ অমরদাসকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আনীত ভেটদ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে বজ্রখচিত একটি বহুমূল্যবান হার। এই হারটি তিনি গুরুর গলায় পরাইয়া দিতে চান। গুরু হাসিয়া কহিলেন, "আমি বৃদ্ধ মানুষ, এই মূল্যবান হার কি আমার গলায় শোভা পায়? বরং আমার পরম স্নেহভাজন এবং আমার দ্বিতীয় স্বরূপ কোনো তরুণ সাধককে এটি উপহার দাও।"

কে সেই ভাগ্যবান্ সাধক, গুরু যাহাকে দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিতেছেন। সভা প্রাঙ্গণে গুঞ্জন উঠিল, কেহই বুঝিতেছে না গুরু অমরদাস কাহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছেন, কেহ বলিতেছেন, গুরুর পুত্রদ্বয় মোহরি বা মোহন হয়তো হইবে, উভয়েই উন্নত ধরনের সাধক। কেহ বা নবাগত অন্যান্য তরুণ শিষ্যদের কথা বলিতেছেন। সবাকার জল্পনা কল্পনায় ছেদ টানিয়া দিয়া গুরু প্রসন্ন বদনে কহিলেন, এ হার পরবার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে আমাদের জেঠা—রামদাস। শেঠজীর হাত হইতে বজ্রখচিত হারটি তুলিয়া নিয়া এইটি তিনি প্রিয়তম শিষ্যের গলায় দোলাইয়া দিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। গুরু অমরদাস কয়েকজন শিষ্য সহ বিপাশার তীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হঠাৎ সেখানে এক পাগলাটে সাধুর সঙ্গে তাঁহাদের দেখা। সাধুটি অমরদাসকে দেখিয়াই আপন মনে গালাগাল শুরু করিয়া দেয়। বলিতে থাকে, "এই তো দেখছি গুরু অমরদাসকে। আহা, কি এক মস্ত গুরুই যে তিনি হয়ে গেছেন।

লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে অজস্র টাকাকড়ি নিচ্ছেন, আর তা অপচয় করছেন হাজার হাজার বাজে লোককে খাইয়ে দাইয়ে। কেন, এই যে আমি একটা সাধু এখানে পড়ে আছি, আমার দিকে তো তার কোনো লক্ষ্য নেই। কই, এতটুকু আফিম বা ভাঙ তো আমার জন্যে পাঠান নি? আমার কিছু দান করলে পুণ্য হয়। অমরদাস কি তা জানে? ওর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে?"

অমরদাস ধৈর্য ও প্রশান্তির মূর্ত বিগ্রহ। সাধুর কথা শোনার পর কোনো ভাব বৈলক্ষণ্যই তাঁহার মধ্যে দেখা যায় না। আরও একদিন সাধুটি এভাবে অমরদাসকে গালিগালাজ করিয়াছে এবং তিনিও তাহাতে কোনো কর্ণপাত করেন নাই।

আর একদিন নদীতীরে জেঠাকে একলা পাইয়া সাধুটি পূর্ববৎ অমরদাসের নিন্দা শুরু করিয়া দেয়। জেঠা বিরক্তির সুরে কহিলেন, "রোজ রোজ তুমি এই তিক্ততা বাড়াচ্ছ কেন বল তো। এমন একজন সর্বজনমান্য মহাত্মাকে গালিগালাজ করলে পাপ হয় তা জানো?"

সাধুটি বলিয়া উঠে, "কেন, করবো না? এত লোকে আমায় ভিক্ষা দেয়, কিন্তু তোমার গুরু কি কখনো একটা পয়সা আমায় দিয়েছে? এই তো তোমার গলায় দুলছে দেখছি একছড়া হার। ওটা আমায় দিয়ে দাও দেখি। ওটা বিক্রি করলে আমার বেশ কিছুদিনের খোরাক হয়ে যাবে।"

কোনো দ্বিরুক্তি না করিয়া জেঠা তাঁহার গলার হারটি তখনি পাগলা সাধুকে দান করেন। বলেন, "দ্যাখো, এবার থেকে আর অযথা গুরু অমরদাসের নিন্দাবাদ করো না।"

সাধু তো আনন্দে আত্মহারা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "বেঁচে থাকো বেটা, সুখে থাকো। তুমি দেখছি পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, বিক্রমাদিত্যের চাইতেও বড় দাতা।"

যাক, দুর্মুখ পাগলাটে সাধুকে তো বশীভূত করা গিয়াছে। এবার জেঠার মন অনেকটা হাল্কা। সানন্দে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিত্যকার দিনচর্যা শুরু করিলেন।

অমরদাসের কাছে যাইতেই তাঁহার চোখ পড়ে জেঠার খালি গলার দিকে। প্রশ্ন করেন, "তোমার সেই মূল্যবান হারটি কোথায় গেল, বল তো?"

"সেটি আমি নদীতীরের সেই পাগলা সাধুটিকে দান করেছি। মহারাজ, শ্রীভগবানের নামের যে হার কৃপা করে আপনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়েই আমি দিব্য আনন্দে দিনরাত ভরপুর রয়েছি। রত্নখচিত হার দিয়ে আমার কি প্রয়োজন?"

গুরুর চোখে মুখে খুশির উজ্জ্বলতা। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "জেঠা, তুমি ভাগ্যবান, দুর্লভ ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী তুমি হয়েছো। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার বংশে এই ভগবৎপ্রেমের ধারা থাকবে অব্যাহত।"

অমরদাসের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতে

থাকে। ইহা দেখিয়া একদল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শঙ্কিত হইয়া উঠে। এই নূতন ধর্মান্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য তাহারা তৎপর হয়।

বিরোধীদের যুক্তি—অমরদাস জাতিবর্ণ সব একাকার করিয়া দিতেছেন। তাঁহার লঙ্গরখানার সামনে ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করে। উচ্চবর্ণের ভক্তেরাও ভক্তিভরে তাহার পাদোদক পান করে। এই ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা চলিতে দিলে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব ও সম্মান ধূলিসাৎ হইবে। ক্ষত্রিয়দের ধর্মও হইবে বিলুপ্ত। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া অমরদাসের মণ্ডলীর উপর আঘাত হানা প্রয়োজন।

এই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মারওয়াহা নামে এক ক্ষত্রিয় জমিদার। দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে তাহারা অভিযোগ উপস্থিত করে,—অমরদাস হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করিয়াছেন, সরকারের উচিত এখনই তাঁহাকে দমন করা।

সম্রাটের দরবারের একজন প্রভাবশালী মুসলমান মনসবদার অমরদাসকে জানিতেন। তিনি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠান। এ প্রসঙ্গে সম্রাট্‌কেও স্মরণ করাইয়া দেন যে ইতিপূর্বে অমরদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহার লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্রাট্‌ তাঁহার কন্যার নামে কয়েকটি গ্রামও দান করিয়াছেন। অমরদাসের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপরায়ণতার স্মৃতি তখনো সম্রাটের মনে জাগরূক রহিয়াছে। তাই এই অভিযোগ তিনি বাতিল করিয়া দিলেন।

বিরোধীরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। কিছুদিন পরে আবার তাহারা এক নালিশ দায়ের করে। এবারকার যুক্তি অতি প্রবল। নালিশকারীদের বক্তব্য, অমরদাসের অনাচারের ফলে একদল সমাজদ্রোহীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারা শুধু সমাজের উপর আঘাত হানিয়াও থামিবে না, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অচিরে রাজনৈতিক বিরোধিতাও শুরু করিবে, সম্রাটের বিরুদ্ধে হানিবে প্রচণ্ড আঘাত। এখনই এই বিদ্রোহের অঙ্কুর সমূলে উৎপাটন করা দরকার। অমরদাসের মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হোক, অথবা তাঁহাকে ও তাঁহার দলবলকে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত করা হোক।

এবার দিল্লীর দরবার হইতে সমন জারী করা হয়, অমরদাস যেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহার নিজের বক্তব্য পেশ করেন। দরবারের একজন কর্মচারী সমনটি নিয়া গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত।

অমরদাস আবেদন জানান, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার পক্ষে দিল্লীতে হাজির হওয়া সম্ভব নয়, সম্রাট্‌ যেন এজন্য আমায় মার্জনা করেন। আমার প্রতিনিধিরূপে আমার প্রধান শিষ্য জেঠা (রামদাস) যাবে দিল্লীর দরবারে। আমার দিক্‌কার বক্তব্য সে বুঝিয়ে বলতে পারবে।"

অমরদাসের এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। জেঠাও গুরুর আশীর্বাদ নিয়া উপস্থিত হন দিল্লীর দরবারে। অভিযোগের উত্তরে তিনি জানান, তাঁহার গুরু অমরদাস বলপ্রয়োগ করিয়া কাহাকেও তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করান নাই। তাঁহার উদার মতবাদই জনগণকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহার লঙ্গরখানার একসঙ্গে বসিয়া আহার করার ফলে জনগণের

মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ।[১] এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিও লোকের আগ্রহ জাগিয়াছে। গুরু অমরদাসের এই আদর্শ ও কর্মসূচী নিশ্চয়ই সম্রাটের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

জেঠার এই বক্তব্য শুনিয়া সম্রাট সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিরোধীদের অভিযোগ-পত্র বাতিল করিয়া দেন।

কিছুদিন পরে রামদাস একবার কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বার অঞ্চলে পরিব্রাজন করিতে বাহির হন। এ অঞ্চলে শিখধর্মের প্রচার এযাবৎ করা হয় নাই, প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই একদল অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সেবকদের নিয়া তিনি যাত্রা শুরু করেন।

কুরুক্ষেত্র এবং থানেশ্বর অঞ্চলে বহু নূতন ভক্তকে অমরদাস নামমন্ত্র দান করেন। শিখধর্মের উদারতা, ভক্তিবাদ এবং শরণাগতির বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে।

কনখল ও হরিদ্বারে গুরু অমরদাসকে দর্শনের জন্য ভিড় জমিয়া যায়। বহু মুক্তিকামী নরনারী এই বর্ষীয়ান মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

পরিব্রাজনের পথে যে সব স্থানে অমরদাস তাঁহার শিষ্যগণসহ অবস্থান করেন এবং ধর্ম উপদেশ দান করেন, শিখ সাধকের দৃষ্টিতে সে স্থানগুলি পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই সব স্থানে গুরু তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাসমতো দরবার বসাইতেন। জপজী এবং সোহিলা আবৃত্তি করা হইত, নূতন নূতন যেসব স্তব তিনি রচনা করিতেন, তান লয় সহযোগে সেগুলি ভক্তিভরে গীত হইত।

এসময়কার রচিত একটি স্তবে গুরু অমরদাস বলিতেছেন :

> অসীম অনন্ত প্রভু আমার অলখ নিরঞ্জন,
> বৃথা খুঁজে বেড়াও তাঁকে দেশ দেশান্তরে।
> গোপনে, সবার অলক্ষ্যে রয়েছেন তিনি বিরাজিত
> প্রতি মানুষের হৃদয় কন্দরে।
> গুরুর পদে করো আগে আত্মসমর্পণ,
> অহমিকার সামান্যতম চিহ্নটি ফেল মুছে,
> সাক্ষাৎ করো তোমার বহুবাঞ্ছিত ভগবানকে।
> ওগো, হারিয়ে ফেলেছি আমি আমার সত্তাকে
> ছড়িয়ে দিয়েছি নিজেকে অগণিত মানুষের হৃদয়ে,
> যেখানে সংগোপিত সুমধুর নাম সুধা।
> মুক্তি আর অমৃত দুই-ই রয়েছে এই নামে,
> গুরুর দাক্ষিণ্যে ও স্পর্শে হয়েছে তা মধুরতর।
> অহংকারের পাষাণ প্রাচীর দাও ভেঙে ফেলে,
> মুক্ত ক'রে দাও চৈতন্যের স্রোতধারা
> গুরু কৃপার বলে জাগিয়ে তোল তোমার নামমন্ত্র,

---

১ শিখিজম—এ রোজ ; এনসাইক্লোপিডিয়া অব এথিকস অ্যান্ড রিলীজিয়নস।

গুরু কৃপার জ্যোতিতে কৃতার্থ হও তুমি।
গহন অরণ্যে গুপ্ত রয়েছে যে মহাধন
গুরু ছাড়া কে দেবে তার পথসন্ধান?
পরম পুরুষকে পাবে না হেথায় হোথায় ঘুরে,
একান্ত ধ্যানে নয়ন করো নিমীলিত,
অনাহত নাদকে স্পর্শ করো তোমার চেতনা দিয়ে,
সেই পরম এক এবং পরম সত্যকে হও পরিজ্ঞাত।
সদ্‌গুরুর হাতে রয়েছে সেই চাবিকাঠি
যা খুলে দেবে মুমুক্ষার দ্বার,
দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে মরার পাপচক্র
হবে চিরতরে বিধ্বস্ত, ফিরে পাবে তুমি নিজেকে।

দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর অমরদাস আবার তাঁহার নিজের স্থানে, গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া আসেন। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়।

গঙ্গা নামে এক ধনী ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ে বহু টাকা লোকসান দেয় এবং শেষটায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনেরা সবাই এসময়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই চরম দুর্দশার দিনে গঙ্গা শুনিতে পায় সিদ্ধপুরুষ অমরদাসের কথা, আর্ত ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার কৃপার কথা। অতঃপর পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে উপস্থিত হয় গোবিন্দোয়ালে।

গুরুর চরণে পতিত হইয়া গঙ্গা নিবেদন করে তাহার দুঃখের কাহিনী, কাঁদিয়া বলে, "আপনি আমার কৃপা করুন, আমায় মানুষের মতো বাঁচতে দিন। আপনার আশ্রয় না পেলে বিপাশার জলে গিয়ে আমি ডুবে মরবো।"

গুরুর অন্তর বিগলিত হইল, কহিলেন, "ভয় নেই আবার তুমি তোমার বিত্ত বিষয় ফিরে পাবে, কিন্তু ধর্মের দিকে, আর্তের দুঃখ মোচনের দিকে সদাই দৃষ্টি রেখো। তুমি দিল্লী শহরে যাও, সেখানে গিয়ে সাহুকারী ব্যবসা খোল।"

নির্দেশ মতো গঙ্গা শুরু করে তাহার নূতন ব্যবসা এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনী শেঠরূপে সে পরিচিত হইয়া উঠে।

সে-বার এক দুঃস্থ ব্যক্তি গুরু অমরদাসের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে, বলে, "আমার কন্যার বিয়ে স্থির হয়েছে, কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই। আপনি আমায় এ সংকট থেকে উদ্ধার করুন। আপনার তো কত ভক্ত শিষ্য রয়েছে, এদের কারুর কাছ থেকে আমায় কিছু অর্থ যোগাড় ক'রে দিন।"

গুরু তাহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা টাকার হাতচিঠি দিয়া দিল্লীতে ভক্ত গঙ্গার কাছে পাঠাইয়া দেন।

গঙ্গা কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত লোকটিকে টাকা দেয় নাই। প্রচুর অর্থের অধিকারী হওয়ার পর হইতে তাহার চরিত্র কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল,

'একবার যদি গুরুর এই হাতচিঠার টাকা দিই, তা হলেই বিপদ। প্রায়ই এ ধরনের দাবি আমার ওপর চেপে বসতে থাকবে।' অমরদাসের প্রেরিত লোকটিকে সে ফিরাইয়া দিল।

সকল কথা শোনার পর গুরু কহিলেন, "অর্থ ও জাগতিক প্রতিষ্ঠা এমনি ক'রেই মানুষের ভেতরকার দিব্যসত্তাকে নষ্ট ক'রে ফেলে। আমার হাতচিঠাকে অগ্রাহ্য ক'রে গঙ্গো ভাল কাজ করে নি। যাক্, এসো এ দুঃস্থ লোকটিকে আমরা সবাই মিলে সাহায্য করি।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং গুরুর চরণে প্রণাম জানাইয়া বিপন্ন প্রার্থী হাসি মুখে বিদায় নেয়।

অতঃপর গঙ্গোর ব্যবসায়ে আকস্মিকভাবে এক সংকট দেখা দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে সে দেউলিয়া হইয়া পড়ে।

এবার হৃতসর্বস্ব গঙ্গোর চৈতন্যোদয় হয়, গুরুর দরবারে আসিয়া দৈন্যভরে পতিত হয় তাঁহার চরণতলে। অনুতাপের দহনে তখন সে জ্বলিয়া মরিতেছে। সজল চক্ষে নিবেদন করে, "গুরুজী, এবার আমি বুঝতে পেরেছি, অর্থ ও মান যশ আমার কি ক্ষতিসাধন করেছে। অহংকারে মত্ত হয়ে আমি আপনার মতো আশ্রয়দাতাকেও ভুলে গিয়েছি। আপনার চরণে আমার এই মিনতি, এখন থেকে অর্থ যেন আমার জীবনে না আসে, আবার যেন আমার অন্ধ ক'রে না ফেলে। অর্থের বাসনা আমার চিরতরে দূর হয়েছে, এবার আমি চাই পরমার্থ। কৃপা ক'রে মুক্তির পথ আমার আপনি দেখিয়ে দিন।"

গঙ্গোর জীবনে আসে এবার তীব্র বৈরাগ্যের জোয়ার। তাহার কৃচ্ছ্রসাধন ও গুরু-সেবার নিষ্ঠা দেখিয়া ভক্ত শিষ্যেরা বিস্মিত হইয়া যায়।

করুণাধারা এবার ঝরিয়া পড়ে ভক্ত গঙ্গোর জীবনে। পরম স্নেহে গুরু নামমন্ত্র তাহাকে দান করেন, সেই সঙ্গে একখণ্ড শুভ্র উত্তরীয় তাহার শিরে জড়াইয়া দিয়া বলেন, "আত্মশুদ্ধির আগুন জ্বলে উঠেছে তোমার জীবনে, আর ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ করি, সাধনায় সফলকাম হও তুমি। শুধু তাই নয়, তোমার এই সাধনার ঐশ্বর্য তুমি বিতরণ করো দেশের জনগণের মধ্যে।"

আম্বালা জেলার দাউ নামক স্থানটি আজো সিদ্ধসাধক গঙ্গোর সাধনপীঠরূপে পরিচিত হইয়া আছে।

প্রেমা নামক এক হতভাগ্য ক্ষত্রিয় যুবক সে-বার গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকালেই পিতামাতাকে সে হারায়, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল নিকট আত্মীয়েরা তাহা জবরদখল করিয়া বসে। আশ্রয়হীন, কপর্দকহীন প্রেমার জীবনে আসে দৈবের আরো কঠিন আঘাত, জঘন্য কুষ্ঠরোগে সে আক্রান্ত হয়। এই চরম দুর্দশার দিনে ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সে দিন যাপন করিয়া থাকে।

লোকের মুখে প্রেমা শুনিতে পায় অমরদাসের সিদ্ধ জীবনের নানা আশ্চর্য কাহিনী। ভাবিতে থাকে, 'এই মহাপুরুষের কৃপায় কত আর্তমানুষ উদ্ধার পেয়েছে,

মারাত্মক রোগের কবল থেকে বেঁচে উঠেছে। আমার মতো অসহায় ও রুগ্ন মানুষের ওপর কি তাঁর কৃপাদৃষ্টিপাত হবে না ?'

আশায় বুক বাঁধিয়া, সারা পথ হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে প্রেমা একদিন আসিয়া উপস্থিত হয় গোবিন্দোয়ালে। গুরু অমরদাসকে কেন্দ্র করিয়া এক বৃহৎ নগরের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে। নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ শিখ ভক্তেরা কেহ গাহিতেছে নাচিতেছে, কেহ বা চক্রাকারে বসিয়া গুরু রচিত আনন্দ, সোহিলা ও স্তবগানে আত্মহারা হইয়া আছে।[1] এ যেন এক আনন্দের হাট।

ভাবাবেগে উচ্ছল প্রেমা গুরুর উদ্দেশে রচনা করে এক স্তবগান, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বার বার তাহা গাহিতে থাকে। রাস্তায় ভিড় জমিয়া যায়।

প্রেমা কাতর কণ্ঠে বর্ষীয়ান্ শিখদের কাছে মিনতি জানায়, "গুরুর দর্শন ও কৃপা-লাভের ব্যবস্থা আপনারা ক'রে দিন, আমি যে এসেছি তাঁর কাছে এক নূতন জীবন ভিক্ষা করতে।

সবাই তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "গুরুর লঙ্গরখানার আহার ক'রে তুমি অপেক্ষা করো। গুরু নিজেই তোমার আহ্বান ক'রে নেবেন, অন্ধ আতুর ও মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা আছে, ঐদিন তোমাকেও তিনি টেনে নেবেন তাঁর কাছে।"

কিন্তু প্রেমাকে বেশী অপেক্ষা করিতে হইল না। এক অন্তরঙ্গ ভক্ত গুরুর কাছে গিয়া বর্ণনা করিলেন তাহার চরম দুর্ভাগ্যের কথা, আর সেই সঙ্গে বার বার প্রশংসা করিলেন তাহার সদ্য রচিত স্তবগানের। শিখটি আরো কহিলেন, "গুরুজী সব চাইতে বিস্ময়ের কথা, মারাত্মক ঘৃণ্য রোগে প্রেমা ক্লিষ্ট, কিন্তু গুরুর স্তব রচনা করার মতো আর তা গেয়ে শোনানোর মতো আনন্দ তাঁর অন্তরে উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড!"

প্রসন্নমধুর হাসি হাসিয়া অমরদাস উত্তর দিলেন, "প্রেমা খুঁজে পেয়েছে তার চিরন্তন দিব্যসত্তা, সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের আমূল পরিবর্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানকার আশীর্বাদ এবার অবশ্যই তার ওপর বর্ষিত হবে। কাল প্রত্যূষে আমার স্নানকরা বিপাশার জলে তার সারা দেহ ধুইয়ে দাও, তারপর তার ঘায়ের স্থান-গুলো বেঁধে দাও পরিষ্কার কাপড়ের বন্ধনী টুকরো দিয়ে। তারপর আমি অবসর মতো নিজেই গিয়ে তাকে দেখে আসবো।"

নির্দেশ পালিত হইল। পরদিন গুরু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণসহ প্রেমার কাছে গিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। করুণাভরা নয়নে কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। তারপর স্বহস্তে সযতনে তুলিয়া ফেলিলেন ঘায়ের বন্ধনী। কিন্তু কি আশ্চর্য। কুষ্ঠরোগের কোনো ক্ষতচিহ্নই ভিখারী প্রেমার দেহে নাই। ত্বকের বর্ণ একেবারে স্বাভাবিক এবং উজ্জ্বল।

---

১ শিখদের গ্রন্থসাহিব-এ গুরু অমরদাস বহু সংখ্যক স্বরচিত স্তব সংযোজিত করিয়াছেন। দ্রঃ এ রোজ ই-আর-ই, ভল্যু ২।

গুরু তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করেন, তারপর নির্দেশ দেন, "মুরারি, মুক্তিকামী মানুষকে নামমন্ত্র দানের চাপরাস তুমি আজ আমার কাছ থেকে পেলে। এবার তোমার স্বগ্রামে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে ব্রতী হও পুণ্যময় শিখধর্মের প্রচারকর্মে। বৎস, আমার শক্তি এখন থেকে কাজ করবে তোমার ভেতরে থেকে।"

উত্তরকালে এই মুরারি শিখ সম্প্রদায়ের এক প্রখ্যাত সাধক ও প্রচারকরূপে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গুরুর যোগশক্তির ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই শক্তি শুধু কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই চৈতন্যোদয় ঘটাইত না, আশেপাশের সাধক ও সাধারণ নরনারীকেও করিত প্রভাবিত।

তালওয়ান্দিতে অমরদাসের এক পুরাতন ভক্ত বাস করিতেন, তাঁহার একটি পা ছিল একেবারে নিঃসাড় ও অকেজো। কোনোমতে একটি পা নিয়াই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইত এবং গুরুকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিত স্বগৃহে। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে ডাকিত লঙড়া বলিয়া। শ্লেষের সুরে অনেকে বলিত, "তোর গুরুর এত শক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পাই, অথচ তোর একটা পা তিনি আজ অবধি সারিয়ে তুলতে পারলেন না? তুইও তেমনি নির্লজ্জ, ঐ গুরুকে দর্শন করবার জন্য রোজ হিঁচড়ে হিঁচড়ে গোবিন্দোয়ালে যাস্। যে গুরু তোর খোঁড়া পা'টাই ভালো করতে পারেন না, স্বর্গের মতো দূরদেশে তোকে নিয়ে যাবেন কেমন ক'রে?"

উত্তরে লঙড়া শান্ত স্বরে বলিত, "খোঁড়া পা ভালো করবার জন্য কি আমি শিখধর্ম নিয়েছি? আর এই তুচ্ছ ব্যাপারে আমি গুরুকে কোনো প্রার্থনাও তো কখনো জনাই নি।"

একদিন গ্রামের চৌধুরীও অনেকের সঙ্গে জুটিয়া লঙড়াকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। লঙড়া সেদিন উত্তেজিত হইয়া উঠে, অমরদাসের দরবারে গিয়া জানায় তাঁহার দুঃখ দুর্দশার কাহিনী।

উত্তেজনায় গুরুর চোখ দুটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, শান্ত দৃঢ় স্বরে কহেন, "এবার তবে তোমার খঞ্জত্ব ঘোচাতেই হবে, দেখছি। তুমি এখনি বিপাশার তীরে চলে যাও। সেখানে এক বনের ভেতরে চুপচাপ ক'রে বসে থাকেন এক প্রাচীন ফকীর। নাম তাঁর হুসেনী শাহ্। বড় উগ্রমূর্তি এবং কর্কশভাষী। তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না তাঁর কথাবার্তায় বা আচরণে। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার নির্যাতনের কাহিনী বল এবং আরও বল, গুরু বলেছেন—আমার এ খোঁড়া পা'টি নিরাময় ক'রে দিতে।"

লঙড়া এবার ফকীরের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হয়। সকলেই জানে, যে কেহ সম্মুখে আসিলেই ফকীর ক্ষিপ্তপ্রায় হয় এবং কদর্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে। কিন্তু তাহার দিকে তাকাইবার পর ফকীরের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সাহস পাইয়া লঙড়া তাঁহার সান্নিধ্যে বসিয়া সবিস্তারে জানাইতে থাকে দুঃখের কাহিনী। সব কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফকীর হঠাৎ মারমুখী হইয়া উঠে, তারপর চীৎকার করিয়া একটা মোটা লাঠি নিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লঙড়া তাহার নিজের লাঠিটা ফেলিয়াই সেখান হইতে দৌড়িয়া পালায়।

কিছুটা পথ আসার পর সবিস্ময়ে সে থমকিয়া দাঁড়ায়। এ কি? তাহার পা' তো আর খোঁড়া নয়। স্থির নিঃসাড় অঙ্গটি কোন্ ইন্দ্রজাল বলে একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ধীরে ধীরে সে ফকীর হুসেনী শাহের কাছে ফিরিয়া আসে। কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাকে বার বার।

ফকীর এবার শান্ত স্বরে বলিয়া উঠে, "ওরে, তোর জখম-হওয়া পা'টা তো তখনি ভালো হয়ে গিয়েছে যখন গুরু অমরদাস তোরে আসতে বলেছে আমার কাছে। এসব গুরুরই কাণ্ড। সে নিজে আড়ালে থেকে অনেক কিছু করবে, আর এই সব সিদ্ধাইর 'দুর্নাম' ফেলবে পাগলা হুসেনী শাহের উপর। একটা কথা জেনে রাখবি, চারিদিকে খোদার বহু সেবক রয়েছে আমার মতো, কিন্তু গুরু অমরদাসের মতো রয়েছে খুব কম সংখ্যক লোক।

নিজের দিব্যদৃষ্টি দিয়া অমরদাস দেখিয়াছেন, জেঠা-ই—রামদাসই তাঁহার গদি ও নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী। যথাসময়ে নিজেই তিনি তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যকে গদিতে বসাইয়া দিয়া যাইবেন, নানক অঙ্গদের প্রিয় ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন তাহার শিরে।

সেই সঙ্গে গুরু একথাও উপলব্ধি করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে গোবিন্দোয়ালে বাস করিয়া জেঠা তাঁহার এই গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, এজন্য চাই বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্র এবং ব্যাপকতার উদ্যোগ আয়োজন।

জেঠাকে ডাকিয়া একদিন কহিলেন "বৎস, ইতিপূর্বে দিল্লীর সম্রাট্ কয়েকখানি গ্রাম হস্তান্তর করেছেন তোমার পত্নী—আমার কন্যা বিবি ভানির নামে। সেখানে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থানে তুমি তোমার একটি নূতন ভবন নির্মাণ করো এবং তার চারিদিকে গড়ে তোল শিখ ভক্তদের একটি নূতন উপনিবেশ। জেনে রেখো, আমার অপ্রকটের পরে ঐ জনপদটিতেই তোমার স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে।"

একথা শুনিয়া পরম ভক্ত জেঠার দু'নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। গুরুকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাঁহাকে থাকিতে হইবে, যে গোবিন্দোয়ালের সর্বত্র গুরুর পুণ্যস্মৃতি জড়ানো তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এ চিন্তাও যে তাঁহার কাছে অসহনীয়।

স্মিত হাস্যে অমরদাস জানান তাঁহার আশ্বাস বাণী, "বৎস, তোমার ঐ বাসস্থান এবং সন্নিহিত অঞ্চলই একদিন হয়ে উঠবে শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তোমার ভবনের পূর্ব অঞ্চলে অগৌণে তুমি একটি পুণ্য-সরোবর খনন শুরু করে দাও।"

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করেন জেঠা। তাঁহার শ্রম ও তৎপরতার ফলে নির্মিত হয় একটি ক্ষুদ্র জনপদ ও পুষ্করিণী। এই কার্য ব্যপদেশে গুরুর পুণ্যসঙ্গ ছাড়িয়া প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে তাঁহাকে বাস করিতে হইতেছে, এজন্য মনে খেদের অন্ত নাই। সেবার গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া গিয়া আরব্ধ কর্মের বিবরণ অমরদাসকে তিনি জানাইলেন। গুরু কহিলেন, "বৎস, সেখানে তুমি পুষ্করিণী খনন করেছ, তা রয়েছে দূঢ় এবং উচ্চ

ভূমিতে। এটি আর বেশী খনন করার দরকার নেই, এ পর্যন্তই থাক্। আমার বরে এই পুষ্করিণী জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শিখেরা ভক্তিভরে সেখানে স্নান করলে অশেষ পুণ্য অর্জন করবে। এই পুষ্করিণীর নাম দিলুম আমি 'সন্তোখ্ সর'।[1] যে কেউ এর জল স্পর্শ করলে, প্রাপ্ত হবে প্রকৃত সন্তোষ ও শান্তি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গুরু কহিলেন ঐ পুষ্করিণী থেকে আরও কিছুটা পূর্বে নিম্নভূমি রয়েছে। তার ভেতরে তুমি একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন করো। আমার আশীর্বাদে উত্তরকালে ঐ সরোবর হয়ে উঠবে শিখ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আগে থেকে তার নামকরণও আমি ক'রে রাখলাম, তা অভিহিত হবে 'অমৃতসর' নামে।[2]

গুরু অমরদাস ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তাই নিজে বুঝিয়া নিয়াছেন, বিদায় লগ্নের আর বেশী দেরি নাই। এ সময়ে মাঝে মাঝেই তাঁহার মনে জাগিতেছে শিখধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের কথা। তাঁর দেহান্তের পূর্বেই গুরুর গদিতে এমন একজন শিখ সাধককে বসাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যিনি ভক্ত শিষ্যদের সত্যকার দিকদিশারী হইবেন, সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও পরিচালনার মধ্য দিয়া শিখধর্মকে স্থাপন করিবেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।

মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, সিদ্ধ সাধক জেঠাকে অভিষিক্ত করিবেন গুরুর গদিতে।

অমরদাসের এই মনোভাব প্রবীণ ও অন্তরঙ্গ শিখদের অজানা নয়। কিন্তু তাঁহাদের কেউ কেউ এই মনোনয়নে তেমন সায় দিতে পারিতেছেন না। ভাবিতেছেন 'গুরু অমরদাসের জ্যেষ্ঠ কন্যা দানীর বিবাহ হইয়াছে রামের সঙ্গে। রাম একজন নিষ্ঠাবান্ শিখ। লঙ্গরখানার কাজে, গুরুর এবং মণ্ডলীর সেবার কাজে, সর্বত্র সর্বসময়ে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বিশেষত গুরু নির্মিত পুণ্যতোয়া বাওয়ালির ব্যবস্থাপনা ও তীর্থযাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে তাঁহার উপর। এদিকে জেঠাও বিবাহ করিয়াছেন গুরুর কনিষ্ঠ কন্যাকে। তাছাড়া, তিনি এক উন্নত স্তরের সাধক এবং গুরুর মণ্ডলীর এক বিশিষ্ট সেবক। তবু জেঠার চাইতে রাম বয়সে বড় এবং অধিকতর অভিজ্ঞ। গুরুর পদে তাঁহাকেই তো মনোনীত করা উচিত।

এ ধরনের কিছু কিছু কথাবার্তা গুরুর কানে গেল। কোনো মন্তব্য না করিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গুরুগদির দুই প্রার্থীর পার্থক্যটি এবার সবাইকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া দরকার।

ঘনিষ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়া গুরু অমরদাস হঠাৎ সেদিন পবিত্র বাওয়ালির সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। রাম এবং জেঠা দু'জনকেই সেখানে ডাকিয়া আনা হইল। গুরু কহিলেন, "আমার মনে ইচ্ছে জেগেছে, এই বাওয়ালির পাশে বসে প্রতিদিন আমি জপতপ

১ সুরজপ্রকাশ, রাস ২, অধ্যায় ১১

২ গুরু অমরদাসের পরিকল্পিত অমৃত সরোবর এবং অমৃতসর শহরের খ্যাতি আজ শুধু সারা ভারতে নয় সারা বিশ্বে প্রচারিত।

করবো। এজন্য দুটো উঁচু পাকা মঞ্চ নির্মাণ করা প্রয়োজন। রাম, তুমি একটি মঞ্চ তৈরি করো, তাতে সকালবেলায় আমি আসন পাতবো। আর জেঠা, তুমি নির্মাণ করো অপরটি, তা আমি ব্যবহার করবো সন্ধ্যাবেলায়।"

দুই শিষ্যই মহা উৎসাহে আদিষ্ট কাজে ব্রতী হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

গুরু সেদিন বাওবালির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রামের তৈরী মঞ্চটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিলেন।

তারপর কহিলেন, "রাম, এটার জন্য তুমি খুবই পরিশ্রম করেছ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জানো, মঞ্চটি আমার তেমন মনঃপূত হয় নি। এটি ভেঙে ফেলে দিয়ে আর একটি নূতন মঞ্চ তুমি বানাও।"

আবার সোৎসাহে নির্মাণ-কর্মে লাগিয়া যান রাম। অচিরে সেটি সমাপ্ত হয় এবং গুরুকে ডাকিয়া আনিয়া দেখান। এবারও অমরদাসের পছন্দমত কাজ হয় নাই। নির্দেশ দিলেন, "এ দিয়ে আমার কাজ হবে না, বরং আর একবার নূতন ক'রে একটি মঞ্চ তুমি তৈরি করো।"

দুই দুই বারই গভীর নিষ্ঠা ও সতর্কতার সহিত রাম তাঁহার নির্মাণকার্য সমাধা করিয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত অযৌক্তিকভাবেই গুরুজী ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিখদের কাছে বিরক্তিকর সুরে রাম কহিলেন, "গুরুজী অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।"

গুরুর কানে একথা পৌঁছিল। এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করিয়া তিনি শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

জেঠার মঞ্চ পরীক্ষা করার পরও প্রকাশিত হইল গুরুর একই মনোভাব। নানা খুঁটিনাটি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া তিনি কহিলেন, "এ দিয়ে আমার কাজ চলবে না, জেঠা। সবটা গুঁড়িয়ে ফেলে আবার তুমি নির্মাণ করো নূতন মঞ্চ। তাতে এবার যেন কোনো রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে।"

অম্লান বদনে জেঠা তখনি সেটা ভাঙিয়া ফেলেন, অধিকতর সতর্কতার সহিত আবার গাঁথিয়া তোলেন নূতন মঞ্চ।

এটি পরিদর্শন করিতে আসিয়া অমরদাস কঠোর স্বরে বলেন, "কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার জেঠা। এ দিয়ে আমার কোনো কাজই চলবে না। ভেঙে ফেলে দাও সবটা, সত্যিকার নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে এটা সম্পূর্ণ ক'রে তোল।"

জেঠার অন্তরে নেই কোনো খেদ ও বিরক্তি। প্রতিবারই গুরুর তিরস্কার ও বাতিল করণের নির্দেশ প্রাপ্তির পরই তিনি বলিয়া উঠেন, "গুরুজী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এটি বাতিল হবারই যোগ্য। আমি আবার এটি তৈরি করছি।" সেই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মঞ্চটি পুনরায় নির্মাণের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন।

গুরুর নির্দেশের বিরুদ্ধে কেউ কোনো নিন্দা সমালোচনা করিলে জেঠা বলেন, "আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধি নিয়ে গুরুর বুদ্ধির বিচার কি ক'রে

করা সম্ভব ? গুরু সিদ্ধপুরুষ। তৃতীয় নেত্রের, জ্ঞান নেত্রের অধিকারী তিনি। আমাদের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণ উৎসারিত হয় তা থেকে। তিনি যা করছেন, আমার প্রতি গভীর ভালবাসার বশেই তা করছেন, আমার প্রকৃত কল্যাণই যে তাঁর অভিপ্রেত।"

বাওয়ালির পাশে দাঁড়াইয়া প্রবীণ শিখদের সহ অমরদাস সেদিন জেঠার অষ্টমবারের নির্মিত মঞ্চটি পরিদর্শন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য আনন্দের আভা। স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলেন, "জেঠা, সাতবার তোমার এই আয়াসসাধ্য মঞ্চ আমি ভেঙে দিতে বলেছি, সাতবারই বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখিয়ে অম্লান বদনে, তা তুমি ভেঙে দিয়েছো। বার বার কত কষ্ট ক'রে এটিকে নির্মাণ করেছো। বৎস, আমার পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ।"

এবার পাশে দণ্ডায়মান ভক্ত শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া সহর্ষে কহিলেন, "আশাকরি ইতিমধ্যে তোমরা উপলব্ধি করেছো, জেঠার গুরুভক্তি কতটা গভীর ও একনিষ্ঠ, তার আত্মোৎসর্গ কি সুমহান্, আর তার ধৈর্য ও সহনশীলতা কি অপরিসীম। হ্যাঁ, এমনি শিখ সাধকের হাতে আমি সঁপে দিয়ে যেতে চাই শিখমণ্ডলীর নেতৃত্ব।"

কিছুদিন পরের কথা। শত শত ভক্ত শিখ পরিবৃত হইয়া অমরদাস তাঁর ধর্ম-দরবারে বসিয়া আছেন। একের পর এক চলিতেছে ভজন সংগীত ও ধর্ম-উপাসনা। এ সময়ে গুরু সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করবো, যা শিখসমাজের পক্ষে হবে পরম কল্যাণকর।"

পাশে দণ্ডায়মান ভাই বাল্লুকে এবার আদেশ দিলেন অমরদাস, "আজকের এই পুণ্যদিনে আমাদের প্রিয় জেঠাকে—রামদাসকে—উপবেশন করানো হবে গুরুর গদিতে। তার মতো পবিত্র ও আত্মনিবেদিত সাধক আর কেউ নেই। আমার স্থলে শিখধর্ম ও শিখমণ্ডলীর নায়কত্ব সে আজ গ্রহণ করবে। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ এবং আমার এই গদির মর্যাদা সে কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটি নারিকেল ও পাঁচটি মুদ্রা তুমি এখানে নিয়ে এসো। সর্বজনের সমর্থন ও কল্যাণ কামনা সহ এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি আমি এখানে সম্পন্ন করতে চাই।"

ভাই-বুধা এবং অন্যান্য প্রবীণ শিখেরা সানন্দে অমরদাসের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে রামদাসের গদি আরোহণ পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। দরবার-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল শিখদের আনন্দ উল্লাস এবং বোহ্‌গুরু ধ্বনিতে।

অতঃপর অমরদাস একদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের নিকটে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, "এ দেহটি বেশ প্রাচীন হয়েছে আর আমার যাত্রার সময়ও এসে গিয়েছে। দ্বাদশ মাঞ্জার উদাসী শিখ এবং সংসারাশ্রমী শিখদের অনেকেই এখানে রয়েছো।[১] তোমরা

১ সাধন-ঐশ্বর্যের সঙ্গে গুরু অমরদাসের জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল অসামান্য সংগঠনশক্তি। ত্যাগী উদাসী শিখ এবং ভক্ত সংসারী শিখ, এই দুই দলকেই তিনি পৃথকভাবে সুসংগঠিত করিয়া গিয়াছেন। দ্রঃ খাজান সিং. ফিলজফিক হিস্ট্রি অব দ্য শিখ রিলিজিয়ন।

আমার ভাই এবং বন্ধু, তোমরা সবাই এবার আমায় বিদায় দাও। শ্রীভগবানের আহ্বান এসেছে। তাঁর কাছে যেতে হবে, তাই আমার আনন্দের আজ অবধি নেই।”

ভক্ত শিষ্যদের অশ্রুসজল চক্ষের দিকে চাহিয়া অমরদাস কহিলেন, “এ বিদায়, তুষ্টির বিদায়, পরম প্রভুর মিলনানন্দের জন্য বিদায়। আমার দেহান্তের পর কোনো শিখ যেন একফোঁটা অশ্রু বিসর্জন না করে, এই আমার অনুরোধ। ভগবানের নামজপ করবে, তার গান গাইবে, আর তাঁর শব্দের জন্য—তাঁর অনাহত নাদের জন্য—থাকবে সদা উৎকর্ণ হয়ে। তোমাদের কাছে রইল এই আমার শেষ বাণী।”

অস্ফুটস্বরে জপজীর পুণ্যময় স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে সিদ্ধপুরুষ অমরদাস ত্যাগ করিলেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস। গোবিন্দোয়ালের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিল অগণিত শিখ নরনারীর উচ্ছ্বাসময় ধ্বনি—বোহ্‌গুরু, সৎগুরু, সৎনাম।

রায় রামানন্দ

পূর্বভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে, গৌড়ীয় প্রেমধর্মের ইতিহাসে রায় রামানন্দ একটি অবিস্মরণীয় নাম। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে, প্রাক্ চৈতন্য যুগে, উড়িষ্যার কৃষ্ণ-উপাসনার যে ধারাটি প্রবর্তিত ছিল, তিনি ছিলেন তাহারই এক ধারক বাহক। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় আন্দোলনের পর্যাপ্ত প্রভাব পড়িয়াছিল রায় রামানন্দের জীবনে। তাছাড়া, ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও গোপী-ভজনের মরমী ব্যাখ্যাতা ছিলেন এই বৈষ্ণব পুরুষ। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের প্রেম সাধনার মধুর রসও রামানন্দ পান করিয়াছিলেন আকণ্ঠ পুরিয়া, তাঁহার রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটক ও প্রেমভক্তিময় সংগীতে উৎসারিত হইয়াছিল এই পরম রস।

কিন্তু এহ বাহ্য। রায় রামানন্দের সর্বপেক্ষা বড় পরিচয়—তিনি প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার অনন্য প্রবক্তা। বৈষ্ণবীয় সাধনার যে শতদলটি নিজ জীবনে রায় রামানন্দ একান্তে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছিল, রঙে রসে সৌগন্ধে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যেরই দিব্য করুণার আলোক-সম্পাতে।

আনুমানিক ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা রাজ্যে রায় রামানন্দের জন্ম হয়। পিতা ভবানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র গজপতির অন্যতম বিশ্বস্ত সচিব এবং দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্তা। জাতিতে তিনি কায়স্থ, কুলপদবী —পট্টনায়ক। দক্ষ প্রশাসক বলিয়া ভবানন্দের যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন সংস্কৃতিবান্ এবং ধর্মপরায়ণ, দক্ষিণ-ভারত এবং উড়িষ্যার প্রখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভবানন্দের পুত্র সংখ্যা পাঁচ, ইঁহাদের মধ্যে রায় রামানন্দ ছিলেন মধ্যম পুত্র। পিতার কর্মকুশলতা এবং ধর্মসংস্কৃতির সংস্কার দুই-ই সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনে।

অল্পবয়সে গজপতি সরকারের অধীনে রায় রামানন্দ কর্ম গ্রহণ করেন এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের গুণে রাজা প্রতাপরুদ্রের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন, ফলে উত্তরকালে উন্নীত হন রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তার পদে।

তখনকার দিনে রাজমহেন্দ্রী ছিল উৎকলের এক প্রান্তীয় প্রদেশ। অদূরেই শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা। বিজয়নগর, বিজাপুর ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে এ সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। বিশেষ করিয়া বিজয়নগরের প্রতাপশালী রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সেনাবাহিনীর কাছে উড়িষ্যাধীপ প্রতাপরুদ্রকে একাধিকবার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছিল।[১] এই সংকটময় কালে এবং এই সমস্যা জর্জরিত ও

---

১ কে এন. শাস্ত্রী অ্যান্ড এন বেঙ্কটরমনাইয়া ফারদার সোর্সেস, পি মুখার্জি : গজপতি কিংস।

বিপজ্জনক ভূখণ্ডে রাজা প্রতাপরুদ্র নিয়োগ করিতে চাহেন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ বিশ্বস্ত ও কর্মকুশল শাসককে। প্রবীণ সচিব রায় রামানন্দের মধ্যে এই গুণগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন উড়িষ্যারাজ, তাই রাজমহেন্দ্রীতে তাঁহাকেই রাখিয়া দিয়াছেন নিজের প্রতিনিধিরূপে।

রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে শাসনকর্তা রামানন্দকে স্বভাবতই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অন্তর্জীবন ছিল প্রশান্তি ও প্রেমভক্তিতে সদা পরিপূর্ণ। আড়বারদের প্রেমরসাশ্রিত সাধনা এবং ভাগবতে বর্ণিত গোপীপ্রেমের সাধনা ছিল তাঁহার আত্মিক জীবনের আদর্শ। এই আদর্শের রূপায়ণে তাঁহাকে সদা তৎপর থাকিতে দেখা যাইত।

উড়িষ্যার বিশিষ্ট সাধক, আচার্য ও দার্শনিকদের কাছে প্রেমিক সাধক রামানন্দের এই পরিচয়টি অজানা ছিল না। ভারতবিশ্রুত বাঙালী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত, এই সার্বভৌম বেদান্ত ও ন্যায়ের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত হইলেও রায় রামানন্দের তত্ত্ব জানিতেন, তাঁহার প্রেমভক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতেন। তাই দেখি, পুরীধামে প্রেমভক্তির জোয়ার বহাইয়া দিয়া, বাসুদেব সার্বভৌমকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে পরিব্রাজনে অগ্রসর হইতেছেন, সার্বভৌম তখন ব্যাকুলভাবে অনুরোধ জানাইতেছেন রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য। শ্রীচৈতন্যরে কহিতেছেন,

"প্রভু, গোদাবরীর তীরে, রাজমহেন্দ্রীর বিদ্যানগরে রাম রায় রয়েছেন। অব্রাহ্মণ ও বিষয়ী বলে তাঁকে যেন তাচ্ছিল্য ক'রো না। তাঁর মতো রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নেই। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের তিনি মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর মাহাত্ম্য আমি আগে বুঝতে পারি নি, এবার তোমার কৃপায় কিছুটা বুঝেছি। তাঁর সঙ্গে অবশ্য তুমি আলাপ পরিচয় ক'রে আসবে।"

শ্রীচৈতন্য কথা দিলেন রায় রামানন্দের সহিত অবশ্যই তিনি সাক্ষাৎ করিবেন।

পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে স্নান সারিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দোলায় চড়িয়া রামানন্দ সেখানে উপস্থিত। সঙ্গে রহিয়াছে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ, বন্দী, পরিচারক ও বাদ্যকর। জাঁকজমকের ঘটা দেখিয়া চৈতন্য বুঝিলেন, ইনিই প্রদেশের শাসনকর্তা রামানন্দ। পরিচয় সাধনের জন্য অন্তর তাঁহার অতিমাত্রায় ব্যাকুল। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই ধৈর্য ধরিলেন। একান্তে রহিলেন উপবিষ্ট।

গৌরকান্তি দিব্যদর্শন কে এই সন্ন্যাসী? পরিচয় সাধনের জন্য রামানন্দ নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের এক মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন

সূর্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥

উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁও কহে সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূতলে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ।
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥

কিছুটা সুস্থ হইয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন, "এখানে আসার সময় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম বলে দিয়েছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার অবশ্যই যেন মিলিত হই। ভালোই হলো, এখানে বসেই অতি সহজে তোমার দর্শন পেলাম।"

করজোড়ে উত্তর দেন রামানন্দ, "সার্বভৌম বড় কৃপালু, আমায় তিনি ভৃত্য বলে জ্ঞান করেন। সর্বদা আমার কল্যাণ তিনি চান। তাই তো আপনার দর্শন আজ পেলাম। তাছাড়া, আমি বুঝেছি, সার্বভৌমের প্রতিও আপনার কৃপা কম নয়। নইলে তাঁর অনুরোধে আমার মতো নগণ্য অস্পৃশ্য একটা মানুষকে আপনি স্পর্শ করবেন কেন? আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর আমি হচ্ছি রাজসেবী, বিষয়ী ও শূদ্রাধম— উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিপুল ব্যবধান। আর কি আশ্চর্য কাণ্ড আমার সঙ্গী শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা সবাই আপনাকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসে রসায়িত হয়ে উঠেছেন, আনন্দাশ্রু ঝরছে তাঁদের নয়ন থেকে, মুখে উচ্চারণ করছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আপনি ঈশ্বরস্বরূপ, তাইতো আপনাকে দর্শনের পরই তাঁরা ভাবাবেগে এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছে।"

প্রভুও রামানন্দের গুণ গাহিতে কম উৎসাহী নন। বলেন, "তুমি যে একজন পরম ভাগবত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপর লোক তো দূরের কথা আমার মতো শুষ্ক সন্ন্যাসীর মনও তোমার সংস্পর্শে এসে গলে গিয়েছে, কৃষ্ণপ্রেমে আমি ভাসছি। সার্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত, যাতে আমার হৃদয়ের শোধন হয়, সে জন্যই তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

উভয়ে উভয়ের প্রশস্তি গাহিতেছেন, এমন সময়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্যকে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। স্থির হইল, মধ্যাহ্নে প্রভু তাঁহার কুটিরেই ভোজন করিবেন, এবং রায় রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন সন্ধ্যার পর।

উভয়ের মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল। প্রভু কহিলেন, "রায় রায়, সাধন-ভজনের ফলে সাধকেরা যে পরম বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই সাধ্য সম্পর্কে আমায় কিছু বল।"

রামানন্দ রায় উত্তর দেন, "বর্ণাশ্রমচারীরা পরম পুরুষ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন তাঁদের নিজ নিজ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এ ছাড়া তাঁকে তুষ্ট করার অন্য উপায় নেই।"

প্রভু বলেন, "এটা বাইরেকার কথা, রায় রায়। ভেতরকার তত্ত্ব কিছু বল।"

রামানন্দ এবার বলেন, কৃষ্ণে কর্ম অর্পণের কথা।

প্রভু একথায় মোটেই সন্তুষ্ট নন, কহেন, "আরো গভীরে যাও রায় রায়।"

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের চরণে শরণ নিবার কথা বলেন রামানন্দ।

শ্রীচৈতন্যের মতে,—ইহাও বাহ্য কথা, আরও গভীরতর সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করা হোক ইহাই তিনি চান। অতঃপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা উল্লেখ করেন রায় রামানন্দ।

প্রভুর মতে ইহা উত্তমা ভক্তি নয়, কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিতে বুঝা যায় অভেদাত্মক ব্রহ্মানুভব রূপ জ্ঞান। ভাগবৎতত্ত্বের রসমধুর অনুভূতি যেখানে নাই, সেখানে ভক্তি কোথায়?

রায় রায় এবার জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা তোলেন। এ ভক্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তাই শ্রীচৈতন্য আংশিকভাবে এই সাধ্যতত্ত্ব মানিয়া নিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা তো একথায় নাই। তাই আরো অগ্রসর হওয়ার কথা তিনি বলিলেন।

রামানন্দ এবার উপস্থাপিত করেন দাস্যপ্রেমের তত্ত্ব। ভাবময় ভক্তি ইহাতে আছে সত্য, কিন্তু ইষ্টের ঐশ্বর্যদর্শনে সাধকের সেবাসুখে সংকোচ বা ভয় কখনো কখনো আসিয়া পড়ে। তাই ইহাও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোমত নয়—কহিলেন, "ইহার কিছুটা গ্রহণীয় বটে, কিন্তু তুমি আরো গভীরে তলিয়ে দ্যাখো।"

অতঃপর উঠে সখ্যপ্রেমের কথা। এ প্রেম বিশুদ্ধ, ইহাতে ভয় সংকোচের বালাই নাই। তাই প্রভু বলিলেন, "ইহা উত্তম," অর্থাৎ দাস্যপ্রেমের উপরে ইহাকে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু আরো গভীরতর সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয়ে তিনি অভিলাষী।

রামানন্দ রায় এবার বলেন, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার।"

এই প্রেম মধুর রসাশ্রিত, ইহা কৃষ্ণেরই সুখের জন্য, কৃষ্ণেরই সম্ভোগের জন্য নিবেদিত। ইহাতে রহিয়াছে পাঁচটি গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসংকোচ ভাব, কৃষ্ণে প্রগাঢ় মমতা এবং কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণের সেবন।

এই উত্তরে শ্রীচৈতন্য প্রসন্ন হইয়া উঠেন, বলেন, "এ প্রেমকে অবশ্যই সাধ্যবস্তুর সীমারূপে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু রায় রায়, কৃপা ক'রে আমায় তুমি আরো ভিতরকার তত্ত্ব বল, আমি প্রাণভরে তা শুনি।"

নিগূঢ় প্রেমরসের তাত্ত্বিক রায় রামানন্দের বিস্ময় এবার চরমে উঠিয়াছে। তিনি কহেন, "প্রভু, এই প্রেমের আরো গভীরতর স্তরের কথা জানিতে চায়, এমন ব্যক্তি তো এই পৃথিবীতে নেই। হ্যাঁ, যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়, তবে বলবো,—এই কান্তাপ্রেমের সংবাহিকা গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীরাধা. এবং রাধাপ্রেমই হচ্ছে সাধ্য শিরোমণি।"

প্রভু কহিলেন, "রায় রায়, আহা! তোমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে অমৃতধারা, রাধাপ্রেমের পরমতত্ত্ব শুনিয়ে তুমি আজ আমায় কিনে নাও।"

রায় রায় গদ্‌গদ স্বরে বর্ণনা করেন রাধাপ্রেমের তত্ত্ব, "রাধাপ্রেমের তুলনা কোথায়? রাসস্থলীতে শত শত গোপী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করছেন, শ্রীরাধা দেখলেন, অন্যান্য গোপীদের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস করছেন, তেমনি রয়েছেন তাঁরও পাশে, তবে সাধারণ গোপীদের তুলনায় রাধার বিশেষত্ব কি রইল? রাধা মান করলেন. তাঁর প্রেম কুটিল পথে গিয়ে বামভাব প্রাপ্ত হলো। রাসস্থলী ত্যাগ ক'রে, কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে তিনি আত্মগোপন করলেন বনের অভ্যন্তরে। এদিকে রাধাকে অন্তর্হিতা দেখে কৃষ্ণ মহা ব্যাকুল। সমগ্র রাসলীলা যে রাধার যোগসূত্রে এবং রাধারই নিগড়ে বাঁধা, তিনি না থাকলে শত শত গোপীর সঙ্গ কৃষ্ণের লীলা-বিলাসের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। তাই তো রাধার বিরহে নিখিলপতি কৃষ্ণ হাহাকার ক'রে বেড়ান। এখানেই রাধাপ্রেমের রমণীয়তা আর প্রগাঢ়তা।"

প্রভু. শ্রীচৈতন্যের আনন্দের আর অবধি নাই, প্রেমপূর্ণ স্বরে বলেন, "রায় রায়, আহা, কি অমৃতের আস্বাদনই আজ তোমার কথায় পেলাম। এবার কৃপা ক'রে আমায় বল তো কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধার স্বরূপই বা কি?"

রায় বলেন, "প্রভু এ প্রশ্ন ক'রে তুমি শুধু আমার অপরাধ বাড়াচ্ছো। এ সব রসতত্ত্বের আমি কি জানি? তোমার প্রেরণা আমার হৃদয়কে করেছে উদ্দীপিত, তোমার বাণী আমার জিহ্বাকে করেছে মুখর। তাই তো তোমার শেখানো কথাই শুকপাখির মতো আমি কেবলই বলে যাচ্ছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তোমার এ লীলাখেলার মর্ম কে বুঝবে?"

প্রভু দৈন্য ও বিনয়ের অবতার। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, প্রেমভক্তির সুধারস আমার ভেতরে কই? পুরীধামে সার্বভৌমের সঙ্গ কিছুদিন করেছিলাম, তাতে মন কিছুটা নির্মল হয়েছে। তাঁকে কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এ তত্ত্বের কিছুই জানিনে, জানেন রামানন্দ রায়, তাঁর কাছে তুমি যাও।' তাই তো তোমার কাছে এখানে ছুটে এলাম। এখন দেখছি, তুমি আমার সন্ন্যাসবেশ দেখে আমার স্তুতি শুরু ক'রে দিয়েছ। রায় রায়, আমি তো এই বুঝি —ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা শূদ্রের বর্ণ বিচার অবান্তর, আসল কথা হচ্ছে, কৃষ্ণতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই গুরুর আসনে বসার অধিকারী, প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা তিনিই শুধু দিতে পারেন। তুমি আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাও রায় রায়।"

রামানন্দ করজোড়ে বলেন, "প্রভু, আমি নট বটে, কিন্তু তুমি তার সূত্রধর। নেপথ্যে থেকে তুমিই আমায় তোমার ইচ্ছেমতো কথা বলাচ্ছো, আর নাচাচ্ছো।"

প্রভুর দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন রায় রামানন্দ

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্মা পর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥ (চৈ-চরিতামৃত)

কৃষ্ণ-স্বরূপের এই অপূর্ব বর্ণনা শুনিয়া প্রভু আনন্দে উদ্বেল। দু'হাত প্রসারিয়া আলিঙ্গন দেন রামানন্দ রায়কে। আবেগ ভরা স্বরে বলেন, "আহা! আমার কৃষ্ণের কি করুণা, তোমার মতো মহাভাগবতের মুখ দিয়ে আমায় শোনাচ্ছেন তাঁর পরম মাহাত্ম্য। রাম রায়, এবার কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কথা বলে আমার প্রাণ জুড়াও।"

রামানন্দের এই তত্ত্ব বর্ণনা ভক্ত সাধক কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে অমর হইয়া আছে:

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥
সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনী সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥ (চৈ-চরিতামৃত)

প্রভু শ্রীচৈতন্যের সুগৌর তনু ভাবাবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, সারা দেহে আনন্দ রোমাঞ্চ, দুই নয়নে বহিতেছে আনন্দলোর। কৃষ্ণ-রাধার স্বরূপ-তত্ত্ব শুনিয়া এখনো তাঁহার আশ মিটে নাই। স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন, "রাম রায়, মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেম যে সাধ্য শিরোমণি তা তোমার মুখে শুনে কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু তোমার মতো মহাভাগবতের কাছে যে আমার আরও দাবি রয়েছে। তার পরে আরও এগিয়ে গিয়ে বল।"

'পরবর্তী স্তরের কথা শুনে কি তুমি আনন্দ পাবে প্রভু?—সাধকের বোধিতে এর পরে আর যে কিছু ধরা দেয় না। এর পর আসে প্রেমলীলার চরম অবস্থা—প্রেম-ক্রীড়ায় তখন আর রমণ ও রমণীর ভেদজ্ঞান নেই, নেই কোনো দ্বৈতসত্তা— সবই সেখানে অভেদ এবং একাকার।"

সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ রায় গাহিয়া উঠেন তাঁহার স্বরচিত রাধা-কৃষ্ণের সুমধুর মিলন সংগীত যাহা দ্বৈতসত্তাকে মিলাইয়া দিয়াছে অদ্বৈতসত্তায় —

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

প্রিয়া ও প্রিয়, মিলন ও বিরহ সবকিছু একাকার হইয়া গেলে লীলা অনুধ্যানরত বৈষ্ণব সাধকের কাছে লীলার চমৎকারিত্ব আর কি করিবার থাকে? মাধুর্যঘন ভগবান্

শ্রীগোবিন্দ আর মহাভাবময়ী শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ আর প্রেম-মিলনের আনন্দ চাঞ্চল্যই বা কোথায় থাকে? প্রভু তাই তাড়াতাড়ি রামানন্দ রায়ের মুখটি চাপিয়া ধরিলেন, অর্থাৎ, "আর এগিও না রায় রায়, এর পর লীলাবিলাসের বৈচিত্র্য থাকে না, থাকেন না রাধাগোবিন্দও।"

সাধ্যবস্তু- সাধনা দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায়—তাহার তত্ত্ব নির্ণয় তো হইল। এবার প্রভু রায় রায়ের মুখ দিয়া সাধন পন্থার কথাটি বলাইয়া নিতে চান। বিনয় করিয়া কহেন, "রায়, তোমার কাছ থেকে সাধ্যবস্তুর চরম সীমা তো জানা গেল। এবার বল, কি ক'রে কোন্ সাধনপন্থার মাধ্যমে সেখানে পৌঁছান যায়।"

করজোড়ে রামানন্দ নিবেদন করেন, "প্রভু, আমার কি সাধ্য আছে যে, এত সব নিগূঢ় তত্ত্ব আমি উদ্‌ঘাটন করি? তোমার লীলা বুঝা দায়। আমাকে দিয়ে তুমিই বলছো এসব কথা, আবার নিজেই সেজে বসেছো শ্রোতারূপে।" অতঃপর বৈষ্ণবীয় সাধনের নিগূঢ় পদ্ধতিটি ভাঙ্গিয়া বলেন রামানন্দ :

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিত সখী আস্বাদয়॥
সখী-বিনু এই লীলার নাহি অন্যের গতি।
সখী-ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

... ...

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবক।
সখী-ভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে অষ্টমী লক্ষ্মী করিবা ভজন।
তথাপি না পাইলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

বক্তা ও শ্রোতা দুই জনেই তখন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর, বিহ্বল। একে অপরকে বার বার আলিঙ্গন করিতেছেন, আর প্রশস্তি জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় উভয়ে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

প্রভুর পুণ্যসঙ্গের লোভ রাম রায় ছাড়িতে পারিতেছেন না। কাতরকণ্ঠে কহিলেন,

"প্রভু, যদি নিজে যেচে আমায় কৃপা করতে এসেছ, তবে এখানে দিন দশেক থেকে যাও? আমার দুষ্ট মনকে শোধন করে দাও তুমি। আমি বুঝতে পেরেছি, জীবকে উদ্ধার করতে, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করতেই, তুমি আবির্ভূত।"

উত্তরে প্রভু বলেন, "রাম রায়, তা নয়। আমি এসেছি তোমার গুণের কথা শুনে। কৃষ্ণকথা শুনে নিজেকে পবিত্র করতে এসেছি আমি। তোমার মহিমা সম্পর্কে যা আমি শুনেছিলাম, তা যথার্থ। তুমি সত্য সত্যই কৃষ্ণপ্রেমরসের সীমা। দশদিনের কথা কি বলছো, সারা জীবনে আমি তোমার পুণ্য সঙ্গ ছাড়তে পারবো না। তুমি নীলাচলে এসো, আমরা একসঙ্গে সেখানে থাকবো, কৃষ্ণকথার সুধা পান ক'রে দিন কাটাবো পরমানন্দে।"

রামানন্দ রায় বার বার বলিয়াছেন, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উদ্দীপনা দিয়াছেন, কণ্ঠে বসিয়া যোগাইয়াছেন নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব। তাঁহার একথা শুধু বিনয়ের কথা নয়, বৈষ্ণবীয় দৈন্যের কথা নয়—প্রভুর কৃপায় তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন রামানন্দ। সে দর্শন তাঁহার জীবনকে করিয়াছে মধুময়, আলোকময়। সেদিন স্পষ্ট ভাষায় প্রভুকে বলিলেন তাঁহার এই দর্শনের কথা, "তোমার গৌরকান্তি দেহে শ্যামল কিশোর কৃষ্ণের রূপ যে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি, প্রভু। তাছাড়া আরও দেখছি, পরম মনোহর মুরলীবাদন রত ত্রিভঙ্গ মূর্তি।"

প্রভু হাসিয়া উড়াইয়া দেন সে কথা। "রায় তার আসল কথাটা কি জানো, যাঁরা প্রেমিক সাধক, মহাভাগবত, তাঁরা যে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুরই মধ্যে দর্শন করেন তাঁদের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে।"

রামানন্দ উত্তর দেন, "প্রভু, তোমার এসব ছলাকলা তুমি রেখে দাও। তোমায় আমি যেরূপে দর্শন করেছি, তোমার যে মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছি, তা কোনোদিনই বিস্মৃত হবার নয়।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর তাঁহার রচিত কড়চায় চৈতন্য-রামানন্দ মিলনের যে মনোরম বর্ণনা সূত্রাকারে লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিয়াই ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আঁকিয়াছেন তাঁহার মনোরম আলেখ্য। এই আলেখ্য সম্পর্কে তাঁহার নিজের মন্তব্যটি গৌড়ীয় ভক্তজনের কাছে চিরস্মরণীয়।

কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন :

> সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপূর।
> রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড[১] প্রচুর॥

অতঃপর প্রভু রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদায় নিলেন, রওনা হইলেন দক্ষিণের তীর্থ পরিব্রাজনে। বিদায় কালে নির্দেশ দিলেন রামানন্দ রায়কে, "রায়, এবার তুমি বিষয়-কর্ম ত্যাগ করো, নীলাচলে এসে বাস করো। আমি তীর্থ দর্শন সেরে এসে তোমার সঙ্গে সেখানে মিলিত হবো। কৃষ্ণকথা রঙ্গে এবং পরমানন্দে আমরা সেখানে দিন যাপন করবো।"

---

১ খণ্ড—মিছরির টুকরো।

স্পষ্ট ক'রে একথা বলে। তাছাড়া, তোমার সঙ্গ না পেলে কৃষ্ণকথায় আমি ডুবে থাকবো কি ক'রে?"

রামানন্দ রায় আরো বলেন, "প্রভু, আরো কি কথা হলো রাজার সঙ্গে তা বলছি। আমার বিষয় ত্যাগের প্রস্তাব শুনে, আর তোমার নাম শুনেই রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, সোৎসাহে আমায় দিলেন আলিঙ্গন। তারপর প্রেমভরে আমার হাতদুটো ধরে বললেন, 'নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি প্রভুর চরণসেবা করতে থাকো। আর যে বেতন তুমি রাজ-সরকার থেকে পেতে আগেকার মতোই তা পেতে থাকবে। রাম রায়, আমি বড় দুর্ভাগা, প্রভুর দর্শন লাভে আমিই বঞ্চিত হয়ে রইলাম। যাক, তিনি কৃপালু, ঈশ্বর-স্বরূপ, কোনো জন্মে নিশ্চয় আমায় দর্শন দিয়ে ধন্য করবেন। প্রভু, তোমার প্রতি রাজার যে ভক্তি প্রীতি দেখলাম, মনে হয় আমার ভেতর তার একাংশও নেই।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেন, "রায়, তুমি কৃষ্ণভক্তদের প্রধান। তোমার প্রতি যাঁর প্রীতি আছে সে তো মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ণ অবশ্যই একদিন তাঁকে কৃপা করবেন।"

প্রভুর পাশে তখন দণ্ডায়মান পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রবীণ সাধক। রামানন্দ দৈন্যভরে ইঁহাদের পদবন্দনা করিলেন, সবাই দিলেন তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন।

প্রভু এসময়ে প্রশ্ন করেন, "রাম রায়, শ্রীজগন্নাথকে দর্শন ক'রে এসেছো তো?"

"প্রভু, এবার যাচ্ছি শ্রীমন্দিরে তাঁকে দর্শন করতে" উত্তর দেন রামানন্দ।

"এ কি করেছো রায়, শ্রীভগবান্‌কে আগে দর্শন না ক'রে তুমি এখানে এলে।"

"প্রভু, চরণ হচ্ছে রথ, আর হৃদয় সারথি। সেই সারথিই প্রথমে আমায় তোমার কাছে নিয়ে এল, সেস্থলে আমি তার কি করতে পারি।"

"না—না রাম রায়, এ তুমি ঠিক করো নি। এক্ষুনি যাও পরম প্রভুকে দর্শন করো।"

শ্রীচৈতন্যের চরণে এমনিভাবে সেদিন রামানন্দ রায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তীর্থবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনের কথাটিও হইয়াছেন বিস্মৃত।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি প্রভু শ্রীচৈতন্যের মহিমার কথা, দেবদুর্লভ রূপের কথা, বহুভাবে শুনিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রতিম এই মহাপুরুষ তাহারই রাজ্যে বাস করিতেছেন, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত করিয়াছেন প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য রাজার, এ যাবৎ একটিবারও প্রভুকে দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রভু বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, তাই রাজদর্শনে তাঁহার প্রবল বিরূপতা, প্রতাপরুদ্র তাহার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা শুনিয়াছেন। সার্বভৌমের প্রতি প্রভু অতিশয় প্রসন্ন, তাহাও তিনি জানেন। তাই সার্বভৌমকে একদিন রাজপ্রাসাদে ডাকিয়া আনেন, অনুনয় করিয়া কহেন, "পণ্ডিতবর, অন্তত একটিবারের জন্য যেন প্রভুর দর্শন পাই, সেই ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিন।"

প্রভুর কাছে সার্বভৌম এই প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র তিনি শিহরিয়া ওঠেন, "না

—না সার্বভৌম এমন অনুরোধ আমায় আপনি করবেন না। আমি সন্ন্যাসী, বিষয়ী রাজার দর্শন আর স্ত্রীলোক দর্শন আমার পক্ষে ত্যাজ্য, বিষবৎ ত্যাজ্য।"

সার্বভৌম যুক্তি দিয়া বুঝান, "প্রভু, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের প্রধান সেবক, নিজে তিনি উত্তম ভক্তও বটেন।"

"না সার্বভৌম, তা হয় না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কাষ্ঠ নির্মিত নারীদেহ দর্শন করাও ঠিক নয়, তার ফলে কামের উদ্রেক হতে পারে। তেমনি রাজা যত ভক্তিবানই হোন, শ্রেষ্ঠ বিষয়াধিকারী তো বটেই। তাঁর দর্শনও তাই সমীচীন নয়।"

বাসুদেব সার্বভৌম চুপ করিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পরে সুবিধামতো আবার প্রভুকে রাজী করানোর চেষ্টা করা যাইবে।

রামানন্দ রায় পুরীতে আসার পর রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইল। রায়ের প্রতি প্রভুর কৃপা ও প্রেমের অন্ত নাই। রাজা তাই রাম রায়ের শরণ নিলেন।

সেবার রাজা প্রতাপরুদ্র ও রাম রায় উভয়েই পুরীতে রহিয়াছেন। রাজার অনুরোধে রামানন্দকে দৌত্য গ্রহণ করিতে হয়, প্রভুকে তিনি চাপিয়া ধরেন। নিপুণ রাজ-সচিব তিনি, বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রতাপরুদ্রের ভক্তি ও ঈশ্বরসেবার কথা বলিয়া প্রভুর মন গলানোর চেষ্টা করিতে থাকেন।

প্রভু কহেন, "রাম রায়, তুমি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। আচ্ছা তুমিই বল দেখি, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন সঙ্গত কি না। এতে যে সন্ন্যাসীর ইহলোক পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের উপহাসের পাত্র হয় সে।"

"প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী, ঈশ্বরপ্রতিম ও স্বতন্ত্র পুরুষ, তোমার আবার কাকে ভয়? লোকনিন্দারই বা কি ধার ধারো তুমি?"

"না—রাম রায়, তুমি বুঝতে পারছো না। সন্ন্যাস আশ্রম বড় কঠিন ঠাঁই। সন্ন্যাসীর চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছিদ্র পেলে লোকে তাই নিয়ে কানাঘুষা করে। শুক্ল বসনে একবিন্দু কালি পড়লে তা সবারই চক্ষে পড়ে না কি?"

"সবই বুঝলাম, প্রভু। কিন্তু কত পাপী-তাপীকেই তো তুমি এযাবৎ উদ্ধার করেছো। প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানের সেবক এবং তোমার একান্ত ভক্ত। তাকেও তুমি উদ্ধার করো।"

"কিন্তু রাম রায়, প্রতাপরুদ্র যত গুণবানই হোন, রাজা তো বটেন। দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে একবিন্দু মদ্য পড়লে তা আর সাত্ত্বিক ব্যক্তির স্পর্শযোগ্য থাকে না। তেমনি 'রাজ' শব্দটি জড়িত আছে যাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা যায় না।"

খানিকক্ষণ চিন্তার পরে শ্রীচৈতন্য একটু নরম হইলেন, কহিলেন, "হ্যাঁ রাম রায়, তোমার যখন এমন প্রবল ইচ্ছে হয়েছে তখন একটা কাজ করা যায়। রাজার পুত্রকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। শাস্ত্রে রয়েছে—আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ, আমার সঙ্গে তাঁর পুত্রের মিলন হলে, তা তাঁর নিজের মিলনেরই তুল্য। তাই করো রাম রায়।"

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করা হইল। রাজার পুত্রটি আয়ত নয়ন, শ্যামল সুন্দর কিশোর। পরিধানে পীত রং-এর পরিচ্ছদ এবং নানা অলংকার। তাহাকে দেখা মাত্র

প্রভুর মনে জাগিয়া উঠে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে প্রেমভরে বুকে টানিয়া নেন।

প্রভুর এই স্পর্শ তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের মধ্যে ঘটায় অত্যাশ্চর্য রূপান্তর। অশ্রু স্বেদ কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত হয় তাহার দেহে, দিব্য আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সে নৃত্য করিতে থাকে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের করস্পর্শে আবার তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। রাজ-প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে রাজা প্রতাপরুদ্র সাগ্রহে পুত্রকে করেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে তাঁহার পুত্রের দেহ পবিত্রীকৃত, তাই সেই দেহ আলিঙ্গন করিয়াই রাজা সেদিন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাণের ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বর্ধিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য এই ব্যাকুলতার কথা অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্যের অজানা ছিল না। কিন্তু রাজার প্রেমোৎকণ্ঠাকে তিনি ধীরে ধীরে আরো তীব্র করিয়া নিতে চাহিতেছিলেন।

প্রতাপরুদ্র শেষটায় একদিন বাসুদেব সার্বভৌমকে ডাকিয়া অন্তরের দহন জ্বালা উদ্‌ঘাটিত করিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আমি কি তবে জগাই মাধাই অপেক্ষাও হীন? প্রভু তাদের উদ্ধার সাধন করলেন, আর আমাকে রেখে দিলেন দূরে সরিয়ে? আমার নিজ জীবনের প্রতি ধিক্কার এসে গিয়েছে, এবার প্রভুর দর্শন যদি না পাই তবে এজীবন আর আমি রাখবো না।"

সার্বভৌম রাজাকে ধৈর্য ধরিতে পরামর্শ দিলেন। কহিলেন, "ইতিমধ্যে প্রভুর মন আপনার সম্বন্ধে অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।"

অতঃপর সার্বভৌম এক ফন্দী আঁটিলেন। কহিলেন, 'মহারাজ, আগামী রথযাত্রার দিন প্রভু বহুক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য করবেন এবং রথের অনুষ্ঠান শেষে বিশ্রাম নেবেন পুষ্প-উদ্যানে, তখনই আসবে আপনার পরম সুযোগ। আপনি দীনবেশে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর পাদ সম্বাহন করবেন, আর রাসপঞ্চাধ্যায়ীর সুমধুর শ্লোক দু' চারটি তাঁকে শোনাবেন। তবেই আপনি পাবেন প্রভুর কৃপা।'

সার্বভৌমের এই গোপন পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছিল, রাজা ধন্য হইয়াছিলেন প্রভুর অনুগ্রহ লাভে। এ অনুগ্রহ অনেক আগেই তিনি লাভ করিতেন কিন্তু তাহা বিলম্বিত হইবার কারণ, প্রভু তাঁহার ভক্তদের দেখাইতে চাহিতেছিলেন যে, বৈরাগী বৈষ্ণবের পক্ষে রাজা ও রাজবিষয় হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়।

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুদর্শনের সমস্যাটি এভাবে মিটিয়া যাওয়াতে রামানন্দ রায় যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রামানন্দ রাজাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার ভগবদ্-ভক্তির[১] জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন। প্রভু এবার তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া নেওয়াতে রাম রায়ের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

---

১ রাজা প্রতাপরুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী কবিকর্ণপূরের প্রশস্তি উল্লেখনীয়। ভক্ত-কবি তাঁহাকে বলিয়াছেন—ভগবদ্ভাবস্বভাবঃ স্বয়মাবির্ভূত শান্তিরসাগাহনির্ধূতবজস্তম।

বথযাত্রাব সময় প্রভুব গৌড়ীয়া ভক্তেবা পুবীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ ও প্রভুব সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দবঙ্গে মত্ত হইয়াছেন। এবাব এসময়ে বুপ গোস্বামীও আসিয়া উপস্থিত। বথযাত্রাব পবে চাতুর্মাস্যেব সময়ও তিনি পুবীতে থাকিয়া গেলেন। এই সময়ে প্রভু তাঁহাকে নানাভাবে শিক্ষা দিলেন ব্রজবসেব তত্ত্ব।

বুপ অসামান্য কবি, এবাব শ্রীচৈতন্যেব কৃপায় ও প্রেবণায় শুবু কবিযাছেন বিদগ্ধ মাধব ও ললিতমাধব এই দুইখানি নাটকেব বচনা। স্ববুপ দামোদব এবং বামানন্দ বায প্রভুব এই দুই পার্ষদ ব্রজবসসাধনাব সিদ্ধ সাধক, বৈষ্ণবীয নাট্যকাব্যেব মর্মী সমালোচক। প্রভুব একান্ত ইচ্ছা বুপেব নাটকেব বস ইঁহাবা আস্বাদন কবুন এবং প্রশস্তি জানাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত কবুন।

বামানন্দ বাযেব নির্দেশমতো বুপ তাঁহাব নাটকেব এক একটি অংশ পাঠ কবিতেছেন আব প্রভু এবং ভক্ত বৈষ্ণবেবা তাহা আস্বাদন কবিযা মুগ্ধ হইতেছেন।

শ্লোক শুনিযা বাম বায এক একবাব উল্লসিত হইয়া প্রশংসা কবিতে থাকেন, আব বুপ সংকোচে আড়ষ্ট হন। বলেন, "আপনাব বৈদগ্ধ্যেব প্রভা হচ্ছে সূর্যেব প্রভাব মতো আব আমাব বচনা যেন খদ্যোতেব আলো। আমায উৎসাহিত কবুন, কিন্তু প্রশংসা ক'বে লজ্জা দেবেন না।"

নাটকেব শ্লোকগুলি শোনাব পব বামানন্দ বায সোল্লাসে বলেন, "প্রভু, এ তো কাব্য নয, এ হচ্ছে অমৃতেব প্রস্রবণ। নাটকেব সব লক্ষণ ও সিদ্ধান্ত এতে সুপবিস্ফুট হযেছে, সামগ্রিকভাবে বুপেব এ বচনা দুটি হযেছে সর্বতোভাবে বসোত্তীর্ণ। যে কোনো বসিক লোকেব কর্ণ এ শুনে তৃপ্ত হবে, চিত্ত হবে আনন্দসাগবে নিমজ্জিত। কিন্তু প্রভু বসবস্তুব পেছনে বযেছে তোমাব শক্তি, নইলে এমন মাধুর্যমণ্ডিত সৃষ্টি সম্ভব নয।"

শ্রীচৈতন্য বাব বাব বুপেব কবিত্বশক্তি ও মাধুর্যবস এবং তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনেব দৈন্য, বৈবাগ্য ও পাণ্ডিত্যেব বাব বাব প্রশংসা কবিতে থাকেন।

বাম বায সহাস্যে মন্তব্য কবেন, "প্রভু, তুমি স্বযং ঈশ্বব, যা তোমাব অভিবুচি অবলীলায তাই তুমি সম্পন্ন কবছো। ইচ্ছে হলে কাঠেব পুতুলও তুমি নাচাতে পাবো। দেখতে পাচ্ছি, আমাব মুখ দিয়ে যে বস যে তত্ত্ব তুমি বলিযেছো, বুপেব বচনাযও বযেছে তা। ভক্তদেব প্রতি তোমাব কৃপাব অন্ত নেই। তাই তো ব্রজবসেব প্রচাব তুমি কবাচ্ছো এই ভাবে।"

প্রভুব অনুবোধে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অপব বযীযান্ ভক্তেবা বুপকে আশীর্বাদ কবিলেন, জানাইলেন সস্নেহ অভিনন্দন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক উড়িষ্যাব এক ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যেব আনুগত্য গ্রহণ কবেন এবং তাঁহাব পুণ্যসঙ্গেব লোভে স্বগ্রাম ছাড়িযা আসিযা নীলাচলেই বাস কবিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথেব দর্শন, শ্রীচৈতন্যেব সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণেব জপধ্যান এই নিয়াই এই ভক্তেব দিন পবমানন্দে কাটিয়া যায়। একদিন মিশ্র শ্রীচৈতন্যেব কাছে নিবেদন কবেন, "প্রভু,

আমার প্রাণের একান্ত বাসনা, আপনার শ্রীমুখ থেকে একদিন কৃষ্ণকথা শুনবো। কবে আপনার অবসর হবে বলুন।"

প্রভু উত্তর দেন, "মিশ্র, তুমি মহা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণকথা শোনবার ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছে। কিন্তু কৃষ্ণকথা আমি আর তেমন কি জানি, এই কথার আসল ভাণ্ডারী হচ্ছেন রামানন্দ রায়। তুমি তাঁর কাছে যাও। তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।"

অতঃপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন রামানন্দের ভবনে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু ভৃত্যদের কাছে শুনিলেন, তিনি গৃহে নাই, দুইটি সুন্দরী কিশোরীকে নিয়া নিভৃত উদ্যানে খুব ব্যস্ত রহিয়াছেন। সেখানে প্রতিদিন তাহাদের তিনি নিজের নাটক জগন্নাথবল্লভম্-এর অভিনয় এবং নৃত্যগীত শিক্ষা দেন। ফিরিতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হইবে।

আরো বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র। ইহা শুধু অভিনয় শিক্ষাদান নয়, ইহা রাম রায়ের ব্রজরস সাধনার, মাধুর্যময় ভগবানের সাধনার, এক বিশেষ অঙ্গ। সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া ঐ কিশোরী দেবদাসীদের তিনি স্বহস্তে গাত্রমার্জনা করেন, শাড়ি ও ওড়না পরাইয়া দেন, প্রসাধন করান। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে অভিনয়ে, গীতে ও নৃত্যে গূঢ় অর্থ স্ফুরিত হয়, সঞ্চারী-সাত্ত্বিক-স্থায়ী ভাব প্রকটিত হয়, সেজন্য নিজ হাতে ধরিয়া সব শিক্ষা দেন।

সুন্দরী দেবদাসীর এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াও কি রাম রায়ের চিত্তে কখনো বিকার দেখা যায় না? মিশ্র মহাশয়ের মনকে বার বার দোলা দিতে থাকে এই প্রশ্নটি।

সেদিন বহুক্ষণ পরে রামানন্দ রায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মিশ্র অপেক্ষা করিয়া আছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, করজোড়ে কহিলেন, 'আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হয়েছে, আমার এ অপরাধ মার্জনা করুন। আপনি ভক্ত বৈষ্ণব, তদুপরি প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিজ জন, আপনার পদধূলিতে এ ভবন পবিত্র হয়ে উঠেছে। আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন কি আমায় করতে হবে।"

বৈষ্ণবীয় দৈন্য দেখাইয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রও উত্তর দিলেন, "আপনার মতো পরম ভাগবতের দর্শন পেলাম, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার কাছ থেকে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু আজ তো বেলা পড়ে এসেছে, এবার বিদায় নিচ্ছি। আর একদিন আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে ধন্য হবো।'

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, মিশ্র এতক্ষণ উঠি উঠি করিতেছিলো। তাছাড়া, ভৃত্যদের কাছে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহার পর রাম রায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শোনার উৎসাহ আর মোটেই নাই। উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধক হইয়া রাম রায় যেভাবে সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গ করিতেছেন তাহাতে তাঁহার সম্পর্কে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনে বরং একটা ধোঁকা লাগিয়াই গিয়াছে। তাই সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রভু হঠাৎ সেদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রশ্ন কহিলেন, "কি হে, কি সংবাদ তোমার? রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তো? কৃষ্ণকথা কেমন শুনলে তাঁর মুখে? সে অমৃতের ভাগ আমাদের একটু দাও।"

মিশ্র উত্তর দিলেন, "না প্রভু, কৃষ্ণকথা আর রাম রায়ের মুখে শোনা হয় নি আমার। অতঃপর সেদিনকার বৃত্তান্ত এবং নিজের মনের প্রতিক্রিয়ার কথা প্রভুকে সব খুলিয়া বলিলেন।

প্রভুর দৃষ্টিতে রামানন্দ রায় ব্রজরস সাধনার এক সিদ্ধপুরুষ। রূপসী তরুণীদের সহিত নির্জনে যত ঘনিষ্ঠতাই তিনি করুন, তিনি থাকেন সদা নির্বিকার। রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে সদা তিনি আবিষ্ট, তাই প্রাকৃতজনের মানসিক বিকার বা চাঞ্চল্য তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রামানন্দ রায়ের সাধন মাহাত্ম্যটি এই সুযোগে প্রভু ভক্তদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন :

আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে রহে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আরো সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী-স্পর্শে নির্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক[১] তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদরোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥

---

১ শ্রীচৈতন্য এখানে ভাগবতের ১০।৩।৩৯ শ্লোকের মর্মার্থ কহিতেছেন

উজ্জ্বল মধুর প্রেম-ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্যে বিহরে সদায় ॥
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥

গৌড়ীয়া ও উৎকলীয় ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যে মুখে রাম রায়ের মাহাত্ম্য শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

বৃদ্ধা ভক্ত মাধবী দাসীর কাছ হইতে ছোট হরিদাস সরু চাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন চৈতন্য প্রভুর ভোজনের জন্য। বৈরাগী হইয়া তিনি নারী সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এই অপরাধে প্রভু তাঁহাকে বর্জন করেন, অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হয়। আর রামানন্দের বেলায় প্রভুর এ কি ব্যবস্থা!

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে প্রভু শ্রীচৈতন্য বলেন, "মিশ্র, রামানন্দ রায় এ হেন ব্যক্তি। রাগানুগা সাধনে সিদ্ধ তিনি। তাই তো তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা শোনার জন্য আমার এত লোভ। যদি তা শুনতে চাও, মিশ্র, তবে আবার তাঁর কাছে যাও। তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়েছি তোমায়।"

প্রভুর কৃপায় রামানন্দের স্বরূপ এবার মিশ্রের কাছে উদ্ঘাটিত। সোৎসাহে সেইদিনই তিনি উপস্থিত হন রায়ের ভবনে। যুক্তকরে বলেন, "প্রভুর নির্দেশে আবার আমি এসেছি আপনার কাছে, কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিন।"

নিভৃত কক্ষে মিশ্রকে নিয়া বসান রামানন্দ, প্রশ্ন করেন, "বলুন, কোন্ বিশেষ কথা শোনার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত।"

করজোড়ে মিশ্র বলেন, "আমি দীনহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভালমন্দের কিছুই জানিনে। আপনি স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপদেষ্টা, আপনাকে আমি আর কি প্রশ্ন করবো? বিদ্যানগরে প্রভুকে ব্রজরসের তত্ত্ব বলেছিলেন, তাই আমায় বলুন।"

কৃষ্ণকথা শুরু হয়, বলিতে বলিতে রাম রায় আপনা বিস্মৃত হইয়া যান। প্রেমরসের ভাবতরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠে। বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া যায়, তবু রায়ের হুঁশ নাই। সেবকরা আসিয়া জানায় দিবা অবসান হইয়া গিয়াছে, তবে রামানন্দ রায় ক্ষান্ত হন। বহুতর সম্মান দেখাইয়া মিশ্রকে বিদায় জ্ঞাপন করেন।

মিশ্রের জন্য শ্রীচৈতন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে প্রশ্ন করিলেন, "কিহে মিশ্র, কেমন লাগলো রাম রায়ের কৃষ্ণকথা?"

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সারা অন্তর ভরে উঠিয়াছে, আনন্দে তিনি উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। কহিলেন, "প্রভু, আমাকে কৃতার্থ করেছো, কৃষ্ণকথার অমৃত রসে করেছো আমায় নিমজ্জিত। রামানন্দ রায়ের কথা কি বলবো, প্রভু, তিনি মানুষ নন, দিব্যপুরুষ

কৃষ্ণভক্তিরসে সদা তিনি রসায়িত। আর একটা কথা বার বার বললেন রাম রায়, 'মিশ্র একটা কথা জেনে রাখুন, কৃষ্ণকথার প্রবক্তা আমি নই, প্রভুই আমার মাধ্যমে বলছেন এই অমৃতময় কথা, কৃপালু তিনি, পৃথিবীতে এই অমৃত বিতরণের ইচ্ছে হয়তো তাঁর রয়েছে।''

প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "রাম রায় বিনয়ের খনি, তাই তোমায় ওকথা বলেছেন। মহানুভব যাঁরা তাঁদের স্বভাবই এই, নিজেদের কৃতিত্বের কথা কখনো বাইরে প্রকাশ করেন না।"

সারাজীবন বিষয়ের আবর্তে থাকিয়াও রামানন্দ রায়, এমনতর উচ্চকোটির এক সিদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছিলেন। ব্রজরস সাধনার তত্ত্ব বর্ণনায় তাঁর জুড়ি সমকালীন উড়িষ্যায় কেহ ছিলেন না। সর্বাপেক্ষা বড় কথা প্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে রাম রায়ের সঙ্গকে পরমকাম্য বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়াই হইতেন আত্ম-বিস্মৃত।

রামানন্দ রায়ের পরিবারের ওপর শ্রীচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি সতত নিবদ্ধ ছিল। রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথের প্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতেন, মালজাঠিয়া দণ্ডপাট নামক অঞ্চলের তিনি অধিকর্তা ছিলেন। রাজকর আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে তাহা জমা দেওয়ার ভার ছিল তাঁহার উপর। একসময়ে দেখা গেল, প্রায় দুইলক্ষ কাহন কড়ি তিনি বাকী ফেলিয়াছেন। এই বাকীর দায়ের জন্য এক বড় সংকট তাঁহার জীবনে ঘনাইয়া আসে।

সেদিন এক ভক্ত আসিয়া শ্রীচৈতন্যকে সংবাদ দিলেন, "প্রভু, রাম রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথের আজ বড় বিপদ। রাজ-আজ্ঞায় তাঁহাকে চাঙ-এ চড়ানো হচ্ছে, এবার খড়্গাঘাতে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হবে।"

চাঙ এ চড়ানোর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। এই দণ্ড দিতে হইলে অপরাধীকে একটি চাঙ বা বধ্য মঞ্চের উপর দাঁড় করানো হইত, নিচে পাতিয়া রাখা হইত সুতীক্ষ্ম খড়্গ। তারপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো তাহাকে নিক্ষেপ করা হইত মঞ্চের তলদেশে, তীক্ষ্ম খড়্গের আঘাতে তাহার দেহ হইত দ্বিখণ্ডিত।

চাঙ-এর কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য চমকিয়া উঠিলেন, জানিতে চাহিলেন বিস্তারিত তথ্য। ভক্তেরা কহিলেন, "প্রভু, রাজার সঙ্গে পাওনা দেনার ব্যাপারটা হয়তো বা মিটে যেতে পারতো, কিন্তু গোপীনাথের নিজের দোষে তা হতে পারে নি। সরকার থেকে টাকা আদায়ের চাপ দেওয়া হলে গোপীনাথ বলেন, 'যে টাকা ভেঙেছি, তা এক সঙ্গে আমি দিতে পারব না। আমার দশ বারটি ভালো ঘোড়া আছে, এগুলো আমি সরকারকে হস্তান্তর করবো। এভাবে ঘোড়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা এখনি আদায় দেবো, আর বাকীটা শোধ করবো ধীরে ধীরে।"

রাজ-সরকার এ প্রস্তাব মানিয়া নেন এবং টাকা আদায়ের ভার দেওয়া হয় রাজার এক পুত্রের উপর। এই রাজপুত্রটি গোপীনাথের ঘোড়ার মূল্য অত্যধিক কম করিয়া ধরিতে চাহিলে গোল বাধিয়া যায়। দর কষাকষির ফলে উত্তেজিত হইয়া গোপীনাথ

বলিয়া ফেলেন "আমার ঘোড়া ঘাড় ফিরায় না আর ঊর্ধ্বদিকেও ঘন ঘন তাকায় না। তবে তার দাম কম হবে কেন ?"

এ রাজপুত্রের একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিতে বলিতে গ্রীবা ঘুরাইয়া তিনি ঊর্ধ্বদিকে চাহিতেন, গোপীনাথ তাঁহার ঐ মুদ্রাদোষকে উপহাস করিয়া জটিলতার সৃষ্টি করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজপুত্র তাঁহার পিতা প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে আদেশ বাহির করিলেন, গোপীনাথকে চাঙ-এ চড়ানো হইবে।

ভক্তেরা জানাইলেন, "প্রভু, রাজরক্ষীরা শুধু গোপীনাথকে নয় তোমার পরম ভক্ত বাণীনাথ প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করেছে, এবং গোপীনাথকে চাঙ-এ চড়িয়ে তার প্রাণবধ করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি এদের উদ্ধার না করলে কে করবে ? রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার আদেশ ফেলতে পারবেন না। তুমি একটিবার মুখ ফুটে তাঁকে বল।"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য কহেন, "রাজার প্রাপ্য ধন, যে তছরূপ করে, বিলাস বাহুল্য আর নর্তকীদের পেছনে টাকা উড়ায় আমি তার জন্য কেন বলতে যাবো ? রাজার দোষ কি ? তাঁর প্রাপ্য অর্থ আদায় তো তিনি করবেনই। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, শ্রীজগন্নাথের দর্শনের জন্য নীলাচলে এককোণে পড়ে আছি। আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবো না। রাজাকে এ পার্থিব ব্যাপারে অনুরোধ জানাতেই বা যাবো কেন ?"

প্রভুর এমনতর অটল মনোভাব দেখিয়া স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। সংকট যেরূপ ঘনীভূত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপ ছাড়া উদ্ধারের কোনো আশা নাই। যদি একটিবার তিনি রাজাকে বলিয়া দেন, তবেই শুধু গোপীনাথ প্রাণে বাঁচিয়া যায়।

স্বরূপ কহিলেন, "প্রভু, সবাই জানে রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার আশ্রিত। বৃদ্ধ ভবানন্দ রায় তোমাকে কত শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। আর বাণীনাথ তো তোমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে পড়ে রয়েছেন, তোমার এবং তোমার গৌড়ীয় ভক্তদের সেবায় তিনি প্রাণপাত করছেন। রামানন্দের অপর ভ্রাতারাও তোমার প্রতি কত সশ্রদ্ধ। তোমার স্নেহের অধিকারী এ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এসময়ে তোমার কি কৃপা করা উচিত নয় ? না—প্রভু তোমার আর উদাসীন থাকা চলে না।"

প্রভু ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন, "তাহলে তোমরা চাও যে আমি রাজার দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা মাগি, আর আঁচল ভরে টাকাকড়ি দিয়ে এসে গোপীনাথের দায় মিটাই। এই তো ? কিন্তু আমি পাঁচ গণ্ডার পাত্র এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ! ভিক্ষা চাইলেই রাজা আমায় দু'লক্ষ কাহন দেবে কেন তা বলতে পারো ?

ক্ষণপরেই এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া খবর দেয়, "প্রভু, গোপীনাথকে চাঙ-এ তোলা হইয়াছে, এবার রাজার রক্ষীরা তাহাকে খড়্গের উপর ফেলিয়া দিবে।"

উপস্থিত ভক্ত বৈষ্ণবেরা অধীর হইয়া উঠেন, বার বার শ্রীচৈতন্যকে জানাইতে থাকেন সনির্বন্ধ অনুরোধ, "প্রভু, আর দেরি করলে সব শেষ হয়ে যাবে। অবিলম্বে যা হয় একটা কিছু তুমি করো।"

প্রভু ইতিমধ্যে কিছুটা নরম হইয়াছেন, নিতান্ত উদাসীনভাবে কহিলেন,"আমি ভিক্ষুক মানুষ, আমি কি করতে পারি? তোমরা যদি গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করতেই চাও, তবে প্রার্থনা জানাও শ্রীজগন্নাথের কাছে। ভালোকে মন্দ করার, মন্দকে ভালো করার, ক্ষমতা আছে শুধু ঈশ্বরের। সবাই মিলে কাতর স্বরে তাঁকে নিবেদন করো। তবেই তো কাজ হবে।"

হরিচন্দন পাত্র প্রতাপরুদ্রের একজন বিশ্বাসী অমাত্য, আবার প্রভু শ্রীচৈতন্যেরও পরম ভক্ত জন। তিনি তাড়াতাড়ি তখনই রাজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, গোপীনাথ অপরাধী ঠিকই, কিন্তু সে একজন পুরাতন রাজ-সেবক তো বটে, এই টাকার জন্য তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। তাছাড়া, ভবানন্দ রামানন্দ এঁরা সবাই আপনার প্রাচীন প্রিয় সচিব, উপকারী বান্ধব। এক্ষেত্রে গোপীনাথকে এ ধরনের চরম দণ্ড আপনি কেন দিচ্ছেন? তাকে বধ করলে কি আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় হবে? বরং যে ঘোড়াগুলো সে দিতে চাচ্ছে, তা নিয়ে তা থেকে তার দেয় টাকার কিছুটা পরিশোধ হোক, বাকীটা সে কিস্তিতে দিয়ে দিক। এ ব্যবস্থায় তার প্রাণ রক্ষা হবে, রাজ-সরকারের অর্থও আদায় হয়ে যাবে। আপনি দয়া ক'রে তাই করুন।"

রাজা প্রতাপরুদ্র তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করেন হরিচন্দনের এ প্রস্তাব। বলেন, "তুমি ঠিক কথাই তো বলছো। এতে আমার আপত্তি হবে কেন? রাজ-সরকারের প্রাপ্য অর্থ আদায় হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। গোপীনাথের প্রাণ বধ ক'রে আমার কি লাভ? তাছাড়া তার গোষ্ঠী আমার দীর্ঘদিনের সেবক।"

গোপীনাথকে চাঙ হইতে নামাইয়া আনা হইল, এবং বাণীনাথ প্রভৃতি অন্য ভ্রাতারাও মুক্তি পাইলেন।

সংবাদ নিয়া যাঁহারা আসা-যাওয়া করিতেছেন সেই ভক্তদের শ্রীচৈতন্য প্রশ্ন করিলেন, "আমার সেবক, বৈষ্ণবদের সেবক, বাণীনাথকেও তো ওরা বেঁধে নিয়ে গিয়েছে, বাণীনাথ তখন কি করছিল, বল তো?"

ভক্তেরা জানাইলেন, "প্রভু, বাণীনাথ সারাক্ষণ নির্বিকার হয়ে বসে ছিলেন, আর নিরন্তর জপ করছিলেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম।"

এ সংবাদে প্রভু মহা পুলকিত। কহিলেন, "হাঁ এই তো চাই। ভক্ত বৈষ্ণব পরম-প্রভুর নাম নেবে, তাঁর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে থাকবে, তবেই তো সর্বসংকট থেকে পাবে উদ্ধার।"

রাজার গুরু কাশী মিশ্রের আবাসে একটি নির্জন কুটিরে শ্রীচৈতন্য অবস্থান করেন। সেদিন কাশী মিশ্র প্রভুকে প্রণাম করিতে এবং কুশলাদি জানিতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে দুঃখিত অন্তরে কহিলেন, "মিশ্র, এখানে দেখছি নানা উপদ্রব। শান্তিতে নিরুদ্বেগে বসে কৃষ্ণনাম জপ করবো, তার উপায় নেই, ভাবছি নীলাচলের অদূরে আলালনাথে গিয়ে এবার বাস করবো। সেখানে বসে শ্রীজগন্নাথের মন্দির চূড়া দর্শন করবো, আর কৃষ্ণনামে ডুবে থাকবো। তবে কিছুটা সোয়াস্তি যদি মিলে।"

"এসব কি বলছেন, প্রভু। এখানে আপনার উপর উপদ্রব করবে, কার এমন সাহস!" ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠেন কাশী মিশ্র।

"এই তো দ্যাখো, মিশ্র। ভবানন্দ রায়ের পুত্রেরা রাজকর্ম করে। তাদের একজন গোপীনাথ, রাজার প্রাপ্য অর্থ দেয় নি, তাই রাজা তাকে চাঙ-এ চড়িয়েছে। এ সংবাদ বহন ক'রে চার চারবার লোক ছুটে এসেছে আমার কাছে। বলেছে, এ সংকটে যা হয় একটু কিছু করুন। কিন্তু আমি কাঙাল সন্ন্যাসী, এসব ব্যাপারে আমার কি করবার আছে? এই তো গোপীনাথকে রাজা মুক্তি দিলেন, স্বীকার করিয়ে নিলেন, ধীরে ধীরে অনাদায়ী টাকা সে শোধ ক'রে দেবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি গোপীনাথ কথার সত্যতা না রাখে, রাজার প্রাপ্য অর্থ না দেয়, তবে তো আবার আমাকে এসব ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। না মিশ্র, এ সব বিষয়-বার্তা শুনতে শুনতে আমার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আলালনাথে গিয়েই নিভৃতে আমি বাস করবো এবার।'

রাজগুরু কাশী মিশ্র প্রভুর পরম ভক্ত এবং আশ্রিত। তিনি তাঁহার চরণ ধরিয়া দৈন্যভরে বলেন, "প্রভু, তুমি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, অপরের কথায়, বিষয়ের কোনো কথায়, তোমায় কেন জড়ানো হবে? সাংসারিক লাভের জন্য তো ভক্তেরা তোমার ভজনা করে না, করে তোমার কৃপার জন্য, তোমার শ্রেষ্ঠ দান প্রেমভক্তিধন লাভের জন্য। বিষয় সম্পর্কিত কাজের কথা বলে তোমার মতো ব্যক্তিকে যে ক্ষুব্ধ করে সে তো মহামূর্খ।"

"না মিশ্র, সম্প্রতি আমার বিষয় সম্পর্কে এত কিছু কথা শুনতে হলো, তাই মনে উদ্বেগ হচ্ছে। আমি ভিখারী, আমার কাছে এসব প্রশ্ন নিয়ে আনাগোনা কেন?'

যুক্তকরে কাশী মিশ্র নিবেদন করেন, "প্রভু, সত্য কথা বলতে কি, তুমি ভক্তদের কৃপা ক'রে নির্বিষয় ও নির্বাসনা করতে পারো, প্রেমধন দিতে পারো, সেই জন্যেই তারা তোমার কাছে বেশী আসে। প্রভু, তুমি তো জানো, তোমার জন্য রায় রামানন্দ প্রদেশ শাসকের কাজ ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে এসে পড়ে আছে। তোমার আশ্রয় পাবার জন্য সনাতন রাজ-বিষয় রাজমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন। তোমার সঙ্গ পাবার লোভে সপ্তগ্রামের কোটিপতি জমিদারের পুত্র রঘুনাথ এই শ্রীক্ষেত্রে পড়ে আছে। তোমার কৃপায় ভক্তি প্রেমধন সে পেয়েছে, তাই কাঙালের জীবন যাপন করছে, ছত্রে মেগে খাচ্ছে দু'মুঠো অন্ন। আর দ্যাখো, রামানন্দের ভাই গোপীনাথ নিজে কিন্তু তোমার কাছে বিষয় চাচ্ছে না। তার প্রাণ বিপন্ন দেখে তার সেবকরা তোমার কাছে ছুটোছুটি করেছিল। না প্রভু, তোমার কাছে লোকে বিষয় প্রার্থনা করে না, শুদ্ধাভক্তি-ই চায়। যা হোক, তুমি আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হ'য়ো না, আমাদের ছেড়ে অন্যত্র যেয়ো না।'

"কিন্তু গোপীনাথের সব হাঙ্গামা তো একেবারে চুকে যায়নি, মিশ্র।

"সে যদি রাজার বাকী টাকা না দেয়, আবার ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। এই তো তোমার ভয়, প্রভু? তা নিয়ে তোমায় আর ঝামেলা পোহাতে হবে না, এবার যেমন শ্রীভগবান্ তাকে রক্ষা করেছেন, পরেও তিনি তাকে দেখবেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি কাশী মিশ্রের গৃহে আসিয়াছেন। [illegible]

নিয়ম ছিল, যতদিন নীলাচলে থাকিতেন, দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ পাইবার পর চলিয়া আসিতেন স্বীয় গুরু কাশী মিশ্রের ভবনে। সেখানে গুরুর শয্যার পাশে বসিয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেন, আর শ্রবণ করিতেন শ্রীজগন্নাথের সেবা ও ভোগরাগাদির বিবরণ, এবং শ্রীবিগ্রহের নানা পুরাতন কাহিনী।

রাজা নীরবে বসিয়া গুরুর পদসেবায় রত, এমন সময়ে কাশী মিশ্র প্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা পাড়িলেন। প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন, "মহারাজ, প্রভুকে নিয়ে এক মহা মুশকিলে পড়া গেছে। তিনি স্থির করেছেন, নীলাচল ত্যাগ ক'রে আলালনাথে গিয়ে বাস করবেন।"

রাজা চমকিয়া উঠেন, দুঃখিত অন্তরে প্রশ্ন করেন, "সে কি কথা গুরুদেব, প্রভু কেন শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে যাবেন।"

মিশ্র এবার সুকৌশলে উপস্থাপিত করেন তাঁহার বক্তব্য। বলেন, "এই তো দেখুন, গোপীনাথের ব্যাপার নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তাকে চাঙ-চড়ানো হলে অনেকে এসে প্রভুকে বললো সে কথা। সব ঘটনা জেনে তিনি তো মহা ক্ষুব্ধ। বললেন, ব্রহ্মস্ব অপহরণের মতো রাজধন অপহরণও মহাপাপ।—গোপীনাথ তাই করেছে। রাজা তাঁর প্রাপ্য টাকা আদায় করতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর দোষ কোথায়? এরা রাজার টাকা দেবে না, আবার আমাকে এসে বলবে উদ্ধার করার কথা, এ কি রকমের আচরণ। আলাল-নাথে গিয়ে পড়ে থাকাই বরং আমার ভালো, বিষয়ীর সম্পর্কে আসতে হবে না।"

"গুরুদেব, এজন্যই কি প্রভু নীলাচল ছেড়ে যেতে চান? প্রভুর দর্শনের জন্য, তাঁকে এখানে রাখার জন্য, যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে যে আমি প্রস্তুত। গোপীনাথের কাছে যে পাওনা আছে, তা নয় না-ই পেলাম। প্রভুর তুলনায় আমার যে কোনো বিত্ত বিষয়ই যে অতি তুচ্ছ। দুই লক্ষ কাহন তো কোন্ ছার, প্রভুর চরণে আমার এই রাজ্য, এই প্রাণ, আমি এই মুহূর্তে উৎসর্গ করতে পারি।"

উত্তরে কাশী মিশ্র বলেন, "না মহারাজ, রাজসরকারের প্রাপ্য অর্থ গোপীনাথকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তা কখনোই প্রভুর অভিপ্রেত নয়। বরং তা ছেড়ে দিলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি দুঃখ পান, তাও তিনি চান না।"

"গোপীনাথ একটা বড় ভুল করেছে, সে আমার পুত্র পুরুষোত্তম জানাকে অপমান করেছে। তাতেই সমস্যাটি এত জটিল হয়ে যায়, তাকে চাঙ-এ চড়ানো হয়। যাক্, সে সব চুকে গেছে, আপনি এবার যে কোনো উপায়ে, বলে কয়ে প্রভুকে শান্ত করুন, সযত্নে তাঁকে নীলাচলে রাখুন। আপনি তাঁকে কথাটা এভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, ভবানন্দ রায় আমার শ্রদ্ধেয়, রামানন্দকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাঁর ভাইয়েরা সবাই আমার অতি আপনজন, স্নেহের পাত্র। তাই গোপীনাথের কাছে যে পাওনা রয়েছে তা আমি মাপ ক'রে দিলাম।"

অতঃপর গোপীনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রতাপরুদ্র কহিলেন, "গোপীনাথ, রাজ-সরকারের কাছে তোমার যে দেনা রয়েছে তা আর তোমায় দিতে হবে না। আর শোন, পূর্বতন মালজাঠিয়া অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের ভার আমি আবার তোমারই ওপর ন্যস্ত

করলাম। এখন থেকে তোমার বেতন দ্বিগুণ করা হলো। যাও, আর যেন কখনো রাজ-সরকারের অর্থ নিয়ে গোলযোগ করো না।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা নেতধটির শিরোপা-বস্ত্র গোপীনাথ পট্টনায়কের মাথায় জড়াইয়া দিলেন এবং অমাত্যদের সমক্ষে সসম্মানে তাহাকে পূর্বতন পদে করাইলেন অধিষ্ঠিত।

শ্রীচৈতন্য অন্তর্যামী, গোপীনাথকে কেন্দ্র করিয়া যে সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, যেভাবে তাঁহার উদ্ধার সাধন সম্ভব হইয়াছে, কোনো কিছুই তাঁহার অজানা নাই। প্রশান্ত বদনে আপন নিভৃত কুটিরে তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্তপ্রবর কাশী মিশ্র করজোড়ে নিবেদন করেন গোপীনাথের প্রাণরক্ষার কথা, ভবানন্দ রায়ের পরিবারের ধনপ্রাণ রক্ষার কথা।

প্রভু মনোকষ্টের ভান করিয়া কহিলেন, "মিশ্র, এ তুমি কি করলে বলতো? বৈরাগী সন্ন্যাসী আমি, শেষটায় আমাকে রাজ-প্রতিগ্রহ করালে?"

কাশী মিশ্র রাজা প্রতাপরুদ্রের কথাগুলি প্রভুকে সবিস্তারে বলেন, আশ্বাস দেন বার বার, "প্রভু, ভবানন্দ রায়ের পরিবারের প্রতি রাজা চিরদিনই সদয়, গোপীনাথের মার্জনা তারই এক নূতনতর প্রকাশ। তুমি অনর্থক খেদ করছো। রাজা তোমাকে অনুগ্রহ করেন নি, অনুগ্রহ করেছেন গোপীনাথ ও তার গোষ্ঠীকে।"

ভবানন্দ রায় তাঁহার পাঁচ পুত্র সঙ্গে নিয়া প্রভুর কুটিরে আসিলেন, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানাইলেন তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। কহিলেন, প্রভু উৎকলের সবাই জানে আমরা তোমারই কিংকর। কিন্তু এবার আমাদের ধন প্রাণ মান বাঁচিয়ে নূতন ক'রে তুমি আমাদের সবাইকে কিনে নিলে। এবার সারা দেশে তোমার ভক্তবাৎসল্যের মহিমা প্রচারিত হয়ে গেল।"

সাশ্রুনয়নে করজোড়ে গোপীনাথ কহিলেন, "প্রভু চাঙ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার দেহ দ্বিখণ্ডিত হবে, বিত্তবিষয় রাজা সব কেড়ে নেবেন, এই কথাই তো ছিল। সেস্থলে ফুটে উঠলো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা। মৃত্যু আর লাঞ্ছনা তো তুমি ঠেকালেই তদুপরি ব্যবস্থা ক'রে দিলে দ্বিগুণ উপার্জন, আর নেতধটির রাজগৌরব। নিতান্ত দুর্ভাগা হয়েও নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি, প্রভু। আমার মতো দুষ্টের উদ্ধার সাধন করেছ, তাই তো তোমার মহিমা আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। কিন্তু একটা বিশেষ প্রার্থনা আমার রয়েছে তোমার কাছে। আমার দুই ভাই রামানন্দ আর বাণীনাথ তোমার চরণে পড়ে আছে, আর বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে। আমাকেও কৃপা ক'রে সেই মুক্তি তুমি দাও।"

প্রভু উত্তরে কহেন, "পরিবারের সবাই নির্বিষয় এবং বৈরাগী হলে চলবে কেন, গোপীনাথ। বৃহৎ পরিবারের কত কুটুম্ব ও স্বজন পোষণ রয়েছে, কত কর্তব্য রয়েছে, পিতা এখনো বর্তমান। সংসারে থেকেই তুমি ধর্মাচরণ করতে থাকো। আর একটা কথা মনে রেখো, রাজার প্রাপ্য তাঁকে অবশ্য দিতে হবে উদ্বৃত্ত আর যা তোমার থাকবে তারও করবে সদ্ব্যবহার।"

চারিদিকে তখন ভক্তদের হরিধ্বনি ও উল্লাস। ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী বিদায় নিলে,

সবাই বলাবলি করিতে থাকে, প্রভুর কৃপালীলার ভঙ্গীটি কি চমৎকার। বতবার গোপী-নাথের জীবন রক্ষার জন্য আকুতি জানানো হইয়াছে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। একটিবার রাজাকে কোনো অনুরোধ জানান নাই, আর রাজগুরু কাশী মিশ্র, যিনি প্রভুর অন্যতম সেবক, তাঁকেও একটিবার তিনি সাধেন নাই। কোনোপ্রকার বহিরঙ্গ প্রয়াস ছাড়াই, নেপথ্যের ইঙ্গিতে এই বিস্ময়কর কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

ভক্তেরা একথাও উপলব্ধি করিলেন যে, প্রভুর এই অলৌকিক লীলার পশ্চাৎপটে রহিয়াছে রামানন্দ রায়ের প্রতি তাঁহার অপার অগাধ প্রেম ও সখ্যভাব। রামানন্দের শরণাগতি ও আত্মোৎসর্গই স্পন্দন তুলিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্যসত্তায়, তাহাই ঘটাইয়াছে সেদিনকার এই অঘটন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য দুই বৎসর একাদিক্রমে নীলাচলে অবস্থান করেন। তারপর এই মহাধাম হইতে একবার গৌড়ে ভ্রমণ করিতে যান. অন্য বারে যান কাশী ও বৃন্দাবনে। এই দুইটি সফরকাল বাদ দিলে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় আঠারো বৎসর। এই আঠারো বৎসরকাল প্রভুর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে থাকিয়া রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর নানাভাবে তাঁহার সেবা করেন, দান করেন অন্তরঙ্গ সখ্য।

প্রভুর নীলাচল বাসের শেষ বারোটি বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার বহুলখ্যাত গম্ভীরা-লীলার। গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের বহিরঙ্গ জীবনকে তিনি সংহরণ করিয়া নেন ; কৃষ্ণবিরহের আবেশ, দিব্যোন্মাদ ও ধ্যানতন্ময়তায় থাকেন বিভোর।

এই সময়ে তাঁহার প্রধান দুই সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ। কৃষ্ণ বিরহের উন্মাদনায় প্রভু তখন প্রায়ই উত্তাল হইয়া উঠিতেন, স্বরূপ ও রামানন্দ নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতেন। প্রভুর ভাবাবেগ অনুযায়ী রাম রায় কখনো কখনো ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতেন তাঁহার কাছে, কখনো বা স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইতেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সমধুর সংগীত। কখনো বা রামানন্দ রায়ের রচিত 'জগন্নাথ বল্লভম্' শুনানো হইত তাঁকে।

কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার যে দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সবকয়টিই এসময়ে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্যের দেহে। সাধক কবি কৃষ্ণদাস বলিতেছেন :

—এই মত গৌররায় বিষাদে করে হায় হায়।
হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥
তবে স্বরূপ রাম রায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন

গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥
এইমত বিলাপিতে অর্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে।

এক একদিন প্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ঘরের মেঝেতে মুখ ঘষিয়া রক্তারক্তি কাণ্ড করেন, কখনো বা গভীর নিশিতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া উদ্দাম প্রেমাবেশে বাহির হইয়া পড়েন। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করেন, কখনো তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের মিলনের রসমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদ ও প্রেমিক ভক্ত নরহরি সরকার একটি পদে শ্রীচৈতন্যের এসময়কার বিরহ যাতনার বর্ণনা দিয়াছেন। স্বরূপ ও রাম রায়কে প্রভু বলিতেছেন যে, তাঁহার কৃষ্ণবিরহের মর্মব্যথা কেহই বুঝিতেছে না—

স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি কবে হায় হায় ॥
কহে মৃদু গদ্‌গদ ভাষ।
ঘন বহে দীর্ঘ-নিশাস ॥
ধরম না বুঝে বেহ মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর ॥
কেনে বা এ প্রেম বাড়াইলুঁ।
জীবন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ (পদকল্পতরু)

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-খিন্ন জীবনের এই বারটি বৎসরে সহমর্মিতা, সময়োচিত শ্লোক বর্ণন ও সংগীতের মধ্য দিয়া স্বরূপ ও রামানন্দ তাঁহার যে সেবা পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পার্ষদ, ব্রজরস সাধনার সার্থক সাধক, রামানন্দ রায়ের জীবনেও নামিয়া আসে ইষ্টবিরহের, গুরুবিরহের ঘন অন্ধকার। আনুমানিক ১৫৩৪ সালে মরজগতের সমস্ত বন্ধন তিনি ছিন্ন করেন, প্রবিষ্ট হন রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাধামে।

স্বামী প্রেমানন্দ

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর অন্যতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন বাবুরাম মহারাজ—স্বামী প্রেমানন্দ। গুরুনিষ্ঠা, শুদ্ধাভক্তি ও মানব-প্রেমের দিক দিয়া এই সাধকের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। পরমহংসদেব ইঁহার সহজাত পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বাবুরাম নৈকষ্য, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ, দেহে পাপকর্ম, মনে দুশ্চিন্তা হতে পারে না।" একদিন বলেন, "দেখলাম ও হচ্ছে শ্রীমতীর অংশ, ওর দেবীভাব।" বাবুরাম মহারাজের এই দিব্যপ্রেমময় শুদ্ধসত্ত্ব রূপটিই সেদিন স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার গুরুর মানসপটে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রিয় গুরুভ্রাতা সম্বন্ধে অনেক সময় বলিতেন, বাবুরাম অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ। আমি ওকে ঐ ভাবেই দেখি।

তরুণ সন্ন্যাসী প্রেমানন্দের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগ তিতিক্ষা ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যেন মূর্ত হইয়া উঠে। ঠাকুরের মতো স্বামী প্রেমানন্দের হস্তও কাঞ্চনস্পর্শে হইত আড়ষ্ট ও সংকুচিত। দেবীর প্রণামী বা উৎসবাদির জন্য প্রদত্ত অর্থ স্বহস্তে তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, সঙ্গী সাধুদের কুড়াইয়া নিতে বলিতেন। নেহাত কখনো নিজেকে গ্রহণ করিতে হইলে, অঞ্চল পাতিয়া ধরিতেন, আর তখনি উহা মঠের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর কাছে জমা না দিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অন্তর্গত আঁটপুর বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান। ঐ গ্রামে তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তারাপ্রসন্ন বিত্তবান ব্যক্তি, আবার তেমনি ছিলেন ধর্মপ্রবণ। গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ স্থাপিত ছিলেন, এবং এই বিগ্রহের সেবাপূজা ভোগরাগের সুব্যবস্থা ছিল।

বাবুরামের জননী মাতঙ্গিনী দেবীও ছিলেন পরমা ভক্তিমতী। নয়নাভিরাম শিশু পুত্রটি হৃদয়ে যেন এক দিব্যলোকের বার্তা লইয়া উপস্থিত হয়। এই শিশুর জন্মের পূর্বে জননী নানা অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিতেন, বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। কখনও সূক্ষ্মদেহী দেবদেবীর আবির্ভাবে, কখনও বা অস্ফুট দিব্য সংগীত শ্রবণে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। তাই এই পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেবতার এক বিশেষ কৃপা হিসাবেই তাহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন।

বাল্যকালেই বাবুরামের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর কিছুকাল পর্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়েই তিনি লেখাপড়া করিতে থাকেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় চলিয়া যান, সেখানে খুল্লতাতের অভিভাবকত্বে তিনি বাস করিতে থাকেন এবং শ্যামবাজারের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসনে তাঁহাকে ভর্তি করা হয়।

এই স্কুলে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন রাখাল, উত্তরকালের রামকৃষ্ণ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ। রাখাল এবং এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (উত্তরকালে রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা) সান্নিধ্যে আসার পর হইতে তাঁহার জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়।

সহজাত শুভ সংস্কার এবং ধর্মপ্রবণতা নিয়া বাবুরামের জন্ম। শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর কি এক অজ্ঞাত তৃষ্ণায় চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান। হরিসভা ও সংকীর্তনের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রচুর, এজন্য তিনি নানা স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। কেশব সেনের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও ধর্মপ্রেরণা তাঁহার তরুণ হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। এই সময়ে একদিন জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় দূর হইতে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন ভিড়ের মধ্যে ঠাকুরের দিব্য মূর্তি তাঁহার অন্তরে রেখাপাত করে নাই।

ইতিমধ্যে বাবুরামের মাতা ও অগ্রজ তুলসীরাম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নিপতি বলরাম বসু এবং ভগিনী কৃষ্ণভাবিনী দেবী ঠাকুরের চরণতলে আত্ম-নিবেদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এসব কথা তখনো বাবুরাম জানিতেন না।

বড় ভাই তুলসীরাম একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য ভাবের কথা তুলিলেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি নাকি ভাব সমাধিতে ডুবিয়া যান।

"তুই একদিন যাবি নাকি তাঁকে দেখতে?" দাদা প্রশ্ন করেন। বাবুরাম সানন্দে সম্মতি জানান, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই।

স্কুলের বন্ধু রাখালের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়ে। রাখাল কহিলেন, "আমি তো প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করছি রে।"

দক্ষিণেশ্বরের এই মহাসাধকের প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ জাগিয়া উঠে বাবুরামের মনে। তাই তাঁহার দর্শনমানসে রাখালের সঙ্গীরূপে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বয়স তখন বিশ বৎসর।

ঠাকুর তখন দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে ধ্যানাবিষ্ট হইয়া আছেন। কিছুকাল পরে রাখালের দেহে ভর দিয়া টলিতে টলিতে নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

ঐশ্বরিক ভাবে মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন, মহাপুরুষের এই দর্শন বাবুরামের নয়নসমক্ষে একটা নূতন দৃশ্যপট উন্মোচিত করে। যে অনুভূতি ও দর্শনের কথা এতকাল লোক-মুখে শুনিয়াছে এবং পুস্তকে পড়িয়াছে, তাহারি প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেন সম্মুখস্থ ঐ সিদ্ধপুরুষের জীবনে।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইবার পর ঠাকুর বাবুরামের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শুনিলেন, তাঁহার পরমভক্ত বলরামেরই আত্মীয়। আনন্দিত হইয়া ঠাকুর বলিলেন, "তুমি বলরামের আত্মীয়? তবে তো আমাদেরও আত্মীয়। তা বেশ, বেশ।"

কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাবুরামকে নিকটে ডাকিলেন, বলিলেন, "এসো, আলোয় এসো। তোমার মুখখানি ভাল ক'রে দেখি।"

মুখ দেখার পর হাত পায়ের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলেন, কিছুক্ষণ হাতটি ধরিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ ছেলেটি। বেশ।"

ঈশ্বরীয় কথাবার্তায় রাত্রি গভীর হয়। বাবুরাম, রাখাল এবং আর এক তরুণ ভক্ত রামদয়াল রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া যান।

কিন্তু শয়নের এক ঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুর তাঁহার কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান।

অর্ধবাহ্য অবস্থা। পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের মতো বগলে চাপিয়া ধরিয়াছেন, একেবারে উলঙ্গ। উৎকণ্ঠিত স্বরে রামদয়ালকে ডাকিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "ওগো ঘুমুলে? দ্যাখো, নরেনের জন্য প্রাণটা গামছা নিংড়াবার মতো মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করতে বোলো। সে যে সত্ত্বগুণের আধার। তাকে না দেখলে আমি থাকতে পারি না।"

ঠাকুরের নানা অবস্থার সহিত রামদয়াল পরিচিত। বুঝিলেন, তিনি তখন দিব্য ভাবে আবিষ্ট। তাই নানা কথায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্য বাবুরামের বুকে দোলা লাগাইয়া দেয়। একি অদ্ভুত প্রেম ঠাকুর রামকৃষ্ণের। শুদ্ধসত্ত্ব আধার তরুণদের জন্য এ কি আর্তি, একি ব্যাকুলতা?

সে রাত্রে কিন্তু ঠাকুরের ভাবাবেশ আর কাটিল না। বার বার বাহিরে আসিয়া তরুণ শিষ্য নরেনের জন্য মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আবার বাবুরামকে ডাকিয়া পাঠান ঠাকুর। ইহার পর ঘন ঘন যাতায়াতের মধ্য দিয়া উভয়ের আত্মিক বন্ধন গড়িয়া উঠিতে থাকে। কখনো সতীর্থ রাখালের সঙ্গে, কখনও মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিতেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের কাছে পাইয়া ঠাকুরের হৃদয়ও আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিত, নানা তত্ত্ব, নানা ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন।

বাবুরামকে এক একদিন বুঝাইতেন, "মানুষের জীবন স্বাধীন কোথায়? সকলই যে ঈশ্বরাধীন। কেশব সেনকে সেদিন বললাম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া নড়ে না। ন্যাংটা (তোতা-পুরীজী) অত বড় জ্ঞানী, সে জলে ডুবতে গেছলো। কিন্তু হাঁটু জলের বেশী গঙ্গায় তখন আর জল হয় না। মহামায়ার ইচ্ছা অনুরূপ বুঝে তীরে ফিরে এল। তাই তো বলি,—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি রথ, তুমি রথী।"

কথাগুলি বাবুরাম উৎকর্ণ হইয়া শোনেন, আর তাঁহার তরুণ হৃদয়ে সেগুলি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

বাবুরাম বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে বেশিদিন থাকিতে পারেন না, অন্তরে তাই বড় দুঃখ। ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্তও করেন। ঠাকুরও প্রার্থনা জানান ইষ্টদেবী ভবতারিণীর কাছে, "মা, ওকেও টেনে নাও, ও অত দীনভাবে থাকে। তোমার কাছে আসা যাওয়া করছে।"

রাখালের অসুখ, কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুরের নিত্যকার সেবার জন্য ভক্তগণ রহিয়াছেন, কিন্তু সমাধিস্থ অবস্থায় বিশেষ দেহরক্ষীর প্রয়োজন। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, আজন্ম শুদ্ধাচারী, বাবুরামের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সেদিন বলিলেন, "এ অবস্থায় কাউকেই ছুঁতে দিতে পারি না। তুই থাক, তাহলে ভাল হয়।"

মুহুর্মুহুঃ ঠাকুর মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন। এ সময়ে বাবুরাম ছাড়া কেহ স্পর্শ করিলে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। বাবুরামের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা ঠাকুরের দেবদেহের নিকষ পাথরে সেদিন এমনি ভাবে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল।

বাবুরামের মা একদিন পরমহংসকে প্রণাম করিতে আসিলে ঠাকুর বলিয়া বসিলেন, "ওগো, তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও।"

মাতঙ্গিনী দেবী তো এ প্রস্তাব শুনিয়া কৃতার্থ, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সে তো ভালো কথা, ঠাকুর। আপনার কাছে বাবুরাম থাকলে তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তাই আর আমার থাকবে না।"

গৃহের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়া গেল, তাই এখন হইতে বাবুরাম দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। অবস্থিতিও দীর্ঘতর হইতে লাগিল। সম্মুখে প্রবেশিকা পরীক্ষা, কিন্তু পড়াশুনার মনোবৃত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সম্মুখে আসিলেই এক দিব্য চেতনায় তাঁহার সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের হাতছানি আসে বার বার, অপার্থিব আনন্দে হৃদয় হয় ভরপুর।

কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার দাবী কঠোর, মাশুল আদায় না করিয়া সে পথ ছাড়িবে কেন? বাবুরাম অকৃতকার্য হইলেন। ঠাকুরের কানে এসংবাদ পৌঁছিল। অবলীলায় তিনি তা উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "বেশ তো, ভালই তো। ও পাশমুক্ত হলো। জানতো,—যার য'টা পাস্ তার ততটা পাশ (বন্ধন)।"

বাবুরামের কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য নাই। ভাবিলেন, ভগবান্ মঙ্গলময়, এ তিনি ভালই করিলেন। স্কুলের বিদ্যা ছাড়িয়া বাবুরাম ধরিলেন আত্মিক জীবনের পথ।

পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার ও সহজাত পবিত্রতা নিয়া বাবুরামের জন্ম, তারপর দৈব কৃপায় লাভ করিয়াছেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর স্নেহময় সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্য এবার তাঁহার সাধন প্রস্তুতির পক্ষে পরম সহায়ক হইয়া উঠে।

শিষ্যসম্বন্ধে সদাসতর্ক সদ্‌গুরু বাবুরামকে বুঝান—"দ্যাখ্, ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। একটু কামনা থাকলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। সুতোর একটু রোঁ থাকলে ছুঁচের ভেতরে যায় না।"

কখনো বা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঠাকুর বলিতে থাকেন, "সাধনের অবস্থায় কামিনী দাবানলের স্বরূপ, কালসর্পের সমান। সিদ্ধাবস্থায়, ভগবান্ দর্শনের পরে, তবে মা আনন্দময়ী। তখন মারই এক একটি রূপ বলে বুঝবি।"

তরুণ সাধকের হৃদয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচার আচরণ সত্যকার পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেন।

উত্তরকালে বাবুরাম মহারাজ এসময়কার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের মেজেতে মাদুরে শুয়ে আছি। রাত্রি দুপুর একটার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, ঠাকুর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, থুথু ক'রে চারদিকে মুখামৃত ফেলছেন, আর বলছেন, 'দিসনি মা দিসনি মা।' মা যেন ধামা পুরে নাম যশ নিয়ে তাঁকে দিতে এসেছেন, তাই ঠাকুর বলছেন, দিসনি মা, দিসনি মা।"

পবিত্রচেতা নিরভিমান বাবুরামের অন্তরপট হইতে ঠাকুরের যশ বিতৃষ্ণার এ দুর্লভ চিত্রটি কোনোদিনই আর অপসৃত হয় নাই।

স্বাভাবিক জীবনের মমত্ব ও আত্মিকযোগ উভয়েরই মধ্য দিয়া ঠাকুরের স্পর্শ

বাবুরাম এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তদের উজ্জীবিত করিয়া থাকিত। একবার ঠাকুর ভক্ত মণি মল্লিকের গৃহে কীর্তনরঙ্গে মাতিয়াছেন। মাতৃনামে মত্ত ও আবিষ্ট অবস্থায় দীর্ঘ সময় কোথা দিয়ে কাটিয়াছে সে দিকে হুঁশ নাই। হঠাৎ বাবুরামের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, বুঝিলেন সে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। অথচ ঠাকুরের আগে সে কিছুতেই আহার করিবে না। নিজে ভোজন করিবেন বলিয়া ঠাকুর তখনি কতকগুলি সন্দেশ আনাইলেন। উহা হইতে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া বাবুরামকে দিয়া দিলেন সবটা প্রসাদ। শুদ্ধসত্ত্ব তরুণ ভক্তদের প্রতি এমনি ছিল তাঁহার স্বাভাবিক মমত্ববোধ।

ঠাকুরের নির্দেশে, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া, পঞ্চবটীমূলে গভীর রাত্রিতে বাবুরাম একটানা ধ্যানজপ করিতেন। সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সুন্দর সুঠাম তনু, বস্ত্রাম্বর পরিহিত, এই নবীন সাধক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।

সাধক বাবুরাম একদিন পরমহংসদেবকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহার যেন সত্বর ভাব-সমাধি হয়। ঠাকুর ইষ্টদেবী ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কহিলেন, "বাবু-রামের কথা মাকে আমি বললুম, তা মা বললেন, ওর ভাব হবে নি, ওর জ্ঞান হবে।'

কিন্তু অন্যান্য গুরুভাইদের কাহারো কাহারো ভাবসমাধি হইতেছে, বাবুরামের মনে তাই স্বস্তি নাই। ঠাকুরের কাছে প্রায়ই তিনি কাঁদাকাটি করিতেছেন। ঠাকুর পড়িলেন মহা বিপদে। অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলিতে লাগিলেন, "তাই তো কি হবে। এটা (ভাবসমাধি) না হলে যে ও আর আমায় মানবে নি।' ভাবখানা এইরূপ, যেন বাবুরাম নামক নবীন সাধক অভিমানভরে তাঁহাকে না মানিলে এই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহা-পুরুষের আর উপায় নাই। আসল কথা, বাবুরাম ঠাকুরের আত্মার আত্মীয় হইয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার মান অভিমানের ভয়ে তিনি অনেক সময় থাকেন শঙ্কিত।

নবীন শিষ্যদের সম্বন্ধে ঠাকুর ধ্যানে যাহা জানিয়াছিলেন, মাস্টার মহাশয়ের কাছে একদিন তাহা খুলিয়া বলিলেন, "বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলায় হার, সখী সঙ্গে।...স্বপ্নে ও কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ, একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।"

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন বাবুরামকে নিকটে ডাকিলেন, তারপর তাঁহার মুখে কারণের ছিটা দিয়া বলিলেন, "যা, আজ তোর পূর্ণাভিষেক হয়ে গেল।" শিষ্যদের দিব্যশক্তি বা চৈতন্য প্রদানের ভঙ্গীটি ঠাকুরের এমনি সহজ অনায়াস ছিল।

কৃপাসিন্ধু ঠাকুর তাঁহাকে আরো কৃপা করিতেছেন না, ইষ্টদর্শন ও সমাধি ত্বরান্বিত হইতেছে না, এই ক্ষোভ মাঝে মাঝে আসিয়া যায় বাবুরামের মনে। ঠাকুর একদিন স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দ্যাখ্‌রে পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটি পড়ে গেছে, জায়গাটি ঠিক ক'রে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়। শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে হয় প্রত্যক্ষ দর্শন।"

সাধক বাবুরাম সদ্‌গুরুর কৃপায় তাহার হারানো রত্নের সন্ধান জানিয়াছিলেন, সেটির উদ্ধার সাধনেও হইয়াছিলেন সক্ষম।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। অমাবস্যার তিথি ও কালীপূজার দিনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন হঠাৎ একসময়ে প্রিয় শিষ্য বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ

হইয়া গেলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে ধীরে ধীরে ভক্তদের কহিতে লাগিলেন "সব দেখলুম, কে কতদূর এগিয়েছে। রাখাল, মাস্টার, সুরেন্দ্র, বাবুরাম অনেককেই দেখলুম। সবাইর হয়ে যাবে দেখলুম। সব দেখলুম ঘুপটি মেরে রয়েছে।" বলা বাহুল্য, ভক্তরা তাঁহার একথায় নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর ঠাকুর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। অন্যান্য ভক্তদের মতো বাবুরামেরও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। জীবনের একমাত্র পরম আশ্রয়টি নয়ন সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সাধক বাবুরাম একবার হতাশা ও বিষাদে ভাঙিয়া পড়িতেছেন। আবার কখনো উপলব্ধি করিতেছেন, ঠাকুর তাঁহার ভক্তদের কল্যাণের জন্যই এই উৎকট রোগ নিজ দেহে ধারণ করিয়াছেন। তরল ঔষধ ও পথ্য গলাধঃকরণে যাঁহার দুঃসহ দেহকষ্ট দেখা যায়, আবার ঐশ্বরীয় প্রসঙ্গে অথবা সমাধিস্থ অবস্থায় দেখেন তাঁহার সেই দেহে অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতির প্রকাশ। বাবুরাম প্রায়ই এ দৃশ্য লক্ষ্য করেন, আর অন্তরে জাগিয়া উঠে ঠাকুরের অধ্যাত্ম-স্বরূপের প্রকৃত পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন জানাইয়া দেন, "এই গলার অসুখ, এরও একটা মানে আছে। এখানে বাড়ি ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত এবার এখানে দলে দলে আসছে। সকলে কি দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতো?"

অতঃপর ঠাকুরকে কাশীপুরের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁহার সেবা-পরিচর্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদল ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পান।

ঠাকুর তখন যেন ভক্তদল মধ্যে ঐশী কৃপার এক অমৃত নির্ঝররূপে অধিষ্ঠিত।— শিষ্যদের বিশুদ্ধ আধারে আপন দিব্যশক্তি অকৃপণ করে তিনি ঢালিয়া দিতেছেন।

অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত বাবুরামও ঠাকুরের এই করুণাধারায় স্নাত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইতে থাকেন।

ভক্ত বুড়ো গোপাল এই সময় উত্তরাখণ্ডের তীর্থস্থান দর্শন করিয়া ফিরিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি? এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।"

পরমহংসদেবের ইঙ্গিতমতো তিনি গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ মালা চন্দন প্রভৃতি আনয়ন করিলেন। ঠাকুর স্বহস্তে অন্তরঙ্গ ভক্তদল, নরেন, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতিকে সন্ন্যাসরূপের এইসব উপকরণ বিতরণ করিলেন। বাবুরাম এবং তাঁহার গুরুভাইদের হৃদয়ে চরম ত্যাগের মন্ত্র চিরদিনের মতো ঠাকুরের কৃপায় অঙ্কিত হইয়া গেল।

এই সম্পর্কে কথা উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজ উত্তরকালে বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে কিছু ক্রিয়া শিখাইয়া দিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন যা এখন থেকে তোরা চণ্ডালের বাড়ি খেলেও দোষ হবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বরাহনগরে ত্যাগীভক্তদের জন্য একটি আশ্রমস্থল ঠিক

করা হয়। ঠাকুরের আশীর্বাদ ও ভক্তদের প্রীতিবন্ধনের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর উন্মেষ এবার ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে। অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত ত্যাগ তিতিক্ষাপরায়ণ বাবুরামও এই সময়ে চরম পরীক্ষা প্রদান করেন। দারিদ্র্য ও অবহেলার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভক্তদলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথটি উন্মুক্ত হইতে থাকে।

এই সময়ে একবার নরেন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়া বাবুরামের পিতৃগৃহ আঁটপুরে গিয়াছিলেন। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রিতে বাবুরামদের প্রাঙ্গণে সবাই ধুনি জ্বালাইয়া ধর্মালোচনা ও ধ্যানজপে বসিতেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলে স্থির করিলেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ তরুণ ভক্তদের কেহই আর গৃহে ফিরিবেন না। নরেন্দ্রনাথের ত্যাগদৃপ্ত কণ্ঠ বাবুরাম প্রভৃতি গুরু ভাইদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিল।

ধুনির সম্মুখে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ সেদিন বলেন, "ঠাকুরের প্রেরণা আমাদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত। তিনি যে ত্যাগমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত ক'রে গিয়েছেন, আমাদের সকলের হস্তে গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে অঙ্গুলীসংকেত করেছেন, সেই ত্যাগ মার্গেই আমরা চলবো। ঠাকুরের সুমহান্ উদারভাব জগতে প্রচার করতে যদি আমাদের প্রাণ যায় তাও স্বীকার। তবুও আমরা ঘরে ফিরবো না।" ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মানসিক প্রস্তুতি এভাবে নরেন্দ্রনাথের এ সংকল্পবাণীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসার পর সংসারত্যাগী ভক্তেরা বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "বাবুরাম শ্রীমতীর অংশে জন্মেছে।" সেই কথা স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নামকরণ করিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ। রামকৃষ্ণ মণ্ডলীতে প্রেমঘন এক সিদ্ধসাধকরূপে অবস্থিত থাকিয়াই স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার দিব্য-প্রভাব বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন।

নবীন সন্ন্যাসীর দল পরমত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও আদিষ্ট ধ্যান জপে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাদের এই সময়কার কঠোর তপস্যা ও ত্যাগ তিতিক্ষার পরীক্ষার কথা-প্রসঙ্গে প্রেমানন্দ মহারাজ উত্তরকালে প্রায়ই বলিতেন—'আজ যে এত বড় মঠ দেখছো, কোথায় এর আরম্ভ। ঠাকুর যখন অপ্রকট হলেন, লাটু, আর কয়েকটি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই। শেষে সুরেশ মিত্তির বরানগরে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে দিলেন। নিচের একতলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় ছিল তিনটে ঘর। ঠাকুরের কোনোদিন বা দুটো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হত, কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনোদিন জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। থালা বাসন তো কিছু নেই। বাড়ির সংলগ্ন বাগানে লাউ গাছ, কলা গাছ ঢের ছিল কিন্তু দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে উড়ে মালী যা তা গাল দিত। শেষে মানকচুর প্যাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হতো। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ আর ভাত, তা আবার মানপাতায় ঢালা—কিছু খেলেই গলা কুটকুট করতো। এত যে কষ্ট তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দুটি একটি ক'রে বাড়তে লাগল। পূজা ধ্যান সর্বক্ষণ চলছে।'

ঠাকুরের দেহান্তের পরেও প্রেমানন্দের উপর হইতে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি অপসৃত হয় নাই। আলমবাজার মঠে ত্যাগী ভক্তেরা তখন বাস করিতেছেন। প্রেমানন্দজী নিরামিষ আহার করিতেন এবং যাঁহারা মাছ, মাংস ভোজন করিতেন তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। এসময়ে এক-রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, জ্যোতির্ময় মূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিতেছেন, "হ্যাঁরে শালা। তুই মাছ খাস্‌নি বলে বড় সাধু হয়েছিস, আর ওরা মাছ খায় বলে ওদের ঘেন্না কচ্ছিস? দাঁড়া, আজ তোর চোখ গেলে দেব।"

আতঙ্কে প্রেমানন্দ মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাছ মাংস খাওয়ার জন্য যাহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, প্রথমে মনে মনে তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর বাহিরে গিয়া তৎক্ষণাৎ দুই একটি মাছের আঁইষ মুখে স্পর্শ করাইলেন। সেইদিন হইতে আমিষ-ভোজীদের তিনি আর নিন্দা করিতেন না।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ দিকে দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। এ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মের প্রধান ধারক-বাহকরূপে চিহ্নিত হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং প্রেমানন্দ। ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন,—"গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কর্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব এদের বড় বলতেন।"

নিবেদিতার নিকট লিখিত এক পত্রেও দেখা যায় স্বামীজী লিখিতেছেন, "এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর এ দায়িত্ব প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর পড়বে।"

স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজ লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর অদর্শনের কয়েক বৎসর পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠ ও মিশনের কার্যোপলক্ষে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন বাবুরাম মহারাজই মঠের সমস্ত কাজকর্ম দেখিতেন। মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের নিত্য শিক্ষাদান ও সমাগত ভক্তমণ্ডলীদের ধর্মোপদেশ তিনি অতি প্রীতির সহিত প্রদান করিতেন। মঠের সাধু ব্রহ্মচারী এবং বাহির হইতে সমাগত ভক্তেরা সকলেই তাঁহার আদরযত্ন ও অমায়িক ব্যবহারে একবাক্যে বলিতেন যে, প্রেমানন্দ স্বামী যেন মঠের মা, এমন স্নেহযত্ন আমরা কোথাও পাই না। কিরূপভাবে মঠ চালাইতে হইবে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কিরূপে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টাপূর্বক অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।"

মঠ ও মিশনের ধারক শক্তি এবং সূত্রধররূপে স্বামী প্রেমানন্দের সাধনা কাজ করিয়া যাইত। ঠাকুর পূজা, ভাঁড়ারের কাজ ও নূতন ব্রহ্মচারীদের সহিত ফলের খোসা ছাড়ানো ও গোবর পিণ্ড পাকাইতে যেমন তাঁহার উৎসাহ ও দক্ষতা ছিল, নূতন মঠ-বাসীদের ধ্যান জপ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তেমনি ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি।

সেদিন একদল ব্রহ্মচারী সাধু জপধ্যান সারিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইতেছেন। ইঁহাদের একজন স্বামী প্রেমানন্দকে প্রণাম করা মাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি রে, ডোমপাড়া থেকে এলি ?"

প্রকৃতপক্ষে সেদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া এই তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার মনকে জপে বসাইতে পারে নাই, নিষিদ্ধ বিষয়বস্তুতে তাহা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। প্রেমানন্দজীর মন্তব্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। এভাবে এই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তরুণ সাধুদের রক্ষা করিতেন, পরম স্নেহে ও যত্নে তাহাদের অধ্যাত্ম প্রগতির পথ খুলিয়া দিতেন।

শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধনায় নবাগত সাধুদের প্রেমানন্দজী উদ্বুদ্ধ করিতেন আশ্বাস দিতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপার কথা বলিয়া।

শুধু উপদেশ দিয়াই মহারাজ ক্ষান্ত হইতেন না, নিরভিমানতা ও প্রেমের জীবন আদর্শ নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়া দেখাইতেন।

সেবার এক উৎসব উপলক্ষে বেলুড়মঠে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সমবেত হইয়াছেন। উঠানের উপর জুতা রাখিয়া মঠের চারিদিকে সবাই ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। নূতন দুই তিনজন ব্রহ্মচারী আগন্তুকদের পাদুকাগুলি হাতে না উঠাইয়া পায়ে ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে দিতে থাকে। প্রেমানন্দ মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, বলেন, "ভক্তের জুতা মাথায় ক'রে তুলবি, তা না তোরা পায়ে ক'রে তুলছিস্। জানিস্ না, ভক্তই ভগবান্, ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা। সাধু হতে এসেও অহমিকা গেল না, বাবা! এই অহংকার দূর করবার জন্য সাধক অবস্থায় ঠাকুর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কাঙালীদের এঁটো পাতা মাথায় ক'রে গঙ্গার জলে ফেলে আসতেন, কৈবর্তদের পায়খানা লুকিয়ে সাফ করতেন। আর তোদের বুঝি অপমান বোধ হয়, ভক্তের জুতো হাতে ক'রে সরাতে ? অহংকার ভিতর থেকে না গেলে ভগবান্ লাভ হবে কি, চাঁদ ?"

মঠ ও মিশনের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমে বাড়িতে থাকে। ইহা দর্শনে মাঝে মাঝে এই বৈরাগ্যবান্ সাধকের অন্তরে শঙ্কার আলোড়ন উঠিত। সেবার এক ভক্তকে তিনি লিখেন, "সাধু হয়ে আবার এই ঘরবাড়ি ক'রে থাকা—কি সব আমরা করছি। এ ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার প্যাঁচ। অবিদ্যা কত রকমের ফাঁদই পেতে খেলাচ্ছেন তার ইতি-অন্ত নেই। রক্ষা কর ঠাকুর রক্ষা করো।"

কখনও কখনও তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "ঠাকুর ছিলেন, ত্যাগীর বাদশা। আজ যদি ঠাকুর পুনরায় দেহ ধারণ ক'রে এখানে আসেন, মঠধারী আমাদের সব গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে দিতে বলবেন, 'বেটারা সব মঠধারী সাধু হয়েছিস, বেরো শালারা।"

আবার তখনই তাঁহার মনে পড়িত ঠাকুরের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে স্বামীজীর ব্যাখ্যান ও ভাষ্য। বলিতেন, "ঠাকুরের অবর্তমানে আমরা যে রকম কঠোর তপস্যা করেছিলাম, এখনকার ছেলেরা তা পারবে না বলে স্বামীজী এই মঠ তৈরি করলেন, সাধকদের চাট্টি ডাল-ভাতের ব্যবস্থা ক'রে। কলিতে অন্নগতপ্রাণ কিনা!"

বেলুড়মঠে আগত একটি ভিখারীকে একবার স্বামী প্রেমানন্দ দয়াপরবশ হইয়া একটি কাঁচ লাউ প্রদান করেন। ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রেমানন্দকে ডাকাইয়া কহেন, "বাবুরামদা, ওকে ওটা দিয়েছো কার হুকুমে?'

প্রশ্নটি শুনামাত্র ক্রুদ্ধ প্রেমানন্দজী একখানা গামছা কাঁধে করিয়া মঠ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। ফটকের সামনে আসিয়াছেন, এমন সময় ঘটে এক বিস্ময়কর অলৌকিক কাণ্ড। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্ম মূর্তিতে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন, "কোথায় যাচ্ছ, চাঁদ?"

অভিমানাহত প্রেমানন্দজীর ক্ষোভ দুঃখ মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেল। সদ্‌গুরুর কৃপার স্পর্শে তখন তাঁহার দেহ পুলকাঞ্চিত, নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা। মনে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, এই মন্দির, মঠ এবং চতুর্দিকস্থ যাবতীয় বস্তু, ভক্তদের দেহ মন প্রাণ, সমস্তই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের—কাহারও কোনো পৃথক অস্তিত্বই নাই। কৃপাসিন্ধু নিজে আবির্ভূত হইয়াই সেদিন তাঁহাকে এ তত্ত্বটি বুঝাইয়া গেলেন।

ছুটিয়া গিয়া তখনি তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, কহিলেন, তুমি ঠিক বলেছ মহারাজ, এ সবারই তো মালিক ঠাকুর। তুমি ঠাকুরের সন্তান, স্বামীজী তোমাকে তাই সব অধিকার দিয়ে গেছেন। আমি কে? তাঁর দাস মাত্র।'

নিরভিমান, প্রেমঘন প্রেমানন্দকে ব্রহ্মানন্দ পরম স্নেহে করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। অতুল ভাবসম্পদের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন সত্তাটি প্রেমানন্দ মহারাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমময় দেহে দর্শন করিতেন ঠাকুরের দেহাংশ।

স্বামীজী মঠবাসী সাধুদের প্রায়ই বলিতেন, "বাবুরাম মহাসিংহ। আমার কাছে কুঁচকে থাকে বলে ওকে সামান্য মানুষ মনে করিস নি। পরে ওকে দেখে বহু লোকের চৈতন্য হবে। ওর মতো প্রেমিক ঈশ্বরবিশ্বাসী দুনিয়া ঘুরে দেখতে পারি কিনা সন্দেহ। রাখাল, বাবুরাম এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটি কেন্দ্রের মতো।"

অপর গুরুভাইরাও স্বামী প্রেমানন্দের প্রতি নিবিড় ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। স্বামী সারদানন্দ অসঙ্কোচে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'ঠাকুর ঈশ্বরকোটি বলে তোমাদের নির্দেশ করেছেন তোমরা হুকুম করবে, আর আমরা পালন করব।'

মৃত্যুর পূর্বে শশী মহারাজ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, এই প্রিয় গুরুভ্রাতারই পাতবশিষ্ট ভোজনের জন্য অনুরোধ জানান। এসময় তাঁহার এক সেবককে বলিয়াছেন "বাবুরামদা ও ঠাকুর আলাদা নয়, বুঝলি! বাবুরামদা'র প্রসাদ ঠাকুরের প্রসাদ। দে তুই আমায় তাঁর প্রসাদ দে।

গুরুভাইরাই শুধু যে এই মহাপুরুষকে চিনিয়াছিলেন তাহাই নয় তাঁহার প্রেমের স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া বহু সাধু, ভক্ত ও গৃহীজনের চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে, নূতন অধ্যাত্ম-সত্তায় তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সদাই প্রেমিকের ভাবময়তা ও দৈন্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলেও এই সম্পর্কে

সাধকের মধ্যে দেখা যাইত সত্যকার আত্মপ্রত্যয় ও বলিষ্ঠতা। মঠের তরুণ ভক্তদের উদ্দীপিত করিয়া প্রায়ই বলিতেন, "নাহং নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু যতক্ষণ এই-ভাব ঠিক ঠিক না হয়, ততক্ষণ আর গা সাধন সমবে!"

একবার মালদহের এক উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া প্রেমানন্দ বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের নির্যাস ছিল, জীবের সেবা ও ত্যাগ তিতিক্ষাই ধর্ম। ভাষণ শেষে কয়েক জন শ্রোতা বলিয়া উঠেন, আমরা প্রেমভক্তি সাধন সম্পর্কে শুনতে চেয়েছিলাম আপনার মুখ থেকে। তাই আমাদের বলুন।"

সুপ্ত সিংহ যেন গর্জিয়া উঠিল। প্রদীপ্ত নয়নে দৃঢ়কণ্ঠে স্বামী প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে কাকে বলবো প্রেমভক্তির কথা? বলতে পারেন আপনারা, প্রেম-ভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে?"

"হাজার হাজার লোকের মধ্যে এমন অধিকারী কি একজনও এখানে নেই" বলিয়া উঠেন এক ভক্ত শ্রোতা।

প্রেমানন্দ মহারাজ আত্মপ্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "তাই যদি না বুঝবো তো এতকাল সাধু হয়েছি কেন? মুখ দেখেই সব বুঝতে পারি। তাহলে শুনুন এক কাহিনী: এক অভিনব পশারী প্রেম ফিরি ক'রে যাচ্ছে,—প্রেম, প্রেম নেবে গো, প্রেম। লোকের ভিড় জুটে গেল দুয়ারে। মূল্য কি? পশারী হাঁকলো—'মাথা! হ্যাঁ, প্রেম নিতে হলে মাথা দিতে হবে। প্রেমভক্তির কথা আপনারা শুনতে চান। উত্তম। কিন্তু এজন্য যে মাথা দিতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগ করতে কেউ রাজী আছেন? সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে তবেই না এর অধিকারী হওয়া যায়!"

বিস্মিত জনতা উদ্দীপিত সিংহের আননের দিকে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ত্যাগপূত প্রেমের এই একনিষ্ঠ সাধনা রামকৃষ্ণশিষ্য বাবুরাম মহারাজের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার প্রেমের স্পর্শে বহু অঙ্কুরকে পরিণত করিয়াছিলেন বনস্পতিতে।

তরুণ কর্মী ও সাধকেরা ছিলেন প্রেমানন্দ স্বামীর প্রাণস্বরূপ। ইহাদের এক একটি হৃদয়কে প্রেমাবেগে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে, এক একটি জীবনকে প্রেমে পুণ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে কি অপার ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়াই না তিনি সদা তৎপর থাকিতেন। বেলুড়মঠের প্রকাশিত স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলীতে তাঁহার অন্তরঙ্গতার সুরে ভরা চিঠিপত্রগুলিতে ইহার পরিচয় মিলে।[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

২৭।১১।১৪

পরমস্নেহাস্পদেষু—

তোমরা হৃষীকেশে অনেকগুলি জুটেছ—গাজন নষ্ট না হয়। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইও না। এইটি বিশেষ নজর রাখিবে। তোমরা সবাই সিদ্ধ হয়ে যাও, শ্রীশ্রীপ্রভুর ও পরম উদার স্বামীজীর নাম নেবার উপযুক্ত হও। তোমরা বঙ্গদেশে আদর্শ ত্যাগী, এইভাবে

১ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী: প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ।

তোমাদের জীবন প্রস্তুত করিতে হবেই হবে। কেবল পরের ঘাড়ে তীর্থে ভ্রমণ, উত্তম ভোজন ও দুচারটি বচন ঝাড়বার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। ঘোর তপস্যায় লেগে যাও, অভিমান ধ্বংস ক'রে বস্তু লাভ ক'রে তবে ফিরবে। ভারত, কেবল ভারত কেন, সারা ভুবন তোমাদের দেখে অবাক হবে, আচার্যের স্থানে বসাবে। তবেই তোমরা বেলুড়মঠের সাধুভক্ত। নতুবা পেটের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সাধু হিন্দুস্থানে প্রচুর। হও পবিত্র, হও অকপট, আর প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর বলে। পরম দয়াল প্রভু বল দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অন্তর থেকে ডাক, তিনি শুনবেনই শুনবেন। রা—, অ—, গি—, প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে ও তুমি জানবে। আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখতে —শেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎ মন বুদ্ধি দিন—এই প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
১৯।৬।১৫

পরম প্রীতিভাজনেষু,—

"তোমার সেবা-শুশ্রূষা দেখিয়া কে না মোহিত হইবে? "সেবা বন্দি আউর অধীনতা, সহজে মিলি রঘুরাই।"

সেবা কি একটা সামান্য জিনিষ! ঠাকুর গাইতেন—"আমার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়, তারে কেবা পায় সে হয় ত্রিলোকজয়ী।

ভয় কি? তুমিও ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে ত্রিলোক জয়ী হয়ে যাচ্ছো। খুব ঠাকুরের ও ভক্তের সেবায় লেগে থাক। ধন্য হয়ে যাও, কৃতার্থ হয়ে যাও। ভয় ডর দূর হয়ে যাক। তোমাদের দেখে লোকে বলুক, এরাই পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবতা। খালি দীন হীন হলে চলবে না। মহাবীর হনুমানের মত রামভক্ত প্রাণ অন্তর্বহি রামগত প্রাণ হতে হবে। ঠাকুর তোমাদের সব ভার নিয়েছেন। তোমাদের ঐ সখের ভাবের চাকুরী-টাকুরীগুলোর ভাবনা ক'রো না। তুমি ওসব ভার ভগবানের উপর দিয়েছ। নির্ভীক হয়ে থাক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
২৮শে ভাদ্র, ১৩২২

পরমস্নেহাস্পদেষু,—

আমি দেখছি তোমাদের উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা। তুমি একান্তে একা একা বেশ আছ। প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। সিদ্ধ হও, জীবন্মুক্ত হও, ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হও

মেতে যাও। লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক, খেয়াল ক'রো না। এই জীবনে এই শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চাইই চাই। তখন তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে ভগবদ্বাণী—অহঙ্কার, অভিমান, দেশ ছেড়ে পালাবে।

দেখছ না মানুষে কি চায়? কেবল চায় ঐহিক সুখ-সম্পদ ভোগ ঐশ্বর্য। ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করে? আর যদি বিশ্বাস করে, ক'টা লোক তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়? বাবা! যে লোকমান্য, কামিনী কাঞ্চন দিয়ে রেখেছেন, এ ছাড়িয়ে উঠে এমন বীর কটা আছে?

সৃষ্টি অনন্ত, ভাব অনন্ত। অপরের দোষ দেখতে দেখতে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে এসে পড়ে। আমরাও লোকের দোষ দেখতে কিংবা দোষ শোধরাতে আসি নাই, এসেছি কেবল শিখতে। সর্বদা পরীক্ষা করবি কি শিখলাম। চতুর্দিকে দেখছ ত কত বিজাতীয়, কত বিধর্মী ভাব রয়েছে। তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার বল? এসেছি আম খেতে, পেট ভরে আম খাবার চেষ্টা করা যাক্। এই ভাল। আর তোমার আমার কথা লোকে কৃপা ক'রে শুনে মাত্র। নিজেদের ধারণা কত হল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্যে নিলে কিনা জানবার ইচ্ছা। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি কোথায়, একবার চিন্তা করি এস। প্রচারের কাজ নাই। এখন পালাতে পাল্লে হয়। বাপ্। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, তাই রক্ষে, নতুবা চারিদিকে ত কেবল দাবানল, বাড়বানল, আর জঠরানল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি করতে পার? পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

'প্রেমিক চায় ন্যাক' জাতি, চায় না সুখ্যাতি, সে ভাবে পূর্ণ, হয় ক্ষুণ্ণ বটলে অখ্যাতি। আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলে, আসমানেতে বানায় ঘর। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। ও ভাই থাকে না তার আত্মপর।'

সে মানুষের দোষগুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাল বেসে বেসে মরে, মরেই বা কেন? ভালবাসার যে অনন্ত জীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা, এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্য ধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই। এই জিনিষ লড়াই ক'রে কেড়ে নিবার যো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বলছি জানবে। বিশ্বাস-বল, শ্রদ্ধা-বল চাই এ ধন লাভ করতে হলে। সম্মুখে ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমরা কতই ভাগ্যবান্। কিন্তু মা সব ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দেন, এই এক মহা মোহ। তবে শরণাগতকে রক্ষা করেন, সদ্বুদ্ধি, সৎমন সৎসঙ্গ দানে।

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

বেলুড়মঠে প্রতিদিন পাঠ হয়। এই পাঠের কাজ যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় এবং সবাই নিষ্ঠাভরে ইহাতে যোগ দেয় এজন্য প্রেমানন্দ স্বামীর উৎসাহের সীমা ছিল না।

সেদিন অনেকে সময় মত আসেন নাই। প্রেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে,

তোদের আজ এত দেরি হ'ল কেন? রোজ রোজে এমনিভাবে ডেকে বসাতে হবে নাকি?"

সকলেই চুপচাপ। একজন তরুণ সাধু কৈফিয়ত হিসাবে বলিলেন, "সময় মত আসব কি, মহারাজ, এখানে যত বাইরের লোক আসে ও থাকে। তাদের মধ্যে এমন সময় কেউ কেউ বা শুয়ে থাকে, কেউ বা ঘুমিয়েও থাকে।"

স্বামী প্রেমানন্দ মমতাভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আহা! আহা! ওরা ঘুমোবে না? এমন ঘুম আর কোথায় হবে? এমন মন্ত্রবায়ু, গঙ্গা, হাওয়া কোথায় আছে? জানিস, সংসারে এদের কত চিন্তাভাবনা, কত জ্বালা-যন্ত্রণা? জ্বলে পুড়ে এখানে আসে একটু প্রাণ জুড়াতে, শান্তি পেতে। এমন শান্তির স্থান আর কোথায় আছে? বলছিস এরা সব ঘুমোয়। আর ঘুমোলেই বা। তোরা সব আছিস কি করতে। তোরা সব বাড়িঘর ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসেছিস যে জাগাতে রে। ঠাকুর, স্বামীজী এসেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জাগাতে। তোরা যে সব তাঁদেরই কাজ করতে এসেছিস। তোরা যে এই মোহনিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাগাবি—এই জগৎকে জাগাবি। আর এই কজন লোককে জাগাতে পারবি না? তোদের জাগ্রত দেখলেই যে এদের সব ঘুম ভেঙে যাবে।"

দেখা গেল, কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে দিব্য প্রেমের আভা, চোখ দুটি পরম করুণায় ছলছল। সকলেরই হৃদয়ে স্পর্শ লাগিয়াছে এই প্রেমের, নতমস্তকে নীরবে তাঁহারা বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা কাল পাঠকক্ষে বিরাজিত রহিল এক অপূর্ব নিস্তব্ধতা। স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমপূর্ণ এবং তেজস্বিনী বাণী অনুরণন তখনো চলিতেছে শ্রোতাদের অন্তরে।

এ সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী বাংলার দিকে দিকে এমন কি গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যদের দর্শনের জন্য, তাঁহার লীলাকথা শোনার জন্য সবাই সমুৎসুক। এ সময়ে ঠাকুরের নব ভক্তদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলেই প্রেমানন্দজী তাহাদের কাছে ছুটিয়া যাইতেন, জাগাইয়া তুলিতেন অপূর্ব আত্মিক প্রেরণা। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ঢাকা এবং ময়মনসিং জেলায় এবং উত্তরবঙ্গে মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে সহস্র সহস্র ভক্ত তাহার পুণ্যময় সান্নিধ্য পাইয়া উপকৃত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এই জয়জয়কার দেখিয়া এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন

" আমরা দুই তিন দিন হইল ঢাকা প্রভৃতি ঘুরিয়া মঠে ফিরিয়াছি। পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলার ধুম দেখিয়া আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। ও দেশের ছেলেরা বেশ মেতেছে ঠাকুর ও স্বামীজীর নামে। আসুক আরও উৎসাহ—অদম্য উদ্যম। যাক ভেসে দেশ ভক্তি প্রেমের হিল্লোলে। ভাবের বন্যা আসুক, ডুবে যাক হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কেউ না বাদ যায় চুনো পুঁটি পর্যন্ত, দ্বেষাদ্বেষি দূরে ক'রে শতুক ইউরোপ, আমেরিকা ভাব, মহাভাব লাভ করতে। সায়েন্স (জড় বিজ্ঞান) আনন্দ ও শান্তি প্রদানে নিশ্চয়ই অক্ষম। ঠাকুরের ছদ্মবেশে শান্তির পথ দেখাবার জন্য, মূর্খের সাজে এসেছিলেন, পাণ্ডিত্যের গর্ব চূর্ণ করবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। হও সরল, মন মুখ

এক ক'রে তাঁর চিন্তা কর। এই শরীরেই প্রভুর দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হতে হবে তোমাদের। তাঁর নামে অসীম শক্তি অনুভব করবে। আসুক তোমাদের ভিতর দৃঢ়তা। বিশ্বাস কর—তোমাদের মধ্যেই অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। ভগবান্ তোমাদের মধ্যে মহত্ত্ব ও উদারতা দিন—এই প্রভুর নিকট প্রার্থনা।[1]

সেবাকর্ম যে শুধু দুমুঠো অন্ন বিতরণের জন্য নয়, মহত্ত্ব দেবত্ব দিবার জন্যে, এই তত্ত্বটি মিশনের কর্মীদের হৃদয়ে সদাই তিনি গ্রথিত করিয়া দিতেন। একটি পত্রে এ সম্পর্কে লিখিতেছেন

...গতকল্য রাত্র হতে এখানে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় তোমাদের ওখানেও এই বৃষ্টি বাদ যাবে না। বিশ্ব-বিধাতা ভগবান্ না দিলে মানুষের দানে লোকের অভাব কখনই মিটে না। এই সব দুঃখকষ্ট রোগশোকের মধ্যেও প্রভুর লীলা দেখবার চেষ্টা কর। তিনি পরম কল্যাণময়। আমরা মাটির খেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনী কাঞ্চন, মান ইজ্জত পেয়ে সব বিস্মরণ। তাই কৃপানিধান দয়া ক'রে মহামারী দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে 'বহুজন হিতায়' আসেন। দেখ, দেখে দেখে কেবল শিক্ষা কর। কেবল মাত্র দুমুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই—মহত্ত্ব ও দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন, উদার হৃদয় কেমন ক'রে লাভ করতে হয় শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এযুগের অবতার বলেছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' এভাবে প্রত্যক্ষ কর, মানবজীবন ধন্য কর, স্বামীজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর। বুঝছ না আমরা কি এখানকার কর্তা? ভগবৎ শক্তির বিকাশ এখানে, সেই শক্তিবলে তোমরা ঐ সব কাজ করতে সমর্থ। জান না কি, স্বামীজী লিখে গেছেন, 'তিনি সূক্ষ্ম দেহে এই সঙ্ঘের মধ্যে বর্তমান'? বিশ্বাস কর সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের আদর্শবাণী। বিশ্বাস কর। তোমাদের কর্ম-পাপ কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। কি হে! তোমরা কি সাধারণ লোক? ভুলে গেছ কি যে আদ্যাশক্তির কৃপা লাভ করেছ? জগতের কটা লোকের এ সুযোগ সৌভাগ্য হয় বল? আমার খুব ভাল লাগে 'নাহং নাহং ভাব'! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী—কৃপাময় কেবল এইটুকু বোঝাচ্ছেন রোজ রোজ। মহারাজ বলেন—তোমাদের কোটি কোটি জন্মের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে ঐ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মে। এ কেবল স্তোকবাণী নয়, সত্যকথা জানবে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে হরির সেবা করছ। ঐ মূর্খ জড়প্রায় গণ্ডগ্রামে ঠাকুরের লীলা দেখে অবাক্ হচ্ছ! এ কার ঐশ্বর্য মনে কর? এর মধ্যে কি কিছু শিখবার নেই? বলি, তুমি কে মাধাই দাস যে লোকে তোমার মুখে ঠাকুরের কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব? এইখানেই প্রভুর শক্তির বিকাশ। তুমিও সেই দেববাণী শুনাতে মেতে যাও নাকি? সাধনভজন কার নাম? অনন্ত আকাশে লম্বা লম্বা কল্পনা জল্পনা নিয়ে থাকলেই কি বড় হওয়া চলে? কবিত্ব ছেড়ে কাজে লেগে যাও। জীবন দেখাও, আদর্শও রয়েছে সামনে, ভয় কি! হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে। (পত্রাবলী : ঐ)

১ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী : প্রকাশক, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণমঠ

পবিত্রতা ত্যাগ বৈরাগ্য এবং মায়ামোহ বর্জনের উপর স্বামী প্রেমানন্দ অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। সেবার পূজার মহাষ্টমীর দিন বেলুড়ে দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। জগজ্জননী মহামায়ার ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম। আশে পাশে উপবিষ্ট ভক্তদের বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ কি জানিস? পবিত্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস যদি থাকে তবে আর ভয় নেই। যা কিছু দরকার সব এসে যায়। সংসারটা কি রকম জানিস? ঠিক কুকুরের লেজের মতো। তাকে যতই টানাটানি কর, সংসারের দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখনো একেবারে দূর হবে না। সংসারে মিথ্যাচরণ হিংসা, দ্বেষ আর রেষারেষি লেগেই আছে। আহা, মহামায়ার কি খেলা। কেমনটি ক'রে বাহ্য চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। মায়ার ডোরে সব বাঁধা, তাই সকলে ভুল আছে।"

ভক্ত ধীরেন্দ্র, উত্তরকালের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেদিন নিবেদন করেন, "মহারাজ, কিভাবে থাকব একটু দয়া ক'রে বলে দিন।"

"কিভাবে থাকবি? খুঁটি ধরে থাকবি—পবিত্রতারূপ খুঁটি।" গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিয়া উঠেন প্রেমানন্দ স্বামী।

"মাঝে মাঝে 'আমি আমার' এই অভিমান, অহংকার কত কিছু যে উঁকি মারে।"

দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "কেন? ফোস্ ফোস্ ভাব একটু থাকবে না? নইলে যে কাজ হয় না। তবে ভেতরটা খুব নরম কোমল রাখা চাই। বাইরে একটু শক্ত থাকবেই। জানবি আর বলবি—আমি প্রভুর দাস, আমায় মঠের সকলে ভাল বলে জানেন, আমি কি এর বিরোধী ভাব নেব? আমি ঠাকুরকে ডাকি, তাঁর কথা ভাবি তবু শালা খারাপ ভাব আসবি? এভাবে আবার নিজেকেও ফোস্ ফোস্ করতে হয়।'

একবার জনৈক জিজ্ঞাসু ছাত্র মহারাজকে প্রশ্ন করে, "ঠাকুরের লীলাকথা যা শোনা যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হ'লে তো সবই মিথ্যা।"

স্বামী প্রেমানন্দ উত্তরে বলিলেন, "আচ্ছা, আদালতের জজ তো ভাল সাক্ষীকে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন। মনে কর্ তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি আমি সচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তাঁর ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম। সবই কি সকলে দেখতে পাবে? কেউ দেখে, কেউ শোনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই বিশ্বাস অচল অটল। সবল বিশ্বাস না হলে কিছুই হবে না। একটি ছেলে বি-এ পড়ে, বীরভূম জেলায় বাড়ি। বে-থা করেছে। আমায় মাঝে মাঝে পত্র দেয়। কয়েক-দিন হ'ল আমায় লিখেছে—ভয়ানক ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে, খুব অশান্তি ভোগ করছে। কাতর হয়ে আমায় আশীর্বাদ করতে লিখে। আমি তাকে লিখি—তুমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হও আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি তোমায় শান্তি দিন। পত্র পেয়ে কি সুন্দর উত্তর দিয়েছে।

তখনি একজন ব্রহ্মচারীকে ঐ পত্রটি আনয়ন করিতে বলিলেন। সেটি পড়িয়া তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কেমন সুন্দর লিখেছে—উপদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের শরণাপন্ন

হয়ে তাঁকে ডাকা অবধি দেখছি চাঞ্চল্য কোথায় দূর হয়ে গেছে—ইন্দ্রিয়গুলি যেন কেঁচো হয়ে আছে, ইত্যাদি। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর। বুঝলি[১]।"

সে-বার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সহজে ঈশ্বরের ধারণা কি ক'রে হয়?"

সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর গুরুনিষ্ঠার দিক দিয়া প্রেমানন্দজী ছিলেন অনন্য। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর-ফিশ্বরের হোমরা চোমরা একটা ধারণা না করে ঠাকুরকে ডাক্। তাঁকে স্মরণ মনন কর্, তাঁকে ধ্যান কর্। ঠাকুরের শরণাপন্ন হোস্ না কেন? তিনি যে কল্পতরু, বাবা! ঠাকুর স্বামীজীরই অন্ত পাই না, তা আবার ঈশ্বর! ঠাকুরের বিষয়ে স্বামীজীই কি কম গোঁড়া ছিলেন? কৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, আর যার যার কথাই বল না কেন এমনটি আর হয় নি। ঠাকুর সর্বভূতে চৈতন্য দেখতেন। দূর্বার ওপর দিয়ে কোনো কিছু নিয়ে গেলে, দাগ পড়লে তিনি কষ্ট পেতেন, নূতন কাপড় চড়চড় ক'রে ছিঁড়তে প্রাণ পড়পড় ক'রে উঠত। সমাধি অবস্থায় কোনো অপবিত্র লোক ছুঁতে পারত না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে মহারাজ এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সকলেই অবাক্ বিস্ময়ে নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার কথা শুরু করিলেন, বলিলেন ঠাকুরের একদিনকার দিব্যভাবের উদ্দীপনার কথা, "আহা! প্রভুর কি অপার দয়া! আমার মাকে (গর্ভধারিণীকে) লক্ষ্য ক'রে একদিন ঠাকুর বলছেন—যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া) মানত করলেই সব হবে। চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ।"

মঠ ও মিশনের কাজ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে শিবজ্ঞানে জীব-সেবার আদর্শটি স্বামী প্রেমানন্দ সারা মনপ্রাণ দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধৃতির পিছনে ছিল সদ্‌গুরুর কল্যাণবহ কৃপা। অনেক সময় এই কৃপার স্পর্শ ঠাকুরের অলৌকিক আবির্ভাবের মধ্য দিয়াও তাঁহার জীবনে পৌঁছিয়াছে।

একবার দু'একজন নবাগত ব্রহ্মচারীকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও যথোচিত পথে আনিতে না পারিয়া মহারাজ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, তাহারা তা মানিয়া চলিতে পারিত না; ফলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সকল নবাগত অবাধ্য ছেলেদের লইয়া ঘর করা এক বিড়ম্বনা। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলেও তাহার বিড়ম্বনার শেষ হইল না, তাঁহার সস্নেহ উপদেশাদি যেন ব্যর্থ হইল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। একদিন মঠ ত্যাগ করিবার জন্য মঠের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন কিছুই কিন্তু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। ফটকে আসিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া ফটকে দণ্ডায়মান। বাবুরামকে মঠ পরিত্যাগে দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন,

---

১ স্বামী প্রেমানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর, হুগলী।

"হ্যাঁরে বাবুরাম, আমায় ফেলে তুই কোথায় যাচ্ছিস?" তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।[১]

নূতন গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসী সাধক, উভয়ই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট হইতে সাধন সম্পর্কিত উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণবহ চিঠিপত্রে ইহার অজস্র প্রমাণ মিলে। একটি চিঠিতে এক ভক্ত মহিলাকে মহারাজ লিখিতেছেন

মা—তোমার চিঠি পড়লাম। মার নিকট হইতে দীক্ষা লইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানবদেহ ধারণ।

ভা-এ আশ্রম স্থাপন করতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা—শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয়, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার, তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়ে সর্বভূতে ভগবান্ দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর—জীবের মোহান্ধকার ঘুচাবার শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন ক'রে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচবে, তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, এইটি উপলব্ধি করবার জন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, বন্দনা, রোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপালাভ হয়। পবিত্রতাময় প্রীতি ও ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত করা, আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক্ হয়ে যাক, ইহাই তো শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানবে না আমি একটা বড় কাজ করছি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যা মোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও, দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে।

বা—কে বিশেষ ক'রে পড়াশুনা করতে বলবে। অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক—তাকে বুঝিয়ে দেবে, মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাবপ্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না, বাবা। ভাব শক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন? ধর্ম কর্ম ছেলেমানুষি ব্যাপার? শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য, মানের জন্য, অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা, আর ধর্মলাভের জন্য, শাস্ত্রপাঠের জন্য, শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা, ইহা অবশ্য অবশ্য কর্তব্য[২]।"

অপর একটি চিঠিতে মহারাজের প্রেমভক্তির ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন, "মালা জপা ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম ক'রে যাবে—আমাদের অত বিধি মানতে হবে না। যারা মানে মানুক। আমাদের চাই মার্গের ভজন সাধন,—যেমন ছিল ব্রজগোপীদের। 'সখি, তোমাদের হল কথার কথা আমার যে অন্তরের ব্যথা, আমার ত না গেলে নয়।' হতে হবে ব্যাকুল. উন্মাদ এরই নাম রাগ মার্গের ভজন। এখন ভগবৎ কৃপায় ভক্তি প্রেমের বান এসেছে ঠাকুরের আবির্ভাবে। যাও ভেসে, যাও মেতে, ভয় নাই! ভয় নাই

১ 'স্বামী প্রেমানন্দ'· শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর হুগলী।

২ পত্রাবলী' ঐ

দাও ঝাঁপ—অমর হবে। হে জীব, নবজীবন লাভ করো, নূতন রাস্তায় এগিয়ে চল। জয় শ্রীপ্রভুর জয়, শ্রীভক্তের জয়।"

নূতন সাধকের জীবনে অশান্তির জ্বালা ও নৈরাশ্য মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেয়, তাহাদের আত্মিক প্রস্তুতির ভিৎ-ও অনেক সময় নড়াইয়া দেয়। ইহাদের জন্য স্বামী প্রেমানন্দের বলিষ্ঠ আশ্বাসবাণী তাঁহার বিভিন্ন পত্রে রহিয়াছে[১]

"তোমার পত্র পেয়ে সকল অবগত হলাম। ঠাকুরের কথা তো পড়েছ? —'খানদানি চাষা হতে হবে। একবছর ধান হল না বলে যে হাল গরু বিক্রি ক'রে বসে থাকতে হবে, তার মানে কি? লেগে থাকতে হবে। ধ্যান জমবে না বলে একেবারে হতাশ্বাস হওয়া ভক্তের লক্ষণ নয়। ভক্ত প্রভুকে সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, শান্তি অশান্তিতে, সকল সময়েই ধরে থাকে। জানতো, 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে'—একথা ঠাকুর বলতেন। সেই জগৎগুরুকে ধরে থাকতে পারলে তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দেন, তাঁহার পাদপদ্মে অনুরাগ, প্রেম প্রভৃতি দান করেন। অতএব যে সর্বদা তাঁর শ্রবণ মনন রাখে তার আর কিসের দরকার।'

গুরু ইষ্ট, ধ্যান, জপ প্রভৃতি সম্পর্কে নবীন ভক্ত সাধকদের যে সব চিঠিপত্র তিনি দিতেন, তাহা ছিল তাহাদের সাধনপথের পরম সহায়ক

.."তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু মধ্যে মেদিনীপুর গমন করায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। বড় বড় সাধকেরও জপ ধ্যানে বসিলে মন চঞ্চল হয়, উহা কেবল তোমার নয়। এজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা, বন্দনা কখনও বা ধীরভাবে মনকে তাড়না করিতে হয়। আবার মন যে স্থানেই যাক না কেন সর্বত্রই ব্যাপকভাবে আমার ইষ্ট রহিয়াছেন, বুঝিতে হয়।

উহাতে কোনো ভয়ের কারণ নাই জানিবে, ঈশ্বর কৃপায় যেদিন মন স্থির সেইক্ষণেই সমাধি। গুরু ও ইষ্ট মূলত একই জানিয়া ধ্যান করিবে। যখন যেটি ভাল লাগিবে তাতেই ধ্যান করিয়া যাও। পরে তোমার মন শুদ্ধ ও নির্মল হলে ঐ মনই গুরু হয়ে সব বলে দেবে। পদ্ম এখন থাক্। হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যাও। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট, যখন যেটি খুশী ধ্যান করো, তাতে দোষ নাই। একটিতে নিষ্ঠা এলেই হল। ধৈর্যের সহিত অন্তর্বহিরিন্দ্রিয় দমন করার নাম—ব্রহ্মচর্য। বাহিরের সংস্কারে কি হবে?"

" ..তোমার চিঠি পড়িলাম। তোমার ধ্যান শীঘ্রই হইবে, কোনো ভয় নাই। যে ভগবানকে চিন্তা করে ঈশ্বরই তাহাকে ধ্যান করবার শক্তি ও সামর্থ্য দেন। সৎসঙ্গ, সংযম, সদ্বুদ্ধিও তিনি প্রেরণ করেন। তুমি ধ্যান করিতে বিরত হইও না। মনই সৎ-সঙ্গ, সদ্গুরুর কাজ করিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিবে। অবসরমতো তোমার পত্র পাইলেই উত্তর দিব। তুমিও সকল কথা নির্ভয়ে খুলে লিখিও, কোন ভয় ভাবনা নাই। যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী তাহাদের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম, ক্রোধ করবে কি? চিন্তা করবে আমরা ভগবৎ-দাস, বিশ্বনাথের সন্তান, মদনান্তক শূলপাণির ছেলে। তবেই দেখবে ঐ কাম-ক্রোধগুলো দেশছাড়া হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা।—

---

১ পত্রাবলী ঐ

রাম রম্ভা তিলোত্তমা যদি মন ছলে,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মন কভু নাহি টলে।

এই মহামন্ত্র সর্বদা আওড়াবে, সব শঙ্কা চলে যাবে।

যে রূপ তোমার ভাল লাগে তাহা হৃদয় মধ্যে বসাইয়া ধ্যান ক'রে যাও। একটু জোর ক'রে মশারীর মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিও। অভ্যাস হ'য়ে গেলে ধ্যান না ক'রে থাকিতে পারিবে না। উহাতে মজা পাইবে। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক ইহ'ই শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট আমার প্রার্থনা। ভগবান্ তোমায় রক্ষা করুন সর্বদা।"

..."এরই মধ্যে অত উতলা হচ্ছ কেন? ঠাকুর একটি গান গাইতেন—

"মন কর পণ প্রণাবধি, ত্যজ মান অপমান,
জ্যান্তে মর, সহজ মানুষ ধরবি যদি।"

দেখ, বাবা, যদি কোন কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে। নতুবা ঠাকুরের নাম নিয়ে আর কেবল হৈ-চৈ ক'রে এই মহামূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করা কি তোমার মতো আক্কেলবন্ত লোকের সাজে? যখন লেগেছ তখন নিশ্চয়ই ওটাকে পাকা ক'রে তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড নাই, চাষার ক্ষেত্রে জল আনার বিষয় কি বোক্। কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ যে জ্বলন্ত জীবন্ত ব্যাপার? ঐ উপদেশগুলো কি কেবল পুস্তকেই থাকবে না কাজে দেখাতে হবে? তোমাদের যে এক একটা আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই যে তোমাদের প্রভুর শিক্ষা। এসেছ যখন এ ঘরে, নাম যদি লিখিয়ে থাক এ খাতায়, তখন তো আর পেছুলে চলবে না চাঁদ? ঐ স্থানে বসে কেবল একমনে সর্বসিদ্ধিদাতা প্রভুকে ডেকে যাও, সব পাবে। সব পাবে কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই। দেখ্‌চ না, ভগবৎ-শক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সর্বদা বিদ্যমান। তাছাড়া শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজীর সম্বন্ধে তোমরা পড় নাই কি? কেমন ক'রে নিঃসম্বলে একা বন্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাজ ক'রে এলেন? এ কি সত্য না স্বপ্ন? তোমরা কি সেই মহাপুরুষের অনুসরণ কত্তে প্রস্তুত? নতুবা যাও, যেমন সহস্র সহস্র সাধু এই ভাবতে কেবল পেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যদি তোমার ও কাজ ভাল না লাগে যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহিত আমাদের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে।"

মঠের অতিথি-সৎকার, নবাগত ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সব কিছুর ভার লইয়া থাকিতেন প্রেমানন্দ স্বামী, তাই অনেকে বলিতেন,—এ যে মঠের মা।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে মঠবাড়ির বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া একখানি চেয়ারে তিনি অনেক সময় বসিয়া থাকিতেন। গঙ্গাবক্ষে কোনো নৌকা আসিতে দেখিলেই তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া গঙ্গার ঘাটের সোপানের উপর থাকিতেন অপেক্ষমাণ। নৌকা ঘাটে ভিড়িবামাত্র আরোহীদের বলিতেন, "দেখগো, ঠাকুরঘর বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা গঙ্গায় স্নান ক'রে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করো। তারপর ঠাকুরঘর খুললে দর্শন ক'রো।"

একথা বলার পর তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেন রান্নাঘরে। উনুনে আগুন দিয়া,

ছাড়িতে জল চাপাইয়া তবে তাঁহার কিছুটা স্বস্তি। ভক্তেরা ছুটিয়া আসিয়া বলিতেন, "মহারাজ, এ আপনি কি করছেন? আপনি ওপরে যান, আমরা খাবার তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

তিনি সহাস্যে বলিতেন, "আমার আর কি কাজ? এই ভক্তসেবাই আমার কাজ।"

ভক্তেরা জোর করিয়া রান্নার ভার নিয়া নিতেন, খিচুড়ি তৈরি করিয়া অতিথিদের খাওয়ানো হইত। সপ্তাহে চার পাঁচ দিন এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই অসময়ে আসিয়া-পড়া আগন্তুকদের বিরুদ্ধে প্রেমানন্দজীর কোনো নালিশ ছিল না, মুখমণ্ডলে ছিল না কোনো বিরক্তির ভাব।

মঠের নিত্যকার কর্ম ও প্রেমানন্দজীর মধুর সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করিয়া সত্যানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, "তখন প্রত্যহ সকালবেলা কুটনো কুটতে সবাইকেই প্রায় উপস্থিত হ'তে হ'ত। সে সময়ে তিনি নানাপ্রকারে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা ব'লে আমাদিগকে মুগ্ধ ক'রে রাখতেন। বাগানে তরিতরকারি আনার সময় সর্বদাই আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। সেই সময় আমাদের মঠের সামনে বহু জেলেদের নৌকা থাকতো। তিনি বাগান থেকে ডেঙো ডাঁটা কুমড়ার ডাঁটা এনে তাদের ডেকে ডেকে দিতেন, আর তারা প্রায়ই দু'একটা ক'রে ইলিশ মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য দিত। তিনি বলতেন, "আমরা আর কি দিই—এর পরিবর্তে দেখ, ইলিশ মাছ দিচ্ছে। সদ্ব্যবহারই সাধুর ভূষণ।"

মঠের নূতন কর্মী ও সাধকদের প্রেরণা দিতে এবং উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে প্রেমানন্দজীর জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন:

...সর্বদা মনে রেখে চলিও যে, তুমি প্রভুর সন্তান, তাঁর দাস। তোমার মধ্যে যেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা স্থান না পায়। সহ্য করাই যেন তোমার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন এই সহ্যগুণের এক অপূর্ব আদর্শ। ঠাকুর তাঁর সহিষ্ণুতার কত কথাই শুনিয়েছেন। শেষে কইতেন, 'শ, ষ, স—যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। তিনটে শ, ষ, স কেন জানিস? হে জীব, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর; আর না সইলে নাশ নিশ্চয়।' আমরা ঠাকুরের সংসারে শিখতে এসেছি এই—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

নারায়ণবোধে জীবের সেবা করতে আমাদের জন্ম; এই আমাদের সাধন, ভজন, ত্যাগ, তপস্যা। লোকের ভালমন্দ দেখবার আমাদের সময় কই? উহা আমাদের ধর্মবিকাশ।

সকলের সুবিধাজনক স্থান একটা চাই। দরিদ্র, দুর্বল, পতিত, মূর্খ—এদেরই আপনার ক'রে নিতে হবে। এও বলি—একদলকে ভালবাসতে গিয়ে অন্য বড় লোকদের ঘৃণা না করিয়া বসি। এদিকেও দৃষ্টি রাখবে। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হবে, বাবা—এই শ্রীশ্রীপ্রভুর ও বিবেকানন্দ স্বামীর শিক্ষা।

স্বামী স্থান দেখে যেতে তোমার ইচ্ছা, ইহার নাম দৃঢ় নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা না থাকলে মানুষ নিজের ও দেশের উন্নতি করতে পারে না। আমাদের দেশ কিরকম হবে জান? 'স্বদেশোভুবনত্রয়ম্।' এই একটা দেশ আমাদের নয়, সারা পৃথিবীই আমাদের দেশ, জানতে হবে। সমস্ত জীবের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, কাজ করতে হবে। 'আমি' 'আমার'—অজ্ঞান, মোহ, ইহা দূর করা চাই। প্রভু তুমি, তোমার জগৎ, আমি তোমার একজন সেবক মাত্র। কথায় উদার নয়, কাজে দেখাতে হবে। আবার ঠাকুরের পাতকো কাটার নিষ্ঠা চাই—এক জায়গায়।

তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও—ইহা আমার অন্তরের প্রার্থনা জানবে। আধা ক'রে ছাড়া ভাল নয়। তোমাদের দেখে লোকে অবাক্ হয়ে থাকবে না? না হ'লে ঠাকুরের নাম গ্রহণের বিশেষত্ব কি? যখন ভয় পাবে তখন ঠাকুরকে প্রাণভরে ডাকবে, তিনিই দয়া ক'রে শক্তি ভক্তি সাহস ও বল দিবেন।

নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা ছিল অপরিসীম। বেলুড়মঠে নিধিরা নামে এক পুরাতন ভৃত্য ছিল। গরু বাছুরের দেখা-শোনার ভার ছিল তাহার উপর।

স ধু উমানন্দ লক্ষ্য করিলেন, নিধিরা দুধ দুইবার পর ঘটিতে অনেকটা জল ঢালিয়া দিল। উদ্দেশ্য ঐ পরিমাণ দুধ সে চুরি করিবে।

স্বামী উমানন্দ তো মহাক্রুদ্ধ। পায়ের জুতা খুলিয়া অপরাধীকে তিনি মারিয়া বসিলেন। তারপর নিধিরাকে উপস্থিত করা হইল প্রেমানন্দজীর সম্মুখে। উমানন্দ চাহেন তখনি এ ভৃত্যকে বিদায় দেওয়া হোক্।

মহারাজ তখন বলিলেন, "শুনলুম, তুই তো ওকে জুতো দিয়ে মেরেছিস্, তাতে শাস্তি হয় নি? এ এতদিন মঠে আছে, ওকে এখন চাকরি হ'তে সরিয়ে দিলে ওর বাচ্চা-কাচ্চারা না খেয়ে মরবে। এ কথা একবারও ভেবেছিস? মানুষ তো আর সাধু হ'তে এবং তোদের এখানে চাকরি করতে আসবে না। যা—নিধিরাকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

নিধিরাকে মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "দুধে জল মিশিয়েছিস্?"

'হাঁ, মিশিয়েছি' বলিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের পায়ে পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন, "যা, আর কোনো দিন এরূপ কাজ করবি না,—আজ ক্ষমা ক'রলাম।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একদিন প্রেমানন্দকে বলিলেন, "বাবুরামদা—তোমার পায়খানা-গুলি এমন নোংরা হয়েছে যে, আর যাওয়া চলে না। একটা ধাঙড়কে ডাকিয়ে এগুলি পরিষ্কার ক'রে ফেলাও।"

প্রেমানন্দ উত্তরে কহিলেন, "ভাই, শীঘ্রই করিয়ে দেব।"

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে ধাঙড়কে আর পাওয়া গেল না। অতঃপর একদিন দেখা গেল স্বামী প্রেমানন্দ নিজেই গামছা পরিয়া চুনের বালতি ও পোঁচড়া হাতে নিয়া

পায়খানার দিকে যাইতেছেন। একজন নবীন সাধু তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে এগুলি লইতে গেলে তিনি বলিলেন, "ওরে, এসবই ঠাকুরের কাজ। আচ্ছা তুই কর।" এইরূপ শত শত নিরভিমানতার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে রহিয়াছে।

এই নিরভিমানতা ও আত্মত্যাগ ও সহনশীলতার বাণী ছড়ানো রহিয়াছে প্রেমানন্দ মহারাজের লিখিত অজস্র পত্রে। এক ভক্ত কর্মীকে তিনি লিখিতেছেন

'লোক চালান কঠিন ব্যাপার। বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না হলে মুস্কিলে পড়িতে হয়, অভিমান অহঙ্কার এসে জোটে। কৌশল হচ্ছে আমিত্ব ভুলে তুমিত্ব প্রতিষ্ঠা। 'তুমি কর্তা, আমি অকর্তা'. ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু' এই সব প্রাণে ধারণা চাই। ভিতর বার ভালবাসার পূর্ণ করতে হবে। আমার ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন—আমাদের সবাইকেই তাই। অন্তর্বহিঃ ভালবাসা। গালাগাল মন্দও ঐ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। প্রভু আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি, ধূলির একটু কম বেশী মাত্র। মঠে কোনও অশান্তি বা অমঙ্গল হলে সাক্ষাৎ শিব স্বামীজী আমায় গালাগাল দিতেন, কত মন্দ বলতেন। কিন্তু সে ভালবাসার অন্ত নাই, পার নাই, সীমা নাই। তখন ভাবতুম, কেন আমায় মন্দ বলেন আমার কি দোষ? এখন দেখছি স্বামীজী ঠিকই বলতেন, আমিই সকল দোষের মূল। এই দুষ্ট 'আমি'কে দূর করা চাই। নইলে নিস্তার নাই, কল্যাণ নাই। তারপর দেখছি আমার দোষগুলো অনেক আপনা আপনি বেশ নকল করতে শিখেছে, কিন্তু ভেতরটা দেখতে চেষ্টাই করে না আর করবেই বা কি। একটা দোষের পুঁটুলি বই আর কি আছে আমার ভিতর, তাই তোরাও ঐ রকম হচ্ছিস্। যারা ঠাকুরের নাম করবে—তাদের জগৎজয়ী হতে হবে—আপনাকে প্রভুর পায়ে সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় করতে হবে।

আশ্রমে যদি কোনো গোল বাধে, জানিস সে সব তোমার ও আমার দোষ। সব অপরাধ 'আমার' স্বামীজীর এই মত। চাঁদ, তুমি ভাল হও, আরও ভাল হও। আপন আপন দোষগুলি শুধরাতে চেষ্টা করো। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদ, প্রার্থনা করো। প্রভো! দয়া ক'রে গাদগুলো ময়লা মাটিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দাও। অন্য উপায় নাই। ওখানে যদি কোনো অশান্তি আনয়ন করো সে দোষ তোমার জানবে। কি জন্য এ সাজ পরেছো মনে মনে সর্বদা বিচার করিও। পাগলামি ছেড়ে দাও কিংবা ভগবানের নামে পাগল হও। খুলে যাক তোমার দিব্য দৃষ্টি প্রভুর দয়ায়। ভালবেসে সকলকে কিনে ফেল—এই হচ্ছে জ্ঞান, এই হচ্ছে ভক্তি বৈরাগ্য। তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁয়ে সেবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিপূজা উপলক্ষে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্থানীয় ভক্তেরা প্রেমানন্দজীকে সেখানে নিয়া গিয়াছেন। সহস্র সহস্র ভক্ত সেখানে জড়ো হইয়াছেন। কিন্তু প্রসাদ পাইবার ঢালাও ব্যবস্থা উদ্যোক্তরা করেন নাই। দর্শনার্থীরা নিজ নিজ ব্যয়ে ভোজন করিবেন ও উৎসবের আনন্দে অংশ গ্রহণ করিবেন। প্রেমানন্দজীর ইহা ভাল লাগিল না, অন্তরঙ্গ ভক্ত দীনদুকে কহিলেন, "কারু সঙ্গে হয়তো আধ পয়সাও থাকবে না, এরা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব দেখতে এসে

এমনি ফিরে যাবে? হ্যাঁরে, যারা ভোগ দিয়ে খেতে পারবে না, কেউ কি তাদের খাওয়াবার ভার নেয় নি?"

"পাছে সমবেত ভক্তগণের কোনো অসুবিধা হয়, কেহ অভুক্ত থাকে, এই চিন্তায় প্রেমিক মহাপুরুষ অধীর হইয়া পড়িলেন, মনে হইল তাঁহার যেন আহারে প্রবৃত্তি নাই। আহার প্রস্তুত, আসনে উপবেশন করিবেন তখনও এই কথাই বার বার বলিতেছিলেন। এমন সময় একজন সেবক আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইজন ধনী ব্যবসায়ী উৎসবে সমাগত সকলকে যথাশক্তি সেবা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ যেন আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখে সরল হাসি দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "যা, বেশ হয়েছে সকলে জয়ধ্বনি দিগে যা।"

প্রেমানন্দ মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া একবার উত্তরবঙ্গ মালদহের ভক্তেরা বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিলেন। মালদহের প্রসিদ্ধ ফজলী আম তখনো তেমন লাগে নাই। উৎসব শেষে মহারাজ বালক ভক্তদের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া উদ্যোক্তাদের কহিলেন, "ঠাকুরের নামে উৎসব করতে এরা মালদহ এসেছে, আর আম খেয়ে যাবে না এ কেমন কথা।"

এক স্থানীয় ভক্ত বলিলেন "এখনও এখানকার আমের সীজন হয় নি।"

মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "তা কি জানি, বাবু, কিন্তু এরা দেশে গেলে যখন এদের খেলার সাথীরা বলবে—মালদহে গিয়ে কেমন আম খেলি? তখন এরা কি বলবে? আম ছাড়া মালদহের উৎসব, তাও আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে সে কেমন হবে?"

আম ছাড়া উৎসব যেন প্রেমানন্দ স্বামীজীর ভাল লাগিতেছিল না। প্রতাপচন্দ্র শেঠ সেখানকার একজন বিরাট ধনী ও বহু বড় বড় আমবাগানের মালিক। উৎসবের সময় মহারাজকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া পড়িলেন। মহারাজ সস্নেহে শেঠজীর পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার উঠালেন ছেলেদের আম খাওয়ানোর কথা।

শেঠজী চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, "শেঠজীর পেটে যা হাত বুলিয়েছি দেখবি আম এল বলে—ঝুড়ি ঝুড়ি আম আসবে।"

তাহাই কিন্তু ঘটিতে দেখা গেল। অন্যান্য আমবাগানের মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া শেঠজী পাকা আম সংগ্রহ করিবার ভার দিলেন। ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি আম চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। সকলেই ইচ্ছামতো মত্ত হইল রসনা তর্পণে।

উৎসব শেষে একদিন মহারাজ শেঠজীকে বলিলেন, "শেঠজী, ছেলেদিগকে নিজের হাতে আম পেড়ে খেতে না দেখলে কি আনন্দ হয়? কাছে কি আপনার বাগান নেই?"

শেঠজীর আঁবুয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে একটি অতিবৃহৎ আম বাগান ছিল। ঐ বাগানে বৃন্দাবনী ও অন্যান্য ভাল ভাল আমের গাছ ছিল। শেঠজী মহারাজের মন-রঞ্জনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বিকালবেলা বাবুরাম মহারাজ [illegible]

অভ্যাগতদের শতাধিক লোক সঙ্গে লইয়া শেঠজীর আমবাগানে গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া সকলেরই বিপুল আনন্দ হইল। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গীর সকলকে মহাবীরের মতো আম পাড়িয়া খাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সকলেই ইচ্ছামতো আম খাইতে লাগিল। মহারাজের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও নিজহাতে ছাতা দিয়া গাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া ছেলেদের আম পাড়িয়া লইতে বলিলেন।

শেঠজীও আনন্দে বিভোর হইয়া 'যে যত খেতে পারেন নিতে পারেন নিন' বলিয়া আরও আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত আমোৎসব চলিল[১]।

ভক্ত জীতেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "মহারাজ আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুই কি ডাবল্যুট্ হয়ে যেতে পেরেছিস?' তিনি যে প্রেমে ঠাকুরের সহিত একেবারে ডাবল্যুট্ হইয়া গিয়াছিলেন, একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তিনি তাঁহার 'অহং'টাকে মারিয়া ফেলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে যে এক হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রতিটি হাবভাব হইতে বুঝিতে পারা যাইত। তিনি সর্বদা 'নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ'— এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন।

...সমস্ত দিন উৎসবের নানা বিষয় তত্ত্বাবধান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মহারাজ একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ভাবে লাল হইয়া গিয়াছে এবং এক দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল, জানালা দিয়া বহু লোকে একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছিল। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপর হইতে 'হরি ভাই'কে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ডাকিয়া আনিতে বলিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিচের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আপনি কেবল উপরেই থাকতে চান, মাঝে মাঝে নিচে নেমে আমাদিগকে দয়া করিতে হবে।"

হরি মহারাজ বলিলেন, "আমরা কখনও উপরে আবার কখনও নিচে থাকি, কিন্তু তুমি তো নিচ-উপরের পার হইয়া গিয়াছ।"

"মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দার পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। আমি একাকী সেই সময়ে সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাবুরাম মহারাজকে বলিতেছেন, 'তোমার এখনও একটু 'ইয়ে' আছে।' এই কথা বলিয়াই রাজা মহারাজ উপর তলায় উঠিয়া গেলেন।

ব্রহ্মানন্দজী উঠিয়া যাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে শুনাইয়াই বেশ জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমি সিদ্ধের সিদ্ধ, আমি নিত্যসিদ্ধ। আমি স্বামীজীর চেলা, স্বামীজীই আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঠাকুরের কথা শুনাতে বলেছে।" বুঝিলাম ঠাকুরের প্রচার সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁহাদের মধ্যে হইতেছিল। ঠাকুরের লীলা ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার একটা ভাব বাবুরাম মহারাজের মধ্যে ছিল। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া কত লোক যে ভক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

---

১ স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম।

ভক্ত জীতেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় প্রেমানন্দ মহারাজের নিজস্ব সিদ্ধি ও আত্মস্বীকৃতির এক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। আমাদের মধ্যে একজন (প্রকাশবাবু) দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে ধমক দিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তদানুসারে তিনি ও আমি ১৯১৪ সনের ৺পূজার পরে একদিনেই শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করি। ঐ বৎসরই হউক বা তাহার পরে একদিন বিকালবেলা আমি বেলুড়মঠে গিয়াছি। বাবুরাম মহারাজ উপর তলার বারান্দায় ছিলেন। আমি গঙ্গার উপর দিয়া মঠের বাড়িতে ঢুকিতেছি—বাবুরাম মহারাজ উপর হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রসাদ নিয়ে যেও।'

আমি ভিতরে গিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যে ঘরে থাকে সেখান হইতে প্রসাদ ধারণ করিয়া উপরে বাবুরাম মহারাজের নিকট গেলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রসাদ নিয়েছ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়েছি।'

তিনি তখন একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'ইহাকে প্রসাদ দাও।' জানিলাম উহা বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ। এইভাবে তিনি নিজের প্রসাদ আর কোনো দিন আমাকে খাইতে দেন নাই।

প্রসাদ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যিনি ঠাকুরের ভিতর ছিলেন, যিনি স্বামীজীর ভিতর ছিলেন, তিনিই এর ভিতর (অর্থাৎ তাঁহার নিজের ভিতর) আছেন।" এই প্রকার কথা তাঁহার মুখ হইতে পূর্বে আর কখনও শুনি নাই।

কালাজ্বরের আক্রমণে প্রেমানন্দজীর শরীর ভগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। মঠের গুরুভাইরা শরীর সারানোর জন্য তাঁহাকে দেওঘরে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে গেলেন স্বামী সত্যানন্দ এবং অপর দুইটি সেবক। স্বামী সত্যানন্দ এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন:

"দেওঘরে গিয়ে স্টেশনের গায়েই শচীনবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়িতে আমাদের স্থান হ'ল। ওখানে যাওয়ার পরদিনই বাবুরাম মহারাজ তাঁর জিনিসপত্র দেখতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর কোনো ট্রাঙ্ক বা সুটকেশ থাকত না। তাঁর ছিল একটা ক্যানভাস-এর ব্যাগ, তাতে লোহার একটা তালাচাবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। দেওঘর গিয়েই ব্যাগটা অত্যন্ত বড় হয়ে গিয়াছে দেখেই—আমায় বললেন, 'কি রে! ব্যাগটা আমার এত বড় হয়ে গেছে যে!' তাতে আমি বললুম, শৌরেনবাবু ছ'টা আদ্দির ফতুয়া, ছ'খানা কাপড় ও চারখানা গামছা দিয়েছে।"

তখন তিনি বললেন, "তুই আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে এ সব নিলি কেন?"

বললুম, 'আপনার কটা জিনিসপত্র থাকে, আমার তো জানা নাই।'

তখন তিনি বললেন, "দ্যাখ, তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সাধারণতঃ চারখান

ছ'হাতি কাপড়, চাবটা ফতুযা, দু'খানা গামছা ও একখানা গাযেব চাদব—এই ব্যাগে থাকবে। এব বেশী ব্যাগে বাখবি না। আব আমাব নাম ক'বে যদি ভক্তদেব কাবও কাছে কোনো জিনিস বা টাকা পযসা চাস, তবে সেই মুহূর্তে তোকে আমাব এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। আমি এ-সব পছন্দ কবি না[১]।"

নিজেব শবীব প্রায বিধ্বস্ত, বেশীব ভাগ সমযেই শয্যাশাযী থাকেন, তবুও আগন্তুক, অতিথি বা ভক্তদেব সেবা পবিচর্যাব জন্য প্রেমানন্দজীব দুশ্চিন্তাব অবধি নাই। কলকাতাব ট্রেন আসিবাব সময হইলেই তাঁহাব সেবককে স্টেশনে পাঠাইযা দিতেন। কহিতেন, "দ্যাখ তো কোনো ভক্ত এলো কিনা। এলেই ডেকে নিযে আসবি। স্টেশন থেকে ফিবে এসে তোবা খাবি, একটা হাঁড়িতে গবম জল বসিযে বেখে যা, যদি কেউ এসে পড়ে তাব জন্য চাবটি চাল চাপিযে দিবি।"

বেলুড় আশ্রমে থাকাব সময অতিথি ভক্তদেব জন্য যেমন উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল, এখানেও ঠিক তেমনি।

মহাপুরুষ মহাবাজ সেদিন পীড়িত গুরুভাইকে দেখিতে দেওঘবে আসিযাছেন। একসময়ে বহস্যভবে কহিলেন, "বাবুবাম মহাবাজ, তুমি দেখছি এখানে হোটেল খুলে বসেছ।"

উত্তব হইল, "তাবকদা, বাবুবাম যতদিন থাকবে, তাব হোটেল সঙ্গেই থাকবে। আমি তো এজন্য কাবু কাছে আধ পযসা চাইনে। আমি দেখি, ঠাকুবই আনেন, ঠাকুবই খান, ঠাকুবই খাওযান। আমি তো দেখছি, ভক্ত ভগবান্, ভাগবত—একে তিন, তিনে এক। যদি এ ব্যাটাদেবও এরূপ গতিগতি হয তবে তো এবা ধন্য হযে যাবে।"

রুগ্ন প্রেমানন্দ মহাবাজকে ভাল ভাল ফল খাওযানোব জন্য ভক্ত বামকৃষ্ণ বোস তখন মহা ব্যস্ত। প্রাযই কলকাতা হইতে প্রচুব ফল মিষ্টি আনাইযা দিতেন। মহাবাজ একদিন তাঁহাকে চাপিযা ধবিলেন, কহিলেন, "তুমি যে সতীশকে হিসাব শুনাচ্ছিলে, তাতে আমাব মনে হচ্ছিল, বোজ আট দশ টাকাব ফল খাচ্ছি। আমি সাধু, এরূপ ফল খেলে আমাব প্রাণ বাঁচবে, এ কেউ বলতে পাবে? আমাব মনে হচ্ছিল, তুমি যেন আমাকে একদিন বিষ খাইযেছ। কাল হতে আমি ফল-টল আব খাব না। কোথায় আমবা গাছতলায থাকবো, তা না—এইসব।"

এ কথা শুনিয়া বামকৃষ্ণবাবু প্রেমানন্দজীব পাযে ধবিযা কাঁদিতে লাগিলেন।

মহাবাজ কাতবকণ্ঠে কহিলেন, "এখানে থেকে গবীবদেব অবস্থা দেখে আমাব প্রাণ বড্ড ব্যাকুল হযেছে। তুমি এদেব কিছু লোককে এক পেট ক'বে দই চিড়া খাওযাও আব একখানা ক'বে নতুন কাপড় দান কবো।"

বামকৃষ্ণ বোস তৎক্ষণাৎ শিবোধার্য কবিযা নিলেন মহাবাজেব এই নির্দেশ।

প্রেমানন্দ স্বামীব শবীব ক্রমেই খাবাপেব দিকে যাইতেছে। ভবানীপুব গদাধব আশ্রমেব প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ ঘোষ মহাশয তখন দেওঘবে। চিন্তিত হইযা তিনি একদিন দেওঘবেব সাধু বালানন্দ স্বামীকে নিযা আসিলেন প্রেমানন্দ মহারাজকে দেখানোব

১ স্বামী প্রেমানন্দ : শ্রীবামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম।

জন্য। বালানন্দজী জড়িবুটি ও দৈবী চিকিৎসা জানিতেন। প্রেমানন্দ স্বামীকে পরীক্ষা করার পর তিনি কহিলেন, "মহাত্মা। সাধুর যদি শরীরের দিকে আকর্ষণ না থাকে তা'হলে শরীর কখনো থাকে না। আপনি দয়া ক'রে এ শরীরটার উপর একটু নজর দিলেই এটা সেরে যাবে।'

শান্তস্বরে প্রেমানন্দ বলিলেন, "দেখুন, আর এই শরীরটার উপর এখন একেবারেই মমতা নেই। আমার এ শরীরটাকে যেন একটা পচা কুমড়োর মতো মনে হচ্ছে। এটার কথা ভাবলেই যেন গা ঘিনঘিন করে, ওর দিকে কিছুতেই মন দিতে পারি না।"

বিদায় নিবার কালে বালানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সেবকদের বলিয়া গেলেন "এ শরীর থাকবে না—শীঘ্রই যাবে।" মহারাজকে কোনো দৈবী ঔষধাদি আর তিনি দিলেন না।

পূর্ববাংলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার করিতে গিয়া প্রেমানন্দ স্বামীকে অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং সেখানকার জলো আবহাওয়ায় কালাজ্বরে তিনি আক্রান্ত হন। এই রোগের আক্রমণে ভুগিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে এবং শেষ পর্যায়ে তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে আনিয়া রাখা হয়। এখানে আসার পর হঠাৎ তিনি আক্রান্ত হন মারাত্মক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জায়।

এবার তাঁহাকে কলকাতায় বলরাম বসুর ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু এখানকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় কোনো ফলোদয় হওয়া দূরে থাকুক, রোগের তীব্রতা দ্রুত বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে সংকট শেষ পর্যায়ে আসিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেলুড়মঠ হইতে ছুটিয়া উপস্থিত হন প্রেমানন্দজীর শয্যার পাশে। গুরুভাই ও ভক্ত শিষ্যদের চোখের জলে ভাসাইয়া, প্রেমভক্তি-সিদ্ধ রামকৃষ্ণের প্রেমানন্দজী চিরতরে ত্যাগ করেন এই মরধাম।

রামদাস বাবাজী

ফরিদপুরের অখ্যাত অজ্ঞাত কিশোর রাধিকারঞ্জনের জীবনে হঠাৎ একদিন লাগে ত্যাগবৈরাগ্যের হাওয়া, অবলীলায় ঘরসংসার ত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়েন বৈষ্ণবীয় সাধনার পথে। পরম সৌভাগ্যবান্ ছিলেন রাধিকারঞ্জন, তাই আত্মকৃপা, গুরুকৃপা ও ঈশ্বরকৃপার বিরল সম্মিলন দেখা যায় তাঁহার জীবনে, সিদ্ধ মহাত্মা রামদাস বাবাজীরূপে ঘটে তাঁহার পরম অভ্যুদয়।

'অন্তরে রস আস্বাদন ও বাহিরে জীব উদ্ধারণ' এই কল্যাণময় ব্রতটি উদ্‌যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন বাবাজী মহারাজ। এ সংকল্প তাঁহার পূর্ণ হয়, অগণিত নরনারী তাঁহার প্রেমভক্তির রসে হয় অভিসিঞ্চিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর শহরের নীলটুলি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে রামদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত, মাতা—সত্যভামা দেবী।

এক পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া দুর্গাচরণ ও তাঁহার স্ত্রী বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন বাস করেন। তাপিত চিত্ত ক্রমে শীতল হয়। গৃহে ফিরিবার পরের বৎসর যে পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হয়, বৃন্দাবনের পুণ্যময় স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য পিতা মাতা তাহার নাম রাখেন রাধিকারঞ্জন।

বাল্যকাল হইতেই রাধিকার জীবনে নানা সদ্‌গুণ পরিস্ফুট হইতে থাকে। পরোপকার এবং ঈশ্বরভক্তি ছিল তাঁহার সহজাত। সুকণ্ঠ ও সুরজ্ঞ ছিলেন তিনি, তেমনি ছিলেন সুদক্ষ আঁতাই—যাত্রা বা বাউলের দলে যে কোনো ভক্তিসংগীত শুনিলে তৎক্ষণাৎ সেই সুরে লয়ে সে গান গাহিয়া শুনাইতে পারিতেন।

স্কুলের লেখাপড়ায় রাধিকার কোনোদিনই তেমন মনোযোগ দেখা যায় নাই, অথচ ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু স্কুলের বিদ্যা তাঁহার বেশাদূর অগ্রসর হয় নাই, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর তাহাতে ছেদ পড়িয়া যায়।

রাধিকার বালকজীবনের এক বড় সৌভাগ্য, পূতচরিত তরুণ ভক্ত-সাধক জগদ্বন্ধুর বন্ধুত্ব লাভ। জগদ্বন্ধু ফরিদপুরেরই লোক, বয়সে তিনি রাধিকা হইতে কয়েক বৎসরের বড়। কিন্তু এই বয়সেই ব্রজরস সাধনার ধারা তাঁহার জীবনে বহিতে শুরু করিয়াছে, কীর্তন ও ধ্যান মননের মধ্য দিয়া প্রচুর অধ্যাত্মশক্তি তিনি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। শুভ সংস্কারযুক্ত বালক রাধিকারঞ্জনকে জগদ্বন্ধু প্রগাঢ় স্নেহে আবদ্ধ করিলেন, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে শুরু করিলেন তাঁহার জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ।

রাধিকার বাড়ির লোকদের মোটেই পছন্দ নয় যে হরিনাম-পাগল জগদ্বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সে মেলামেশা করে। তাই উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আলাপ পরিচয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই জগদ্বন্ধু একদিন উপদেশ দিলেন রাধিকাকে, "দ্যাখ্, মানুষ কেবল কথা শেখে তাতে কি হবে ? নিজের জীবনে সেসব কথার আচরণ চাই। আর সেই কথার আদর্শ দিয়ে জীবনকে গঠন করা চাই, না হলে সেসব কথা শুধু কথার কথাই হবে, তার কথায় প্রাণ থাকবে না। তার কথা কেউ শুনবে না। মরা কথায় কি কারো চৈতন্য হয় ? জীবন্ত কথা চাই। জীবন্ত কথা কইতে হলে নিজেকে জীবন্ত হতে হয়। প্রাণ থাকলেই জীবন্ত হয় না। ও তো বায়ুর নড়াচড়া। শোন! আগে দেহ মন বাক্যের সংযম চাই। সংযম পবিত্রতা থাকলেই হরিভক্তি থাকবে। জীবনটাই হবে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ, দয়ায় ভরা। এর আগে তোকে প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা বলেছিলাম ঐজন্যে। তাঁদের জীবনে এগুলি সবই ছিল।"

সাধনজীবনে সংযম যেমন চাই, তেমনি চাই ঈশ্বরের জন্য ভক্তি, প্রেম, ধ্যান মনন। তাই আর একদিন জগদ্বন্ধু কহিলেন, "দ্যাখ্, তুই সকাল সন্ধ্যায় অন্তত এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা ক'রে ধ্যান করবি। নিজের ও অপরের জন্য রোজ সকালে সন্ধ্যায় শ্রীহরির স্মরণ করবি। সব বিঘ্ন তোর দূর হয়ে যাবে।"

ফরিদপুরের উপান্তে বাসকারী বুনো ও সাঁওতালেরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত এবং নির্যাতিত। এসময়ে মিঃ মিডি নামে এক খৃষ্টান পাদরী তাহাদের ধর্মান্তরিত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরও এবিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ, ঐ পাদরীকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

অন্ত্যজ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের খৃষ্টান করার এই প্রয়াসের কথা শুনিয়া জগদ্বন্ধু চঞ্চল হইয়া উঠেন। অশিক্ষিত বুনো ও সাঁওতালদের হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে রাখার জন্য তিনি তৎপর হন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শহরে এক বিরাট কীর্তন দল গঠিত হয়। নিম্নবর্ণের লোকেরা যেদিন খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইবে, সেইদিনই পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী হিন্দুসমাজের সর্ববর্ণের সমন্বয়ে এক কীর্তন বাহিনী সভম্বরে শহর পরিক্রমা করিতে শুরু করে।

সেদিনকার এই কীর্তন উৎসব শত শত বুনো সাঁওতালের মতি গতি ঘুরাইয়া দেয়। পঞ্চমবর্ণের হিন্দু হিসাবে তাহারা স্থান পরিগ্রহ করে হিন্দুসমাজে।

পাদরী মিডি সাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার মূলে ছিলেন তরুণ সাধক জগদ্বন্ধু, আর রাধিকারঞ্জন ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক। এই দিনের কীর্তনে রাধিকার ধর্ম-জীবনের একটা প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা সকলের চোখে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সারা প্রাণ-মন দিয়া কীর্তন অনুষ্ঠান করার পর কিশোর রাধিকার মনও আনন্দে তৃপ্তিতে হয় ভরপুর। তাছাড়া জগদ্বন্ধুর সহকারীরূপে এই কল্যাণকর উৎসব সম্পন্ন করায় বৃদ্ধি পায় তাহার আত্মপ্রত্যয়।

রাধিকার বাড়ির লোকেরা কিন্তু তাঁহার এ কাজে সেদিন মোটেই খুশী হইতে পারে নাই। পরদিন তাঁহার দাদা মায়ের কাছে ভ্রাতার পাগলামির বিবরণ দিয়া শ্লেষের স্বরে বলেন, "মা, শুনলে তো তোমার গুণধর পুত্রের কীর্তি। লোকে এবার অপমান

মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। বলছে—বাউল বৈষ্ণবের দল ক'রে রাধিকা রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে। উনি এবার পতিত উদ্ধারের কাজে মেতেছেন। আমরা তো আগেই বলেছিলাম, ওকে এখান থেকে না সরালে ভবিষ্যতে একটা খ্যাপা বাউলের দল ক'রে বসবে। এই হতচ্ছাড়া জগদ্বন্ধুটার সঙ্গে মিশেই তোমার রাধিকা গোল্লায় যেতে বসেছে।"

বরিশালের স্কুলে এবং তারপর ব্রাহ্মণকান্দার এক টোলে রাধিকারঞ্জন কিছুদিন পড়াশুনা করিলেন। মেধা ও বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্ট, কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা ও পাঠ ক্রমের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকার মতো ছেলে তিনি নন। কতকটা নিজের জন্মগত শুভ সংস্কার আর কতকটা জগদ্বন্ধুর ভাগবত জীবনের প্রভাব তাঁহাকে সংসার সম্পর্কে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে জগদ্বন্ধুর সঙ্গে একবার তিনি পাবনায় যান। দুই বন্ধুই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা এবং কীর্তন গাহিতে পরম উৎসাহী। কয়েকটা দিন সেখানে ভজন ও কীর্তনে অতিবাহিত হয়। পাবনায় প্রবীণ বৈষ্ণব দীনবন্ধু দাস বাবাজী এবং সিদ্ধ হারাণ ঠাকুরের সঙ্গে জগদ্বন্ধুর মাধ্যমে রাধিকা পরিচিত হন। এই দুই মহাপুরুষকে তাঁহার সংগীত শুনাইয়া তিনি আনন্দ দেন, লাভ করেন তাঁহাদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

দীনবন্ধু বাবাজীই হঠাৎ একদিন রাধিকারঞ্জনের নব নামকরণ করেন, রামদাস। সিদ্ধ বৈষ্ণবের প্রদত্ত এই নামেই জগদ্বন্ধু রাধিকাকে অভিহিত করিতে থাকেন এবং এই রামদাস নামেই সাধক ও ভক্তসমাজে ধীরে ধীরে রাধিকারঞ্জন সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

জগদ্বন্ধুর সঙ্গীরূপে রামদাস একবার নবদ্বীপ দর্শনে যান। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর। এই সুযোগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণানন্দ স্বামী এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাধকের সঙ্গে রামদাস পরিচিত হন, তাঁহার কীর্তনের মাধুর্য, আবেশ এবং আখর এই সব মহাত্মাদের আনন্দ বর্ধন করে, ইঁহাদের স্নেহ ও কৃপায় রামদাস ধন্য হন।

পরের বৎসর, জগদ্বন্ধুর আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় রামদাস রওনা হন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ বৃন্দাবনধামের দিকে। তখন তিনি সতের বৎসরের তরুণ যুবা। হাতরাশ স্টেশনে পৌঁছানোর পর জগদ্বন্ধুর এক পত্র তিনি প্রাপ্ত হন। বৈরাগ্যময় জীবনের দিগ্‌নির্দেশ রহিয়াছে তাঁহার এই পত্রে ' প্রিয় রামদাস। তুমি একাকী বৃন্দাবনে যাবে। বৈরাগী একাকীই যায়, একাকীই আসা-যাওয়া করে। কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহাকেও অনুরোধ করে না, তার কাহারও সহিত বিরোধ হয় না। সে সর্বদা সহজ সত্যবস্তু উপলব্ধি করে। প্রভুর অনন্ত বিভূতি। তাহার মধ্যে ছয়টি প্রধান। বৈরাগ্য তাহাদের মুকুটমণি। তুমি সেই বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইয়াছ। সর্বদা নির্ভয়, সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে। মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিবে। কোথাও স্থূল ভিক্ষা করিও না। শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরেই প্রথম যাইও। যথা-সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে। আমার সহিতও যথাসময়ে তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ইতি—তোমার 'বন্ধু'।

মহাধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া রামদাসের আনন্দের আর সীমা নাই। ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এ সময়ে, নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত ভক্ত বৈষ্ণব আচার্যেরা এই মহাতীর্থে ভিড় করিয়াছেন। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া শ্রীবিগ্রহ এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন করিয়া রামদাস প্রাণমন সার্থক করিতে থাকেন।

ঝুলনযাত্রার পরে বৈষ্ণবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বহির্গত হন। রামদাসও তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া যান, আংশিকভাবে এ পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসেন বৃন্দাবনে। পরিক্রমার পথে গাঁঠুলীগ্রামে অবস্থান করার কালে রামদাস এক সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ বৈষ্ণবের মাধ্যমে অন্নপূর্ণার সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীকুণ্ড এবং প্রেম সরোবরে স্নান করার সময়ও তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠে রাধাকৃষ্ণের দিব্যলীলার অনুভূতি। এই অনুভূতির মাধুর্য তরঙ্গ সাধকের অন্তর রসায়িত করিয়া তোলে।

অতঃপর জগদ্বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হন শ্রীবৃন্দাবনে। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া রাধাবাগের ছত্রিশগড় কুঞ্জে অবস্থান করিতে থাকেন, বিগ্রহ দর্শন, লীলা অনুধ্যান ও কীর্তনানন্দের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দিন কাটিতে থাকে পরম আনন্দে।

কিছুদিন পরের কথা। যমুনার পুণ্যসলিলে অবগাহনের পর দুই বন্ধু পথ চলিতেছেন। এ সময়ে জগদ্বন্ধু রামদাসকে কহিলেন, "যা, মাধুকরী সেরে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে একাকী চলিয়া গেলেন কুঞ্জের দিকে।

"এত ভোরে মাধুকরী কোথায় পাবো"—রামদাস নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন নারী কণ্ঠের এক মধুর আহ্বান।

পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন বিশ পঁচিশ বৎসরের এক সুন্দরী তরুণী। সঙ্গে তাঁহার এক পরিচারিকা।

তরুণীটি ভক্তিভরে রামদাস বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, তারপর পরিচারিকার হাত হইতে একটি ঠোঙা নিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। কহিলেন, "বাবা কৃপা ক'রে আপনি এ প্রসাদটুকু নিন্।"

ঘটনার আকস্মিকতায় রামদাস কিছুটা বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। ঠোঙাটি হাতে নিয়া নীরবে তিনি চলিয়া আসিলেন শিক্ষাগুরু জগদ্বন্ধুর কাছে।

"তোর হাতে ওটা কিরে?" প্রশ্ন করেন জগদ্বন্ধু।

রামদাস ঠোঙাটি খুলিয়া দেখান। প্রচুর পুরি, কচুরি লাড্ডু ও ক্ষীরের পেঁড়া উহাতে রহিয়াছে। জগদ্বন্ধু এক কণিকা প্রসাদ হাত দিয়া তুলিয়া নিলেন, অর্ধেকটা নিজে গ্রহণ করিলেন, অপর অর্ধেক পুরিয়া দিলেন রামদাসের মুখে। তারপর নির্দেশ দিলেন, "এক্ষুনি যমুনায় চলে যা। যমুনাকে প্রণাম করবি, প্রসাদকে প্রণাম করবি, তারপর ঠোঙাটা জলে ফেলে দিয়ে আসবি।"

রামদাসের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। ভাবিতেছেন, "প্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু, চিন্ময়, তা জলে বিসর্জন দেবো হবে, এ কেমন কথা?"

অন্তর্যামী জগদ্বন্ধু তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "দ্যাখ, শ্রীমূর্তি আর প্রসাদ তো ভিন্ন বস্তু নয়। কিন্তু শ্রীমূর্তি তো বিশ্বের সর্বত্র আত্মগোপন

ক'রে রয়েছেন। ভক্তদের আগ্রহ অনুসারেই শ্রীবিগ্রহ নিজ স্বরূপ প্রকট করেন, তার সঙ্গে কথা কন। ভক্তের ভক্তি ও আগ্রহ না থাকলে শ্রীবিগ্রহ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। প্রসাদও তেমনি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করেন না। ভক্তস্থানেই প্রসাদ গ্রহণ করবি, শুধু মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলবি।"

কথাগুলি রামদাসের অন্তরে দিব্যভাবের অনুরণন তুলিয়া দিল, অতঃপর প্রসাদের ঠোঙাটি যমুনার ঢালিয়া দিয়া আসিলেন।

একদিন রামদাসকে সঙ্গে নিয়া জগদ্বন্ধু শ্রীগোবিন্দের আরতি দর্শন করিতে গিয়াছেন। মন্দিরে ঢুকিবার সময় কহিলেন, "দেখিস কোনো স্ত্রীলোক যেন আমার শরীর না ছোঁয়। খুব সাবধানে আমায় রাখবি।"

আরতির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মৃদঙ্গ করতাল ও ঝাঁঝের ঐকতান। দলে দলে ভক্ত নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়ায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে। রামদাস ভাবতন্ময় হইয়া প্রভুজীর আরতি দর্শন করিতেছেন, অন্য কোনো দিকে তাঁহার হুঁশ নাই।

কিছুকাল পরে জগদ্বন্ধু তাঁহাকে ভিড় হইতে বাহিরে টানিয়া আনিলে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এবার লক্ষ্য করিলেন, জগদ্বন্ধুর চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ। কুঞ্জে ফিরিয়া আসার পর বুঝা গেল এই যন্ত্রণার তীব্রতা। জগদ্বন্ধু গায়ের চাদরটি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আঃ জ্ব'ল গেল, জ্বলে গেল।"

"কি হলো তোমার?" এমন করছো কেন? হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করেন রামদাস।

"বললাম, স্ত্রীলোক যেন এ দেহ না ছোঁয়। তা তোর কি এদিকে কোন খেয়াল ছিল?"

রামদাস বুঝিলেন, জগদ্বন্ধুর কথার মর্ম না বুঝিয়া, সতর্ক না থাকিয়া, তিনি অন্যায় করিয়াছেন। পবিত্র আধারে কামনা-বাসনাযুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ ঘটিলে কি তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে—এ সত্যটি রামদাস সেদিন প্রত্যক্ষ করিলেন। দৃশ্যটি তাঁহার মনে চিরদিনের তরে অঙ্কিত হইয়া গেল।

নবীন বৈষ্ণব রামদাসের সাধন-প্রস্তুতির জন্য জগদ্বন্ধুর চেষ্টা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। তাঁহার নির্দেশে রামদাসের জপতপ কীর্তন সব কিছু কঠোরভা'র নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃচ্ছ্র সাধনের বিধিও কম পালন করিতে হয় নাই। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া যমুনা স্নান, দুই বেলা শিউলি পাতার রস (জগদ্বন্ধু ইহাকে বলিতেন সবুজ শরবত) রামদাসকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, সেই সঙ্গে স্বল্পাহার ও উপবাসের কড়াকড়ি তো ছিলই। তিনমাস একত্রে উভয়ে একই কুঞ্জে বাস করিয়াছেন এবং এই সময়ের মধ্যে অভিজ্ঞ ও উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধনভজনের অনেক কিছু রামদাসকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়াছেন।[১]

এসময়ে একাদিক্রমে প্রায় নয়মাস রামদাস ব্রজমণ্ডলে বাস করেন, এই নয়টি মাসে তিনি তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছেন, দর্শন করিয়াছেন বহুজনবন্দিত

১ চরিত মাধুরী, ২য় খণ্ড : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী

সিদ্ধ বাবাজীদের, আর সেই সঙ্গে আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিয়াছেন বৈষ্ণবদের বহুঈপ্সিত পরমমধুর ব্রজরস।

জগদ্বন্ধু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রিয় রামদাস তখনো বৃন্দাবনে। এবার তাহাকে এদিকে নিয়া আসা প্রয়োজন, তাই পাথেয় ও নির্দেশ পাঠাইতে বেশী দেরি হইল না। এসময়ে জগদ্বন্ধু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলিতেন, "বৃন্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি। ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছি। সেখানকার জল হাওয়ায় বেশ পুষ্ট হয়েছে, অল প্রুফ্ হয়ে গিয়েছে, শিগ্গীরই আসছে।"

কলকাতায় জগদ্বন্ধুর সহিত মিলিত হন রামদাস। জপতপ কীর্তন, নিত্যকার টহল ও বন্ধুর প্রেমময় সান্নিধ্য সব কিছুরই মধ্যে আনন্দ রহিয়াছে। কিন্তু তবুও রামদাসের অন্তর ভরিয়া উঠিতেছে না, চঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন পুণ্যধাম বৃন্দাবনে ফিরিবার জন্য।

তাঁহার এ মনোভাবটি জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। একদিন তিনি কহিলেন, "তুই তো ব্রজে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিস, তা বুঝছি। দ্যাখ্, নিজের খাওয়ার যোগাড় তো পশুপাখিরাও করে, যে দশজনকে খাইয়ে খায়, সেই তো খাঁটি মানুষ।" কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল অটল গাম্ভীর্যের মহিমা। রামদাসের অন্তরপটে শিক্ষাদাতা ও চির শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর এই বাণী প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিল চিরদিনের তরে। উত্তরকালে এই কল্যাণময় বাণীই তাঁহার সাধন-জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে ঈশ্বর নির্ধারিত পথে। নামাচার্য রামদাস, নামমূর্তি রামদাসরূপে ঘটাইয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

একুশ বৎসর অবধি তরুণ রামদাস জগদ্বন্ধুর শিক্ষায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ও নামমন্ত্রের প্রচারকরূপে গণ্য হন। বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে শত শত ভক্ত নরনারীর উপর তাঁহার আত্মিক প্রভাব বিস্তারিত হয়।

ইহার পরপর্যায়ে তাঁহার সাধনজীবন গড়িয়া উঠে শক্তিধর সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রাধারমণ চরণদাসজীর আশ্রয়ে। নামপ্রেম-দানের মধ্য দিয়া জীবোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন চরণদাসজী। নবাগত শিষ্য রামদাস বাবাজীর আগমনের পর হইতে তাঁহার এই দুরূহ ব্রত সহজ হইয়া পড়ে, রামদাসের অসামান্য কীর্তন প্রতিভা বাংলার দিকে দিকে নবতর প্রাণতরঙ্গ তুলিয়া দেয়, শত শত মানুষের জীবনকে ভক্তিপ্রেমের রসে উদ্বেল করিয়া তোলে।

কীর্তন-মূর্তি, মহানামের চারণ, রামদাস বাবাজীর কীর্তনবৈভব সম্পর্কে তাঁর এক শিষ্য লিখিয়াছেন, "কীর্তনকালীন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আখরগুলি কীর্তনের বিষয়বস্তুকে সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিত। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তার পরে কি ভাব প্রকাশ পাবে, তার জন্য সর্ব মনপ্রাণ এক ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করত। সে এক অপূর্ব আকর্ষণ। সহজ সুমধুর সুর অথচ তার কি অপূর্ব প্রাণশক্তি, যার একই চরণ তাঁর

মুখে বার বার শুনে মনে হত যেন নিত্যনূতন। এই নামকীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে নিতাই-চৈতন্য ও রাধা-কৃষ্ণের লীলাগুণ এমনি নিপুণভাবে পরিবেশিত হত যে, শ্রোতৃবৃন্দ নামের মহিমাকে সহজে উপলব্ধি করতে পারত! সুরে সুরে ভাববল্লরী ছন্দায়িত হয়ে উঠতো, আর সেই প্রেমময়েরই বাণী ঝংকৃত হত অগণিত ভক্তজনের মর্মস্থলে।

বাবাজী মহারাজ গৌরপরিকরগণের ও আচার্যগণের লীলানুধ্যানের মরম কথাই ব্যক্ত করেছেন প্রেমের অনাবিল ছন্দে। শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যের পদাঙ্কিত ভূমিতে পূর্বে যে সব লীলা হয়েছে, সেখানে নানা সময়ে উপস্থিত হয়ে সেই লীলাস্মৃতিকে জনচিত্তে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতেন যেজন্য বৈষ্ণবজগৎ তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে যুগ যুগ ধরে।

এই মহাবৈষ্ণবের আর একটি বিশেষ দান 'সূচক' কীর্তন। মহাপ্রভুর পার্ষদ ও তাঁর পরবর্তী আচার্যগণের তিরোধান তিথি উপলক্ষে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন ও তৎসহ সামান্য কিছু কীর্তন অনুষ্ঠানের হয়তো বা ব্যবস্থা ছিল, যার সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগই ছিল না। বাবাজী মহারাজ সেই সব তিরোধান তিথি ধরে তাঁদের জীবনলীলা ভাব ও সুরের ছন্দে পরিবেশন করতেন। এই কীর্তন 'সূচক কীর্তন' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছে। এই কীর্তন ব্যাপকভাবে প্রচার করেন বাবাজী মহারাজই। আবার এই সূচক কীর্তন গীত হওয়ার ক্রম, ভাব, ভাষা ও সুরের যে ছাঁচটি মানুষের মনের মূলে গিয়ে একটি রূপমাধুর্য লাভ করেছে, তাও তাঁর উদ্ভাবন।[১]

সিদ্ধ বৈষ্ণব, মহাপ্রেমিক আচার্য, চরণদাসজীর সঙ্গে যুক্ত হইবার পর হইতে রামদাসের জীবনে শুরু হয় এক নবতম অধ্যায়। চরণদাস বাবাজী বলিতেন,—"নাম আর নামী অভিন্ন—নামীকে মাটির মানুষের কাছে নামিয়ে আনো ভাই, তাঁর কৃপা-মাধুর্য বিতরণ করো বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু মানবের কাছে, নামের সদাব্রত খুলে দিয়ে জীবকে তরাও। এ যুগে এর চাইতে মহত্তর দান আর নেই।" এই কথাগুলি বৈরাগী নামপ্রেমী রামদাস বাবাজীর মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয়, নামপ্রেমের প্রচারকে সাধনার এক বিশেষ অঙ্গরূপে তিনি ধরিয়া নেন।

রামদাসকে আত্মসাৎ করার পর কয়েক বৎসর চরণদাসজী তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া নাম-প্রচারে মত্ত হন, এবং এই প্রচারের মাধ্যমে রামদাসের বৈরাগ্যের প্রস্তুতি আরো দৃঢ়তর হইয়া উঠে। চরণদাসজী নিজেকে কোনোদিন গুরুরূপে শিষ্যদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, করিয়াছেন দাদা-রূপে, নামপ্রেম সাধনপথের সতীর্থ ও সাথী-রূপে। গুরুর গুরুত্ব নিয়া চরণদাস কোনোদিনই শিষ্যদের হইতে নিজেকে দূরে রাখেন নাই, মর্যাদার উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট হইয়া উপর হইতে কথা বলেন নাই। ভক্ত শিষ্যদের কাছে আসিয়া তিনি তাঁহাদের হাত ধরিয়াছেন, প্রেমাশ্রুপ্লাবিত নয়নে, প্রেমকম্পিত দেহে, তাহাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের সাথী হইয়া মন্দিরে মন্দিরে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তনানন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। রামদাসকেও চরণদাসবাবাজী, এমনিভাবে

১ নামাচার্য রামদাস : সুশীলকুমার সেন।

বুকে টানিয়া নিয়াছেন, দাদারূপে মরমের মরমীরূপে, নামপ্রেম প্রচারের সাথীরূপে, তাঁহাকে নিয়া ঘুরিয়াছেন পথে পথে, শহরে ও জনপদে।

কীর্তন সফরে উভয়ে যখন বাহির হইতেন, কোথায় কোন্ অঞ্চল পরিক্রমা করিবেন, কোথায় কতদূরে গিয়া থাকিবেন তাহার কোনো স্থিরতা ছিল না। পথে আহারের কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। কীর্তনরসে উভয়ে প্রমত্ত হইয়া আছেন, আর অযাচক ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ঠাকুরের ভোগ সংগৃহীত হইতেছে। সঙ্গী কীর্তনকারী ভক্ত এবং অভ্যাগতদের সেবার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাই দিয়া চরণদাসজী ও রামদাসের উদরপূর্তি চলে। নিত্যকার টহলের পথে যে ভিক্ষা পাওয়া যাইত, পরের দিনের জন্য তাহার কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখার উপায় ছিল না।

এ সময়ে রামদাস বাবাজীর পরিধানে থাকিত শুধু একটি কৌপীন ও বহির্বাস, আর থলির মধ্যে—ইষ্টদেবের চিত্রপট, করতাল ও একখানা ভজনগ্রন্থ।

রামদাসের কীর্তন পরিক্রমার নিষ্ঠা ও ভাবাবেশ দেখিয়া, তাঁহার বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র-সাধন দেখিয়া গুরু চরণদাসজীর আনন্দের সীমা নাই।

ত্যাগী পরম সাত্ত্বিক রামদাসের দেহ ছিল শান্ত সুঠাম ও শ্যামল-শ্রীসম্পন্ন। তাঁহার মধুর কণ্ঠ, ভাবাবেগ ও আখর সৃষ্টির স্বভাবজাত শক্তির আকর্ষণও ছিল অতি প্রবল। যেখানে যখন তিনি যাইতেন, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে শত শত লোক তাঁহার চারিদিকে ভিড় জমাইয়া ফেলিত। এই জনপ্রিয়তা দর্শনে গুরু চরণদাস শিষ্যের বৈরাগ্য সাধনার পরীক্ষাকে আরো কঠোর করিয়া তুলিতেন। কিন্তু প্রতিবারের পরীক্ষায়ই রামদাস উত্তীর্ণ হইতেন সসম্মানে। এভাবে ক্রমে তিনি পরিণত হন নিখাদ সোনায়।

গুরুর সঙ্গে সেবার বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন বাস করেন রামদাস, তাঁহার কৃপায় সেখানকার কয়েকটি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন। ব্রজরস সাধনার নানা নিগূঢ় তত্ত্ব ইঁহাদের কৃপায় তিনি শিক্ষা করেন। রামদাসও তাঁহার কীর্তন ও আখরের মাধুর্যে মহাত্মাদের প্রাণমন ভরিয়া তোলেন।

গুরুর সঙ্গে রামদাস বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর চরণদাসজীর নির্দেশে এই কলিকাতা নগরীই হয় তাঁহার সাধনক্ষেত্র ও কর্মভূমি।

প্রেমপূরিত নয়নে চরণদাসজী প্রিয়তম শিষ্যকে একদিন বলেন, "ভাই রামদাস, রাধামাধবের কৃপায় যে নামকীর্তনের সুধা তোমার হৃদয় ও কণ্ঠ থেকে অবিরাম উদ্গত হচ্ছে, যা শুনে আমরা আনন্দে আত্মবিস্মৃত হচ্ছি, তা তুমি ছড়িয়ে দাও কলকাতার এই ঈশ্বরবিমুখ জনজীবনে। যে বস্তু তুমি পেয়েছো এবং পাচ্ছো, তা বিলিয়ে দাও পাষণ্ডীদের কল্যাণে, তবেই তো বুঝা যাবে তুমি প্রকৃত বৈষ্ণব কিনা। পরম বস্তু নিজে ভোগ না ক'রে যে অপরকে বিলায় সেই তো প্রকৃত বৈরাগী—প্রকৃত বৈষ্ণব।"

গুরুর এই কল্যাণময় বাণী শিরোধার্য করিয়া নেন রামদাস বাবাজী। নিজের বৈষ্ণবীয় সাধনার আদর্শ ও নামকীর্তনের ধারা এবার হইতে কলিকাতা ও তাহার আশে-পাশে অকৃপণ করে তিনি বিস্তারিত করিতে থাকেন।

রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্তন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার এক শিষ্য লিখিয়াছেন :

"কীর্তন সাধনার এমন একটি রূপ রামদাসজী এ যুগে তুলে ধরেছিলেন যা অননুকরণীয়। কেবল সুরসম্পদে বা কণ্ঠের কৌশলে সে রূপের মাধুর্য আস্বাদন করা যায় না। যেমন বাণীযন্ত্রের এমন একটি বিশেষ স্থিতিকে বাদক সুরে বাঁধে যে একটু এধার ওধার হলেই সে ঝঙ্কার আর ফুটে উঠে না, তেমনি সাধনরাজ্যের সিদ্ধির ক্ষেত্রে এমন একটি মাধুর্য স্তর আছে সেখানে না পৌঁছুলে প্রকৃত রসের সন্ধান মেলে না।

"কীর্তনের সুরধারার সঙ্গে তার নয়নের দু'কোণ বেয়ে যখন ঝরে পড়তো পুলকাশ্রুর ধারা, তখন কীর্তনের ভাষা জীবন্ত হয়ে জাগিয়ে তুলতো মানুষের হৃদয়ে অপূর্ব আলোড়ন। মনের মূলে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতো অখিলাত্ম দেবতার সংবেদনময় মূর্তি।

"শাস্ত্রে আছে, নববিধাভক্তির মধ্যে নামসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধনমার্গের কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুলে এ বস্তুটি কিভাবে মানুষের মর্মে মর্মে ছড়িয়ে পড়ে তা দেখবার সুযোগ বিংশশতাব্দীর যুগেও সম্ভব হয়েছে বাবাজী মহারাজের অমৃত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব কবি দেবকীনন্দন দাস এই শ্রেণীর কীর্তন পাগল, নামপ্রেমের উদ্গাতা মহাত্মাদের কথা উল্লেখ ক'রেই বলেছেন—(তাঁরা) জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে[1]।"

সে-বার চরণদাস বাবাজী মহারাজ একদল ভক্তসহ বরানগরে বাস করিতেছেন, সঙ্গে রয়েছে প্রিয় শিষ্য রামদাস। একদিন হঠাৎ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি প্রেমভরে রামদাসকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। দুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু। কিছুক্ষণ পরে এই আবিষ্ট অবস্থায়ই রামদাসকে বৈরাগীর বেশে তিনি সাজাইয়া দেন। তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন তুলসীতরুর একটি মৃত্তিকা-ভাণ্ড আর একটি বৈরাগীর যষ্টি। গুরু এভাবে সেদিন রামদাস বাবাজীকে বেশাশ্রয় দান করেন, উন্নীত করেন সর্বত্যাগী দীন-হীন এক কাঙাল বৈষ্ণব সাধকে।

মরধাম ত্যাগের দিন চরণদাস মহারাজ সস্নেহে রামদাস বাবাজীর হাতে তুলিয়া দেন তাঁহার নিজস্ব করতাল জোড়া। প্রেমাশ্রুপ্লাবিত নয়নে বলেন, "ভাই রামদাস, এ করতাল তোমার জন্য রইলো, জীবের দ্বারে দ্বারে যাবে, কেঁদে কেঁদে নাম শুনাবে তাদের। এই হবে তোমার জীবনের প্রধান কাজ।"

করতাল জোড়া বুকের মাঝে চাপিয়া ধরেন রামদাস বাবাজী। দরদর ধারে নির্গত হইতে থাকে নয়নবারি। সেই সঙ্গে নাম বিতরণের সংকল্পবাণী নূতন করিয়া উচ্চারণ করেন অস্ফুট স্বরে।

রামদাসজী সারা জীবন ঐ করতালের মধুসংলাপে কত যে জীবের জীবনমূলে নামামৃত রস দান ক'রে সঞ্জীবিত ক'রে তুললেন, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি কোনো সংঘ গড়লেন না, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন না। তাই তাঁর অনুগামীরা হলেন শুধু তাঁর নামেই পরিচিত। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার বা লীলাস্থলীর স্মারক মন্দির ভিন্ন কোনো নূতন

১ নামাচার্য রামদাস : সুশীলকুমার সেন

মঠ বা মন্দির তিনি নির্মাণ করান নি। আরও বড় কথা, চরণদাসজীর কঠোর আদেশ ছিল—নিজেকে বৈষ্ণব মনে করা। সে জন্য কোনো বৈষ্ণব পঙ্গতে প্রসাদ ভোজনের জন্য এক পঙ্ক্তিতে বসা তাঁহার নিষেধ ছিল। বরং ভক্তদের প্রসাদ পাইবার পর পর্যাভক্তদের মতো ভুক্তাবশেষ বৈষ্ণব অধরামৃত জ্ঞানে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর নির্দেশ। সেজন্য বৈষ্ণব সেবার কোনো আমন্ত্রণে বাবাজী মহারাজ ও তাঁর অনুগামীরা যেতেন না। আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করা হতো উক্তরূপ অধরামৃত গ্রহণ ক'রে। গুরুর আর একটি উপদেশ—আচণ্ডালে কৃষ্ণবান্ত করি, দণ্ডবৎ করিবেন বহুমানা করি।—এও রামদাসজী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে গিয়েছেন[১]।"

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও নিরভিমানতার সঙ্গে রামদাস বাবাজীর সাধনজীবনে মিলিত হইয়াছিল উদার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমন্বয়বোধ। বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের ইষ্ট ও মঠ মণ্ডলীকে যেমন তিনি সম্মান করিতেন তেমনি নতমস্তকে অভিবাদন জানাইতেন খৃষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মস্থানের প্রতি। এ প্রসঙ্গে বাবাজী মহারাজ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসীর মূল্যায়ন সকলেরই অনুধাবন যোগ্য

"রামদাস বাবাজী মহারাজ বক্তা নন, বাগ্মী নন, দুর্দান্ত রাজনৈতিক কর্মী নন, মনে হয় নিরীহ গোবেচারী, শুধু ভগবানকেই সার করেছেন। কিন্তু কি শক্তিই না অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এই নিরীহ লোকটির মধ্যে প্রবাহিত, যাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব কৃষ্টি আজ উচ্চশির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ সত্য কল্পনাবিলাসের সত্য নয়—এ ঐতিহাসিক সত্য। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ হয়েছে। সংকীর্তনের সময় রাজপথে বা পরিক্রমা পথে, মন্দির মসজিদের সম্মুখে, গীর্জা ও গুরুদ্বারের সম্মুখে আনত মস্তকে কিছুক্ষণ কীর্তন ক'রে তবে অগ্রসর হন। এতে এক অপূর্বতার সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীনভাবে সকলের চিত্তে প্রকটলীলার স্ফূর্তি হয়। সকল স্থানেই তিনি অনন্ত ভাবময় পরমপুরুষের উপলব্ধি করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও তিনি পরম ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর অনুগামী কয়েকজন ভিন্ন আর কয়জনের জীবনে এরূপ উদার সমন্বয় ভাব প্রকটিত হয়েছে তা জানি না[২]।"

বাবাজী মহারাজের তাত্ত্বিক দৃষ্টির উদারতার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ স্থাপনার বিতর্কে। হাওড়ার নদের নিমাই মন্দিরে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু বৈষ্ণব আচার্য ইহার বিরোধিতা করেন, তাঁহারা বলেন পূর্বসূরী বা পূর্ব আচার্যেরা এই মূর্তিতে পূজার বিধান দেন নাই। বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ বৈষ্ণব, স্বচ্ছ তাত্ত্বিক দৃষ্টির অধিকারী। তিনি তাঁর কীর্তন সভার কীর্তনের মাধ্যমে বাসুদেব সার্বভৌমের সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করিলেন '

> শ্রীকৃষ্ণ শচীসুত গুণধাম।
> আমার এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম।

---

১ নামাচার্য রামদাস

২ নামাচার্য রামদাস

এ ভাবে সন্ন্যাসী গৌর মূর্তির ভজন পূজন সমর্থন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবনে তিনি এক দূরপ্রসরী শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া যান।

রামদাস বাবাজী মহাশয় তখন কলকাতা এবং উত্তর শহরতলির নানা অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য, সাধননিষ্ঠা ও কীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া একদল ভক্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাবাজীর কোনো স্থায়ী মঠ নাই, ফলে ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গ সব সময়ে করিতে পারেন না, তিনি কখন কোথায় থাকেন সে সংবাদও অনেক সময় পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য সাময়িকভাবে দর্মাহাটায় একটি বাড়ি তাঁহারা ভাড়া করেন এবং এটি বাবাজী মহাশয়ের অবস্থান-কেন্দ্র রূপে গণ্য হয়।

একদল ভক্ত একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেন এবং এজন্য জমির সন্ধানও শুরু হয়। এসংবাদ জানিতে পারিয়া রামদাস বাবাজী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের বলিয়া দেন, "দ্যাখো, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা নয় কোনো নূতন মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। কাজে কাজেই তোমাদের টাকা দিয়ে কোনো ভাঙা মন্দির বা মহাপ্রভুর প্রাচীন লীলাস্থলের সংস্কার সাধন করা যায় কিনা, তাই করো।"

ভক্তেরা একথায় কিছুটা দমিয়া গেলেন বটে কিন্তু একেবারে নিরস্ত হইলেন না।

অমিয় নিমাই চরিত প্রণেতা, অমৃত বাজারের সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এসময়ে চৈতন্যপদস্পৃষ্ট বরানগর পাটবাড়ির উন্নয়নের জন্য দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাবাজী মহারাজ স্মরণ রাখিয়াছেন একথা। ইহার কিছুদিন পরে আসে বরানগরের নিতাই-গৌর বিগ্রহের সেবা হস্তান্তরের প্রস্তাব। তৎকালীন অধিকারীরা ইহার খরচ চালাইতে না পারিয়া সংকটে পড়িয়াছেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীও এসংবাদ পাইয়া বাবাজী মহারাজকে এবিষয়ে অনুরোধ জানাইতে থাকেন। অতঃপর বাবাজী মহারাজকে বরানগর পাটবাড়ির সেবা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হয়।

বরানগর পাটবাড়ির পুণ্যময়তা ও ঐতিহ্যগৌরব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া আছে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে এই স্থানটি পবিত্রীকৃত।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নবদ্বীপে সবেমাত্র শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এমন সময় সেখানে গিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হয় রঘুনাথ উপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার এক নৈষ্ঠিক শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্রেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রবীণ বয়সে বরানগরের গঙ্গাতীরে নিভৃতে এক কুটির বাঁধিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। ভাগবত অধ্যয়ন আর সদ্যপ্রাপ্ত দামোদর-গোপাল বিগ্রহের সেবায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে থাকে।

অতঃপর লোকমুখে রঘুনাথ উপাধ্যায় সংবাদ পান, নবদ্বীপে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বৈষ্ণবেরা বসাইয়াছেন এক চাঁদের হাট। রঘুনাথ উপাধ্যায় অচিরে ছুটিয়া যান নবদ্বীপে, শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া মাগেন তাঁহার পরমাশ্রয়। আলিঙ্গন দিয়া উপাধ্যায়কে শান্ত করেন প্রভু, সমর্পণ করেন তাঁহাকে প্রাণপ্রিয় সখা গদাধরের হস্তে।

গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে উপাধ্যায় কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন এবং প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের

আদেশে বরানগরে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। গদাধরের আজ্ঞা হয় তাঁহার প্রতি—"গঙ্গাতীরে নিজ কুটিরে বসে কৃষ্ণভজন করো আর জনকল্যাণের জন্য রচনা করো ভাগবতের বাংলা অনুবাদ, কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী নাম দাও তার।"

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে ছাড়িয়া যাইতে উপাধ্যায়ের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, কান্নায় তিনি ভাঙিয়া পড়েন। এ সময়ে গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "উপাধ্যায়, প্রভুর বিরহে তুমি অধীর হ'য়ো না, স্বস্থানে বরানগরে গঙ্গাতীরে বসে তাঁর লীলা অনুধ্যান করো। তাঁর দর্শন তুমি পাবে।"

পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ আশ্বাসবাণী সত্য হইয়া উঠে। ফুলিয়া, রামকেলী ও পানিহাটিতে অবস্থানের পর চৈতন্যপ্রভু নৌকাযোগে সেবার বরানগরে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রবেশ করেন ভক্তপ্রবর রঘুনাথের কুটিরে।

উপাধ্যায়ের ভাগবত পাঠ শুনিয়া প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পায়, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পতিত হন ভূমিতলে।

সংবিৎ পাইয়া প্রভু উপাধ্যায়কে পরম স্নেহে জড়াইয়া ধরেন, বলেন, "অপার আনন্দ দিয়েছো তুমি আমায় তোমার ভাগবত পাঠ শুনিয়ে। আজ থেকে তোমার নাম হলো—ভাগবতাচার্য। ভাগবত পাঠের সেবা দ্বারাই তুমি লাভ করবে রাধাকৃষ্ণের চরণ।"

শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণধূলিপ্রাপ্ত ভাগবতাচার্যের এই পাটবাড়ি দীর্ঘদিন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থ। কালক্রমে, এই পাটবাড়ির সেবার ভার আসিয়া পড়ে বরানগরের ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ওয়ারিশদের উপর। সেবাকর্মের গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ায় এটি তাঁহারা রামদাস বাবাজীর হস্তে সঁপিয়া দেন।

এই প্রাচীন পাটবাড়ি যে একটি জাগ্রত স্থান, একথা স্থানীয় বৈষ্ণবদের অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। বাবাজী মহারাজের কাছে এটি হস্তান্তরিত হইবার পরও এই শ্রীপাটের অলৌকিকতার ঐতিহ্য হ্রাস পায় নাই। জনৈক শিষ্যের লেখায় পাই

"শ্রীশ্রী পাটবাড়ির সেবাধিকার বাবাজী মহারাজ গ্রহণ করার পর গভীর রাত্রে নূপুর পায়ে নৃত্যের শব্দ, খড়ম পায়ে অলৌকিক গতায়াত ইত্যাদি নানারূপ অঘটন ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। যুগল বিগ্রহের জন্য মাপের চেয়ে বড় ক'রে সোনার বালা তৈয়ার করা হয়, যাতে ভেলভেটের জামার উপরও পরানো যায়। কিছুদিন বাদে দেখা গেল, জামার উপর তো দূরের কথা, এমনিতেই তা অনেক ছোট হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে হঠাৎ একদিন এক শালগ্রাম শিলার আগমনও সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরের সেবক একদিন হঠাৎ দেখতে পান, নারায়ণের সিংহাসনের নিচে রয়েছে এক মূর্তি-শিলা। শালগ্রামের উপরে নিচে চন্দন মিশ্রিত কাঁচা তুলসী ও গলায় রূপার পৈতা। এভাবে দিনের পর দিন বহুতর বস্তুর সমাবেশ অলৌকিকভাবে হতে থাকে[1]।"

বরানগর পাটবাড়ির বিগ্রহের সেবার সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী। বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে এ দুটির মূল্য অপরিসীম। নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী, অপ্রতিগ্রাহী রামদাস বাবাজী

১ নামাচার্য শ্রীরামদাস

মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

বাবাজী মহারাজের মাধ্যমে রামদাস বাবাজী মহারাজের আর এক শ্রেষ্ঠ গঠনধর্মী কর্ম পুরীর হরিদাস মঠের সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মঠের সংস্কারসাধন। ইহার ফলে প্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ নামাচার্য হরিদাসের স্মৃতি সংবাহক এই পবিত্র সমাধি মন্দিরটি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরো কয়েকটি মঠ ও পুণ্যস্থানের রক্ষণে বাবাজী মহারাজকে সক্রিয় হইতে দেখা গিয়েছে এবং এইসব স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছে বৈষ্ণবীয় সাধন ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। এই মহনীয় সংরক্ষণ কর্মগুলি রামদাস বাবাজীকে দেশ ও সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

গুরুদেব চরণদাস বাবাজীর নির্দেশ অনুসারে রামদাসজী সেবার হঠাৎ কলকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। উঠেন গুরুভাই কুঞ্জ মল্লিকের বাড়িতে।

ঐ বাড়িতে তখন মহা সংকট। কুঞ্জবাবু গুরুতর পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন, এবার ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। কিন্তু দেখা গেল, ডাক্তারদের ধারণাকে উল্টাইয়া দিয়া কুঞ্জবাবু হঠাৎ কোন্ এক অলৌকিক কৃপা বলে সুস্থ হইয়া উঠেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া যান।

শরীর তখনো খুবই দুর্বল, কিন্তু রামদাস বাবাজীর পুণ্যময় সঙ্গে রোগী সত্বর উজ্জীবিত হইয়া উঠিতে থাকেন।

একদিন তিনি বাবাজী ম'শায়কে বলিলেন—"দাদা। কতদিন নামকীর্তন শুনতে পাই নি। কাল একটু শোনাবেন না?"

"দেখা যাক্, নিতাই চাঁদের করুণায় আপনাকে কীর্তনানন্দ দিতে পারি কিনা"—উত্তরে বলেন বাবাজী মহারাজ।

"শ্রীগুরু-সুখ তাৎপর্য স্বভাবের মূর্ত বিগ্রহ এক স্বভাব বৈরাগী যুবকের করুণায় বিশিষ্ট ধনী ও সমাজের প্রখ্যাত কুঞ্জ মল্লিক মহাশয় আরোগ্য লাভ করেছেন। সেই যুবকেরই নেতৃত্বে কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে সেদিন বৈকালে নামসংকীর্তন হবে—এ সংবাদে বিস্মিত চমকিত কলকাতার ইংরেজ-ঘেঁষা যত ধনীগোষ্ঠী ও কুঞ্জবাবুর আত্মীয়-স্বজন সব এসেছেন। আর সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন কাঁসারিপাড়ার তারক প্রামাণিকের পৌত্র আশুবাবু, প্রখ্যাত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বেনেটোলার গোস্বামী প্রভু, স্বদেশী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, মহাকবি ও প্রেমিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ চিহ্নিত, প্রিয় পরিকর মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম), পণ্ডিত গিরিশ বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, এঁড়েদহবাসী ভাগবত পাঠক, তারক চট্টোপাধ্যায়, এইরূপ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

"...বাবাজী মশায় সকালে স্নান আহ্নিক সেরে চলে গিয়েছেন, রামবাগান হয়ে সিঁথি ফিরলেন বৈকালে, সঙ্গে জনা কুড়ি সঙ্গী, তাঁরা মৃদঙ্গবাদন ও দোহারকী করবেন,

যথাসময়ে বৈষ্ণবোচিত দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে বাবাজী মশায় ঐ ঘরটি আসরে এসে বসলেন।

"এসব প্রথম দর্শনেই সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ। তারপর, মুদিত নয়ন, বাবাজী মশায়ের মধুকণ্ঠের সংকীর্তন, চোখ মুখে জলের প্রবল অশ্রু পুলকাবলী, মাঝে মাঝে সেই অবস্থায় তাঁর দেহখানি বসার স্থান থেকে প্রায় একহাত উঁচু ত উঠছে আর নামছে। পরবর্তী অবস্থা আরও উন্মাদনাময়। বাবাজীমশায় অলৌকিক ছন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যসহ কীর্তন করছেন। সে কি নৃত্যভঙ্গিমা! তাঁর চোখের জল ছিটকে ছিটকে গিয়ে ঐ সভাস্থ ব্যক্তিদের দেহের স্থানে স্থানে পড়ছে।

"এহেন সময়ে অকস্মাৎ মহেন্দ্র গুপ্তমহাশয় উন্মাদের ভঙ্গীতে টলতে টলতে হাতে তালি দিতে দিতে বাবাজীমশায়ের কাছে কাছে অনুনৃত্য করতে লাগলেন। গিরিশবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মহা আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে। আর সবার চোখে মুখে জল, কারো বাহ্যস্মৃতি নেই। বাহ্যস্মৃতি ফিরে এলে সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন,—গণসহ বাবাজীমশায় আসর থেকে চলে গিয়েছেন[১]।"

বাবাজী মহারাজের সেদিনকার সংকীর্তন অনুষ্ঠানটি যেন ছিল ঈশ্বর-আদিষ্ট, এ কীর্তনের অলৌকিকী শক্তি অচিরে ছড়াইয়া পড়িল কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে।

পুলিন মল্লিকমহাশয় বাবাজী মহারাজকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন। বিপ্লবীদের পুলিনবাবু টাকা সাহায্য দিয়াছেন, এই সন্দেহে পুলিস তাঁহাকে কিছুটা নিগৃহীত করে। তাই সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বাবাজীকে তিনি প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা দাদা! দেশকে ভালবাসা কি অপরাধ?"

"দেশ ছেড়ে দেশকে ভালবাসা কি রকম?" সহাস্যে উত্তর দিলেন বাবাজী মহারাজ। অতঃপরে আরো পরিষ্কার ভাষায় উপস্থাপিত করিলেন তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য। কহিলেন —"ভাইয়ে ভাইয়ে যদি বিরোধ লাগে, তবে বাড়ির ওপর টান কি রকম?"

বাবাজী মহারাজের বক্তব্যের তাৎপর্য, দেশ মানে ভৌগোলিক দেশ নয়, এই দেশে যারা বাস করে তাহারা প্রকৃত দেশ। তাহাদের ভালবাসাকেই বলে দেশকে ভালবাসা।

"ভাইদের ভালবাসা ঠিকই আছে, বিদেশী শত্রুরাই ভাইদের মনকে বিষিয়ে রেখেছে। ওরা চলে গেলেই আবার ভাইএ ভাইএ ঠিক মিল হয়ে যাবে।" উত্তর দিলেন পুলিনবাবু।

বাবাজীমশায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"স্বদেশ বলতে কতটুকু?"

"কেন? সমগ্র ভারত।"

"ধরুন যদি তাই হয়, তবে সমগ্র ভারতের মন কি একা ইংরেজ জাতি বিষিয়ে দিতে পাবে? মুসলমানেরা বদনার জল খাইয়ে আমাদের জাত নিয়ে নেয়, এও কি ইংরেজের জন্যে, না আর কিছু? পশ্চিমের হিন্দুরা বাঙালীর ঘরের অন্ন খেলে ... এও কি

১ রামদাস প্রতিভা - রাধিকেন্দ্র দাস।

ইংরেজের জন্যে ? সমস্ত ভারত জুড়ে যে এত জাতপাঁত ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার, এও কি ইংরেজের জন্যে ? আচ্ছা ' ওরা 'দশ ছেড়ে চলে গেলেই কি সব এক হয়ে যাবে ? তারপর যে দেশে কেউ মারা গেলে পর্যন্ত তার দেহটার জাত বেঁচে থাকে, ভিন্ন জাত ছুঁলে সেই মৃতদেহটারও জাত যায়, যে ছোঁয় তারও—এও কি ইংরেজের জন্যে ?"

অন্তরাত্মায় যেন প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়াছে বাবাজী মহারাজের। ভাবাবেগের সঙ্গে বলিয়া চলিলেন, "ভেবে দেখুন দেখি, ইংরেজ আমাদের পরাধীন করেছে না আমরা সেধে যেচে এগিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে বেড়ী পরে পরাধীন হয়ে বসেছি। আরও শুনুন —ছোট জাত বলে যাদের ঘৃণা করি তাদের হাতের পয়সা নিতেও পর্যন্ত আমাদের মনে সংকোচ আসে। সে পয়সা মাটিতে রাখিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নিই, এও কি ইংরেজ ক'রে দিয়েছে ? শুধু কি তাই, ছোট জাতের বাড়িতে 'নারায়ণ শিলা' গেলে তাঁরও জাত যায়, আর সেই জাত-যাওয়া নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালে উঁচু জাতের জাত যায়।"

পুলিনবাবু এই উদার, দরদী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

বাবাজী মহারাজের বক্তব্যের নির্যাস ' নিতাই গৌরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বাংলাই একদিন আগামীদিনের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তরে আজও তা দিগ্‌দর্শন হিসাবে ধরা আছে।

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কোথা বা ছিল এ বঙ্গ—গৌর প্রবর্তিত নাম সংকীর্তনে ঈর্ষা, দ্বেষ, জাতপাঁতের বিভেদ আদি মুছে গিয়ে প্রেমের উদয় হয়। ক্রমে মানুষের অন্তরে বিস্মৃত কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগে। তারপর দেখে বিশ্বজুড়ে সবই, সবাই কৃষ্ণদাস। তখন নিখিল বিশ্বের সব কিছুই 'আমার প্রভুর' এ বোধ আসবে। বিশ্ব বৈষ্ণবের সেবা ক'রে ধন্য হবে, সুখী হবে।"

সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা, আত্মিক সাধনায় সদা আগ্রহী, অশ্বিনীকুমার দত্তমহাশয় সেবার বরিশাল হইতে বাবাজীমহাশয়কে এক পত্র লিখেন :

প্রিয় রামদাস।

দীর্ঘদিন কাটিয়া গেল, সেই কাশিমবাজারের উৎসবের পর আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সর্বদা প্রার্থনা করি, প্রভুর কৃপায় তোমার সর্বত্র কুশল। আজ একটি গুরুতর প্রস্তাব-সহ তোমার নিকট একখানা সংবাদপত্রের অংশ বিশেষ পাঠাইলাম। তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অশেষ কৃপাভাজন। শ্রীমান্ হুশেন আলিকে তোমার নিকট শীঘ্রই পাঠাইতেছি। শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়া তাহাকে তুমি আশীর্বাদ করিও। অত্রস্থ কুশল। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার সান্নিধ্য শীঘ্রই ঘটিবে বলিয়া মনে করি। ইতি

—অশ্বিনীকুমার দত্ত।

দত্তমহাশয়ের দাগ-দেওয়া বরিশাল হিতৈষীর অংশটি ভক্তেরা বাবাজী মহারাজকে পড়িয়া শুনাইলেন :

'বরিশালের বাটাজোড় নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পীরবাবের সন্তান হুশেন

আলি তাহার স্বজাতীয়ের নিকট হইতে নানাভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতেছেন। হুশেনের অপরাধ, সে হিন্দুদের হরিনাম করে। এই হরিনাম করা অভ্যাস তাহার বাল্যাবধি। প্রথম প্রথম বাড়িতেই মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ধমক দিয়া এই অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করা, কীর্তন করা, বৈষ্ণবের সঙ্গ করার অভ্যাস তাহার বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমক ছাড়িয়া প্রহার, পরে অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলে। এখন তাহার জীবনসংশয় উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, একটি চক্ষু পুরাপুরি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কোনো মুসলমান তাহাকে সামান্য আশ্রয় ভরসাও দেন না, আর কোনো হিন্দুও তাহাকে রক্ষা করিবার সাহস পান না। পুলিস আসিয়া শুধু মজা দেখিয়া যায়। আমরা, উদারচেতা বৈষ্ণবের নিকট আবেদন জানাইতেছি, ভারত ধন্যকারী ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ ও যবনকুলজাত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সংমিলিত বৈষ্ণবধর্মের উদার পন্থা অনুসরণ করিয়া এই হুশেন আলি নামক বৈষ্ণবের দেহ মনকে রক্ষা করুন।

পড়া হইলে দেখা গেল রামদাস বাবাজী মহারাজের দেহে মনে করুণার প্লাবন বহিতেছে। চোখদুটি অশ্রু-সজল, সারা অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। অনুচ্চস্বরে বার বার ধ্বনি দিতেছেন,—জয় নিতাই, জয় দয়াল নিতাই।

কিছুদিন পরের কথা বাবাজী মহারাজ শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গায় বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছেন। "চাঁদের হাটের মতো গণসহ বাবাজী সেখানে বিরাজিত। শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর, বসন্তকুমার সেনগুপ্তমহাশয়, নবদ্বীপ মল্লিকমহাশয় প্রভৃতি আছেন, এবং বাংলা ও উড়িষ্যার খ্যাতনামা অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব ও গোস্বামীবৃন্দও আছেন, গৌর-নরহরির রসাল প্রসঙ্গে সে স্থানটি মশগুল। এমন সময় এক আগন্তুক এসে সবার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন।

"প্রায় একশত হাত দূর থেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করতে করতে ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স্ক এক মুসলমান দরবেশ এলেন—পরনে ছেঁড়া চট্। তিনি তাঁদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর দুচোখে জলের ধারা, অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত। নিকটে এসে, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে ভগ্ন স্বরে রামদাস বাবাজীর কাছে আত্মপরিচয় দিলেন[1]

"আমি পাপিষ্ঠ হুশেন আলি। দীন-দয়াল অশ্বিনীবাবুর সাহায্যে প্রথমে নবদ্বীপে যাই, সেখানে আপনাকে না পেয়ে, সর্বামার কৃপায়, আজ এখানে আসতে পেরেছি।" —বলেই দ্রুত ছুটে এসে বাবাজীমশায়ের শ্রীচরণে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

"তারপর সেকি এক হৃদয় বিদারক ক্রন্দন। বিরাট মেলা। আবার নরনারী দিবাভাগ। তাই অল্প সময়ের মধ্যে স্থানটিতে বহু জনসমাগম ঘটল। বাবাজীমশায় ও সেখানে যাঁরা সমাগত সকলের চোখেই জল। বাবাজীমহাশয় থরথর ক'রে কাঁপছেন। একটু স্থির হ'লে, আমাদের ভাইদের মৌন ইঙ্গিতে জানালেন,—একে নাও।

"অনুভাবী ভ্রাতৃবৃন্দ সেই হুশেন আলিকে ভ্রাতৃস্নেহ প্রথমে নরহরির প্রাণগৌরাঙ্গ দেখালেন, পরে বাৎসল্য প্রসাদ পাওয়ালেন, তারপর কৌপীন ও বহির্বাস দিয়ে তাঁ

১ শ্রীরামদাস প্রতিভা রাধাকিঙ্কর দাস

দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচনা দিলেন গোপীদা। হুশেন, এখন আমাদের গোষ্ঠীর জন। দু'দিন পরে কলকাতায় ফেরা। পরদিনই নবদ্বীপ। সাথে সাথে ভক্তপ্রবর হুশেন আলিও আছেন।"

রামদাস বাবাজীর পূতজীবন বিপুল অলৌকিক শক্তি এবং কারুণ্যে ভরপুর। কত পাষণ্ড ও পাপাচারী মানুষ যে তাঁহার স্পর্শে ও নয়ন-সম্পাতে উদ্ধার পাইয়াছে, দিব্য জীবনে স্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার অবধি নাই। তখন তিনি নবদ্বীপ সমাজবাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। এ সময়কার এক বিচিত্র ঘটনা[১] :

"সেদিন তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক পাঁড় মাতাল। বাবাজীমহাশয় এগিয়ে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীর সাথীরাও। মাতালটি বাবাজীমশায়ের দিকে এক অদ্ভুত ধরনের চাউনির সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করল,—'আ—প—নি—রা—ম—দা—স বাওজী?'

"বাবাজীমশায় মৃদু হেসে বললেন,—'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে।' মাতালটি মদের বোতল দু'টোকে আরও শক্ত ক'রে চেপে ধরে বললে,—'আমি মানকুণ্ডুর উ—পে—ন দত্ত। মেলাই খুন ক'রেছি। এই দেখুন পিঠে কত ছোরার দাগ।'

"বলেই পিছন ফিরে দাঁড়াল। তারপর সামনে ফিরে নত হয়ে আরও সম্মুখে, বাবাজীমশায়ের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, 'আপনি রামদাস বাওজী? ঠিক তো? এই গোসাঞি, বাওজীরা! ইনি রামদাস বাবাজী?' বলেই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বিহ্বল আবেগে টলতে টলতে তাঁর চরণে পড়ার জন্য ঝুঁকতেই তার বগলের বোতল দু'টি দুম্ দুম্ আওয়াজে পড়ে ভেঙে গেল। বিকট মদের গন্ধে চারদিকটা ভরে গেল। সখীমা, গোস্বামীবৃন্দ ও আর আর সবাই ছিটকে পড়ার মতো সরে গেলেন। কিন্তু করুণ নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবাজীমশায়।

'মাতালটা সেই মদ আর ধুলো মাখানো মাটিতে টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ল। এক আশ্চর্য ধরনের বেদনা ও আর্তিভরা স্বরে চিৎকার ক'রে সে বললে, 'আপনি রামদাস বাবাজী তো? আপনি রাম-দা' বাওতো? আপনি আমার উদ্ধার করতে পারবেন? আমি উপেন দত্ত। আপনি রামদাস বা—।" তারপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থানটিতে এক ভিন্ন ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হলো। ভক্তেরা কেউ কেউ সম্ভবত পুলিসে খবর দেবার ব্যবস্থার জন্য চলে গেলেন।

"বাবাজীমশায়ের দুই চক্ষু বেয়ে দরদর ধারে জল পড়ছে। হাতের জপের মালা-ঝোলাটি গলায় নিয়ে কি যেন ভাবছেন, আর থরথর ক'রে কাঁপছেন। চরণ দু'টিতে ছড়ানো মদ এসে লেগেছে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

"সবাই সরে গিয়েছেন, কেবল উনিই যান্ নি মাতালকে ছেড়ে। অকস্মাৎ 'হা নিতাই' বলে হুঙ্কার করে, সেই মাতালটিকে টেনে তুলে সোজা করে দাঁড় করালেন। মাতালটি বাবাজীমশায়ের বুকে এলিয়ে পড়ল। কয়েক পা বাবাজীমশায়ের সঙ্গে এসেই আবার পড়ে গেল। তখন বাবাজীমশায় তার ভ্রূদু'টির মাঝখানে, ডান

১ রামদাস প্রতিভা ' রামকিঙ্কর দাস

হাতের বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে কি যেন জপ করলেন। মাতালটি নিথর হয়ে শুয়ে রইলো।

"এতক্ষণে ভক্তেরা কিছুটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কারো সাহস হচ্ছে না যে বাবাজীমশায়কে ওখান থেকে সরিয়ে আনে।

"বাবাজীমশায়ের সেই জপের পরেই মাতালটি ঝিমুনি চোখে এদিক ওদিক তাকালো। এবার বাবাজীমশায় তার কপালের উপর ডান হাতের তালুটি কিছু সময় চেপে ধরলেন। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। মাতাল উঠে বসলো। বাবাজীমশায় তখনও হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর তিনি মাতালের পিঠের দিকে বাম বাহু দিয়ে চাপ দিতেই মাতালটি দাঁড়াল। বাবাজীমশায় মাতালকে বামদিকে ধরে মরমী বন্ধুর ভঙ্গীতে চলতে লাগলেন।

"উভয়ে মঠের গেট পার হলেন। শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটের দিকে চলেছেন। এ দৃশ্য দেখে মঠবাসীরা বিস্মিত অথচ মৌন। সখীমার মৌন ইঙ্গিতে মাষ্টারদা পিছনে পিছনে গেলেন। আবার কয়েক পা যাবার পরই বাবাজীমশায়ের আদেশ না পেয়ে ঐভাবে ফিরে এলেন। সখীমার তখনো প্রসাদ পাওয়া হয় নি। কারণ, বাবাজীমশায় প্রসাদ পান নি। তিনি ঘন ঘন 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলতে বলতে আশঙ্কায় বিষন্ন হয়ে এদিক ওদিক করতে লাগলেন।

"সন্ধ্যার আরতির পর বাবাজীমশায় ফিরে এলেন, পিছনে সেই মাতাল। তার গলায় তখন বাবাজীমশায়ের নিজের পাঁচকণ্ঠী মালার দু'কণ্ঠী, বিনয় নম্র অপরাধী সেবকের মতো আমাদের 'উপেন-দা' ফিরে এলেন।"

কলকাতার পটুয়াটোলায় বাঁড়ুয্যেমহাশয়ের বাড়িতে কীর্তন। কীর্তন সমাপ্ত হওয়ার পরে, বাড়ির মালিক রায়বাহাদুর মহাশয় অনুরোধ জানান বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীদের, "এবার তাহলে একবার সবাই পেয়ে চল।"

রায়বাহাদুর বাবাজীর পূর্বপরিচিত ব্যক্তি, দীর্ঘদিন উভয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। উপরে গিয়া দেখা গেল প্রচুর ভোজনের আয়োজন।

—"রামদাস! কিছু প্রসাদ নাও ভাই" রায়বাহাদুরের 'রায়'। সেবক সঙ্গীগণ চঞ্চল হলেন। তাঁদের সঙ্গে যে ঠাকুর এসেছেন। এঁদের ঠাকুর যে বন্ধুর মত চিত্র বিগ্রহ হয়ে কাছে কাছে ফেরেন। তাঁর মুখে না দিয়ে এঁরা কেমন ক'রে অন্য বাড়িতে প্রসাদ পাবেন? তাঁরও তো স্বতন্ত্র সেবা চাই? এই কারণেই প্রসাদ পেতে এঁদের সঙ্কোচ এসেছে। সে কথা এঁরা বিনীত স্বরে জানাতে তাঁদের অসমাপ্ত আবেদনে রায়বাহাদুরের ব্রাহ্মণ্য সত্তা অধীর হয়ে উঠলো। বান্ধব প্রীতির-ডুরি দড়ি ছিঁড়ে গেল। রায়বাহাদুরের ঘুমন্ত সংস্কার জাগ্রত হলো।

—'আজ্ঞে, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর আছেন· ··'

—এটি বাবাজীমশাইর শিষ্য সন্তানগণের অসমাপ্ত আবেদন। ভেতরে গেলেন তাঁরা।

বাবাজীমশায় উদাস নেত্রে নীরবে মালা জপিয়া চলিয়াছেন। আর ভক্ত শিষ্যের এ সংকটে একে অপরের দিকে চাহিতেছে। বাবাজী মহারাজ কি সিদ্ধান্ত নিবেন তাহা তিনিই জানেন।

ইতিমধ্যে রায়বাহাদুরের চোখ মুখ অভিমানে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলিয়া উঠেন, "তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়, ব্রাহ্মণবাড়ি, নারায়ণের নৈবেদ্য। এ প্রসাদ নেওয়া চলবে না কেন? আর ঐ যত সব অজাত কুজাত ন্যাড়া শিষ্যের ভোগ দেওয়া হ'লেই ভক্তি ক'রে খাবে···।"

ভক্তসেবকেরা বিমূঢ় অবস্থায় বাবাজীর দিকে চাহিয়া আছেন। আর বাবাজীর গৃহী-ভক্তদের দু'চারজন মহা উত্তেজিত, গুরুর ইঙ্গিত পাইলেই রায়বাহাদুরের উপর হানিবেন প্রচণ্ড আঘাত। বাবাজী মহারাজ কিন্তু অসীম ধৈর্য নিয়া অপেক্ষমাণ।

রায়বাহাদুর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন, দৃপ্তস্বরে বলেন, "এরা তোমায় কেষ্ট বিষ্টু যাই ভাবুক, রামদাস, আমি জানি তুমি 'রাধিকা গুপ্ত।' ছত্রিশ জাতের গুরু হয়েছ, লোকে তোমায় পুজো করে। এত দম্ভ তোমার?—যাও যাও, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে। ফল, নৈবিদ্দি আমি কুকুরকে খাইয়ে দেব।"

"বাবাজীমশায়ের সজল করুণ চোখের ইঙ্গিতে ধনী গৃহী ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ শান্ত। তারপর তিনি রায়বাহাদুরকে বললেন, 'কৃপা করুন, আমার অযোগ্যতায় আপনি ব্যথা পেয়েছেন, দুর্দৈবের দাস আমি।'

ক্ষণপরেই দেখা গেল এক বিস্ময়কর পটপরিবর্তন। 'কি হলো কি হলো' বলে উত্থিত হলো কোলাহল। রায়বাহাদুর মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, আর তাঁর মাথাটি রয়েছে বাবাজী মহারাজের চরণতলে।"

বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরমহাশয়ের বর্ণিত একটি ঘটনায় তাঁহার পতিতপাবনী রূপটি উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখা যায়। ঊর্মিলাদাসী নামে একটি পতিতা রমণী বাবাজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি ছিলেন মধ্য বয়সী, গায়ের রং ও চোখ-মুখ দেখলে মনে হয়, যৌবনকালে রূপ ছিল তাঁহার অসামান্য, গর্ব করার মতো। ঢাকার এক ধনী ব্যবসায়ীর প্রাক্তন রক্ষিতা ছিলেন এই রমণী। বাবাজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণের পর হইতে এই শিষ্যার জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। গুরু নির্দেশিত ভক্তিসাধনার পথটি ধরিয়া নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

নবদ্বীপ সমাজবাড়ির সখিমারও খুব স্নেহভাজন ছিলেন ঊর্মিলাদাসী। এখানকার পুজো-উৎসবে, কীর্তনে, ভোগরাগে সর্বদা তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যাইত, সাধু বৈরাগীদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি সহায়তা করিতেন।

সে-বার রামদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপ সমাজবাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন ঊর্মিলাদাসী তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। বাবাজী মহারাজের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "বাবা, আমার একটি বাসনা আপনাকে পূরণ

করতে হবে।" বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তাঁহার সারা দেহ কাঁপিতে থাকে, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে নয়নাশ্রু।

প্রসন্ন গম্ভীর বদনে বাবাজী মহারাজ উত্তর দিলেন, "নিতাই চাঁদের ইচ্ছা।"

উপস্থিত সবাই ভাবিলেন, অন্যান্য বারের মতো এবারও উর্মিলা হয়তো কোনো বড় উৎসব ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করিবেন এবং আশ্রয়ে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতে থাকিবে।

পরের দিনই একটি বড় ভারী স্যুটকেস হাতে নিয়া উর্মিলা মঠের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান।

অন্য দিনকার মতো স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক নয় তাঁহার এই আগমন। মঠের বিগ্রহ ও সাধুদের যথাক্রমে প্রণাম নিবেদন না করিয়া নীরবে নতমস্তকে তিনি দণ্ডায়মান। কয়েকজন মঠবাসী কৌতূহলী হইয়া উঠেন, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঘিরিয়া দাঁড়ান তাঁহাকে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, "কি ব্যাপার দিদি, এভাবে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, গুরু রামদাস বাবাজীর কাছে তিনি তাঁর একটি বাসনা পূরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে এ সময় তাঁহার আসা।

"কি আপনার বাসনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "সে কথা ভেঙে বলবো বাবার কাছে। তাঁকে একবার খবর দিন।"

সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামদাস বাবাজী তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিছুক্ষণ উর্মিলাদাসীর দিকে গম্ভীর বদনে তাকাইয়া থাকিয়া বাবাজী মঠের গেটটি বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গেটে তালা লাগাইয়া দিল, হঠাৎ কাহারো ভিতরে ঢুকিবার সম্ভাবনা রহিল না।

বাবাজী মহারাজের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া প্রণাম জানাইলেন উর্মিলা। তারপর দুই হাত দিয়া স্যুটকেসটি তুলিয়া ধরিয়া আনন্দের আবেগে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "বাবা, কয়েকমাস আগে কৃপা ক'রে স্বপ্নে আপনি আমার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা গেছে তা যাক। তুই আর ওখানে থাকিসনে।"

"তাই বাবা এবার আমার পুরনো আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছি। আমার যা কিছু বিত্ত সম্পদ আছে, তা সবই রয়েছে এই স্যুটকেসের ভেতর। আপনি কৃপা ক'রে এগুলো অঙ্গীকার করুন, আর আপনার রাতুল চরণে আমায় স্থান দিন।"

বাবাজী মহারাজের চোখ-মুখ এবার স্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া উঠে, চিত্রার্পিতের মতো স্থিরনেত্রে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে দুইটি ভক্ত উর্মিলাদাসীর হাত হইতে স্যুটকেসটি নিয়া উহার ডালা খুলিয়া ফেলেন। দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। সোনা ও জড়োয়ার অজস্র সেটের গহনা স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে ঐ স্যুটকেসে, যার সূর্যকিরণে সেগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে।

উর্মিলার সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নিহিত রহিয়াছে এই স্বর্ণ ও হীরা জহরতের বহুমূল্য অলংকার সম্ভারে। এগুলি গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিয়া তিনি ভারমুক্ত

হইতে চান, মুক্তি পাইতে চান মোহবন্ধনের হাত হইতে। এই সঙ্গে পূর্বেকার ধনী প্রেমিক ও আশ্রয়দাতার সমস্ত কিছু সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাবাজীর নির্দেশ মতো যাপন করিতে চান বৈরাগিণীর ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া রামদাস বাবাজী এতক্ষণ ঊর্মিলার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এবার তাঁহার সারা দেহ ভাবাবেশে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তারপর একটা বিস্ফোরণের মত তিনি ফাটিয়া পড়েন। দৃঢ় কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠেন, "এখানে নয়, এখানে নয়। এ সব নিয়ে এখুনি চলে যাও।"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে বাবাজী মহারাজ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঊর্মিলার দুই চোখ বাহিয়া নামিয়া আসিল অশ্রুর প্লাবন। আবেগভরা কণ্ঠে বার বার সখিমার কাছে কহিতে লাগিলেন, "আমায় স্থান দিন, আমি বড় দুঃখিনী। আমি আপনাদেরই।"

বাবাজী মহারাজের এই বজ্রকঠোর রূপের সঙ্গে মঠের সকলেরই পরিচয় আছে। তাঁহারা ভক্ত ঊর্মিলাকে সস্নেহে বুঝাইতে থাকেন, এই বৈরাগী মহাপুরুষের মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইয়াছে তাহা ফেরানোর উপায় নেই। তুমি এসব বহুমূল্য অলংকার নিয়ে এখনি স্বস্থানে চলে যাও।

ঊর্মিলাকে আরো বুঝানো হইল, "বাবাজী মহারাজের অলৌকিকী প্রজ্ঞা, সিদ্ধান্ত নিবার বেলায় কখনো ভুল করে না। ঊর্মিলা, তুমি আর দেরি না ক'রে এ স্থান ত্যাগ করো।"

পরের দিন সংবাদ পাওয়া গেল, ঊর্মিলাদাসী তাঁহার নিজের বাসভবনে পৌঁছিয়াই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একেবারে শয্যাশায়িনী। মঠ হইতে প্রতিদিন তাঁহার জন্য প্রেরিত হইতে থাকে ঔষধ এবং পথ্যাদি। তাঁহার শুশ্রূষার সমস্ত ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। ঊর্মিলাকে দেখা গেল মঠের প্রাঙ্গণে, বাবাজী মহারাজকে শেষ দেখা দিতে তিনি আসিয়াছেন। অজস্র ফুলে পাতায় সুসজ্জিত একটি শবাধারে তাঁহার মৃতদেহটি শায়িত। গলায় প্রসাদী মালা। কপালে ব্রজরাজের তিলক চিহ্ন। হরিধ্বনি দিয়া বাহকেরা তাঁহাকে নিয়া চলিল শেষ কৃত্যের জন্য।

"ঊর্মিলা তুই আর ওখানে থাকিসনে" বলিয়া যে স্বপ্নাদেশ বাবাজী মহারাজ দিয়েছিলেন, তাহার মর্ম এবার বুঝা গেল। নির্মোহা, বৈরাগ্যব্রতী বৈষ্ণব ঊর্মিলাকে গুরু প্রেরণ করিলেন তাঁহার সত্যকার স্বধামে।

প্রায়শ দৈবাদেশে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে রামদাস বাবাজী তাঁর পতিত-উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িত নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে।

সে-বার আরামবাগ শহরের ভক্তেরা অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার অনুবর্তীদের সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন। শ্রাবণ মাস, ঘোর

বর্ষাকাল। প্রায় ত্রিশ মূর্তি সঙ্গে নিয়া বর্ধমান স্টেশন হইতে শুরু হইয়াছে বাবাজীর পদযাত্রা।

আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, বৃষ্টিও ঝরিতেছে অবিরল ধারে। ক্ষেতের পিচ্ছল আলপথ দিয়া সন্তর্পণে সবাই চলিয়াছেন, কিন্তু খোল বাদ্য এবং কীর্তনের বিরাম নাই। ক্রমে প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়, রাস্তা ক্ষেত জুড়িয়া সব কিছু হয় জলে জলাকার। এদিকে অন্ধকারে পথ চলা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

এভাবে হাঁটুজল ভাঙিতে ভাঙিতে আর কীর্তন করিতে করিতে সবাইর দৃষ্টি পড়ে অদূরস্থিত একটি লণ্ঠনের আলোর দিকে, একটি ক্ষুদ্র চালাঘরে নিবিবিলি উহা জ্বলিতেছে এবং আরামবাগ শহরের উপান্তে এই নিভৃত স্থানটি। বৃষ্টি তখনো অবিরল-ধারে ঝরিয়া চলিতেছে এবং সত্বর থামিবার কোনো আশাও নাই। আপাতত এই ক্ষুদ্র চালাঘরেই আশ্রয় নেওয়া যাক, ভাবিয়া সবাই ঐ চালাঘরের বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়ির মালিক ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধা। "এসো বাবা এসো, এখানে বসে তোমরা একটু জিরিয়ে নাও," বলিয়া বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার ভক্তদের সে অভ্যর্থনা জানায়। বৃদ্ধার ধারণা, এই কীর্তনিয়ারা শহরে গানের বায়না পাইয়াছে, কিছুটা বিশ্রামের পরই সেদিকে যাত্রা করিবে।

বারান্দার পাশে ছোট্ট একটি উনুনে আগুন জ্বলিতেছিল, ভেজা খোলগুলি সেই আগুনের তাপে কিছুটা শুষ্ক করিয়া নিয়া সবাই আবার কীর্তন শুরু করিলেন। ক্রমে এ কীর্তন জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

এদিকে আরামবাগের উদ্যোক্তারা বাবাজী মহারাজের সন্ধানে সদলবলে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে কতকগুলি হ্যাসাক বাতি ও হারিকেন লণ্ঠন।

বৃদ্ধার অঙ্গনে পৌঁছিয়া কীর্তনরত বাবাজী মহারাজের সম্মুখে তাঁহারা অপেক্ষা করিতে থাকে। এবার বাবাজীর দলটিকে পথ দেখাইয়া শহরে নিয়া যাওয়া হইবে।

বাবাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা জানাইয়া দেন, তিনি কীর্তনে এমন মত্ত হইয়া আছেন যে, এ সময়ে তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলা কাহারো সাহসে কুলাইবে না।

কি জানি কি ভাবিয়া আরামবাগের উদ্যোক্তারা বৃদ্ধার এই অঙ্গনেই অষ্টপ্রহর কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। জলকাদার মধ্যেই বিরাট সামিয়ানা টানাইয়া ফেলা হইল। আলোর সুব্যবস্থা করিতেও দেরি হইল না। বৃদ্ধার অঙ্গন পরিণত হইল এক পুণ্যময় কীর্তনস্থলীতে। পরের দিন শহরের ভক্তেরা আসিয়া সোৎসাহে সেখানে যোগ দিলেন। শুরু হইল দুই দিন ব্যাপী কীর্তনের মহোৎসব।

বৃদ্ধা প্রায় তিনদিন যাবৎ উপবাসী, বাবাজীর সান্নিধ্যে আর ভক্ত বৈরাগীদের এই কীর্তন যজ্ঞে আপনাকে সে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। তরুণ বয়সে সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজচ্যুত, দীর্ঘ এতগুলি বৎসর তাঁহার বাড়িতে উচ্চবর্ণের লোকেরা পদার্পণ করে নাই। আজ তাহার গৃহটিই বাবাজী মহারাজের প্রসাদে হইয়া উঠিয়াছে এক পুণ্যতীর্থ।

কৃপালু রামদাস বাবাজী এই বৃদ্ধাকে সানন্দে নামদীক্ষা দিলেন। নামকরণ

করিলেন, সত্যদাসী। আনন্দে ও ভাবাবেগে অধীর হইয়া সত্যদাসী বাবাজীর ভক্তদের চরণ ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে আপনারা এখন থেকে আমার নিয়ে চলুন আপনাদের সাথে; নইলে আমি কিন্তু প্রাণে বাঁচবো না।

কোনো সান্ত্বনা বাক্যেই সে আর প্রবোধ মানিতে চায় না, বাবাজী মহারাজের কাছ হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে চিত্ত তাহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বা কোনো পুণ্যতীর্থে আশ্রয় নিতে না পারিলে সে নিশ্চয় মাথা খুঁড়িয়া মরিবে। অবশেষে স্থানীয় কয়েকটি ভক্ত সত্যদাসীর একটা সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার জমিজমার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া একজন তাঁহাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। অতঃপর এই টাকা বৃন্দাবনের মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে জমা দিয়া সেখানে আজীবন সত্যবালার খোর-পোষের ব্যবস্থা করা হইল।

এমনিভাবে সেদিনকার দুর্যোগের রাতে বাবাজী মহারাজের আগমন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় পথভ্রান্তা ভ্রষ্টা নারী সত্যবালার জীবনে বহাইয়া দিল ভক্তিময় জীবনের অমৃতপ্রবাহ।

কয়েকমাস পরে রামদাস বাবাজী ভক্তগণসহ বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন। এসময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ভক্তিমতী শিষ্যা সত্যবালার। বাবাজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আরামবাগের সেই বৃত্তীকে দেখতে পেলাম। তখন তাঁর নাম সত্যদাসী। দেখেই সে আমাদের চিনলে। তার আবাসে আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল শ্রীমদনমোহনের প্রসাদ পেতে। দেখলাম গোঁসাইবাড়ির অন্দরে সত্যদিদির সম্ভ্রম খুব। তিনি প্রত্যহ একলক্ষ নাম জপ করেন। প্রতিটি ব্রত নিরম্বু উপবাস করেন। গোঁসাইবাড়ির পাশে একটি ঘর পেয়েছেন। সেটা তাঁর ভজন কুটির। বৌদিরা সত্যদিদিকে পিসিমা ডাকেন।"

ভক্তগণসহ বাবাজী মহারাজ সেদিন পুরীধামের পুণ্যময় রথ-উৎসবে যোগদানের জন্য চলিয়াছেন। হাওড়া স্টেশনে ভক্তদের পংক্তিভোজন শেষ হইল। সবাই রিজার্ভ কামরায় উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নন্দ বাবাজীর কাছে একটি সুটকেস ছিল, আর উহাতে রক্ষিত ছিল রথ-উৎসব উপলক্ষে তোলা ভিক্ষা—প্রায় দুই হাজার তিনশত টাকা। ভদ্রবেশী এক দুর্বৃত্ত এটি অপহরণ করে এবং নিশ্চিত আরামে পাশের প্ল্যাটফরম স্থিত একটি ট্রেনে উঠিয়া বসে। কিছুক্ষণ পরে সি-আই-ডি পুলিস নন্দ বাবাজীকে সঙ্গে নিয়া হাতে নাতে ঐ সুটকেস সমেত চোরকে ধরিয়া ফেলে।

গোড়ার দিকে যথেষ্ট বিক্রম দেখানোর পর ভদ্রবেশী চোরটি শেষটায় নীরব ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, পুলিস বেষ্টিত অবস্থায় তাহাকে প্ল্যাটফরম দিয়া নিয়া যাওয়া হয়। চারিপাশে তখন উৎসুক জনতার ভিড়।

ভক্তেরা মনেপ্রাণে চাহিতেছিলেন যে এ দৃশ্যটি বাবাজীর চোখে না পড়ে, তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ না ঘটে। কিন্তু পুলিস ও স্টেশনকর্মীরা সবাবে চোরটিকে তাঁহার সম্মুখ দিয়া হাঁটাইয়া নিয়া যাইতে থাকে।

পুলিস বেষ্টিত অপরাধীটি কাছ দিয়া যাওয়ার সময় বাবাজী মহারাজ তাঁহার এক গুরুভাইকে কহিলেন, "তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস করো, ওঁর বোধহয় কোথাও যাওয়ার জন্য একটি পয়সাও হাতে নেই। কিছু টাকা ওঁর হাতে দাও। কষ্ট খুবই হয়েছে ওঁর।"

বাবাজী মহারাজের অশ্রুসজল চোখ ও বেদনাভরা কণ্ঠ শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সুটকেস চোরটির কি জানি কি হইল থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাবাজীমহাশয়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

জপমালা হস্তে বাবাজী মহারাজ প্রস্তরমূর্তির মতো দণ্ডায়মান, দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। স্টেশন মাস্টার, পুলিস চীফ এবং সঙ্গীয় প্যাসেঞ্জারেরা সবাই এক করুণার্দ্র দেবমানবের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরই অবস্থাটি স্বাভাবিক হইয়া আসিল, বাবাজী মহারাজ সদলবলে ট্রেনে চাপিয়া বসিলেন, সুটকেস অপহরণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কেহ আর সেখানে রহিল না।

এ ঘটনার দুইমাস পরে, বাবাজী মহারাজ পুরীতে হরিদাস নির্বাণ উৎসবে রত হইয়া আছেন। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনের সেদিনকার সেই সুটকেস অপহরণকারী লোকটি দীনহীন কাঙাল বেশে আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে. আত্মানুশোচনা এবং আত্মশুদ্ধির আগুনে ইতিমধ্যে সে নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে।

স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বাবাজী মহারাজ তাহাকে সেই দিনই দীক্ষা দান করিলেন। নব নামকরণ হইল—নরহরিদাস। কিছুদিন পরে বেশাশ্রয় করাইয়া ভেক দেওয়া হইলে ব্রজমণ্ডলের বালু নামক গ্রামে গিয়া সাধক নরহরি ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন যাপন করিতে থাকেন, বহু বৈষ্ণব গুরুভাইর শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি সক্ষম হন। উত্তরকালে ঐ বালু গ্রামেই ভজনরত অবস্থায় ঘটে তাঁহার দেহাবসান।

সে'বার কাটোয়ার এক ভক্তের আহ্বানে রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্তন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে বত্রিশজন ভক্ত এবং শিষ্য। ভাব বিহ্বল হইয়া বাবাজী মহারাজ কীর্তনের অধিবাস সমাপ্ত করিলেন, তাঁহার আর্তি ও সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন।

পরের দিন মঙ্গল আরতির পরে অখণ্ড নামকীর্তন শুরু হইতে যাইতেছে, এমন সময় এক দুস্তর বাধা আসিয়া উপস্থিত। বাবাজী দু'তিনজন সেবক সহ এক বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন, আর দোহার ও বায়েন সহ মূল কীর্তনকারীর দলটি রহিয়াছে অপর একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে।

হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, ঐ ভাড়াটিয়া বাড়িটি বাহির হইতে কে বা কাহারা একটি বৃহৎ তালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দলের লোকদের বাহিরে আসার কোনো উপায় নাই।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা স্থানীয় ভক্তটি তো মহা বিপদে পড়িলেন। তালা ভাঙিয়া ভক্তদের বাহির করিতে গেলে ফৌজদারী মামলায় জড়ানোর আশঙ্কা আছে, তদুপরি

রহিয়াছে স্থানীয় কোনো কোনো বিরোধীদলের হাঙ্গামার আশঙ্কা। কি করিয়া এ সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, কেহ ভাবিয়া পাইতেছেন না।

এ সংবাদটি বাবাজী মহারাজের কানে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ি ডাকাইলেন, দুইজন শিষ্যসহ সরাসরি উপস্থিত হইলেন শহরের থানায়।

বড় দারোগা তখন থানার ভিতরে নিজস্ব কোয়ার্টারে ঘুমাইয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া ব্রস্তেব্যস্তে সসংকোচে তিনি বাবাজী মহারাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া দারোগাবাবু তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তারপর একটু সুস্থ হইয়া জোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, "আপনি দয়া ক'রে বাড়ির ভেতরে আসুন।"

বাবাজী মহারাজ ভিতরে প্রবেশ করিলে দারোগাবাবুর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা একে একে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

এবার বাবাজীর সঙ্গীরা তাঁহাদের থানায় আসার কারণটি প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে দারোগা গৃহিণীকে কহিলেন, "কি আশ্চর্য, উনি তখন ঘুমিয়ে রয়েছেন, কনেস্টবল এসে ওঁকে ডাকতেই ঘুম জড়িত অবস্থায় উনি বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ। বাবাজী। বাবাজী। আমার ধারণা উনি এই বাবাজী মহারাজকেই স্বপ্ন দেখছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন, "হ্যাঁগো, একটা আশ্চর্য স্বপ্ন এতক্ষণ আমি দেখছিলাম। দিব্যকান্তি এক বাবাজী যেন আমায় ডেকে বলছেন,—বিভূতি! চল, যাবে না? স্বপ্নে দেখা সাধুর ঠিক এমনি চেহারা, হাতেও এমনি হরিনামের মালা, ঝোলা। আমি অবাক্ হয়ে এই বাবাজীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি,—উনি স্বপ্নে দেখা বাবাজীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এঁর হুবহু মিল রয়েছে।"

দারোগা গৃহিণীর কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ কোনো মন্তব্য করিতেছেন না, শুধু শুধু মুচকি মুচকি হাসিতেছেন।

বাবাজী মহারাজকে সসম্মানে নিজের কোয়ার্টারে বসাইয়া রাখিয়া দারোগাবাবু তৎক্ষণাৎ থানার জমাদারকে পাঠাইয়া তালা ভাঙার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৃহে আবদ্ধ ভক্তেরা মুক্ত হইয়া আসিয়া সানন্দে কীর্তন শুরু করিয়া দিল।

পরের দিন দেখা গেল, দারোগাবাবু সাগ্রহে বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছেন। তাঁহার ললাটে তিলক রেখা, গলায় তুলসীর পবিত্র মালা, আর হাতে নাম-জপের ঝোলা।

ছয়মাস পরে শোনা গেল, এই দারোগা বিভূতিবাবু ঘরসংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছেন, আর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা আশ্রয় নিয়াছেন তাঁহার শ্বশুরালয়ে। তাঁহার স্ত্রী বাবাজী মহারাজের কাছে আসিয়া যুক্তকরে অকপটে কহিলেন, "আমার স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল আর শান্তি যাতে হয়, তাই আপনি করুন।"

ইহার তিন বৎসর পরে বাবাজী মহারাজ একবার বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গেলে সে সংবাদ চারিদিকেরভক্তমহলে, সারা ব্রজমণ্ডলে, ছড়াইয়া পড়িত। তাঁহার

আগমন সংবাদ বৈরাগী সাধক বিভূতিবাবুর কানেও গিয়াছিল অবিলম্বে তিনি বাবাজী মহারাজের চরণ দর্শন করিতে আসিলেন। জানাইলেন, বেশাশ্রয়ের পর তাঁহার নাম হইয়াছে বৈষ্ণবচরণ দাস। ব্রজের গ্রামে পর্ণকুটির বাঁধিয়া তিনি একাগ্রমনে ভজন সাধন করেন, আর দিনান্তে রুখা-শুখা যাহা কিছু জোটে মাধুকরী করিয়া আনেন। এইভাবে কৃচ্ছ্রময় ভজনে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

দর্মাহাটার ভাড়াটে মঠবাড়িতে বাবাজী মহারাজ মাঝে মাঝে আসিয়া অবস্থান করেন, আবার স্বেচ্ছামতো অপর কোথাও চলিয়া যান। সে-বার মঠবাড়িতে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীর স্বরে বাবাজী ভক্তদের কহিলেন, "প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা যেন বাইরে না ফেলা হয় আর বাইরের কাউকে প্রসাদ না দেওয়া হয়।"

হঠাৎ এ আদেশের তাৎপর্য কি, ভক্তেরা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন।

বাবাজী আরো জানাইয়া দেন দৃঢ় স্বরে, "গেটে তালা দাও। সকাল সন্ধ্যায় তালা দেওয়া থাকবে। কেউ এসে ডাকলে দেখে শুনে যেন খোলা হয়। নূতন কাউকে ঢুকতে দেবে না।"

এত কড়াকড়ি হঠাৎ কেন? কেউ কেউ বললেন, "হয়তো বাইরে রাজনৈতিক হৈ-হল্লোড় থেকে সরে থাকার জন্যই বাবাজীর এই ব্যবস্থা।"

পরদিন বাবাজী মহারাজের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ভক্তেরা লক্ষ্য করেন, গেটের বাইরে একটি তরুণী বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আঠার বিশ বৎসরের বেশী নয়। দেহের সৌন্দর্য ও নিটোল স্বাস্থ্য সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটির গলায় এক-ছড়া তুলসীর মালা, কপালে গোপীচন্দনের তিলক অঙ্কিত। ছোট দুটি করতাল কণ্ঠ-দেশে ঝুলিতেছে, হাত দুটি জোড় করিয়া নির্নিমেষে সে বাবাজী ও তাঁহার ভক্তদের দিকে তাকাইয়া আছে। কি যেন সে নিবেদন করিতে চায়, কিন্তু ভয়ে ও সঙ্কোচে তাহা বলিতে পারিতেছে না। বাবাজী ও তাঁহার সঙ্গীরা নীরবে নবীনা বৈরাগিণীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গার পথে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গী ভক্তেরা সবাই সানন্দে গঙ্গাস্নানে রত, কিন্তু বাবাজী মহারাজের সেদিন যেন বড় ত্বরা। চট্‌পট স্নান সারিয়া তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন, দ্রুত হস্তে গেটটি বন্ধ করিয়া দিয়া অপেক্ষমান রহিলেন গঙ্গার স্নানকারী ভক্তদের জন্য। তাহারা ফিরিয়া আসিলে নিজ হাতে গেট খুলিয়া দিলেন, তারপর নির্দেশ দিলেন, "এটি বন্ধ ক'রে রাখো। আর দেখো, প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা বা এক কণা অন্নপ্রসাদ বাইরে না যায়। সব জড়ো ক'রে রাখো বাড়ির ভেতরে ঐ কলার পাশে।"

আবার কহিলেন, "এ ব্যবস্থা দিন কতক সমানভাবে চলবে। আমি চলে গেলেও এভাবেই চলবে।"

মঠের সচ্ছলতা তেমন নাই বটে কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের জন্য চিরদিনই অবারিত দ্বার। কিন্তু এবার এমন কি ঘটিল যাহার জন্য দরজা বন্ধ করা দরকার, প্রসাদের পাতা

সম্পর্কে বাবাজীব এত সতর্কতা ? ভক্তেবা স্বভাবতই মহা কৌতূহলী হইযা উঠিযাছেন। যাই হোক, বাবাজীব নির্দেশে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চলিতে থাকে এবং কযেক মাস এভাবে অতিবাহিত হয। তাবপব ধীবে ধীবে আবাব পূর্ব ব্যবস্থা ফিবিযা আসে, গেট সবাবই জন্য খুলিযা বাখা হয। প্রসাদেব পাতাও ফেলিযা দেওযা হয মঠেব বাহিবে পূর্বেকাব নির্দিষ্ট স্থানে।

ইতিমধ্যে প্রায এক বৎসব চলিযা গিয়াছে। সেদিন অনেক বাত্রে বাবাজী মহাবাজ হাওডায অনুষ্ঠিত এক কীর্তন সভা হইতে ফিবিযা আসিযাছেন। তখনো মঠেব কাহাবো প্রসাদ পাওযা হয নাই। বাবাজী ব্যস্তসমস্ত হইযা দোতলাব ঘব হইযা নিচে নামিযা আসিলেন। ব্যগ্রস্ববে এক ভক্তকে কহিলেন, "তাড়াতাড়ি একটা পাতায কিছু অন্ন ডাল তবকাবী মেখে নিযে এসো।"

আদেশ পালিত হইলে ভক্তটিকে নিয়া দ্রুতপদে তিনি মঠেব বাহিবে আসিলেন, সম্মুখেব বাস্তা দিযা বেশ কিছুটা অগ্রসব হইযা গেলেন। তাবপব সম্মুখে দেখা গেল, একটি দীন দবিদ্রা বমণী বাস্তাব ধাবে অসাড় হইযা শুইযা আছে। বাবাজী ভক্তটিকে নির্দেশ দিলেন, "পাতাটি ওব সামনে বেখে দাও।"

একটু লক্ষ্য কবিতেই সঙ্গী ভক্তটি চিনতে পাবিলেন মেযেটিকে। এ সেই বৈবাগিণীব বেশধাবিণী যুবতী, দিনেব পব দিন যে বাবাজীব মঠেব সম্মুখে দণ্ডাযমান বহিযাছে, আশ্রয ভিক্ষা চাহিতে আসিযাও মুখ ফুটিযা তাহা বলিতে পাবে নাই। বুঝা গেল, এই যুবতী যাহাতে মঠে কোনো ছলছুতায প্রবেশাধিকাব না পায, সেজন্যই বাবাজীব সেদিন সতর্কতাব অন্ত ছিল না।

যুবতীটি কঙ্কালসাব হইযা গিযাছে, নিজে সে মুমূর্ষ, আব কোলেব কাছে বহিযাছে সদ্য মৃত এক শিশু।

করুণাঘন নযনে মেযেটিব দিকে তাকাইযা, বাবাজী তাঁহাব শিযবে গিযা দাঁডাইলেন, জপ কবিতে লাগিলেন মহানাম।

বামদাস বাবাজী মহাবাজ একবাব স্থানীয ভক্তদেব আমন্ত্রণে ববিশালেব ভোলা শহবে যান। অখণ্ড নামযজ্ঞ সাবাদিন সেখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভোববেলায স্বগণসহ বাবাজী নিকটস্থ খালে স্নান কবিতে গিযাছেন, সেখানে কযেকটি উচ্ছৃংখল ধবনেব যুবকেব সঙ্গে দেখা। একটি যুবক ইযাবাকিব ঢঙে বলিযা উঠে, "কি বাবাজীবা, আপনাবা তো সব যুগল উপাসক, আমাদেব যুগল সাধনা। তা সঙ্গেব লেডীগুলো কোথায ?"

তাব এই বিদ্রূপেব আমোদ সঙ্গী যুবকেবা উপভোগ কবে, উচ্চস্ববে তাহাবা হাসিতে থাকে।

বাবাজী মহাবাজ নীববে ডেঁপো ছেলেটিব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিযা আছেন, প্রশান্ত বদনে ফুটিযা উঠিযাছে মৃদু হাস্যেব বেখা।

কি জানি কি ভাবিযা দুষ্ট যুবকেব দল অতঃপব বাবাজী ও তাঁহাব ভক্তদেব আব বেশী ঘাঁটায় নাই, সেখান হইতে ধীবে ধীবে তাহাবা সবিযা পডে।

এক মাস পরের কথা। বাবাজী মহারাজ তখন কলিকাতায়। পবিত্র রথযাত্রা উৎসব আসন্ন, এ উপলক্ষে তিনি দলবল নিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন।

স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। এক বিরাট লোহার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে সেখানকার তরুণ মালিক উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "জয় নিতাই! ও বাবাজীমশায়, এদিকে আসুন।"

বাবাজী সদলে দোকানে গিয়া উঠেন, দেখেন এ যে সেই বরিশাল ভোলার উদ্ধত যুবকটি। ফিটফাট বাবু, গদিতে বসিয়া এই দোকান চালাইতেছেন। তাড়াতাড়ি গদি হইতে নামিয়া যুবকটি কহিলেন, "বাবাজীমশায় চিনতে পারেন আমায়? ভিক্ষায় বেরিয়েছেন? এই নিন কিছু ভিক্ষা।

একটি দশ টাকার নোট বাবাজীর হাতে দিয়া আবার ভক্তিভরে প্রশ্ন করিলেন, ' এ বছর বরিশালের দিকে আর যাবেন না?"

"ঠাকুরের ইচ্ছা হলেই যাওয়া হবে।" উত্তর দেন বাবাজী মহারাজ। তারপর দলবল নিয়া আবার পথ চলিতে থাকেন।

বাবাজী মহারাজের চেলারা এ সময়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে থাকেন, ভোলা শহরের সে উদ্ধত যুবকটি কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। বাবাজী মহারাজের কৃপা-দৃষ্টিপাত হয়েছে, না জানি ইহার অদৃষ্টে কি পরিণতি লেখা রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হুগলীর ঘণ্টেবাজারে রামদাস বাবাজী এক অখণ্ড নামযজ্ঞে যোগ দিতে আসিয়াছেন। তিন দিন পরে অনুষ্ঠান সাঙ্গ হইয়া গেল। সেদিন বিকেলবেলায় বাবাজী মহারাজ আহ্নিকে বসিয়াছেন, এ দিকে অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। প্রসাদ বিতরণের আয়োজন চলিতেছে। হঠাৎ আহ্নিকের আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া বাবাজী মহারাজ অন্দর মহলের দরজা দিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হন, ধাবিত হন দ্রুতপদে। সঙ্গী কয়েকজন ভক্ত এ দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও করেন বাবাজীর অনুসরণ।

প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরমহাশয় এদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা উদ্বোধন পত্রিকায়, 'সঙ্গে ও প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন

গঙ্গার ধারে বড় রাস্তা। সেখানে গিয়ে বাবাজীমশায় থামলেন। অদূরে কতক-গুলি বালক একটা গোলমালের সৃষ্টি করছিল। বাবাজীমশায়কে দেখেই তাদের কতকগুলি সরে গেল এবং একটা লোক চীৎকার করতে করতে ছুটে এল বাবাজীমশায়ের কাছে। সে ব্যাকুল স্বরে বলছে—'বাবা! বাবা! এরা আমায় মারছে, এই দেখুন বাবা, আমার পিঠটা ফাটিয়ে দিয়েছে। এরা আমায় পাগল বলছে। বাবা, এদের তুমি মারো।'

বলেই, নিরাপদ আশ্রয়ের মতো বাবাজীমশায়ের সম্মুখে সে দাঁড়াল। আর সেই বালকদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

লোকটির একমাথা উস্কখুস্ক চুল, গায়ে কিছুই নাই, পরনে একটা ছেঁড়া ভোট কম্বল,

পা দুটি খালি। এক মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। বাবাজীমহাশয় পরম গম্ভীর। চোখ দুটিতে জলের ধারা।

—বাবাজীমহাশয়কে কিছু বলতে হলো না। ছেলের দল শান্ত হয়ে একে একে সরে পড়লো। বাবাজীমহাশয়ের ইঙ্গিতে সেই পাগলটি আমাদের সঙ্গে এল। তাকে প্রথমে প্রসাদ পাওয়ানো হলো। তারপর তাকে যখন গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে মুখ মাথা কামিয়ে স্নান করিয়ে আনা হলো, তখন সকলে সবিস্ময়ে চিনলেন, ইনিই বরিশালের সেই উদ্ধত যুবক, হরেন, কলকাতার ধনী লৌহ ব্যবসায়ী। উঃ কি বিচিত্র তার পরিণাম।

—শ্রীগুরুদেব সেইদিনই তাঁকে আর এক 'পাগল' আমাদের পরম গুরুদেবের নবদ্বীপের আশ্রমে, প্রখ্যাত সমাজবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন। ক'দিন পরেই বাবাজীমহাশয় ঐ শ্রীধামে গেলেন, তখন তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হলো। প্রায় মাসখানেক পরেই নন্দকাকা তাঁকে ভেক (বেশাশ্রয়) দিলেন, নাম হলো, হরিদাস।

—ইনি নিত্য করতাল বাজিয়ে শ্রীনবদ্বীপে ভিক্ষা করতেন। প্রায় এক বৎসর নবদ্বীপে থাকার পর শ্রীবৃন্দাবনে যান। সেখানে গিয়ে দিনান্তে একবার মাধুকরী, রুখা-শুখা রুটি ভিক্ষা ক'রে জীবনযাপন করতেন। আর সর্বদা নামকীর্তন করতেন, তাঁর চোখ মুখে সব সময় অশ্রুর প্লাবন বয়ে যেতো। বেশ কয়েক বছর ব্রজে কাটিয়ে সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

বৈরাগ্যে ও অনুরাগে, ত্যাগ দৈন্যে ও সিদ্ধির প্রদীপ্ত প্রভাব কারুণ্যে ও বীর্যে, পূর্ণ ছিল বাবাজী মহারাজের বৈষ্ণবীয় মহাজীবন। প্রভু জগদ্বন্ধু ও শক্তিধর সিদ্ধ বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর কৃপায় যে সাধনবীজ তাঁহার জীবন-আধারে উপজিত হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহা হইয়া উঠিয়াছিল পুষ্পিত ও ফলিত। শত শত ভক্ত সাধকের আলোক-দিশারীরূপে রামদাস বাবাজী অধিকার করিয়াছিলেন এক অনন্যসাধারণ ধর্মনেতার স্থান।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈচিত্র্যময় পরম মধুর নরজীবনের উপর নামিয়া আসে চির-বিরতির যবনিকা। আপ্তকাম মহাপুরুষ নিতাই-গৌরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রয়াণ করেন তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত অপ্রাকৃত ব্রজধামে।

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর

নামমূর্তি শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপার্ষদ হরিদাস ঠাকুর বাঙলার অঙ্গনে নামসাধনার পরম পবিত্র প্রস্তাবনাখানিই গাহিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রীহরিদাস জন্মগ্রহণ করিলেন; যে বেগবতী নামকীর্তনের রসধারায় সমগ্র উত্তর ভারত প্লাবিত হইবে, প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে একক প্রচেষ্টায় এই মহাসাধক সেই তটিনীর প্রবাহক্ষেত্র রচনা করিয়া গেলেন।

বাঙলার সমাজজীবনের স্তরে স্তরে তখন পঙ্কিলতার ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুষ্ক জ্ঞান বিচারের কূটতর্কের উত্তেজনায় মনীষীসমাজ চঞ্চল। অপর দিকে পীর খাঁ জাহান আলি ও তাহের আলির অত্যাচারে ধর্মত্যাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই সামাজিক সঙ্কটের মুখে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। মুসলমান গৃহে পালিত এই মহাবৈষ্ণবের অভ্যুদয় সেদিনের জাতি-বিপর্যয়ের দিনে বিধাতাপুরুষের এক কল্যাণময় আশীর্বাদরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

চতুর্দশ শকাব্দের শেষ পাদের কথা। বুঢ়ন পরগনার মধ্য দিয়া তখন সোনাই নদীর উচ্ছল জলধারা প্রবাহিত হইত। নদীতটে প্রসারিত শান্তি-স্নিগ্ধ কলাগাছি গ্রামখানি তখনকার দিনে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই গ্রামের মনোহর চক্রবর্তী ছিলেন পরম ভাগবত। নন্দকিশোর ও বাসুদেব এই দুই বিগ্রহের একনিষ্ঠ সেবায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নে চক্রবর্তী ঠাকুরের দিন কাটে। পত্নী উজ্জ্বলাদেবীর অঙ্কে দুই বৎসরের অনিন্দ্যসুন্দর শিশু খেলিয়া বেড়ায়। উজ্জ্বলকান্তি এই নবজাত শিশুর দেহে অপরূপ লক্ষণাদি দর্শন করিয়া ঠাকুরমহাশয় এক এক সময় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়েন। পাড়ার প্রবীণগণের কাছে এই শিশু এক পরম বিস্ময়।

১৩৭৪ শকাব্দের এক সন্ধ্যায় মনোহর চক্রবর্তীর গৃহে এক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় নামিয়া আসিল। চক্রবর্তী ঠাকুর অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীপ্রাণা উজ্জ্বলা-দেবীর অন্তরে সহমরণের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। মনোহর চক্রবর্তী ও তাঁহার পত্নীর চিতাগ্নি জনতার ভিড় ও কোলাহলের মধ্যে ধীরে ধীরে নির্বাপিত হইয়া আসিল। কলাগাছির অপর পারস্থিত হাকিমপুরে হবিবুল্লা কাজী বাস করিতেন। হবিবুল্লা মনোহর ঠাকুরের এক প্রীতিমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন। মনোহরের গৃহ হইতে এই [illegible] নাবালক শিশুটিকে ক্রোড়ে উঠাইয়া হবিবুল্লা স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। ইহা [illegible] বিচারকপদে সমাসীন প্রতাপশালী হবিবুল্লাকে নিবৃত্ত করিবার সাহস সেদিন কলাগাছির কোনো ব্যক্তিরই ছিল না। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, হরিদাস মুসলমান গৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই জাতিচ্যুত হরিদাসের নামব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতারূপে উত্থান এক বিস্ময়কর কাহিনী। হবিবুল্লা কাজীর গৃহে লালিত শিশুর মধ্যে মহাপ্রভুর [illegible] বিধ্বংসী, মহানামধৃত যে শক্তিবীজ লুক্কায়িত ছিল তাহা সেদিন কে বুঝিয়াছিল?

অসামান্য ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নামনিষ্ঠা দ্বারা হরিদাস ঠাকুর প্রমাণ করিলেন যে, সাধন-জগতের অগ্রগতিতে জাতি বর্ণের অন্তরায় অনতিক্রম্য নয়।

কাজী হরিবল্লা ও তাঁহার স্ত্রীর আদরযত্নে হরিদাস দিনে দিনে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। বালকের সুগৌর অঙ্গকান্তি, আজানুলম্বিত বাহু, অপরূপ মুখশ্রী হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনোহরণ করিত। হরিদাসের অপূর্ব মেধার পরিচয় পাইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি উর্দু, সংস্কৃত ও বাঙলায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

হরিদাস কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। হরিবল্লা কাজী ও তাহার পত্নীর সযত্ন লালনে তাঁহার কোনো কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু প্রাচুর্যের সংসারে একি চরম দৈন্য-বোধের মহাযন্ত্রণা—কিশোর অন্তরে একি অভূতপূর্ব পরম তৃষ্ণার উন্মেষ।

মুসলমান অন্নে পালিত হরিদাসের স্মৃতিতে নিরন্তর হরিনামের ঝংকার অনুরণিত হয়, বিস্ময়ে কিশোরচিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উচ্চকিত হরিদাস গৃহের বাহিরে, অরণ্যে, প্রান্তরে তাঁহার অন্তরের প্রার্থিত ধন খুঁজিয়া ফিরেন। [illegible]ব্রহ্মের চিহ্নিত অধিকারীর কণ্ঠে স্বতঃ উৎসারিত হরিনাম গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। অদ্বৈত-শিষ্য, ঈশান নাগর জাতিস্মর, মহাসাধক হরিদাসের এই অন্তঃসলিলা নামরস ফল্গুধারার ইঙ্গিত তাঁহার 'অদ্বৈত প্রকাশে' দিয়া গিয়াছেন

> ব্রহ্ম হরিদাস লোকে
> জাতিস্মর কয়,
> পূর্ব সংস্কারে
> সদা হরিনাম লয়।

পূর্বজন্মার্জিত সাধন-সঞ্চয় বলে হরিদাসের জীবনে নামকীর্তনের অমৃতধারা উৎসারিত হইতে লাগিল।

এদিকে হরিদাসের মাতৃপ্রতিম কাজী হরিবল্লার স্ত্রী তাঁহার পুত্রের বিবাহোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বিপন্ন হরিদাস ঐ আসন্ন বন্ধন হইতে মুক্তির আশায় অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কাজীর গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। কিশোর-কণ্ঠে মধুমাখা হরিনামের সোনা সোনাই নদীর তটে তটে ঝরিয়া পড়িল। হরিদাসের অন্তরে মহামন্ত্রের আহ্বান আসিয়াছে—কিশোর বৈরাগী উচ্চকণ্ঠে সেই বৈভব বিলাইয়া চলিলেন।

হরিনামামৃত পানে হরিদাস উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। নামের মালা সাধকের অন্তরে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। সুমধুর 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি ভক্ত চারণের কণ্ঠ হইতে উচ্চৈস্বরে নির্গত হইয়া চলিয়াছে। বেনাপোলে উপনীত হইয়া হরিদাস এক নিভৃত ভজনকুটীর নির্মাণ করিলেন। পবিত্র তুলসীমঞ্চ তাঁহার কুটীর সম্মুখে স্থাপিত হইল—ভজন ও নাম-গানের অজস্র ধারা দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হরিনাম-সাধক ঠাকুর হরিদাসের আকর্ষণে অগণিত ভক্তের ভিড় জমিয়া গেল।

সমাগত ভক্তজন হরিদাস ঠাকুরের সেবার জন্য ফলমূলাদি লইয়া আসিতেন। নিস্পৃহ মহাসাধক 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারিত করিয়া উহা জনতার সমক্ষে ছড়াইয়া দিয়া আনন্দ

করিতেন। নামমাহাত্ম্যের প্রথম প্রচারক হরিদাস ঠাকুর নিজের অজ্ঞাতসারে এইভাবেই হরিলুঠের সৃষ্টি করিয়া যান—

ফল মূল মিষ্টান্ন বলিয়া হরি হরি,
চারিদিকে ছড়ালেন আনন্দে নৃত্য করি।
সর্বলোক প্রসাদ বলিয়া তাহা খায়,
কেহ ধরে কেহ পড়ে কেহ বা গড়ায়।
হৈল হরিলুঠ সৃষ্টি শুন সমাচার,
ধন্য বেনাপোল যথা প্রথম প্রচার॥

নিষ্কিঞ্চন মহাবৈরাগী ভজনকুটীর প্রাঙ্গণে সমাগত বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করিতেন—আহার্যের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে হরিনাম লওয়াইতেন। নাম-ব্রহ্মের মহাবীজ হরিদাস ঠাকুর শিশুজীবনের উর্বরক্ষেত্রে এমনই করিয়া ছড়াইয়া গিয়াছিলেন।

ভক্তমণ্ডলীর ভিড় কমিয়া গেলে সাধক হরিদাস তাঁহার মালা লইয়া আপন কৃত্যে উপবিষ্ট হইতেন। প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপের মহাসঙ্কল্প তিনি ইতিমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই জপ চলিত উচ্চৈস্বরে—কীর্তনের ভঙ্গীতে গীত এই নামের মধুর ঝঙ্কার যাহারই কর্ণে প্রবেশ করিত তাহাকেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই সময়কার হরিদাস ঠাকুরের বর্ণনা দিয়াছেন—

নির্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন,
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্বাহন,
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।

এই প্রভাব ও পূজাই জটিলতার সৃষ্টি করিয়া বসিল। একদল ঈর্ষান্ধ ব্যক্তি স্থানীয় রাজা রামচন্দ্র খানের নেতৃত্বে হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিল। রামচন্দ্র চিরদিন বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন। কূটকৌশলী খান এই বৈরাগী সাধকের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া জনচক্ষে হেয় করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। হরিদাস ঠাকুরকে প্রলোভিত করিবার জন্য রামচন্দ্রের বাঁক্ষতা, গণিকা হীরা নটীর প্রয়াস কৌতূহলোদ্দীপক।

রাত্রির অন্ধকার হাঙ্গর নদীর দুই তটে ঘনাইয়া আসিয়াছে। বেনাপোলের উপকণ্ঠস্থ অরণ্যে হরিদাস তাঁহার নামকীর্তনে বিভোর রহিয়াছেন। পরম রূপলাবণ্যময়ী গণিকা হীরা অভিসারে বহির্গত হইয়াছে। মহাবৈরাগ্যবান্ সাধক হরিদাস আজ তাহার লক্ষ্য। আত্মবিশ্বাসশীলা হীরার ধারণা, তাহার যৌবনমদির পাত্রখানি বৈষ্ণব সাধুর ওষ্ঠে ধরিবামাত্র সে হতজ্ঞান হইয়া পড়িবে এবং রামচন্দ্র খানের প্রতিশ্রুত পুরস্কার তাহার মিলিবে।

নিশীথ রাত্রিতে নির্জন ভজনকুটীরে উপস্থিত হইয়া গণিকা হীরা হরিদাসের নিকট প্রেম নিবেদন করিল। পরম রূপসীর যৌবন আবেদনের সম্মুখে নিস্পৃহ হরি নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতই অচঞ্চল। কুলটার কুহককে উপেক্ষা করিয়া অবশেষে [illegible]

হরিদাস বলিলেন, 'আমার সংকল্পিত তিন লক্ষ নামজপ শেষ হউক তাহার পর তোমার প্রার্থনা আমি পূরাইব।' নির্দিষ্ট জপ-সংখ্যার পরিপূর্তি হয় নাই, হরিদাস ঠাকুর নটীকে পরদিন আবার আসিতে বলিলেন। উপর্যুপরি আরও দুই রাত্রি হীরা হরিদাসের ভজনকুটীরে প্রতীক্ষমাণা। রাত্রির গভীরে হরিদাসের তন্ময়তা গাঢ়তর হইয়া উঠে, নয়নে অপার্থিব জ্যোতিঃ, গণ্ডদেশে ভক্তিঅশ্রুর মুক্তধারা। নামসিন্ধু হরিদাসের সম্মুখে বসিয়া হীরার দেহে-মনে একি অপূর্ব দিব্য শিহরণ খেলিয়া যায়! তিন দিবসের সাধু-সান্নিধ্যে গণিকা হীরার একি আমূল পরিবর্তন। হরিনাম রসের মহারসায়ন তাহার সমগ্র সত্তাকে যেন গলাইয়া ফেলিতেছে। রূপোপজীবিনী হীরা আজ দিব্যরূপের আভাস পাইয়া বসিয়াছে। সঙ্গীত পারদর্শিনী হীরা নটীর অস্ফুট কণ্ঠে আজ হরি-নামের মহামন্ত্র অজ্ঞাতসারে গুঞ্জরিত। হরিদাসের নাম-রূপের প্রভাব রামচন্দ্রের গণিকাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল।

অনুতপ্তা হীরা হরিদাস ঠাকুরের পদপ্রান্তে পড়িয়া তাঁহার পরমাশ্রয় যাচ্ঞা করিল। কৃপালু হরিদাস হীরার অন্তরে নাম-বীজ রোপণ করিয়া আশীর্বাদ জানাইলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে রহিয়াছে—

ঠাকুর কহে খানের কথা
সব আমি জানি,
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে
দুঃখ নাহি মানি।
সেইদিন যাইতাম আমি
এ স্থান ছাড়িয়া।
তিনদিন রহিলাম তোমার
নিস্তার লাগিয়া।

হীরা গুরু আজ্ঞায় তুলসী চর্বণ করিয়া তিন লক্ষ নাম জপে ব্রতী হইয়াছে। তাহার বিপুল বিত্ত এখন তাহার ভারস্বরূপ। ইহার কতকাংশ বিতরিত এবং অবশিষ্ট অর্থ জনকল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল। বেনাপোল হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পর্যন্ত নির্মিত রাজপথ আজিও 'হীরার জাঙ্গাল' নামে কীর্তিত। স্বীয় সদ্গুরু হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থানে সে যে প্রশস্ত বর্ত্মনির্মাণ করিয়া যায় 'নটীর জাঙ্গাল' নামে আজিও উহা তাহার স্মৃতি বহন করে। সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া হীরা মহাধাম পুরীক্ষেত্রে গিয়া অবস্থান করে। হীরার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের অপার কৃপা ও তাহার বিস্ময়কর পরি-বর্তন কাহিনী সেদিনকার দিনে নামব্রহ্মের মাহাত্ম্য প্রচারে পরম সহায়ক হইয়াছিল। কুচক্রী রামচন্দ্র খানকে মার্জনা করিয়া হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করিলেন। হরিদাস ক্ষমা করিয়া গেলেও বিধাতার অনিবার্য ন্যায়দণ্ড রামচন্দ্রের উপর নিপতিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে দস্যুদলের আক্রমণকালে ভূগর্ভপ্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র খানের মৃত্যু ঘটে।

হরিদাস ঠাকুর অতঃপর ভ্রমণ করিতে করিতে চাঁদপুরে আসিয়া পেঁৗছিলেন। সপ্ত-

গ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারের গুরু শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে ঠাকুর রোজ ভিক্ষা গ্রহণ করেন আর নামের কীর্তন উচ্চারণ করিয়া ফিরেন। স্বধর্মনিষ্ঠ গোবর্ধন মজুমদার মহাশয় এই বৈষ্ণবসাধকের জন্য এক ভজনকুটির নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার বালক পুত্র রঘুনাথ তখন গুরু বলরাম আচার্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। ভক্তিরসের জীবন্ত বিগ্রহ, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি হরিদাস ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই রঘুনাথকে এই সময়ে আকর্ষণ করে। বালক এই তেজঃপুঞ্জ কলেবর, পরম ভাগবতের সেবায় প্রায়ই ব্রতী হইতেন। হরিদাসের সঙ্গ ও কৃপালাভের ফলে যে অধ্যাত্ম-বীজ রোপিত হয়, উত্তরকালে তাহাই এক মহীরুহে পরিণত হয়। ত্যাগ ও তিতিক্ষার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদে পরিণত হন। কবিরাজ গোস্বামী সত্যই লিখিয়াছেন —

'হরিদাস কৃপা করে
তাহার উপরে,
সেই কৃপা কারণ হইল
চৈতন্য পাইবারে।'

বলরাম আচার্য মজুমদারদের সপ্তগ্রামের রাজসভায় একদিন মহাসাধক হরিদাস ঠাকুরকে লইয়া যান। হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদার পরম শ্রদ্ধাভরে এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের অভ্যর্থনা করেন। হরিদাসের সাধনখ্যাতি তখন দিকে দিকে প্রচারিত। সপ্তগ্রামের সভায় হরিদাসের নামকীর্তনের সুখ্যাতি হইতেছিল। এক পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিলেন, নাম মাহাত্ম্যে পাপক্ষয় ও মোক্ষলাভ হয়। ভক্তবীর হরিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

হরিদাস কহে নামের
এ দুই ফল নহে
নামের ফলে কৃষ্ণপদ
প্রেম উপজয়ে।

প্রেমবিহ্বল মহাবৈষ্ণব নামের মহিমা কীর্তন করিতেছেন এবং সভাজন সেই পুণ্য কথা আকণ্ঠ পান করিতেছেন। অকস্মাৎ গোপাল চক্রবর্তী নামক এক অহংকারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হরিদাসের ভক্তি-ব্যাখ্যা ও তাঁহার নামজপের বিরুদ্ধে নানা অপমানসূচক কথা বলিতে লাগিলেন। এই ধৃষ্ট ব্যক্তির ব্যবহারে সভাস্থ সকলেই উত্তেজিত হইলেও হরিদাস পরম প্রশান্তির সহিত সকলকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিলেন, 'এই গোপালের কোন দোষ আমি দিই না। হরিনাম মাহাত্ম্য যে তর্কের গোচরীভূত নহে, তাহা উনি জানেন না। ভক্তিযুক্ত হইয়া যে নাম আশ্রয় করে, সেই তো শুধু নামের মাহাত্ম্য জানিতে পারে। আমি শ্রীভগবানের নিকট ইহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।' উদারবুদ্ধি করুণাময় হরিদাস সেদিন তাঁহার অপমানকারী গোপাল চক্রবর্তীকে স্বীয় উদারতায় ক্ষমা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু—

ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের
দোষ ক্ষমা করে।

কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা
সহিতে না পারে।

কথিত আছে যে, ভক্তদ্রোহী গোপাল চক্রবর্তী তিন দিবসের মধ্যেই ঘৃণ্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। অহংকারী ব্রাহ্মণের উপর বিধাতার এই রূঢ় দণ্ডাঘাত দর্শনে কিন্তু হরিদাসের দুঃখের অবধি রহিল না। অতঃপর তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

চাঁদপুর ত্যাগের পর হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। নামপ্রচারক মহাবৈষ্ণব হরিদাসের খ্যাতি ইতিমধ্যেই দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। হরিদাস শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সকাশে পৌঁছিলে আচার্য তাঁহাকে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাসকে আচার্য প্রভু নিজ সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। হরিদাসের নামকীর্তন ও আচার্য প্রভুর ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যায় আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

আচার্য এই মহাসাধকের শাস্ত্রজ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণে উৎসাহী হইলেন। হরিদাস লৌকিকভাবে জাতিচ্যুত, কিন্তু যে সাধন-শক্তিবলে আজ তিনি সমস্ত জাতিবর্ণের ক্ষেত্রসীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহার স্থায়িত্ব সাধনের প্রয়োজন। আগামী দিনের লোকগুরু, নামমাহাত্ম্যের প্রধান চারণ হরিদাসকে শ্রীঅদ্বৈত দীক্ষা প্রদানে মনস্থ করিলেন। লৌকিক ও সামাজিক দিক দিয়া হরিদাসের এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আচার্য সেদিন বুঝিয়াছিলেন। মস্তক মুণ্ডন করাইবার পর, গঙ্গাগর্ভে লইয়া গিয়া আচার্য প্রভু হরিদাসের ললাটে তিলক ও কণ্ঠে তুলসীর মালা পরিধান করাইয়া দিলেন। তাহার পর—

কটিতে কৌপীন ডোর
দিলেন বান্ধিয়া,
হরিনাম দিল প্রভু
শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রভু কহে তোর নাম
ব্রহ্ম হরিদাস,
হরিদাস কহে মুঞি
হই তব দাস।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে ভোজন করিতেন—শুধু তাহাই নহে অকুতোভয় আচার্য প্রভু এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাঁহাকে সর্বাগ্রে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজনের সম্মান দান করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই একদল কুচক্রীর মুখে হরিদাসের নিন্দা চলিয়া আসিতেছিল। 'হরিবুল্লা কাজীর বেটা ব্রহ্ম হরিদাস' বলিয়া কেহ কেহ শ্লেষাত্মক মন্তব্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতের এই দুঃসাহসিক কার্যে শান্তিপুরের ব্রাহ্মণসমাজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন আচার্য যদি 'যবন হরিদাসে'র সঙ্গ পরিত্যাগ না করেন তবে তিনি সমাজে স্থান পাইবেন না। সমাজের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করায় শ্রীঅদ্বৈত সমাজচ্যুত হইলেন। নিজের জন্য আচার্য প্রভুর এই নির্যাতন দর্শনে হরি-

দাসের মনস্তাপের অবধি রহিল না, অপরের অজ্ঞাতসারে তিনি একদিন শান্তিপুর হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আচার্যের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সময়ে হরিদাস দীর্ঘদিন স্থানান্তরে থাকিতে পারেন নাই। বিশেষত শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার জন্য সামাজিক অত্যাচার ভোগ করিতেছেন, ইহা তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল। কয়েকমাসের মধ্যে তিনি আর একবার শান্তিপুরে আগমন করিলেন। এইদিনের আত্মপ্রকাশ জনমানসে হরিদাসের মাহাত্ম্য প্রচারিত করিয়াছিল। শান্তিপুরে এক ধনাঢ্যের গৃহে বিবাহানুষ্ঠানের সমারোহ চলিয়াছে। সম্মুখে এক বৃক্ষতলে তেজঃপুঞ্জ কলেবর এক দিব্য মহিমা-সম্পন্ন সন্ন্যাসীর অবস্থিতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সন্ন্যাসীর নয়নের দীপ্তি, মহিমাব্যঞ্জক দেহসৌষ্ঠব এবং অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান সমবেত ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিল। সমাজের ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর ভোজনের পূর্বে সকলে সাগ্রহে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া এই মহাপুরুষকে আহার্য প্রদান করেন এবং করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন।

নবাগত সন্ন্যাসীর সুখ্যাতি শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলেন। নিজ প্রিয় শিষ্যকে আবির্ভূত দেখিয়া আচার্য প্রভুর আর আনন্দ ধরে না। হরিদাসকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আচার্য তাঁহাকে সানন্দে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া এইবার অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, হরিদাস-ঠাকুর ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষ, তাঁহার জাত বিচারের প্রশ্ন অবান্তর। তিনি সমাজের সকলেরই নমস্য।

শান্তিপুরে গঙ্গাতটে হরিদাস ঠাকুর এক সাধনগুহা নির্মাণ করিলেন। মৃত্তিকা-গর্ভস্থ এই নির্জন ভজনগৃহে তিনি বাস করিতেন এবং সমগ্র গঙ্গাসৈকত তাঁহার নামব্রহ্মের সংগীতঝংকারে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। হরিনামোন্মত্ত হরিদাস একদিন স্বীয় গুম্ফা মধ্যে 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন। দ্বারদেশে উপবিষ্ট কৃষ্ণদাস বাবাজী—পূর্বাশ্রমের লাউরের রাজা দিব্য সিংহ এই দিব্যোন্মাদের দর্শনে নয়ন সার্থক করিতেছেন। এই সময়ে সেখানে এক তর্কচূড়ামণি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন। হরিদাস ক্ষণে ক্রন্দন, ক্ষণে হাস্য করিতেছেন। কখনও বা হরিনামের পুলকোচ্ছ্বাসে তিনি মাতোয়ারা, কখনো বা উদ্দণ্ড নৃত্য শেষে মৃতবৎ শায়িত।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই বিপরীত ভাবোচ্ছ্বাস দর্শনে কৃষ্ণদাস বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কি কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক বাউল? কৃষ্ণদাস নিজে পরম ভাগবত, তদুপরি আচার্য শ্রীঅদ্বৈত হইতে তিনি সাধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের মহিমা তাঁহার সুপরিজ্ঞাত। নামপ্রেমে মাতোয়ারা এই মহাবৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। ভগবদ্ভাবে তন্ময় হরিদাস ঠাকুরের এতক্ষণ আত্মসংবিৎ ছিল না। এইবার যখন তিনি কৃষ্ণতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মুখর হইয়া উঠিলেন ভক্তিশাস্ত্রের মধুপ্রবাহ এবং বৈষ্ণব সাধনের অমৃতধারা উদ্বেলিয়া উঠিল। এই সময়ে হরিদাসের নিকট শ্রীঅদ্বৈতের আগমনে গঙ্গাসৈকতে হরিকথার আনন্দ-হাট বসিয়া গেল। উদ্দীপিত হরিদাস ঠাকুর 'অনাদিরাদি' গোবিন্দের প্রেমানন্দময় তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া চলিলেন। দিব্যভাবাবিষ্ট সাধক উর্ধ্ববাহু হইয়া স্তবগান গাহিয়া চলিলেন—

অলং ত্রিদিববার্ত্তযা কিমিতি
সার্বভৌমশ্রিযা।
বিদূবতববর্তিনী ভবতু
মোক্ষ লক্ষ্মীবপি ॥
কলিন্দ গিবি-নন্দিনী-তট
নিকুঞ্জ পুঞ্জোদবে।
মনোহবীতি কেবলং
নবতমাল নীলং মহঃ ॥

স্বর্গেব বার্তা ও ত্রিভুবনেব প্রভুত্বে আমাব প্রয়োজন কোথায়? মুক্তিব মহাবৈভব আমা হতে দূবে থাকুক। কালিন্দিব সুবম্য তটে, কুঞ্জবিলাসী নব তমালনীল মাধব আমাব মন হবণ কবিযা লইযাছে। চতুর্বর্গ ফলেব মোহ ত্যাগ কবিযা আমি শুধু তাঁহাবই অনুধ্যান কবিতেছি।

পুলকাঞ্চিত দেহে শ্রীঅদ্বৈত হবিদাসেব ববতনু প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ কবিলেন— প্রশস্তি জানাইলেন:

তুহু শুদ্ধ ভাগবতগণেব উত্তম।
তব স্পর্শে জীবে হয ভক্তিবীজোদ্গম ॥

তর্কচূড়ামণি মহাশয় এতক্ষণ মোহাবিষ্ট অবস্থায হবিদাস ও শ্রীঅদ্বৈতেব ভক্তি-বস-তবঙ্গে দোল খাইতেছিলেন। ইতিমধ্যেই হবিদাস ঠাকুবেব নাম মাহাত্ম্য, কীর্তন ও ভক্তি রসাযনেব উত্তাপ তাঁহাব তর্কনিষ্ঠ অন্তবকে দ্রবীভূত কবিযা দিযাছে। হবিদাসকে আলিঙ্গন কবিবাব পব, তিনি হবিদাস গুরু শ্রীঅদ্বৈতেব চবণে নিপতিত হইলেন, তাঁহাব আশ্রয ভিক্ষা কবিলেন। শ্রীঅদ্বৈতেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিবাব পব এই তর্কচূড়ামণিব জীবন রূপান্তবিত হয। প্রেম-ভক্তিবসে বসায়িত হইযা ইহা দিব্যরূপে মঞ্জবিত হইযা উঠে। উত্তবকালে বৈষ্ণবজগতেব সুপ্রসিদ্ধ পদবর্তা যদুনন্দন আচার্যরূপে ইনি পবিচিত হন, ইঁহাব পদাবলীব অমৃতধাবায জনসমাজ পবিতৃপ্ত হয়। শ্রীবঘুনাথ দাসগোস্বামীব গুরুরূপে ইনি বৃত হইযাছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতেব নিকট বিদায গ্রহণ কবিযা হবিদাস ঠাকুব অতঃপব শান্তিপুবেব নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। 'মহাবৈবাগ্য শুদ্ধ হেম কলেবব'—এই মহিমময বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে ফুলিয়াব ব্রাহ্মণসমাজ পবম সমাদবে গ্রহণ কবিলেন। হবিদাস ঠাকুবেব দিব্যশ্রীমণ্ডিত সুগৌব তনু, নৈষ্ঠিক ভাগবত জীবন ও নাম প্রচাবেব আকর্ষণে বহু ভক্ত-সমাগম হইতে লাগিল। ফুলিযা ও শান্তিপুবেব গঙ্গাতীব বাহিযা প্রেমোন্মত্ত হবিদাস উচ্চৈঃস্ববে নামগান কবিযা চলিতেন। সুমধুব হবিনাম-ঝঙ্কাবে স্থাবব-জঙ্গম অনুবণিত হইযা উঠিত। দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইযা হবিদাস কখনো বোদন, কখনো হাস্যালাপ করিতেছেন। কখনো বা মূর্ছিত হইবার পব তাঁহাব কণ্ঠ হইতে প্রেম-প্রলাপ নির্গত হইতেছে। প্রেমাবিষ্ট হবিদাসেব দেহে এই সময়ে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবেব প্রকাশ ঘটিত, আব ইহা দর্শনে সমাগত জনমণ্ডলী বিস্ময় বিহ্বল হইয়া পডিত।

হরিদাসের নাম প্রচার তৎকালে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার অতুল প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থানীয় কাজী স্বচক্ষে দেখিতে পারেন নাই। এই গোরাই কাজীর অভিযোগক্রমে হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া হুসেন শাহের দরবারে আনয়ন করা হইল। নাম-মাহাত্ম্য প্রচারক শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অগ্নিপরীক্ষা সমাগত। ইষ্টদেব শ্রীগোবিন্দ আজ নাম-প্রচারের যে মূল্য তাঁহার মহাভক্তের নিকট দাবি করিয়াছিলেন সেই মূল্যই হরিদাস কর্তৃক সানন্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। এমনতর উচ্চমূল্য দিয়াছিলেন বলিয়াই সমসাময়িককালে হরিদাস নামের ভাণ্ডারীরূপে পরিচিত হন। এই অপূর্ব অগ্নিশুদ্ধির ফলেই হরিদাস হরিনাম প্রচারের শ্রেষ্ঠ অধিকারী পুরুষরূপে মহাপ্রভু কর্তৃক চিহ্নিত হইয়াছিলেন। তাই উত্তরকালে উদ্ধত বল্লভ ভট্টের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিতে শুনি

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল॥

সর্বজ্ঞাতা মহাপ্রভুর বিনয় বচনের আক্ষরিক অর্থ না লইয়াও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, স্বীয় অন্যতম প্রধান পার্ষদ হরিদাসকে তাঁহার প্রচারিত নাম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারীরূপে তিনি বরণ করিয়াছিলেন।

বাদশাহ হুসেন শাহের নিকট গোরাই কাজী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল যে, হরিদাস নিজে মুসলমান হইয়া হিন্দুর ধর্ম ও আচার গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমানদের ধর্মাচরণে শিথিলতা আসিতেছে। তাই তাঁহার শাসন প্রয়োজন।

হরিদাস কিন্তু অকুতোভয়। এই বিচারের প্রহসন এবং ফলাফলের নির্মমতা তিনি বুঝিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে যে তাঁহার শ্রীগোবিন্দের সুচতুর লীলা বর্তমান। দুঃখের সুতীব্র মন্থনের মধ্য দিয়া ইহা যে অমৃত সৃষ্টির চিদাচরিত প্রয়াস।

হরিদাস বাদশাহের সম্মুখে তাঁহার আপন ধর্মবোধের ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন। যে উচ্চতর অধ্যাত্ম-স্তরে উপনীত হইয়া মানুষ সমস্ত জাত-বিচার ও সামাজিক ভেদবুদ্ধির পরপারে পৌঁছায়, তাহার তাৎপর্য তিনি ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এ যে তত্ত্ব বিচার নয়, সামাজিক ভেদবুদ্ধিজাত প্রতিহিংসা সাধনে গোরাই কাজী তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বাদশাহ হুসেন শাহ হরিদাসকে অনেক বুঝাইলেন, 'তুমি মুসলমান, মুসলমানের মতই ধর্ম ও আচারপরায়ণ হও। তুমি তোমার ঐ হরিনাম কীর্তন ত্যাগ কর।' হরিদাস ঠাকুর তাঁহার আপন বিশ্বাস ও ধৃতি জীবন থাকিতে ছাড়িবেন না। কাজী ও বাদশাহের ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখে অচঞ্চল বীর সাধক পরম প্রশান্তির সহিত সতেজে উত্তর দিলেন—

খণ্ড খণ্ড যদি হই
যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না
ছাড়ি হরিনাম॥

সত্যধর্মী আত্মবিশ্বাসী সাধকের তেজঃব্যঞ্জক বাণীর মর্ম বাদশাহ বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। গোরাই কাজীর প্ররোচনায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তিনি এক নির্মম শাস্তি ঘোষণা করিলেন। বজ্রবন্ধ হরিদাসকে রাজধানীর বাইশটি বাজারে ঘুরাইয়া বেত্রদণ্ড প্রহারে হত্যা করা হইবে। বাদশাহের পাইকেরা বন্দী হরিদাস ঠাকুরকে প্রতি বাজারে লইয়া গিয়া বাদশাহের হুকুম অনুযায়ী নির্মম প্রহার চালাইতে লাগিল। বেত্রাঘাতে হরিদাসের সর্বদেহের চামড়া ফাটিয়া প্রবল বেগে রক্ত ঝরিতেছে। তীব্র আঘাতে টুকরা টুকরা হইয়া মাংসখণ্ড স্থানচ্যুত হইতেছে।

এই বীভৎস দৃশ্য যাহারা দর্শন করে, তাহারাই চক্ষু মুদিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। যমদূতের মত নির্মম পাইকের দল মহাসাধকের অঙ্গে আঘাতের পর আঘাত হানিয়াই চলিয়াছে। কেহ কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া ঘাতকদের পদতলে পতিত হইতেছে, হরিদাস ঠাকুরের প্রাণরক্ষার অনুনয় জানাইতেছে।

ক্ষতবিক্ষত দেহে দরদর ধারে রক্তস্রোত ঝরিয়া পড়িতেছে। একান্ত সাধক হরিদাস কিন্তু হরিনাম জপ করিয়াই চলিয়াছেন—সংকল্পিত তিন লক্ষ নাম জপ যে তাঁহাকে আজিকার দিনের পুরাইতে হইবে!

ঘাতকদের হইয়াছে মহা বিপদ। বাদশাহের হুকুমমত পর পর বাইশটি বাজারে বেত্রাঘাত করিয়া চলিয়াছে কিন্তু এই বীতরাগ-ভয়ক্রোধ সাধুর মৃত্যুর লক্ষণ কই? কর্তৃপক্ষের আদেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনে তাহাদের প্রহারের নির্দয়তাও বাড়িয়া উঠিল। পরম কৃপালু হরিদাস কিন্তু এই ঘাতকদিগকে প্রশান্ত চিত্তে ক্ষমা করিয়াই চলিয়াছেন—

সবে যে সকল পাপীগণে
তারে মারে,
তার লাগি দুঃখ মাত্র
না ভাবেন অন্তরে।
এ সব জীবেরে প্রভু
করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহে
এ সবার অপরাধ।

নগরীর জনসাধারণ হরিদাস ঠাকুরের এই ক্ষমাসুন্দর অকুতোভয় মূর্তি, নিরন্তর নামকীর্তনের দিব্য আবেশ দর্শনে, হতবাক হইয়া রহিল।

বাদশাহের পাইকদল এবার পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ এই সাধুকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাহাদের নিস্তার নাই। প্রাণঘাতী প্রহারের আঘাতে জর্জরিত হইবার পর একবারও তাঁহার মুখ দিয়া যন্ত্রণাসূচক শব্দ বাহির হয় নাই, বিদ্বেষের একটি বাণীও নির্গত হয় নাই।

বাদশাহের প্রহরীদলের সন্দেহ জাগিল, হয়তো বন্দী সত্যই একজন বড় পীর বা ফকীর হইবেন। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা হরিদাসের শরণাপন্ন হইল। তাহারা বলিল, ঠাকুর এত প্রহারেও তোমার প্রাণ যাইতেছে না, এজন্য কাজীর হস্তে আমাদের

প্রাণ যাইবে। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী শরণাগত প্রহরীদলের বিপদ মোচনে অগ্রসর হইলেন। হরিনাম জপ সারিয়া হরিদাস ধ্যানাবিষ্ট হইয়াছেন। ধ্যানের গভীরতম স্তরে সমাধির চৈতন্যসমুদ্রে হরিদাস যখন অধিষ্ঠিত, প্রহরীদল তখন বিস্মিত হইয়া দেখে—তাঁহার দেহে জীবনের স্পন্দন ও শ্বাসের চিহ্নমাত্র নাই। বন্দীকে মৃতজ্ঞান করিয়া বাদশাহের অনুচরগণ তাঁহার দেহ গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

সমাধি অন্তে হরিদাস ঠাকুর চক্ষু উন্মীলন করিলেন। গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া দেহখানি তটপ্রান্তে আসিয়া ঠেকিল। সংবিৎপ্রাপ্ত জীবনে আবার জপ ও কীর্তনের জোয়ার আসিয়াছে, ভক্তের জয় ঘোষিত হইয়াছে। মহাপুরুষ হরিদাসের অলৌকিক বিভূতির কথা তখন সমস্ত রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশসুদ্ধ ভক্ত ও সজ্জন এই মহাসাধকের পশ্চাতে হরিনামের তরঙ্গ তুলিয়া অগ্রসর হইল।

কথিত আছে, গৌড়ের বাদশাহ এই অসামান্য পুরুষের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বকৃত দোষের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। হরিনামের মহাচারণ হরিদাসের কর্মে ও আচরণে এইবার আর কোনো প্রতিবন্ধক রহিল না। নিরঙ্কুশভাবে তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হইলেন। ধর্মনিষ্ঠ সদাচারী ব্যক্তিগণ হরিদাস ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের নির্যাতন বিষয়ে কেহ অত্যাচারীদের নিন্দা করিলে পরম ভাগবত দীনাতিদীন ভক্ত হরিদাস সজল নয়নে উত্তর দিতেন—

প্রভু নিন্দা আমি যে
শুনিলাম অপার।
তার শাস্তি করিলেন
ঈশ্বর আমার॥
ভাল হইল ইথে বড়
পাইনু সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন
বড় দোষ॥

'শুদ্ধধর্ম আপাপবিদ্ধম' হরিদাসের বিচারে তাঁহার নিজের দোষ অনেক, তিনি পাপীদের কৃত হরিনিন্দা কতই না শুনিয়াছেন। অল্প শাস্তিভোগ করিয়াই প্রভুর কৃপায় তাঁহার এবার নিষ্কৃতি হইল, ইহাই যে তাঁহার পরম সৌভাগ্য। 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা' একথা মহাপ্রভু বলিবার পূর্বেই প্রাক্ চৈতন্যযুগে রূপায়িত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুর তাহার জীবন্ত নিদর্শন।

হরিদাস ফুলিয়ার গঙ্গাতীরস্থ এক মৃত্তিকা গুহায় অবস্থান করিতেন। এই গহ্বর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সকলেই অস্থির হইয়া উঠিত। জানা গেল যে ইহার মধ্যে এক সুবৃহৎ বিরাট সর্প বাস করিতেছে। এই বিপজ্জনক বিরাট গুহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভক্তগণ ঠাকুরকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অবশেষে সকলের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি বলিলেন যে, পরদিবসও এই সর্প যদি গোফায় অবস্থান করে, তবে তিনি নিশ্চয়ই অবিলম্বে এই মৃত্তিকাগর্ভ ত্যাগ করিয়া যাইবেন।

পরদিন সংকীর্তনানন্দে সশিষ্য হরিদাস ঠাকুর মত্ত রহিয়াছেন। দেখা গেল এই প্রাচীন অতিকায় সর্পটি ধীরে ধীরে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোথাও অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদল ক্রমে আসিয়া জুটিতেছে। শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনানন্দ ও কৃষ্ণকথার অনুস্রোত দিবারাত্র প্রবহমান। প্রভুর জ্যোতির্ময় মহাপ্রকাশ পার্ষদদলের নিকট দুর্নিরীক্ষ্য আমন্ত্রণলিপি লইয়া উপস্থিত। অমোঘ আকর্ষণের স্রোতাবর্তে পড়িয়া হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত শিরোমণি, নামের ভাণ্ডারী হরিদাস অবলীলায় স্বীয় স্থানটি চৈতন্যগোষ্ঠীতে অধিকার করিলেন।

শ্রীবাস ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব একদিন ভক্তদের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। করুণাময় প্রভু এক কোণে উপবিষ্ট হরিদাসকে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, 'হরিদাস আমার দেহ অপেক্ষাও তোমার দেহ আমার অন্তরঙ্গ ও প্রিয়। বাইশটি বাজারে যখন তুমি নির্মমভাবে বেত্রাহত হইতেছিলে, তখন যে আমার দেহেও আঘাত পড়িতেছিল। এই দেখ সেই চিহ্ন আজিও ইহাতে বর্তমান।' সমাগত ভক্তগণ দেখিলেন, আবিষ্ট মহাপ্রভুর সুগৌর তনুতে তৎক্ষণে রক্তরঞ্জিত বেত্রাঘাত ফুটিয়া উঠিয়াছে। হরিদাস করজোড়ে দণ্ডায়মান, কপোল বহিয়া দরদর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে। প্রভু ভক্তের মান বাড়াইতে বড় দক্ষ। হরিদাসের ভক্তির প্রশংসা অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। মূর্ছিত হরিদাসকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া প্রভু তাহাকে আপন জ্যোতির্ময় প্রকাশ দর্শন করাইলেন।

হরিদাস ভাবাবেশে রোদন করিতেছেন আর চরণে পড়িয়া আর্তি জানাইতেছেন, 'বাবা বিশ্বম্ভর, আমি তোমার শরণ নিলাম, তুমি এই মহাপাপীকে করুণা ও আশ্রয় ভিক্ষা দাও। প্রভু, তুমি আমার একটি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কৃপালু প্রভু বর প্রদানে উন্মুখ হইলেন। ভক্তের অভীষ্ট জানিবার জন্য তিনি অপেক্ষমান—

দণ্ডবৎ হঞা বলেন হরিদাস ঠাকুর॥
আজ হইতে মুঞি তোমার
দাসের কুকুর॥
ভোজন পাত্রাবশেষ প্রভু
দিবে এক মুষ্টি।
তবে সে জানিব প্রভু
আমি তোমার বটি॥

দৈন্যের আকর হরিদাসের একি প্রার্থনা! ভাগবতোত্তম হরিদাসকে প্রভু উঠাইয়া বসাইলেন। বলিলেন, 'প্রাণের হরিদাস, তুমি শান্ত হও। তোমার দেহমধ্যে আমি যে সদা বর্তমান। যে তোমাকে ভক্তি করিবে আমি তাহার কাছেই বিক্রীত থাকিব। তোমার মত ভক্তের প্রভাবেই যে আমার ঠাকুরালীর প্রতিষ্ঠা। শুধু আমিই নয় আমার সমগ্র ভক্তমণ্ডলীই তোমার নিকট চিরদিন বাঁধা থাকিবে।' হরিদাস ঠাকুরের এই বর যাচ্ঞা বৈষ্ণব-ইতিহাসে পরম প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। হরিদাসের বিনয়, আর্তি ও দৈন্য মহাপ্রভুর গণমধ্যে এক অক্ষয় কীর্তিতে চির সমুজ্জ্বল।

মহাপ্রভু নদীয়ার জনসমাজে স্বীয় বাণী প্রচারের জন্য দুইটি শ্রেষ্ঠ ভক্তকে মনোনীত করিলেন। একটি শ্রীনিত্যানন্দ, অপর শ্রীহরিদাস। অবধূত প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দের সঙ্গী ও প্রচার-সহকারী হইয়া হরিদাসের আনন্দের আর সীমা নাই। দুইজনে নবদ্বীপের পথে পথে কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়া বেড়ান। গৃহস্থেরা এই দুই পরম বৈষ্ণবকে ভিক্ষা প্রদানে অগ্রসর হইলে তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন—

নিত্যানন্দ হরিদাস বলে
এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ,
কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

সজ্জন ও ভক্ত গৃহস্থগণ চারণদ্বয়কে মহা সম্মান প্রদর্শন করেন। আবার দুরাচারী দল কটূক্তিও বর্ষণ করিতে থাকে। সমাদর ও নিন্দার ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই দুই বৈষ্ণব মহাপুরুষ নদীয়ার জনসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন।

একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঘুরিতে ঘুরিতে দুই দুর্দান্ত মদ্যপের সম্মুখে পড়িলেন। ইহারা নগরের কুখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় জগাই মাধাই। অধর্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্তি এই দুই ব্রাহ্মণ সন্তানের দৌরাত্ম্যে নগরের লোক ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিত। যে কোনো পাপকার্যে ইহাদের দ্বিধা বা উৎসাহের অভাব নাই। নেশায় চুর দুই ভ্রাতা সক্রোধে কৃষ্ণনাম প্রচারকারী নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঠাকুরের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দুই বৈষ্ণব প্রচারক কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচাইয়া প্রবাস অঙ্গনে ফিরিলেন। নিত্যানন্দের পরম অন্তরঙ্গ হরিদাস ঠাকুর কৃত্রিম কোপ ও অভিমান ভরে মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার সহকারীর মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন। শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাসের অমৃতোপম ভাষায় নিত্যানন্দ-হরিদাসের আন্তরিক সখ্যের অপরাপর কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের আক্রমণকারী জগাই মাধাইকে রূপান্তরিত ও তাহাদের উদ্ধারসাধনকল্পে শ্রীগৌরাঙ্গ এক মহা অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়া যান।

ইতিমধ্যে চৈতন্যলীলা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু পতিতোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়া যতিবেশে নীলাচলের পথে চলিয়াছেন, হরিদাস ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু তুমি তো নীলাচলে চলিলে, কিন্তু আমার কি গতি হইবে? আমার তো সেখানে যাইবার শক্তি নাই।' প্রভু আশ্বাস দিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণসর্বস্ব হরিদাসকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইবেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের দর্শনমানসে নীলাচলে প্রবেশ করিতেছেন। সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্য রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট ভক্তদের পরিচয় প্রদানকালে হরিদাসের পরিচয় দিলেন, 'হরিদাস ঠাকুর এই ভুবন-পাবন।' মহাপ্রভুর দীনবন্ধন লীলায় তারকব্রহ্ম নামের ধনী তাঁহার এক প্রধান সহায়ক। [illegible] প্রধান দর্শনে অপাপ-বিদ্ধ সাধক হরিদাসকে স্বয়ং মহাপ্রভুও ঐ ভুবনপাবনই মনে করিতেন।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া সকল ভক্তই প্রভুর পাদবন্দনা করিতেছেন। কিন্তু প্রাণপ্রিয় হরিদাস কোথায়? শ্রীচৈতন্য তাঁহার খোঁজ করিতেছেন। দেখা গেল দীনভক্ত

হবিদাস বাজপথপ্রান্তে একান্তে বসিয়া আছেন। তিনি দৈন্যভবে কহিতে লাগিলেন, 'আমি নগণ্য ও নীচ জাতি। মন্দিবেব নিকটে যাইবাব অধিকাব আমাব কোথায়? জগন্নাথ-সেবকদের স্পর্শ বাঁচাইয়া টোটাব (বাগান) এক প্রান্তেই আমি পড়িয়া থাকিব।' পদপ্রান্তে পতিত হবিদাসকে চৈতন্যদেব আলিঙ্গন দিতে গেলেন। 'তৃণাদপি সুনীচ' হবিদাস কাতবে বলিযা উঠিলেন, 'প্রভু আমি নীচ, অস্পৃশ্য—আমাকে তুমি ছুঁইও না।' কিন্তু ভক্তেব পবিচয যে প্রভু ভক্ত হইতেও বেশী জানেন, সে পরিচয়ের মান বাড়াইযা তিনি বলিতেছেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি
পবিত্র হইতে,
তোমাব যে পবিত্রতা
নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কব তুমি
যজ্ঞ তপ দান,
নিবন্তব কব তুমি
চাবি বেদ গান।
দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে তুমি
পবম পালন,
যে কাবণে কব তুমি
নাম সংকীর্তন।

হবিদাসেব প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে মহাপ্রভু এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কবিলেন—জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সাধন সকলেই পাইতে পাবে। এই সাধন উৎকর্ষেব ফলে সে মহামানব লাভ কবিতেও সক্ষম হয।

শ্রীচৈতন্য-পদে নিজেকে উৎসর্গ কবিবাব জন্য শ্রীবূপ পুবীধামে উপনীত হইলেন। মুসলমান বাদশাহেব সেবক ছিলেন বলিযা শ্রীবূপ পবম দৈন্যভবে নিজেকে পতিত মনে কবেন। নীলাচলে আসিযাই তিনি প্রথমে ভাগবতোত্তম হবিদাস ঠাকুবেব আশ্রয গ্রহণ কবিলেন। ঠাকুব তাঁহাকে কৃপা কবিযাছিলেন এবং সস্নেহে আশ্রয় দিযা নিজ টোটাগৃহে বাখিযা ছিলেন। এখানেই হবিদাসেব মাধ্যমে মহাপ্রভুব সঙ্গে শ্রীবূপেব মিলন। সনাতনও নীলাচলে আসিযা সর্বপ্রথম হবিদাস ঠাকুবেবই চবণে বন্দনা কবেন। বৈষ্ণবজগতেব মুকুটমণিদ্বয শ্রীবূপ ও সনাতন গোস্বামী যাঁহাব আশ্রয় ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইযাছেন, তাহাব মহিমা বর্ণনা কবিতে কে সক্ষম হইবে? হবিদাস ঠাকুবকে উদ্দেশ্য করিয়া সনাতন ইহাব কিছু ব্যাখ্যা কবিতে চেষ্টা কবিযাছিলেন—

অবতার কার্য প্রভুব নামেব প্রচাব,
সেই নিজ কার্য প্রভু
কবেন তোমার দ্বাব।

প্রত্যহ কবহ তিন লক্ষ
নাম সংকীর্তন,
সবার আগে কর
নামের মহিমা কথন।
আপনে আচরে কেহ
না করে প্রচার,
প্রচার করয়ে কেহ
না করে আচার।
আচার প্রচার নামের
কর দুই কার্য,
তুমি সর্ব গুরু সর্ব
জগতের আর্য।

প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দির হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের টোটা-গৃহে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেন। নিরন্তর নামকীর্তন ও দূর হইতে মন্দির-চূড়া নিরীক্ষণের পর এই আনন্দময় মিলন লগ্নটির জন্য হরিদাস প্রতীক্ষমাণ থাকিতেন।

প্রভুর পরিচারক গোবিন্দদাস রোজ হরিদাসের জন্য মহাপ্রসাদ বহন করিয়া লইয়া যান। একদিন হরিদাসকে বড় অসহ, জরাজীর্ণ দেখা গেল। আহার্য গ্রহণ না করিয়া কণামাত্র মহাপ্রসাদ কোনোক্রমে গ্রহণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সংবাদ শুনিয়া চৈতন্যদেব পরদিন প্রত্যুষে টোটা কুটীরে আসিয়া উপস্থিত। প্রভু চিন্তাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অসুস্থতা কেন? ভক্ত হরিদাসের অসুখ তাহার অন্তরে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, পূর্বের মতো আর সংকল্পিত হরিনাম সংখ্যাপূরণ করা সম্ভবপর হয় না, তাই হরিদাস সদা সন্তপ্ত হৃদয়ে ভাবেন—এ দেহ ধারণ করিয়া আর কি লাভ হইবে।

প্রভু তাঁহাকে বুঝাইতেছেন, 'হরিদাস, তোমার সিদ্ধ দেহে এত সাধন-কঠোরতার প্রয়োজন কি? কৃষ্ণ তোমাকে দিয়া নামের মহিমার প্রচার করাইয়াছেন, তোমার ব্রত সার্থক হইয়াছে। এইবার নামজপের সংখ্যা কমাইয়া দাও। বৃদ্ধকালে তপশ্চর্যার তীব্রতা কমাইয়া ফেল।' সান্ত্বনাবাক্যে না ভুলিয়া হরিদাস ঠাকুর ধীরে ধীরে হৃদয়ের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাখানি ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, 'প্রভু, আমি বুঝিয়াছি তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে। আমাকে যেন সে দৃশ্য দেখিতে না হয়। কৃপাময়, প্রভু আমার এই প্রার্থনাটুকু তুমি পুরাইও। শেষের দিনে আমার একটি বাসনা রহিয়াছে, তাই তোমাকে বলি—হৃদয়ে তোমার চরণকমল ধারণ করিব, নয়নে তোমার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিব, তারপর জিহ্বায় মহানাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিব। আমার মহাপ্রস্থানে অনুমতি তুমি আজ দাও প্রভু।'

ভক্তের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। হরিদাসের অন্ত্যলীলার শেষ দিনে চৈতন্যদেবের ইঙ্গিতে কীর্তনোৎসবের আয়োজন হইল। ভক্তগণের কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত মহাপ্রভুর নয়নাভিরাম মূর্তির দিকে হরিদাস ঠাকুরের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। কণ্ঠলগ্ন চরণ-

পদ্মখানি সংলগ্ন রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক হরিদাস মহাপ্রয়াণ করিলেন। প্রভুর বিলাপ উথলিয়া উঠিল—

হরিদাসের ইচ্ছা যবে
হইল চলিতে
আমার শকতি তারে
নারিল রাখিতে।
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ
প্রাণ নিষ্ক্রামণ,
পূর্বে যেন শুনিয়াছি
ভীষ্মের মরণ।
হরিদাস আছিল
পৃথিবী শিরোমণি
তাহা বিনা রত্নশূন্যা,
হইল মেদিনী।

হরিদাসের নিষ্প্রাণ দেহভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নৃত্যরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। চতুর্দিকে ভক্তদের কীর্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যের স্রোত প্রবাহিত, কাহারও শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই। অবশেষে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর স্কন্ধ হইতে হরিদাসের দেহ কাড়িয়া লইলেন। হরিদাসের সমুদ্রস্নাত দেহ অগণিত ভক্তের উপস্থিতিতে সমুদ্র-তটে সমাহিত হইল। প্রভু নিজ হস্তে তাহার দেহে বালুকা ছড়াইয়া দিয়া হরিধ্বনি উচ্চারিত করিলেন। নামযাজ্ঞিক হরিদাসের অন্তর্ধান দিনে জগন্নাথক্ষেত্রে নাম-ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

'আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হরিদাসের তিরোধান উৎসবের সাহায্যকল্পে তোমরা আমাকে ভিক্ষা দাও' মানবসমাজ যাঁহার কৃপা-ভিখারি, আজ ভিখারী হইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে তিনি উপস্থিত। মহাপ্রভুকে ভিখারী দেখিয়া পসারীর দল ভারে ভারে খাদ্য-সম্ভার প্রেরণ করিলেন। কীর্তনানন্দ ও বৈষ্ণবসেবার মধ্য দিয়া হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীচৈতন্যদেব ঘোষণা করিলেন, 'ভক্তরাজ হরিদাসের তিরোধান দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার উৎসব অবধি যে সকল ব্যক্তি যোগদান করিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হইবে। মহোৎসবান্তে মহাতাপস হরিদাসের বিরহে প্রভুর গণ্ড বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল, বিলাপ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥

হরিদাস মহাপ্রভুর জন্য ও জীবের জন্য কাঁদিয়া গিয়াছেন, জীবোদ্ধারক মহাপ্রভুও তাই তাঁহার জন্য আজ এমনই করিয়া কাঁদিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত

শচীদেবী আজ বড় বিপন্ন। পুত্র নিমাই গয়া হইতে এক অদ্ভুত অবস্থা নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সর্বদাই সে থাকে ভাবাবিষ্ট, কখনো "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া অধীর হয়, কখনো বা আপন মনে হাসে কাঁদে, প্রলাপ বলিতে থাকে।

প্রতিবেশীরা বাড়িতে ভিড় করে কেহ বলে, "ওগো, এ যে বিষম বায়ুরোগ, ভাল কবরেজ দেখিয়ে চিকিৎসা কর।" কেহ বা বলে, "গতিক বড় সুবিধের নয় নিমাইর মা। ছেলে তোমার পাগলই হয়ে গিয়েছে, সাবধানে রাখো—বরং বেঁধেই রাখো।"

এ বিপদ-সাগরে শচী কূলকিনারা খুঁজিয়া পান না। অবশেষে ব্যাকুল হইয়া সেদিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাড়িতে ডাকাইয়া আনেন। শ্রীবাস তাঁহাদের আত্মীয়—স্বজন, প্রবীণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব বলিয়া সবাই তাঁহাকে জানে। তাঁহার অভিমতকে শচী মূল্যবান মনে করেন।

শ্রীবাস আগে হইতেই নিমাইর এ পরিবর্তনের কথা শুনিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, নিমাইর সারা সত্তায় জাগিয়া উঠিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা। এ বন্যা শুধু তাহাকেই ডুবাইবে না, নবদ্বীপের সমাজ, বৃহত্তর গৌড়ীয় সমাজকেও হয়তো প্লাবিত করিবে। তীক্ষ্ণধী, প্রতিভাধর নিমাই পণ্ডিতের এই ভাবোন্মাদের মধ্যে শ্রীবাস দেখিতে পাইলেন এক আশার আলোক। তাই শচীর আহ্বান পাইয়াই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। মনোগত ইচ্ছা, স্বচক্ষে তিনি নিমাইকে দেখিবেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার এই অলৌকিক প্রেমবিকারের স্বরূপ লক্ষ্য করিবেন।

শ্রীবাসকে দেখিয়াই নিমাই যেন অকূলে কূল পাইলেন। করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "পণ্ডিত, তুমি এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে। এবার আমার বলে দাও দেখি, আমি কি করবো। আমি নিজেকে আর বশে রাখতে পারছিনে। আমার ঘন ঘন মূর্ছা দেখে অনেকে ভাবছে এ আমার বায়ুরোগ। নানা জনে নানা কথা বলছে আর মায়ের চোখের জল ঝরছে অবিরল ধারে। আমার এ বায়ুরোগ কি ক'রে সারবে বলে দাও।"

বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণবের নয়নকোণে জাগিয়া উঠিল আনন্দের ঝিলিক। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "নিমাই, তোমার এ বায়ুর কিছুটা পেলে আমি যে ধন্য হয়ে যাই। আমি দেখছি, পরম সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে তোমার জীবনে, কৃষ্ণ কৃপা স্ফুরিত হয়েছে তোমার হৃদয়ে, উপস্থিত হয়েছে মহাপ্রেম। এ সৌভাগ্য নবদ্বীপে আর কারুর হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

নিমাইর হৃদয় হইতে যেন এক পাষাণভার নামিয়া গেল। পরমানন্দে শ্রীবাসকে তিনি আলিঙ্গন দিলেন।

শচী নিকটে দাঁড়াইয়া সকল কথাই শুনিয়াছেন। কিন্তু মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা সহজে যাইতে চায় না। দুঃখিনীর সর্বস্বধন এই নিমাই। সে যদি উন্মাদ হইয়া যায়, তবে কি নিয়া তিনি সংসার করিবেন?

শ্রীবাস বার বার আশ্বাস দিলেন, "ওগো, ছেলে তোমার পাগল হয়নি, হয়েছে কৃষ্ণ-প্রেমের পাগল। নিজে স্থির হয়ে বসে থাকো, কাউকে এখন কিছু বলো না। এ নিয়ে ব্যস্তও হয়ো না।"

বিদায় নিবার সময় শ্রীবাস নিমাইকে আমন্ত্রণ জানান, "নিমাই, আমার বড় ইচ্ছে, আমার বাড়িতে তোমাকে নিয়ে রোজ আমরা সবাই কীর্তনোৎসব করি।"

নিমাই সানন্দে স্বীকৃতি দিলেন। আর এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়াই শুরু হইল তাঁহার এক অপরূপ লীলা। দিনের পর দিন নামরসে, কীর্তনরসে তিনি ডুবিতে লাগিলেন। অচিরে নবদ্বীপের পুণ্যভূমিতে অভ্যুদয় ঘটিল নামমূর্তি, শ্রীগৌরাঙ্গের। শ্রীবাসের আঙিনায় দিনের পর দিন উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল তাঁহার প্রেমভক্তির নূতন নূতন দৃশ্যলীলা।

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস তখন নৈয়ায়িক ও স্মৃতির পণ্ডিতদের কূটতর্ক আর বিধিব্যবস্থার কচ্‌কচিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। তান্ত্রিকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও এসময় কম নয়। ভক্ত বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ বড একটা মিলে না। যে অল্পসংখ্যক ভক্তদল নগরে বাস করে নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই তাহারা ধর্মচর্চা করে, প্রধানত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে মিলিত হইয়া তাহারা হরিকথা ও নামকীর্তনে রত হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব পরম বৈষ্ণব শ্রীবাসকে কেন্দ্র করিয়াই তখনকার দিনের ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীটি রহিয়াছে। এই মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীবাস সেদিন কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদ নিমাইকে আনিয়া দাঁড করাইয়া দিলেন। বৈষ্ণবগোষ্ঠীর পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন এক নূতন নেতৃত্ব, উন্মুক্ত হইল কৃষ্ণপ্রেমপ্রবাহের এক নূতন উৎস।

শ্রীবাসেরা চার ভাই, প্রত্যেকেই সদাচারী পরমভক্ত ও নামনিষ্ঠ। এবার ভাবনিধি গৌরসুন্দরকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না। এই সঙ্গে যুক্ত হইল সুকণ্ঠ ও প্রতিভাধর কীর্তনিয়া মুকুন্দ দত্তের মধুক্ষরা নামগান। মুরারি সদাশিব গদাধর প্রভৃতি ভক্ত তরুণেরা শ্রীবাসগৃহে প্রায়ই আসিতেন। এবার গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা সবাই কীর্তনরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন।

শ্রীবাসের আঙিনা ধীরে ধীরে হইয়া উঠিল কীর্তন-শ্রীক্ষেত্র। চারিদিক হইতে ভক্ত বৈষ্ণবেরা এই আঙিনায় আসিয়া জড় হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমধুর স্পর্শে আর নৃত্য কীর্তনের মনোহর লীলা দর্শনে ভক্তসমাজে নূতন প্রাণের জোয়ার জাগিয়া উঠিল।

শ্রীবাসগৃহের এই কীর্তন ও বৈষ্ণবদের হৈচৈ প্রতিবেশীদের অনেকেরই ভাল লাগে নাই। ফলে চারিদিক হইতে নানা নিন্দা, শ্লেষ ও কটূক্তি বর্ষিত হইতে থাকে। সারা রাত্রি ব্যাপিয়া কীর্তনের দলে একি সব উন্মত্ত আচরণ; নাচিয়া কাঁদিয়া ও চীৎকার করিয়া হরিনাম নিতে হইবে এ আবার কোন্ রীতিক? মনে মনে ঠাকুরের নাম কি করা যায় না?

নগরে সংবাদ রটিয়া গেল। বাদশাহের লোক বৈষ্ণবদের কীর্তন আর সহ্য করিবে না। নৌকা নিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার কীর্তনিয়া দলবলকে তাঁহারা ধরিতে আসিতেছে। এবার নর্তন-কুর্দন আর কীর্তন কি করিয়া চলে তাহা দেখা যাক্।

একদল প্রতিবেশী তো শ্রীবাস পণ্ডিতের উপর মহাক্রুদ্ধ। তাহারা বলিয়া বেড়ায়, "শ্রীবাস পণ্ডিতের দোষে সারা দেশ উৎসন্নে যেতে বসেছে। কিন্তু আমরা কেন এসব ঝামেলায় জড়াবো। বাদশার লোক যদিই আসে শ্রীবাস পণ্ডিতকে ধরে দেবো তাদের সামনে।"

রাজানুচরেরা বৈষ্ণবদের ধরিতে আসিতেছে, একথা শ্রীবাসের কানেও গেল। তাঁহার জন্য সকলে ডুবিবে, একথা ভাবিতে মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল।

শ্রীবাসের এ মনোভাব শ্রীগৌরাঙ্গের অবিদিত রহে নাই। শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তদের সাহস দিবার জন্য প্রভু এবার হইতে শুরু করিলেন আত্মঘোষণা। নূতনতর ভাবাবেগের মধ্য দিয়া আতঙ্কগ্রস্ত ক্ষুদ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীতে সঞ্চারিত করিলেন সত্যকার সাহস, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয়।

গঙ্গার পুলিনে প্রভু সেদিন বেড়াইতে গিয়াছেন। চারণরত গাভীদের দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল দিব্য আবেশ। বার বার হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মুঞি সেই মুঞি সেই।"

অপূর্ব উদ্দীপনাভরে প্রভু শ্রীবাসের ভবনে ছুটিয়া চলিলেন। পণ্ডিত তখন পূজাকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নৃসিংহদেবের ধ্যান করিতেছেন। প্রভু তখন নৃসিংহভাবেই বিভাবিত—

'কি করিস্ শ্রীবাসিয়া",
বোলে অহঙ্কারে,
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস
যেই ঘরে।
পুনঃপুন লাথি মারে
তাহার দুয়ারে।
"কাহারে বা পূজিস্
করিস্ কার ধ্যান,
যাহারে পূজিস দ্যাখ
তারে বিদ্যমান।
জ্বলন্ত অনল যেন
শ্রীবাস পণ্ডিত,
হইল সমাধি-ভঙ্গ
চাহে চারিভিত।"

প্রভু ইতিমধ্যে সবেগে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। বীরাসনে অপূর্ব গৌরবে তিনি উপবিষ্ট। দিক্ প্রকম্পিত করিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বার বার হুঙ্কার দিতেছেন।

এই দিব্য উদ্দীপনার স্পন্দন শ্রীবাস পণ্ডিতের সর্বসত্তায় আনিয়া দিয়াছে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। দেহখানি বেতসলতার মতো কম্পিত হইতেছে। অপার বিস্ময়ে বিস্ফারিত

নয়নে তিনি প্রভুব দিকে চাহিয়া আছেন। মুখ দিয়া একটি শব্দও নির্গত হইতেছে না। নয়নে ঝরিতেছে অবিরল প্রেমাশ্রুধাবা।

—ডাকিয়া বোলযে প্রভু,
"আবে শ্রীনিবাস।
এতদিন না জানিস
আমাব প্রকাশ।"

এ যে সত্যই এক দিব্যরূপেব প্রকাশ। অন্তবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ব্যাখ্যা বিতর্কেব অবকাশ এখানে নাই। আপন মহিমায, আপন শক্তিতে এ প্রকাশ প্রভুব অবয়বকে কবিযা তুলিযাছে রূপময, ঐশী আলোক সম্পাতে তিনি হইযা উঠিযাছেন দেদীপ্যমান। এই সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিত উপলব্ধি কবিলেন, তাঁহাব ধ্যেয নৃসিংহবিগ্রহ আর প্রভু, এই দুই বস্তু হইয়া উঠিযাছে একাকার।

প্রভু শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত, এবার তুমি আমাব স্তব পাঠ কব।"

শুদ্ধসত্ত্ব প্রবীণ ভক্ত শ্রীবাস যুক্তকবে আবৃত্তি কবিতে লাগিলেন ভাগবতের অপরূপ স্তবগাথা।

কত পুবাতন স্মৃতি আজ শ্রীবাসেব মনে পড়িতেছে। বালক বিশ্বম্ভবকে দিয়া কত সময নিজের কত কাজ কবাইযা নিযাছেন। বালক তাঁহাব সঙ্গে সঙ্গে ফুলেব সাজি নিয়া বেড়াইয়াছে, গঙ্গাব ঘাটে কাপড়-চোপড়ও এক একদিন বহন কবিযাছে। যুবক বিশ্বম্ভর যখন অধ্যাপক তখনও শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাব উপব মাঝে মাঝে অভিভাবকত্ব কবিতে ছাড়েন নাই। ভক্তিমার্গেব সাধনায় সে যাহাতে প্রবেশ কবে, এজন্য মৃদু তিবস্কাবও কবিযাছেন,

কৃষ্ণ না ভজিযে কাল
কি কার্যে গোঙাও।
রাত্রিদিন নিববধি
কেন বা পড়াও।

আজ সেই বিশ্বম্ভব একি অপরূপ দিব্য সত্তা নিযা তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত। এ কি বিস্ময়কব ঐশীরূপ সে আজ তাঁহাব সম্মুখে প্রকটিত কবিল। নির্নিমেষ নযনে শ্রীবাস প্রভুব ভাবাবিষ্ট মূর্তি দর্শন কবিতে লাগিলেন। প্রভুকে, তাঁহার প্রাণনাথকে, সম্বোধন কবিযা পণ্ডিত গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন—

আজি মোব সকল
দুঃখেব হইল নাশ
আজি মোব দিবস
হইল পবকাশ।
আজি মোর জন্ম কর্ম
—সকল সফল

আজি মোর উদয়—
—সকল সুমঙ্গল।
আজি মোর পিতৃকুল
হইল উদ্ধার
আজি সে বসতি ধন্য
হইল আমার।

প্রেমাবেশে আকুল হইয়া বৃদ্ধ শ্রীবাস ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, আর নয়নজলে বসন ভিজিয়া যাইতেছে। আজিকার এ সৌভাগ্য, এ আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই।

প্রভু আজ্ঞা দিলেন, "শ্রীবাস, এবার ওঠো, তোমার গৃহের সবাইকে এখানে ডেকে আনো। আমায় তারা দর্শন করুক। তুমি আজ সস্ত্রীক আমার চরণ পূজো কর। তোমার মতো মহাভক্তকে আমার যে অদেয় কিছু নেই। তোমার প্রাণ যা চায় তাই আমার কাছে বর মেগে নাও।"

ভক্তজন সমক্ষে প্রভুর পূজা অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীবাসের আত্মপরিজন এমন কি দাস-দাসীরাও সেদিন প্রভুর আশীর্বাদলাভে ধন্য হইয়াছিল।

এবার তিনি গম্ভীরস্বরে শ্রীবাসকে কহিলেন, "পণ্ডিত লোকের কথায় তুমি ভয় পেয়েছ, বাদশার লোক নৌকা নিয়ে আমায় ধরতে আসছে তাই না? কিন্তু তুমি কি জানো না, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হয় না, হতে পারে না। তাছাড়া রাজার লোক-লস্কর হাতি-ঘোড়া আমার কি করবে? জেনে রেখো, এমন শক্তি আমার আছে যাতে করে আমি মানুষ, পশু, পাখি সবাইকে দিয়ে কৃষ্ণনাম নেওয়াতে পারি। দেখতে চাও আমার সে অলৌকিক শক্তি? আচ্ছা, তবে তাই হোক।"

শ্রীবাসের ভাইঝি, চার বৎসরের শিশু নারায়ণী নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে। লীলাময় প্রভু তাঁহাকে সস্নেহে নিকটে ডাকিলেন।

সর্বভূত অন্তর্যামী—
প্রভু গৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা "নারায়ণি
কৃষ্ণবলি কান্দ।"
চারিবৎসরের সেই
উন্মত্ত চরিত
'হাকৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে
নাহিক সংবিত।
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা
পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হইল স্থল
নয়নের জলে।

হাসিয়া হাসিয়া বোলে
প্রভু বিশ্বম্ভব
"এখন তোমাব সব
ঘুচিল কি ভব ?"

শুধু সমবেত ভক্তদেব মধ্যেই নয়। নবদ্বীপেব সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রভুব সেই দিনকাব প্রকাশলীলাব কথা অবিলম্বে ছড়াইবা পাড়ল। শক্তিধব এই নূতন নেতাব প্রতি জাগিযা উঠিল অবিচল আস্থা। ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে যে বৈষ্ণববা এতদিন নিজেদেব গোপন কবিয়া বাখিতেন ধীবে ধীবে সমাজজীবনেব বৃহত্তর পবিধিতে তাঁহাবা আসিবা দাঁড়াইলেন। চোখে মুখে তখন তাঁহাদেব নূতন জীবনেব স্বপ্নমায়া জড়ানো, নূতন আবির্ভাবেব প্রত্যাশাব হৃদয় তাহাদেব আবেগ চঞ্চল।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দেব আবির্ভাব ঘটিল। প্রভুব নবোৎসারিত ভক্তিধাবায় সঞ্চাবিত হইল নূতনতব প্রাণশক্তি। প্রেমাবেগে নিত্যানন্দ সদাই থাকেন প্রমত্ত, দুবন্ত শিশুব মতো তিনি সদা চঞ্চল। তাঁহাকে সামলানোই এক কঠিন কাজ। নবদ্বীপেব কোন্ গৃহে তাঁহাকে বাখা যায়। এ এক বড় প্রশ্ন। প্রভু নিজে কখনও থাকেন দিব্য-ভাবে উদ্দীপিত, কখনো বা নামকীর্তনে উদ্বেল। এ অবস্থায় নিত্যানন্দকে তাঁহাব গৃহে বাখা যুক্তিসংগত নয়, তাই ভাবিবা চিন্তিয়া প্রবীণ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত শ্রীবাসেব গৃহেই তাঁহাকে বাখাব নির্দেশ দিলেন। পণ্ডিতেব পত্নী মালিনী দেবীকে মাতৃসম্বোধন কবিয়া নিত্যানন্দ সেই পবিবাবেবই একজন হইযা উঠিলেন।

প্রভু শ্রীগৌবাঙ্গেব নির্দেশে নিত্যানন্দ সেদিন শ্রীবাসের গৃহে ব্যাস পূজা কবিতে বসিযাছেন। পূজা অনুষ্ঠানেব সমস্ত কিছু উপচাব উপকবণ সংগ্রহেব ভার পণ্ডিতেবই উপব। ব্যাসপূজাব আচার্যও তিনি। আঙিনায সমবেত ভক্তদেব তুমুল কীর্তন ও নর্তন চলিতেছে। আনন্দে সকলেবই হৃদয় পবিপ্লুত। পূজা সমাপ্ত হইলে শ্রীবাস কহিলেন, "শ্রীপাদ্ এবার স্তব পড়ে ব্যাসদেবেব চরণে আপনি পুষ্পমাল্য অর্পণ করুন।"

নিত্যানন্দ তাঁহাব আপন ভাবে বিভোব। মালা হাতে কবিয়া কেবলই এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন।

অনন্যোপায শ্রীবাস তাড়াতাড়ি শ্রীগৌবাঙ্গকে ডাকিযা আনিলেন। প্রভু আসিয়া যাহা হয় একটা কিছু কবুন। ভাবোন্মত্ত নিত্যানন্দকে নিয়ন্ত্রণ কবা তাঁহাব কর্ম নয়।

প্রভু আসিযা সহাস্যে কহিলেন, "একি শ্রীপাদ, তুমি এমন ক'বে বসে কেন? ব্যাস-দেবকে মাল্যদান কব।"

কিন্তু নিত্যানন্দেব সে কথায কোনো হুঁশ নাই। প্রভুকে দেখিযাই এক অপূর্ব ভক্তিতবঙ্গ তাঁহাব হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, অর্ধবাহ্য অবস্থায পূজাব মালা তাঁহাবই কণ্ঠে পবাইযা দিলেন। মুহূর্ত মধ্যে নিত্যানন্দেব নযনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল প্রভুব দিব্যোজ্জ্বল অতীন্দ্রিয় রূপ। ষড়ভুজ-মূর্তি দর্শনেব আনন্দে তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীপাদ বাহ্যজ্ঞান লাভ কবিলে প্রভু সানন্দে সবাইকে স্বহস্তে পূজাব নৈবেদ্য বিতবণ কবিলেন। শ্রীবাসেব নিজ পবিজন এবং তাহাব গৃহেব দাসদাসীবাও প্রভুব হস্তেব এই প্রসাদ পাইযা সেদিন আনন্দে অধীব হইযা উঠিল।

কিছুদিনেব মধ্যেই শ্রীঅদ্বৈত পুণ্ডবীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি লীলাপার্ষদেব আগমনে শ্রীবাস পণ্ডিতেব আঙিনায প্রবাহিত হইল কীর্তনানন্দেব বসধাবা। এই পবিত্র আঙিনাতেই প্রভুর লীলামধুব জীবননাট্যেব নানা দৃশ্য দিনেব পব দিন উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এ আনন্দেব স্বাদ সেদিনকাব নবদ্বীপেব জনসাধাবণ তখনো পায নাই, এ সৌভাগ্য তাহাদেব হয নাই। ববং বক্ষণশীল সমাজেব কাছে শ্রীবাস পণ্ডিত ও প্রভুব ভক্তজনকে নিন্দা সমালোচনারই লক্ষ্যস্থল হইতে হইযাছে।

> কেহো বলে, "ভাই, এই
> দেখিল শুনিল।
> নিমাঞি পণ্ডিত লৈযা
> পাগল হইল।
> দুদ্দুবি উঠিবা পাছে
> শ্রীবাসেব বাড়ী।
> দুর্গোৎসবে যেন সাড়ী
> দেয হুড়াহুড়ী।
> হই-হই হায-হায
> এইমাত্র শুনি।
> ইহা সভা হৈতে হৈল
> অপযশ-বাণী।
> মহা মহা ভট্টাচার্য
> সহস্র যথায।
> হেন চাঙ্গাইত'ডলা
> বৈসে নদীযায।
> শ্রীবাস বামন এই
> নদীযা হইতে।
> ঘর ভাঙ্গি কালি লৈযা
> ফেলাইব সোতে।
> ও বামন ঘুচাইল
> গ্রামেব কুশল।
> অন্যথা যবনে গ্রাম
> কবিবে কবল।

প্রভু ও প্রভুব পরিজনদেব সেবা কবিতে গিযা শ্রীবাস তাঁহাব ভ্রাতৃত্রয় এবং আত্মীয়-জনদেব কম নিন্দা ও কটূক্তি সহ্য কবিতে হয় নাই। কিন্তু প্রভুকে এমন কবিযা আক্র

কাছে পাইয়াছে, দিনের পর দিন তাঁহার মাধুর্য ভাবের অপরূপ প্রকাশ দেখিয়াছে, তাহাদের টলাইবে এমন সাধ্য কার? শুধু কি তাই পণ্ডিতের গৃহের দাসীরাও প্রভুর কাছে সর্বসমর্পিত হইয়া বসিয়া আছে।

সেদিন প্রভু দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। গৌরকান্তি, ত্রিলোকসুন্দর অঙ্গখানি প্রেমাবেগে থরথর কম্পিত হইতেছে। ভক্তেরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নয়নে এ পরম মধুর দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভু কহিলেন, তিনি আজ গঙ্গায় অবগাহন করিবেন না। ঘরে বসিয়া স্নান করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে।

স্নান-জল সংগ্রহের জন্য ভক্তদের মধ্যে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। দুঃখী নামে এক পরিচারিকা শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে কাজ করে। প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধার তাহার অন্ত নাই। প্রভু অঙ্গনে বসিয়া স্নান সমাধা করেন। দুঃখী আনন্দে উতলা হইয়া উঠে। জল আনয়নের এ বিশেষ অধিকারটি যে তাহারই নিজস্ব। এ অধিকার কোনমতেই সে ছাড়িতে পারে না।

আজও সে পরম উৎসাহে কাঁখে ঘড়া নিয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। দুঃখী হাঁপাইতে হাঁপাইতে গঙ্গা জল নিয়া আসে, কিছুক্ষণের জন্য প্রভুর নৃত্য কীর্তনের দেবদুর্লভ দৃশ্য দেখিয়া নেয়, দুই নয়নে ঝরিতে থাকে প্রেমাশ্রু। এ জলটুকু ঢালিয়া দুঃখী আবার তখনই ছুটিয়া যায় জল আনয়নের জন্য। প্রভুর এই সেবাটিকে পাইয়া সে যে মহাউল্লসিত—কৃতকৃতার্থ।

নৃত্য ও আনন্দের কোলাহল থামিলে প্রভু স্নানে বসিলেন। সারি সারি বহু কলসী গঙ্গাবারিতে পূর্ণ হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে। প্রভু হঠাৎ শ্রীবাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, শ্রীবাস, আমার স্নানের জন্য গঙ্গা থেকে এত জল কে বহন করে আনে, এমন করে সুন্দর সাজিয়ে রাখে, বল তো?"

পণ্ডিত উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমার গৃহের পরিচারিকা দুঃখী রোজ তোমার জন্য এ জল যোগায়। বড় ভক্তিমতী সে, তোমার সেবায় এ আনন্দ ছেড়ে তার কোন অবসর জুটে না।"

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে প্রভু কহিলেন "না শ্রীবাস, এর নাম তো কখনো দুঃখী হতে পারে না। এ যে প্রেমানন্দের প্রতিমূর্তি—সুখরূপা সুখী। আজ থেকে আমি এর নূতন নামকরণ করলুম—সুখী। তোমরা একে সবাই ডেকো এ নামে, আমি নিজ কানে তা শ্রবণ করি।"

সুখী প্রভুদত্ত নূতন নাম তখনই সমবেত ভক্তদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

আর একদিনের কথা। ভাবাবেশে মত্ত হইয়া প্রভু সেদিন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করিতেছেন। কীর্তনানন্দ বড় জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ অন্তঃপুরে এক ক্রন্দনের রোল উঠিল, শ্রীবাসের শিশুপুত্র অসুস্থ ছিল, এ সময়ে সে স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

স্ত্রীলোকদের কান্নাকাটি শুনিয়া শ্রীবাস তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর গেলেন।

শিশুর দেহে প্রাণ নাই। শোকার্ত হৃদয়ে সবাই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। মাতা ও আত্মপরিজনদের বিলাপে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন।

বড় করুণ, বড় মর্মবিদারী এই দৃশ্য। শ্রীবাস মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সংহত করিয়া নিলেন। কোমলপ্রাণ, সদানন্দময় বৈষ্ণবের চোখে ফুটিয়া উঠিল সংকল্পের দৃঢ়তা। বাড়ির স্ত্রীলোকদের কহিতে লাগিলেন, "তোমরা সবাই পরম ভাগ্যবতী। কৃষ্ণভক্তি তোমাদের হৃদয়ে উপজিত হয়েছে। যাঁর নাম শ্রবণে মহাপাতকীও অন্ত্যকালে তরে যায় এমন প্রভু ভক্তগণসহ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে কীর্তন করছেন। এমন পবিত্র সময়ে আমার ছেলে দেহরক্ষা করলো। এতে আমার নিজের কোনো শোক দুঃখ নেই—এমন ভাগ্য আমার হলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। কাজেই এ মৃত্যু শোকাবহ নয়। কেউ এখানে কাঁদে, এ আমি চাইনে। তবে যদি নিতান্তই কেউ এ শোক সহ্য করতে না পারে, সে যেন কিছুক্ষণ বাদে কাঁদে, বা একলাটি গোপনে বসে কাঁদে, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সাবধান, তোমাদের শোকোচ্ছ্বাসের ফলে প্রভুর নৃত্যের আনন্দে যেন বিঘ্ন না ঘটে, তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করে আত্মহত্যা করবো।"

মৃত পুত্রের মাতা ও আত্মীয়রা হৃদয়ের শোক ও কান্নার অশ্রু চাপিয়া রহিলেন। সত্যিই তো কীর্তন-সভা ভাঙিয়া যাইবে, প্রভু হৃদয়ে আঘাত পাইবেন, ইহা হইতে পারে না। প্রভুপদে সমর্পিত প্রাণ পণ্ডিতগৃহের নারীরা অদ্ভুতভাবে ধৈর্য ধরিয়া মৃত পুত্রের চারিপাশে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে এই মর্মান্তিক সংবাদ কীর্তন-অঙ্গনের কানে একে একে পৌঁছিয়া গিয়াছে, সকলের অন্তর ব্যথায় টনটন করিতেছে, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ একথা আলোচনা করিতেছেন না, প্রভুর কানে এ দুঃসংবাদ কোনোমতে না পৌঁছায়।

কীর্তনের আনন্দে বিভোর গৌরসুন্দর নাচিয়া গাহিয়া এতক্ষণ অঙ্গন তোলপাড় করিতেছেন। এবার কি জানি ভাবিয়া নৃত্য সংবরণ করিলেন। ধীর উদাস কণ্ঠে কহিলেন, "দ্যাখো, আজ যেন কীর্তনের আনন্দ তেমন জমে উঠতে পারছে না। কারণ কি বলতো?"

ভক্তেরা নতমস্তকে নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রভু কহিলেন, "আমার হৃদয়ও আজ কেন যেন বড় উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। আনন্দের কোনো সাড়াই জাগছে না। নিশ্চয়ই শ্রীবাসের ঘরে কোনো দুঃখ বা শোকের ছায়া পড়েছে।"

শ্রীবাস করজোড়ে তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন। সসম্ভ্রমে কহিলেন, "না—না প্রভু, তুমি যেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কীর্তনের আনন্দধারা বইয়ে দিচ্ছ, সেখানে আবার দুঃখ শোক কি আসবে? তুমি কীর্তন আবার শুরু কর প্রভু।"

কয়েকটি ভক্ত এবার সংবাদটি ভাঙিলেন। করুণ কণ্ঠে জানাইলেন শ্রীবাসের এক পুত্র লোকান্তরে গিয়াছে। প্রভু সখেদে প্রশ্ন করিলেন, "একি অদ্ভুত কথা। কেউ আমায় এ সংবাদ জানায়নি। কতক্ষণ আগে এ বিপদ ঘটেছে?"

জানানো হইল, প্রায় আড়াই প্রহর আগে ছেলেটির মৃত্যু হইয়াছে। প্রভুর কীর্তন আসর যাহাতে না ভাঙে এজন্য শ্রীবাস সবাইকে নীরবে থাকিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের এই অপূর্ব ভক্তিনিষ্ঠা দর্শন করিয়া প্রভুর দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা। কাঁদিয়া কহেন, "আমার জন্য পুত্রশোক ভুলে যায়—এমন সব ভক্তে আমি কোন প্রাণে ছেড়ে যেতে পারবো।"

প্রভুর ক্রন্দন সেদিন যেন আর কোনো মতেই থামিতে চায় না।

ভক্তেরা নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন, হঠাৎ প্রভু সঙ্গ ত্যাগের একি এক ইঙ্গিত দিলেন? তবে কি গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিবেন? এ প্রশ্ন তাঁহার অন্তরে কেন জাগে? ভাবিয়া তাঁহারা কোনো কূলকিনারা পান না।

মৃত ছেলেটিকে এবার শ্মশানে নিবার উদ্যোগ চলিতেছে। আত্মপরিজনেরা সবাই শবাধারটি ঘিরিয়া দণ্ডায়মান। শোকের ভারে সারা গৃহটি থমথম করিতেছে। প্রভু এসময়ে এক অপূর্ব লীলা উদ্ঘাটন করিলেন।

মৃত শিশুকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে কেন যাচ্ছো তা একবার বলতো?"

প্রাণহীন দেহের নিস্পন্দ ওষ্ঠাধর ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিল। শিশু উত্তর দিল, "প্রভু, এদেহে বাস ক'রে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে যে স্নেহ ও আদর আপ্যায়ন পাবার কথা নির্দিষ্ট ছিল তা পেয়েছি—এবার বিধির নির্বন্ধ অনুযায়ী নূতন আবাসে আমি চলে যাচ্ছি। সপার্ষদ তোমার চরণে আমার প্রণাম রইলো। চরণে যদি অপরাধ ক'রে থাকি তা মার্জনা করো প্রভু।"

কথা কটি বলিয়াই মৃত শিশু একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। পণ্ডিতগৃহের লোকজন ও ভক্তেরা চারিদিকে দণ্ডায়মান—মৃত শিশুর এই উক্তি শুনিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেলে তাঁহারা বুঝিলেন যে, জীবন ও মৃত্যুর ভেদরেখা তেমন কিছু নয়। আর সর্বশক্তিমান্ প্রভুর কাছে যে কোনো ঘটনাই অজ্ঞাত নয়, কোনো কার্যই অসম্ভব নয়—এ তত্ত্বটি অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়া সেদিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

শ্রীবাসগৃহের নরনারী সকলেরই অন্তর হইতে শোকের ছায়া সেদিন প্রভুর কৃপায় দূর হইয়া যায়। তাঁহার চরণতলে ছুটিয়া আসিয়া তাহারা বলিতে থাকে, "প্রভু, জন্মে জন্মে যেন তোমার এই চরণ পাই, আর পাই তোমার প্রতি অটুট প্রেমভক্তি।"

পুত্রহীন শ্রীবাসের কাছে নিজেকে প্রভু এবার সঁপিয়া দিলেন—

প্রভু বোলে "শুন শুন
শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি তো সকল জান
সংসার চরিত।
এ সব সংসার দুঃখে
তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহো
কভু নাহি পায়।
আমি নিত্যানন্দ দুই
নন্দন তোমার
চিত্তে তুমি কিছু ব্যথা
না ভাবিও আর।

ভক্তদের আনন্দ কলরব ও হরিধ্বনিতে সেদিন তখন দিঙ্মণ্ডল পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত

নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু এ যেন একেবারে নতুন মানুষ। কূটতার্কিক সেই বিদ্যাভিমানী অধ্যাপক আজ যেন আর তাঁহাতে নাই। ঈশ্বরপুরীর মহামন্ত্র শ্রবণে তাঁহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। বিষ্ণুপাদপদ্ম-নিঃসৃত ভক্তিগঙ্গা আজ যেন তাঁহার সর্বসত্তাকে কোথায় ভাসাইয়া নিতেছে। মুরলীধর কৃষ্ণকিশোরের সাক্ষাৎ পাইয়া নিমাই কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভুবনমোহন শ্যামসুন্দররূপ চকিতে আবার কোথায় সরিয়া যায়? 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া নিমাই কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন।

নবদ্বীপের ভক্তগোষ্ঠীতে সাড়া পড়িয়া গেল—অধ্যাপক শিরোমণি নিমাই পণ্ডিতের মহারূপান্তর ঘটিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমরসে উচ্ছলিত ভক্তগণ সকলে মিলিয়া গয়াধামের রহস্য শুনিতে আসিলেন। নিমাই কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আগামী কল্য শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে তিনি সব কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিবেন।

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর প্রভৃতি সকলে পরদিন নিভৃতে নিমাইকে ঘিরিয়া বসিলেন। কিন্তু কাহিনী বর্ণনা করিবে কে? ভাববিহ্বল নিমাই 'কোথা কৃষ্ণ,' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমানন্দে মূর্ছিত। অশ্রু-পুলক-স্বেদ কম্প প্রভৃতি ভাব মহাপ্রেমিকের দেহে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সমবেত ভক্ত ও পণ্ডিতদের নয়নেও প্রেমাশ্রুর ধারা।

ইতিমধ্যে এক বিচিত্র কান্ড ঘটিল। গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকিয়া এক পরম বৈষ্ণব অভিনিবেশ সহকারে নিমাইর ভাবাবেশ দেখিতেছিলেন। প্রেম-ভক্তির এই প্রবল রসতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া কখন তিনিও মূর্ছিত হইয়া গিয়াছিলেন। বহুক্ষণ মূর্ছিত থাকিবার পর সংবিৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। পরম ভাগবত তাই অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

উৎকর্ণ হইয়া নিমাই শুনিলেন। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, নিভৃত গৃহকোণে কে এমন অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে? শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সবিনয়ে জানাইলেন, "আর কেহ নয়, এ তোমারই গদাধর।"

প্রাণপ্রিয় গদাধরকে নিমাই আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন—"গদাধর, তোমরাই সুকৃতি করিয়াছ। শিশুকাল হইতে কৃষ্ণভক্তিতে তোমার অবিচল নিষ্ঠা। আর দেখ—আমার জন্ম তো আমি বৃথাই কাটাইলাম। অমূল্য নিধি নিজ দোষে আমি হারাইয়া বসিয়া আছি।" ভূমিতে লুটাইয়া নিমাই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, "কোথায় তোমার কৃষ্ণ। বন্ধুগণ—তোমরা সত্বর তাঁহাকে আনিয়া দেখাও!" এ কি অদ্ভুত আর্তি—কৃষ্ণ বিরহের এ কি পরম উন্মাদনা। ভক্তগণের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। গদাধর প্রাণের নিমাইকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আজ অপার [illegible] সুধাধারা

স্ফীত হইতেছে। সতীর্থ, আবাল্যসুহৃদ্ নিমাই তাঁহার পরম প্রিয়। কৃষ্ণভক্তি রসায়নে রসায়িত—এই রূপান্তরিত নিমাই আজিকার দিনে তাঁহার জীবন-সর্বস্ব হইয়া উঠিলেন। প্রেয় আজ শ্রেয় হইয়া উঠিল, প্রাণপ্রভুরূপে শুক্লাম্বর-গৃহে দাঁড়াইয়া আজ তাঁহার তিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বীয় জীবনবেদী হইতে গদাধরের এই পূজ্য বিগ্রহ ক্ষণকালের তরেও কোনোদিন স্থানচ্যুত হয় নাই। গৌর গদাধররূপেই নবদ্বীপে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকাশিত হইলেন।

নরহরি, মুরারি, শিবানন্দ প্রভৃতি গৌরভক্ত আদি পদকর্তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে, তাঁহাদের কাব্য-আলেখ্যে এই গৌর গদাধরের রসঘন মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌরাঙ্গভজনের প্রথম পাদে—বিশেষত নবদ্বীপলীলায় এই গৌর গদাধরের আনুগত্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি নিত্যানন্দ উপাসনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার প্রাক্ পর্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ও গদাধরের প্রেমলীলাই গৌরভক্তদের প্রধান উপজীব্য ছিল।

নবদ্বীপলীলায় শ্রীচৈতন্যের ভাবাস্বাদনের এই প্রেমমধুর আলেখ্যটি ঠাকুর নরহরি সরকারের তুলিতে অপূর্ব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ
হৈয়া রহে।
পীত বসন আর সে
মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধরে ধরিয়া
নিজ কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা
গদ্‌গদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত
রহয়ে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ
নরহরি দাসে॥ (ভক্তি রত্নাকর)

প্রভুর একান্ত সুহৃদ্, পরম ভাগবত মুরারি গুপ্ত গৌরাঙ্গপ্রেমের আধাররূপী শ্রীগদাধরের এই মোহন মূর্তিটিকে অঙ্কিত করিয়াছেন—

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া,
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া॥

শ্রীচৈতন্য রসতত্ত্বের মরমী ব্যাখ্যাতা স্বরূপ দামোদরকে বলিতে হইয়াছে—শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসই পঞ্চতত্ত্ব (গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা—কবিকর্ণপুর)।

ভাগবতপ্রেমের উন্মাদনার কথা ভক্তগণ শুনিয়াছেন, কৃষ্ণ বিরহের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষণও তত্ত্বতঃ তাঁহাদের অজানা নাই। কিন্তু নিমাই পণ্ডিত আজ সেই প্রেমোন্মত্ত-

তাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আজ মহাভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। নিমাইর গৃহে তাই ভক্তদলের এত আনাগোনা।

পরম রূপলাবণ্যময় গদাধর শৈশবকাল হইতেই সহজ ভক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—সতীর্থ হইলেও বয়সে তিনি নিমাইর ছোট। কি যেন এক অজ্ঞাত, বিচিত্র আকর্ষণে চিরকাল তিনি এই প্রতিভাধর সুহৃদের চিরঅনুগামী হইয়া রহিয়াছেন। শচীদেবীর কুটীরে এবার ভক্তদল সম্মিলিত হইতে থাকে। কিন্তু গদাধরের সেখানে দিবারাত্রই অবস্থিতি। ভাবোন্মাদগ্রস্ত নিমাইর পিছনে পিছনে থাকিয়া সতর্ক প্রহরায় তিনি তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা করিয়া চলেন।

কৃষ্ণবিরহসন্তপ্ত নিমাই একদিন কাঁদিয়া আকুল—সারাদিনই ভাবাবেশে উন্মত্ত প্রায়। শচীদেবী ও গদাধর উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে কোনোক্রমে সামান্য কিছু আহার করাইয়া আনিয়াছেন। এইবার নানা প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করা হইতেছে। প্রেমোন্মত্ত নিমাই কেবলই গদাধরকে প্রশ্ন করিতেছেন, "গদাধর, বলতো আমার মুরলীধর কৃষ্ণ দেখা দিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? কোথায় তাঁহাকে পাইব, তাহা শীঘ্র বল।" গদাধর কি করিবেন? সান্ত্বনা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয় মধ্যেই আছেন। কেন তুমি উতল হইতেছ? সেইখানেই যে তোমার প্রাণকৃষ্ণকে পাইবে।" আর যায় কোথায়? ভাবাবিষ্ট নিমাই তৎক্ষণাৎ নখ দিয়া বক্ষ বিদারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। গদাধর ত্রস্তব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া তাহার হস্তখানি সজোরে আকর্ষণ করিলেন। নখাঘাত জর্জরিত বক্ষ হইতে তখন শোণিত ক্ষরিত হইতেছিল।

নিমাই এখন নবদ্বীপের ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্ররূপে অধিষ্ঠিত। দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবপ্রেমধর্মের প্রবর্তকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবাসের আঙিনায় তাঁহার ভুবনমোহন নৃত্য-গীত, অপরূপ প্রেমের আর্তি নূতন ভাবময় জীবনধারা উৎসারিত করিতেছে, ভক্তিধর্মের প্লাবন বহাইতেছে। বহুবাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেম এখন আর কল্পিত বস্তু নয়—কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন স্পর্শনে জীবদেহে তাহা উদ্গত হইতেছে। পদকর্তা বাসু ঘোষ সেই করুণাঘন সত্তার প্রশস্তি গাহিয়া লিখিয়াছেন—

আমার পরশমণির
কি দিব তুলনা।
কলুষিত জীবগণে
পরশমণির গুণে
নাচিয়া গাহিয়া হৈল সোনা॥

গদাধর এই স্পর্শমণির দিব্যস্পর্শের ভিখারী। যে সহজশক্তিবলে প্রভু জীবদেহে কৃষ্ণপ্রেমকে উৎসারিত করিয়া দেন। তিনি তাহাই চাহিয়া ফিরিতেছেন। দিবানিশি তিনি ভাবাবিষ্ট প্রভুর সেবায় ব্যাপৃত, তাঁহার স্নান ভোজনে সহায়তা করেন, শ্রম অপনোদনে ব্যজন করেন, আবার কীর্তন নর্তনের শেষে শ্রান্ত দেহে তাঁহার পদতলেই তাঁহাকে নিদ্রামগ্ন হইতে হয়। কিন্তু প্রভুর শক্তি সঞ্চারিত কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা চাহিতে

তাঁহার সাহসে কুলায় না। অন্তরের অভিলাষ বুদ্বুদের মতো অন্তরেই মিলাইয়া যায়।

একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনের শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বগৃহে ফিরিয়াছেন। গদাধর পাখা লইয়া তাহার ব্যজনে রত। অকস্মাৎ দুই হস্তে প্রভুর পদ ধারণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিস্মিত হইয়া গৌরাঙ্গদেব উঠিয়া বসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন এই ক্রন্দন? গদাধরের সব সঙ্কোচ মুহূর্তে মধ্যে অপসৃত হইয়া গেল। ভক্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "প্রভু, তোমার কৃপাসঞ্চারিত কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তির ফলে কত ভক্ত উদ্ধার হইয়া গেল। শুধু হতভাগ্য আমিই কি শুধু বঞ্চিত হইয়া থাকিব?"

প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইল। আনন্দোজ্জ্বল হাসি হাসিয়া প্রভু কহিলেন, "গদাধর, কাল প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানের কালে এই কৃষ্ণপ্রেম তোমাতে সঞ্চারিত হইবে। স্নানান্তে উঠিয়াই বুঝিবে এই বহু মুনি-ঋষি প্রার্থিত দিব্য বস্তু তোমাতে উপজিত হইয়াছে।"

নির্দেশ অনুযায়ী গদাধর প্রত্যূষে জাহ্নবীর জলে আসিয়া নামিলেন। স্নান করিবা মাত্র এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। দেহ মন প্রাণ অকস্মাৎ এক অনির্বচনীয় প্রেম-পুলকে অভিসিঞ্চিত হইয়া গেল। সমগ্র দেহেও তাঁহার অপূর্ব প্রেমবিকার ও আনন্দের ঢল নামিয়াছে। স্বভাবভক্ত প্রেমিক গদাধর আজ অস্বাভাবিক দিব্য প্রেমের ভার সহিতে পারিতেছেন না। চৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন—

অতি হৃষ্ট মনে স্নান করি গঙ্গা জলে।
প্রেমেতে অবশ তনু টলমল করে॥

ভক্তগণসহ প্রভু পিঁড়ায় বসিয়া আছেন। সকলে দেখিতেছেন কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত গদাধর মিশ্র টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দেহ পুলকাঞ্চিত, দুই নয়ন অরুণরাগে রঞ্জিত, আনন্দাশ্রুর ধারায় সর্বদেহ সিক্ত হইয়া যাইতেছে। গললগ্নীকৃতবাস হইয়া প্রভুর সম্মুখে গদাধর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আনন্দের আর অবধি নাই। স্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "কি গদাধর, তোমার প্রার্থিত ধন কি তুমি আজ পাইলে?" গদাধর তখন অনির্বচনীয় কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর— তাঁহার বচন সরিতেছে না। শুধু প্রেমাশ্রুর বন্যাধারায় তিনি প্রভুর চরণ সিক্ত করিতে লাগিলেন। পার্ষদগণসহ প্রভু বুঝিলেন, গদাধর আজ মহাসম্পদের অধিকারী হইয়াছে।

শ্রীবাস অঙ্গনের কীর্তনানন্দ ও নামরসের ধারাস্রোত ক্রমে নবদ্বীপের পথে পথে, জাহ্নবীর কূলে কূলে ছড়াইয়া পড়িল। শুরু হইল ভক্তি প্রেমের রসোচ্ছল প্রবাহপথে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা। এই লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকর গদাধর মিশ্র—এই প্রেমনাট্যের প্রধান সূত্রধর ও সেই গৌরগতপ্রাণ মহাপ্রেমিক পুরুষ।

প্রভুর তখন কৃষ্ণপ্রেমে নবঅনুরাগ ভাব। নবোঢার আনন্দে, বিরহের উৎকণ্ঠায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হয়। গদাধর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। কখনো ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রভু সখীজ্ঞানে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছে—"সখী! সংবাদ পৌঁছিয়াছে কৃষ্ণ আসিতেছেন। তুমি আমায় পুষ্প আভরণে ভূষিত কর—বাসরসজ্জার আয়োজন কই?"

গদাধর প্রভুর ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে সাজাইতেছে। পুষ্প-চন্দনে দেবদুর্লভ রূপ অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আবার কখনও ভাবের পট-পরিবর্তন ঘটে। দয়িত—শ্রীকৃষ্ণ একাত্মকতায় প্রভুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবেশ স্ফুরিত হয়। বনমালা গলায় পরিয়া নবনটবর বেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কীর্তন-নর্তনে অগ্রসর হন। প্রাণপ্রিয় গদাধরের হস্ত ধারণ করিতেই তাঁহার সর্বসত্তায় মহাপ্রেমের পুলকস্রোত সঞ্চারিত হইয়া যায়। ভক্তগণের দৃষ্টিতে তাহা নববৃন্দাবনের দিব্য স্মৃতিকে উৎসারিত করিয়া দিত—

নবহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস-বিনোদিয়া॥
গৌর-দেহে শ্যাম-তনু দেখে ভক্তগণ।
গদাধর রাধারূপ হইলা তখন॥

নবদ্বীপে তখন গৌরাঙ্গদেবের লীলাপট ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে। প্রভু একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীবাসের গৃহে গিয়া উপস্থিত। ঠাকুরঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ইষ্টদেব নৃসিংহদেবের পূজায় অভিনিবিষ্ট, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব তথায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবেশে সর্বসত্তা টলমল করিতেছে—প্রভু গম্ভীর পাদবিক্ষেপে বিষ্ণুখট্টার উপর গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আদেশ প্রচারিত হইল, "শ্রীবাস জাহ্নবীর জলে আমার অভিষেক কর।" সোরগোল শুনিয়া সকলের সঙ্গে গদাধরও আসিয়া উপস্থিত। আজ তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় নিমাই, পরমশ্রেয় গৌরাঙ্গদেব আজ আপন দিব্য মহিমা স্বমুখে ঘোষণা করিতেছেন।

গদাধর প্রভুকে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করিলেন। চাঁচর কেশে মোহনচূড়া বাঁধিয়া তাহাতে সযতনে মালা জড়াইয়া দিলেন। চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও কেশরে প্রভুর দেহ সুবাসিত করা হইতেছে। আর ভক্ত-কণ্ঠের স্তব স্তুতি উদ্গীত হইতেছে। গদাধরের মনে পড়িল, এই কি আমাদের সেই নিমাই, বিদ্যার অভিমানে ন্যায়শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন তুলিয়া ছাত্রাবস্থায় তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে, সর্ব কর্মে সর্বাবস্থায় অন্তরঙ্গ নয়নন্দ মোন গদাধর ইঁহারই অনুগমন করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত তত্ত্ব তখন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আরও মনে পড়ে, এক সময়ে নিমাইর সহিত গদাধর শ্রীঅদ্বৈতের সন্দর্শনে হইয়াছিলেন। আচার্যপ্রবরকে তৎকালে তিনি বলিতে শুনেন, নিমাই কেমন বস্তু অল্পদিন পরেই তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যে এমন পরম বস্তু কে তাহা তখন ধারণা করিতে পারিয়াছিল? সেদিন গর্বগর্ভ নিমাই মহাপ্রেম সঞ্চারিত করিয়া গদাধরকে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। আজিকার অভ্যুদয় সেই দিনের অলৌকিকত্বকেও যে ম্লান করিয়া দিয়াছে!

দিব্য আবেশগ্রস্ত নিমাই অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিতেছেন, "পণ্ডিত, আমি এ কোথায় আসিয়াছি? আমি কি অচৈতন্য ছিলাম? আমি তো এখনে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করি নাই।" শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিত পরস্পরের মুখ চাহিয়া শুধু একবার মুচকি হাসিলেন মাত্র।

শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাপটখানি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ গদাধরের ভূমিকা তাহাতে অনন্যসাধারণ। প্রভু কর্তৃক প্রেমশক্তি সঞ্চারিত হইবার পর হইতে তাঁহার কীর্তনানন্দের নিত্য সহচর তিনি। গদাধর মিশ্রের প্রাণের পিপাসা যেন শান্ত হইতে চায় না। কোথায় যেন কি এক ব্রত উদ্‌যাপন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গভক্তদের মধ্যে অনেকেই সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সুনির্দিষ্ট ভক্তিসাধন পথে তাঁহারা সহজে অগ্রসর হইতে সমর্থ। কিন্তু গদাধরের তো গুরুকরণ আজ পর্যন্তও হইয়া উঠিল না। কোথায় সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত সদ্‌গুরু যাহার উপর তিনি অধ্যাত্মপথের সমস্ত ভার নির্বিচারে ছাড়িয়া দিতে পারেন? মিশ্র পণ্ডিত কিছুটা মনের অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছেন।

ইতিমধ্যে গদাধর মিশ্রের পরম সুহৃদ্‌ মুকুন্দ ওঝা একদিন তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। মুকুন্দ তাঁহার বড় প্রিয় অনুচর। নবদ্বীপের যেখানে যাহা ঘটুক গদাধরকে সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ না জানাইলে মুকুন্দের চলে না। তিনি সংবাদ দিলেন, নগরে এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আগমন হইয়াছে। নাম পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক প্রভাবশালী বৈষ্ণব আচার্য। তিনি মুকুন্দ ওঝার স্বদেশবাসী, তাই তাঁহার তত্ত্ব তিনি সবিশেষ অবগত আছেন। এই পরম ভাগবতের প্রেমবিকারের কাহিনী বড়ই বিস্ময়কর।

পণ্ডিতের হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। এই বৈষ্ণবপ্রধানের নাম যে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মুখে সম্প্রতি বহুবার শুনিয়াছেন। গদাধরের মনে পড়িল, সামান্য কিছুদিন পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করিতে উঠিয়া এক অভাবনীয় কাণ্ড করিলেন। "কোথায় তুমি পুণ্ডরীক, কোথায় আমার বাপ—আমার প্রাণ, বন্ধু।" এই বলিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া কাঁদিতেছেন, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণের বিস্ময়ের অন্ত নাই। নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণ থাকিতে কাহার জন্য প্রভুর এই আর্তি? আবেশ তিরোহিত হইবার পর প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ভক্তগণ তখন চাপিয়া ধরিলেন, প্রভুকে প্রকাশ করিতে হইবে পুণ্ডরীক নামে কোন্‌ পরম ভক্তের নাম ধরিয়া তিনি আজ এমনভাবে কাঁদিতে ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সর্বসমক্ষে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিতে হইল। তিনি বলিলেন, তাঁহার "পুণ্ডরীক বাপ" এক অতি দুর্লভ বস্তু। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র পরম অদ্ভুত—তাঁহার নাম শুনিলেও লোকে পরম পবিত্র হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের হাবভাবে তিনি এক বিষয়ী গৃহস্থরূপে প্রতিভাত হন। সহসা তাঁহাকে এক মহাবৈষ্ণবরূপে চিনিয়া লইবার কোনো উপায় নাই। চট্টগ্রামের এক বিখ্যাত আচার্য-বংশে ইঁহার জন্ম, বৈষ্ণব আচার ও ভক্তিনিষ্ঠায় ইনি অতুলনীয়—

> কৃষ্ণ ভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
> অশ্রু-কম্প-পুলক বেষ্টিত কলেবর॥
> গঙ্গাস্নান না করে পাদস্পর্শ ভয়ে।
> গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দিবাভাগে কেন গঙ্গা দর্শন করে না, তাহারও কারণ প্রভু প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণু পাদোদ্ভূত গঙ্গায় লোকে দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার, গাত্রমার্জনা

করে। ইহা দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের হৃদয় বেদনাহত হয়। তাই নিশাকালেই তিনি গঙ্গাদর্শন করিতে বাধ্য হন। এই পরম ভক্তের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রভুর উৎকণ্ঠার সীমা নাই। সকলকে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, ইঁহাকে না দেখিয়া তাঁহার সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, ভক্তগণ যেন এই পরম ভাগবতকে আকর্ষণ করিয়া নবদ্বীপে সত্বর আনয়ন করেন।

মুকুন্দ ওঝার সংবাদে গদাধর বুঝিলেন, প্রভু যাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন ও অপেক্ষমান, সেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিই নবদ্বীপে আজ আকর্ষিত হইয়া আসিয়াছেন। এমন দুর্লভ বস্তু দেখিতে আর বিলম্ব কেন? মুকুন্দকে সঙ্গে করিয়া গদাধর সত্বর এই বৈষ্ণব আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে তাঁহাকে যেন হতাশ হইতে হইল। এতো বিষয় বিরক্ত পরম বৈষ্ণবের রূপ নয়, এ যে এক চরম বিষয়ানুরক্ত, বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তির নিকটে মুকুন্দ তাঁহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় বহু সেবক ও ব্রাহ্মণ সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ ভ্রমণে আসিয়াছেন। জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে এক রাজপুত্রের ন্যায় তিনি সমাসীন। দেহে বহুমূল্য জরিপাড়যুক্ত বস্ত্র জড়ানো। যে উজ্জ্বল পিতলের পালঙ্কটিতে বসিয়া আছেন তাহার উপরে রঙিন চন্দ্রাতপ। শয্যার উপরে সূক্ষ্ম পট্টবাসের ঝালর দেওয়া উপাধান চারিদিকে বিন্যস্ত। সম্মুখে রক্ষিত ঝকঝকে রৌপ্যাধার হইতে সুগন্ধী পান লইয়া বিদ্যানিধি দুই চারিটি মাঝে মাঝে মুখে পুরিতেছন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুইজন সেবক ময়ূরের পাখা লইয়া ব্যজন রত। আচার্য মহাশয়ের ললাটে উর্ধ্বপুণ্ড্র চন্দন তিলক, তাও আবার রক্তবর্ণ ফাগবিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত। কেশদামে সুগন্ধী আমলকী তৈলের সুরভি জড়িত। চন্দন, অগুরু ও পুষ্পগন্ধে সমগ্র ঘরটি ভরিয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণবগৃহে এ কি বিচিত্র বিলাসদৃশ্য। পণ্ডিতের মনে বড় সন্দেহ জন্মিল। ভক্তি-ধর্মের একান্ত সাধক গদাধর নবদ্বীপে ত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিষয়-বিরক্তির এক মূর্ত বিগ্রহ-স্বরূপ। আশৈশব তিনি সদাচারী ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এমন ব্যাপার তো কোথায়ও তিনি দেখেন নাই। এই রজোগুণসম্পন্ন বিলাসী ব্যক্তির নিকট গদাধর কেন আসিলেন, এই চিন্তাই তিনি এতক্ষণ করিতেছিলেন। তাহাড়া মনে অনুতাপও হইল। বিদ্যানিধি পরম বৈষ্ণব, এই কথাই তিনি শুনিয়াছিলেন। দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রতি গদাধরের ভক্তি অটুট ছিল। কিন্তু দর্শনের পরে সেই ভক্তিটুকু যে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে।

বন্ধুবর মুকুন্দ ওঝা পরিস্থিতিটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্থির করিলেন, এইবার বিদ্যানিধিকে প্রকাশ করিতে হইবে। সুকণ্ঠ মুকুন্দ তখন ভাগবতের এক শ্লোক গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণলীলা-রসের ব্যঞ্জনায় ভক্তিমহিমাবর্ণনে ইহা ভরপুর। মুহূর্ত মধ্যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সর্বসত্তায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কৃষ্ণ-মহিমা স্তবনের একি ইন্দ্রজাল, একি অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া!

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের স্তবন।
বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হুঙ্কার।
এককালে হইল সভার অবতার॥

গদাধরের বিস্মিত নয়নের সমক্ষে তখন এক অদ্ভুত প্রেমভক্তির নাট্যলীলা উন্মোচিত হইতেছে। সৌম্য, শান্ত, পরম গম্ভীর বিদ্যানিধি এক মহাভাবস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। প্রচণ্ড পদাঘাতের ফলে বিলাস-বৈভবের সমস্ত কিছু উপকরণ বিন্যস্ত, বিপর্যস্ত হইয়া গেল। এই ভাবোন্মত্ত অবস্থার কিছুটা উপশম হইলে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। গদাধর পণ্ডিত সভয়ে অগ্রসর হইয়া দেখেন, দেহে বিন্দুমাত্র প্রাণের চিহ্ন নাই।

গদাধরের অন্তরে ততক্ষণে প্রবল এক অশান্তির ঝটিকা উঠিয়াছে। না জানিয়া এই মহাপ্রেমিক বৈষ্ণবকে তিনি অবজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার এই অপরাধের মার্জনা কোথায়? মুকুন্দকে ডাকিয়া তিনি মৃদুস্বরে অন্তরের কথা কহিলেন, "মুকুন্দ, আজ তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ। মনে মনে আমি ইঁহাকে বিষয়ী বৈষ্ণবজ্ঞানে এক মহা অপরাধ করিতেছিলাম। তুমি কৌশলে ইঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করাইয়া আমার মহা উপকার সাধন করিয়াছ। এই অপরাধ স্খলনের একমাত্র উপায়, ইঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা—দীক্ষা গ্রহণ করা। নবদ্বীপের সমস্ত বৈষ্ণবদেরই গুরু রহিয়াছে, আমার ভাগ্যদোষে ইহা এযাবৎসম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত বৈষ্ণব আচার্য আমি খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম। তুমি সত্বর ইঁহাকে সম্মত করাও।

গদাধরের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভক্তি—আশৈশব শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুচররূপে অবস্থিত সব কিছু মুকুন্দ বলিলেন। তাঁহার অনুরোধে বিদ্যানিধি সানন্দে গদাধরকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন—

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥
করাইব—ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্মভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥

বিদ্যানিধির নিকট গদাধরের ইষ্টমন্ত্র গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবেরও আনন্দের পরিসীমা নাই। শীঘ্রই এই শুভকার্য তিনি সম্পন্ন করিতে বলিলেন। ইতি-মধ্যে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত প্রভুরও মিলন হইয়াছে। প্রভু তাঁহার নূতন পদবী প্রদান করিয়াছেন—পুণ্ডরীক প্রেমনিধি। ভক্তসমাজে এই প্রেমনিধির পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "দেখ দেখ, বিধি ইঁহাকে প্রেমভক্তি বিলাবার জন্যই গড়িয়া পাঠাইয়াছেন।" বিদ্যানিধির মহিমা বর্ণনায় চৈতন্য-ভাগবৎকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু শ্রীগদাধর পণ্ডিতেরই অপূর্ব ভক্তিসমৃদ্ধিরই পরিচয় বহন করে—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য তার—ভক্তির এই সীমা॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপলীলা ক্রমে শেষ পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভু একদিন অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে প্রকাশ করিলেন—তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। একনিষ্ঠ গৌর-প্রেমিক গদাধরের নিকটও ইহা প্রকাশ করিলেন। প্রাণপ্রভু চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইবেন। এই দৃশ্য যে হৃদয় বিদারক। গদাধরের নয়নে অশ্রুর বন্যা বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিল। শুধু কাঁদিয়াই বা কি লাভ হইবে? প্রভুকে তো আর ঠেকানো যাইবে না। বৃন্দাবনচন্দ্র বলিয়া তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনের পথে বাহির হইয়া পড়িতেই হইবে। সাহস সঞ্চয় করিয়া অতঃপর গদাধর প্রভুকে বলিতে লাগিলেন —"প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমি বিষয়-বিরত উদাসীন বৈষ্ণব, তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও চলিব। কিন্তু তোমার কথা বড় অদ্ভুত। শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিলেই কি কৃষ্ণ মিলিবে? তোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব কেহই নাই? মাথা মুণ্ডন করিলেই পরম প্রাপ্তি আসিবে—তোমার এই মত তো মোটেই বেদের মত নয়। তাছাড়া তুমি কেন বুঝিতেছ না—তুমি গৃহত্যাগ করা মাত্রই শচীমাতা দেহত্যাগ করিবেন। কেন তুমি এমন করিয়া জননীবধের ভাগী হইবে?" কিন্তু প্রভুর সঙ্কল্প টলিল না। ভক্তদলকে তিনি বুঝাইলেন, কৃষ্ণের বিরহানলে তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এ ভস্মরাশিকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কি ফল? প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ তাই অনিবার্য। গদাধর পণ্ডিত মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। তিনি কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট চলিয়াছেন। ঘনিষ্ঠ পার্ষদ কয়টির মধ্যে গদাধর মিশ্রও আজ প্রভুর অনুসরণকারী। সদাচারী ভক্ত-ব্রাহ্মণ মাধব মিশ্রের তনয় গদাধর। নবদ্বীপে একনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে তিনি শৈশবকাল হইতেই পরিচিত। আর তাঁহার বৃহত্তর পরিচয়—নিমাইর অভিন্ন হৃদয়, একনিষ্ঠ সখা ও সহচররূপে। গদাধরের স্মরণ হয়, বাল্যে ঈশ্বরপুরীর সেই পবিত্র সান্নিধ্যের কথা। নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্যের গৃহে তখন পরম ভাগবত ঈশ্বরপুরী বাস করিতেছিলেন। নিমাই এবং গদাধরের নিকট পুরী গোঁসাই সস্নেহে দিনের পর দিন তাঁহার "কৃষ্ণলীলামৃত" পাঠ করিয়া শুনাইতেন। উভয় সুহৃদ ও সহপাঠীর জীবনে তারপর নানা বৈচিত্র্য, নানা রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। কিন্তু গৌর গদাধরের একাত্মতায় মুহূর্তের তরেও কোনোদিন ছেদ পড়ে নাই। কাটোয়া ও নীলাচলের পথেও চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী গদাধর তাই তাঁহার প্রাণপ্রভুকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রকটিত হইতেছে। গদাধর এই নাট্যমঞ্চেরও একপার্শ্বে তাঁহার নিজস্ব স্থানটি গ্রহণ করিয়া বসিলেন। সর্বদা সর্বত্র ছায়ার মতন তিনি প্রভুর অনুবর্তন করেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই গদাধরের দিবা ও রাত্রি অতি-বাহিত হয়। শ্রীবৃন্দাবন দাসের ভাষায়—

> নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
> প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ না হতি।

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যটনে।
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রেমরসে প্রভু হয় মহামত্ত॥
গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥

প্রভুর লীলাস্থলী নীলাচলে গদাধর স্থায়িভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। পুরী-ধামের এক প্রান্তে চটক পর্বতের সন্নিকটে এক টোটার মধ্যে গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইল। গদাধর প্রাণ ভরিয়া এই অপরূপ দেবমূর্তির সেবা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যদেব পার্ষদ দলসহ এই গোপীনাথের মন্দিরে আসিয়া প্রতিদিন মিলিত হইতেন। গদাধর প্রভুকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়া ধন্য হইতেন, আর তাঁহার মন্দির অঙ্গনে প্রতিনিয়ত প্রভুর প্রেমভক্তির অপূর্ব লীলামাধুর্য প্রকটিত হইতে থাকিত।

গদাধরের গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রভুর পরম প্রিয় ছিল। একবার প্রভু গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন। ভক্তপ্রবর গদাধরও তাঁহার সঙ্গী হইতে চাহিলেন। গৌর-শূন্য নীলাচলে তিনি বাস করিবেন না। প্রাণপ্রভু মহাধাম ত্যাগ করিলে তিনি কি করিয়া দিন কাটাইবেন, এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব মহা-সাধক গদাধরের স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের অজানা ছিল না। প্রভু তাই তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "গদাধর, তুমি ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হইয়াছ। বিগ্রহ-সেবা তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্যকরণীয় বৈষ্ণবাচার। আমার জন্য উন্মত্ত হইয়া এই বিগ্রহসেবা ত্যাগ করা তো তোমার চলবে না। তোমার মত ভক্তের মাধ্যমেই যে নব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা! তুমি নীলাচলে থাকিয়া একনিষ্ঠভাবে গোপীনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। ভয় নাই—আমি আবার ফিরিব।" মর্মান্তিক হইলেও প্রভুর এই আদেশ আদর্শ বৈষ্ণব গদাধরকে শিরোধার্য করিয়া লইতে হইয়াছিল।

এই পরম লাবণ্যময় গোপীনাথ-মূর্তি আজিও পুরীধামের প্রান্তদেশে সহস্র সহস্র ভক্ত-জনকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এই মূর্তিরই প্রশস্তি গাহিয়া চৈতন্য ভাগবত লিখিয়াছেন—

গদাধর ভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে হেন নন্দকুমারসাক্ষাত॥
আপনে চৈতন্য তানে
করিয়াছেন কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে
বিগ্রহ দেখি ভুলে॥

গৌর-প্রেম ও গৌর-সেবার জন্য গদাধর পণ্ডিত তাঁহার নিত্য পূজা ও এই গোপী-নাথের নিত্য সেবা ছাড়িতেও ইতস্তত করেন না। নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্য যখন বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া গৌড়ে রওনা হইতেছিলেন গদাধর পণ্ডিত তখন সমস্ত কিছু

ত্যাগ করিয়াও তাঁহার সঙ্গ কামনা করিয়াছিলেন। শিবানন্দ সেনের একটি পদে এই একনিষ্ঠ গৌর-প্রেমের অপরূপ আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

হেন সে গৌরাঙ্গ চন্দ্রে
যাঁহার পিরীতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে
লাগে খ্যাতি॥
গৌর গত প্রাণ প্রেম
কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্র-বাস কৃষ্ণ-সেবা
যার লাগি ছাড়ে॥ (গৌরপদ তরঙ্গিণী)

ভক্তপ্রবর গদাধরের লাবণ্যময় গোপীনাথ-বিগ্রহে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুরও বড় প্রিয় ছিল। পুরীধামে উপনীত হইয়া তিনি জগন্নাথদেব ও চৈতন্য দর্শনের পরেই টোটা গোপীনাথে ছুটিতেন। এই গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গনে নিত্যানন্দ গদাধরের মিলন বড় মর্মস্পর্শী হইত। বৃন্দাবনদাসের ভাষায় "নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে, তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে।" উভয়ের মিলনানন্দে সর্বদা এক অপূর্ব রসতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

একবার নিত্যানন্দ গোপীনাথের জন্য গৌড় হইতে সুগন্ধী সূক্ষ্ম চাউল ও রঙীন বস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন। গদাধরের ইহাতে পরম আনন্দ। নিষ্ঠা সহকারে তিনি ভোগ রাঁধিতে বসিলেন। নিত্যানন্দ আজ প্রসাদ পাইবেন, তাই তাঁহার উৎসাহের অন্ত নাই। অন্তর্যামী প্রভু শ্রীচৈতন্য ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যাপার জানিয়াছেন। গোপীনাথের প্রসাদান্নের ভাগ লইবার জন্য তাই অকস্মাৎ তিনি টোটায় আসিয়া উপস্থিত—

হাসিয়া বলেন প্রভু, কেন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর॥
আমি ত তোমরা দুই হইতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি খাই॥
নিত্যানন্দ দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন ইথে মোর আছে ভাগ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর মিলনোৎসবে গদাধরের টোটা গোপীনাথ সেদিন ভক্তসমাজে অনাবিল আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য বল্লভ ভট্ট একবার শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য নীলাচলে আসিয়াছেন। ইতিপূর্বেও প্রয়াগে প্রভুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ভট্ট উপলব্ধি করিলেন, তখনকার অপেক্ষা চৈতন্যদেবের এবারকার ব্যবহার যেন কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। প্রভু যেন তাঁহার সম্পর্কে উদাসীন। বল্লভ ভট্ট ভাগবতের এক নূতন টীকা লিখিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা প্রভু ও পার্ষদদলকে ইহা পড়িয়া শুনান। প্রভু কিন্তু কেবলই এড়াইয়া যান। বলেন, "আমি ভাগবতের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না, শুধু কৃষ্ণ নামই যে আমার উপজীব্য, আমাকে শুনাইয়া কি হইবে?" প্রভুর উপেক্ষায় ভগ্নমনে তো ভট্ট

রচনা শুনিতেই চান না। শুধু উপেক্ষাই নয়—আগন্তুক আচার্যের উপর শ্রীচৈতন্যদেব কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। ভট্ট একদিন গর্বভরে বলিতেন—তিনি শ্রীধর স্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। অহংকারী পণ্ডিতকে দমন করিতে প্রভু এক রূঢ় আঘাত হানিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'স্বামী যে না মানে, সে তো কুলটার মধ্যে গণ্য হয়। শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে আমরা ভাগবত চিনিয়াছি, আত্মাভিমান বশতঃ তাঁহাকে নিন্দা করা কি সঙ্গত?" অপমানিত হইয়া ভক্তসভা মধ্যে ভট্ট নিঃশব্দে মাথা নিচু করিয়া রহিলেন।

প্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণের মধ্যে কেহই বল্লভ ভট্টকে ঠাঁই দেয় না। তাঁহার রচনা পর্যন্ত তিনি কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতে পারেন না। অবশেষে বল্লভ ভট্ট ক্ষমাসুন্দর প্রেমিক গদাধর পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইলেন। প্রতিদিন তাঁহার টোটায় গিয়া তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহাকে নিজ রচনা পড়িয়া শুনান। প্রভুর ভক্তগণ ভট্টকে সুচক্ষে দেখিতে পারেন না, গদাধর ইহা জানেন। কিন্তু বল্লভাচার্যের আর্তি দেখিয়া তাঁহার অন্তর দ্রবীভূত হইয়া যায়। তাঁহাকে ভট্টের টীকা শুনিতে হয়।

গদাধরের আশ্রয়ে আসিয়া বল্লভ ভট্টের রূপান্তর ঘটিল। যেটুকু বিদ্যাভিমান তাঁহার অবশিষ্ট ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের আঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। বল্লভ ভট্ট আপন ভ্রম ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শরণাগতি গ্রহণ করেন। কৃপাময় প্রভুও তাঁহাকে অবশেষে আশ্রয় প্রদান করিতে বাধ্য হন। আচার্যের আগ্রহাতিশয্যে গদাধর পণ্ডিত অতঃপর তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ভট্ট ইতিপূর্বে বাৎসল্যভাবে বাল-গোপালের আরাধনা করিতেন। কিন্তু মহাপ্রেমিক গদাধরের সংস্পর্শে আসিয়া কিশোর গোপাল ভজনে তাঁহার মন নিবিষ্ট হইয়া গেল। দক্ষিণ দেশীয় এই বিখ্যাত আচার্যের রূপান্তরে গদাধরের অবদান তাই অপরিসীম।

গদাধরের প্রসাদে কয়েকটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধকেরই পরম প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। আচার্য বল্লভ ভট্ট, চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা জয়ানন্দ এবং তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, ওড়িয়া ভক্ত মাধব তাহাদের অন্যতম। গৌরাঙ্গ-প্রেমিক গদাধর তাঁহার পরম শুদ্ধ প্রেম অকৃপণ করে দীর্ঘদিন বিলাইয়া গিয়াছেন। ইহা স্মরণ করিয়াই কবি বৃন্দাবন দাস গাহিয়া গিয়াছেন—

> পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়।
> গদাধরের প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
> পণ্ডিত প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
> গদাই গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥

গদাধরের দীক্ষিত শিষ্য ওড়িয়া ভক্ত কবি মাধব কর্তৃক মধুর পদ্য ছন্দে ওড়িয়া ভাষায় "চৈতন্যবিলাস" রচিত হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভে তিনি যে গদাধর-স্তুতি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারাই এই পুণ্য জীবন কাহিনীর উপসংহার আমরা করিব—

> সে হি শ্রীচৈতন্যকথা কিছিহি বর্ণিবি।
> এহি মনকু মোহর সুফল করিবি যে॥
> বন্দই যে গদাধর গুরু মহেশ্বর।
> সে পাদ কমলে চিত্ত রহু মাধবর॥

ঠাকুর শ্রীনরহরি

প্রভুর দর্শনে স্পর্শনে দিব্য আনন্দের অনুভূতি তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠে। কখনো ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তনানন্দে তিনি মাতোয়ারা থাকেন, কখনো বা প্রভুর সভায় দিনের পর দিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া থাকেন, দু'চোখ ভরিয়া তাঁহার স্বর্গীয় রূপসুধা পান করিয়া ধন্য হন। প্রতিবারই এভাবে কয়েকমাস নীলাচলে কাটাইয়া নরহরি শ্রীখণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

সেবার লোকানন্দাচার্য নামে এক বহুশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত। দিগ্‌বিদিক্ ঘুরিয়া পণ্ডিতদের তিনি পরাজয় করিয়া বেড়ান, প্রতিভার ছটায় সকলের নয়ন ধাঁধাইয়া দেন।

শ্রীচৈতন্যের কাছে আসিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কহিলেন, "আচার্য, আপনাকে আমি তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি। আমার পণ, যে আমার শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত করতে পারবে সানন্দে আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবো, গুরু বলে স্বীকার ক'রে নেবো।"

"কিন্তু পণ্ডিতবর, আমি তো তর্ক করতে জানিনে। আমি তা কখনো করতেও চাইনে কারণ তর্ক দিয়ে শাস্ত্রের মর্ম, প্রকৃত সত্য জানা যায় না। শ্রীভগবানের চরণেও পোঁছানো সম্ভব নয়। আমি তাই জয়ী বলেই আপনাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছি।"

"কিন্তু আচার্য, আপনার খ্যাতি শুনে, আপনাদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করতেও যে আমি বড় কৌতূহলী হয়েছি।"

নরহরি প্রভুর পাশেই ভাববিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া শ্রীচৈতন্য কহিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে থাকলে, তত্ত্ব-রসের আকর, এই নরহরির কাছে আপনি আপনার প্রশ্ন নিবেদন করুন, সে আপনার সংশয় নিরসন করতে পারবে।"

প্রভুর দৈন্যময় উক্তি শুনিয়া তাঁহার দিব্য কান্তি ও ভাবময় মূর্তি দেখিয়া লোক[illegible] ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা নরম হইয়াছেন। তর্ক ও বিচার দ্বন্দ্বের উগ্র বাসনা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এবার প্রেমিক সাধক নরহরিকে তিনি ধরিয়া বসিলেন। সাধ্য সাধন সম্পর্কে যাহা কিছু তাঁহার প্রশ্ন ছিল একে একে নিবেদন করিতে লাগিলেন। কয়েক-দিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে গভীর তত্ত্বালোচনা চলিল। অবশেষে পণ্ডিত নরহরির চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। গৌররসের প্রকৃত মর্মজ্ঞ নাগরী-ভাবের সাধক নরহরি যে কত বড় তাত্ত্বিক, কত বড় শক্তিধর বৈষ্ণব, সকলে তাহা দর্শন করিল।

নরহরির শিষ্য অশেষ শাস্ত্রবিদ্ লোকানন্দ আচার্যের এ [illegible] গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচারের পক্ষে কম সহায়ক হয় নাই।

আচার্যের রচিত গ্রন্থ "ভক্তিসার সমুচ্চয়" সম্বন্ধে এক মহা উক্তি [illegible] করিয়াছে। প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র হইতে তথ্য ও প্রমাণ আহরণ করিয়া তিনি ইহা [illegible]

মূল্যবান ভজনতত্ত্ব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাছাড়া স্বীয় গুরু নরহরির কথিত 'শ্রীচৈতন্য সহস্রনাম' এবং 'শ্রীভক্তি চন্দ্রিকা' প্রচারিত করিয়াও তিনি বৈষ্ণবসমাজকে কম ঋণী করেন নাই।

নরহরির শ্রীখণ্ড বাস ও গৌরতত্ত্ব প্রচারের তাৎপর্য এখন হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল—শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইতেছেন। তাঁহার হুঙ্কারে ও নৃত্যগানে কীর্তনানন্দের বান ডাকিয়াছে। আবার বৃন্দাবনের কন্থাকরঙ্গধারী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদের জন্য প্রভুর আদেশ অন্য রূপ, সে আদেশ অনুযায়ী তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করিতেছেন। আর করিতেছেন রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যান। শ্রীখণ্ডে নরহরির জন্য প্রভু নির্দেশ করিয়াছেন নিগূঢ় প্রেমভক্তি রস বিতরণের এক পরম পবিত্র কর্ম। প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার রসাস্বাদনের যে অভাব গৌড়মণ্ডলের প্রেমিক বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে অনুভূত হইতেছিল, নরহরির কৃপায় সে অভাব পূর্ণ হইতে লাগিল। গৌরতত্ত্বের শিক্ষাদান বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রের রচনা ও প্রচারে শ্রীখণ্ড হইয়া উঠিল এক মুখ্য কর্মকেন্দ্র।

নরহরির মতে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্, পরতত্ত্ব। প্রেম সাধনার দিক দিয়া তাহাকে পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া নিলে ইহাও মানিতে হয় যে তিনি রসরাজ শৃঙ্গার-স্বরূপও বটেন। তাই এই পরতত্ত্বের সাধনায় নরহরি নাগরীভাবের উপাসনার উপর জোর দিলেন, লীলারসকে অন্তরে ঘনীভূত করিয়া নিয়া নিগূঢ় প্রেম সাধনা প্রবর্তিত করিলেন। নরহরির ভক্তি সিদ্ধান্তের সাধ্য সাধন নির্ণয়ের মধ্য দিয়া গৌরলীলার গোপ্য মহিমা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

প্রাণে তাঁহার বড় ইচ্ছা গৌরলীলার মধুর রস গৌড়মণ্ডলের ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়। কিন্তু এজন্য চাই সহজ সরল বাংলা ভাষায় পদ রচনা। এই কাজেই তিনি ব্রতী হইলেন। ফলে দেখা দিল ভক্তসমাজের পরম প্রিয়, প্রেমরসাত্মক কাব্যধারা। সূচনা হইল গৌর-চন্দ্রিকা পদাবলীর। গৌরলীলার মরমী ব্যাখ্যাতা নরহরির ঋণ তাহার সমকালীন পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি অকপটে লিখিয়াছেন।

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে॥

ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও নরহরিকে "সংকীর্তনের অধিকারী" বলিয়া মর্যাদা দিতে ভুলেন নাই।

উজ্জ্বল রসের যে পরম সাধনায় নরহরি নিমজ্জিত, গোরাচাঁদের যে ভুবনমোহন রূপ হৃদয়ে তিনি আঁকিয়া নিয়াছেন শ্রীখণ্ডে আসিবার পর হইতে তাহা হইল সাধনার প্রধান উপজীব্য। তাঁহার হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল বাংলা গৌর-পদাবলীতে। এই সব রসমধুর পদ শুধু বাংলা সাহিত্যেরই অমূল্য সম্পদ হইয়া রহে নাই—মধুর সাধনার ভাবময় ইঙ্গিতরূপে উত্তরকালের সাধকদের উপরও এগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

নরহরি লিখিয়াছেন—

সোনার বরণ পুরুষ রতন
হৃদয় মাঝারে দেখি,
তে'ই বলি গোরা না যায় পাসরা
না জানি বা কিবা হয়।
আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে
সকলি গৌরাঙ্গময় ॥
বামেতে ডাহিনে সম্মুখে পিছনে।
জলের ভিতর গোরা।
এ জনমের মত অঞ্জন হইয়ে
লাগিয়া রহিল পারা ॥

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ ছিল পরম মনোহর—এ রূপের প্রভাবও ছিল অমোঘ, একবার দর্শন দিয়া ইহা ভক্তজনের প্রাণমন কাড়িয়া নিত। প্রেমিক সাধক নরহরি তাঁহার প্রাণ-প্রভুর এই ভুবনভুলানো মূর্তি আঁকিতে গিয়া যে রসমধুর পদ রচনা করিয়াছিল তাহার তুলনা বিরল :

এতরূপে কে-না হৈল
শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
নয়নে হেরিতে উঠে
রূপের মাধুরী।
কোটিচন্দ্র সুশীতল
চরণারবিন্দ।
মনে পরশিতে মোর
প্রাণে হয় কম্প।
মনে করি প্রাণ চিরি
রাখি প্রাণসঙ্গ।
মনে হলে বাহির করে
দেখি মুখচন্দ্র।
মনে করি নদে জুড়ি
এদেহ বিছাই।
নরহরির প্রাণ গোরা
তাহাতে নাচাই ॥

নরহরির এই অমৃতময় পদগুলি পরবর্তীকালের গৌরপদাদর্শী ভক্তদের ও পদ-কর্তাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তাঁহার সাধনধারার প্রধান সংবাহক হইতেছে ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন। শিষ্য লোচন ও লোকানন্দ। রঘুনন্দনের উপর শ্রীচৈতন্যের কৃপা ছিল অসামান্য। মুকুন্দকে প্রভু আগে

হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার যে পুত্র জন্মিবে সে হইবে এক মহা বৈষ্ণব। গৌড়ীয় সমাজের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে, প্রভু তাঁহার প্রসাদরূপে চর্বিত তাম্বূল মুকুন্দের স্ত্রীর জন্য প্রেরণ করেন এবং এ তাম্বূল খাইবার পর তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন। একবার প্রভু নীলাচলে স্বগণসহ কীর্তনানন্দে মাতিয়া আছেন, এমন সময়ে শিশু রঘুনন্দনকে প্রভুর চরণবন্দনা করিতে আনা হয়। তিনি সস্নেহে শিশুকে আলিঙ্গন দিয়া গলায় পরাইয়া দেন তাঁহার নিজের পুষ্পমালা। কীর্তনান্তে রঘুনন্দনের হাতে দধি-হরিদ্রার কটোরা দিয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদাও সেদিন তিনি দেন।

প্রভুর প্রতীক্ষিত এই ক্ষণজন্মা শিশুর শিক্ষাদীক্ষার গুরুভার ন্যস্ত হয় ঠাকুর শ্রীনরহরির উপর। ভজন কীর্তন ও অন্তর সাধনার নির্দেশের মধ্য দিয়া রঘুনন্দনের জীবনে নরহরির প্রেমধারা ধীরে ধীরে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বালককাল হইতেই তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন এক শক্তিধর বৈষ্ণব সাধকরূপে। নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ তাঁহার জীবনে দেখা যায়।

মুকুন্দ সেদিন কোনো এক বিশেষ কাজে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছেন। বালক রঘুনন্দনকে বলিয়া গেলেন, "বাবা গোপীনাথের ভোগ সাজিয়ে দিয়ে গেলাম। তুমি এদিকে নজর রেখো, আমি খানিক বাদেই ফিরে আসছি।"

বালক একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া আছে, কখন তিনি ভোজনে বসিবেন। কিন্তু প্রতীক্ষা শুধু সার, ঠাকুরের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণই নাই।

রঘুনন্দন এবার অভিমানে কাঁদিতে শুরু করিলেন, "ঠাকুর এত করে সাধছি কেন তুমি খেতে বসছো না? তুমি না খেলে যে আমি ব্যথা পাবো, আর বুঝবো আমি তোমায় যতটা ভালবাসি তুমি আমায় ততটা বাসো না।"

কথিত আছে, গোপীনাথ বিগ্রহ তাঁহার ক্রন্দনে জীবন্ত হইয়া উঠেন। সম্মুখে রক্ষিত প্রসাদী থালা হইতে সমস্তটা ক্ষীর ছানা ও নাড়ু নিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।

গৃহে ফিরিয়াই মুকুন্দ পত্নীকে কহিলেন, "আমার বড় খিদে পেয়েছে শীগগির ঠাকুরের প্রসাদ কিছুটা এনে দাও।"

বাড়ির সকলেই জানে, গোপীনাথের প্রসাদ ছাড়া তিনি আর কিছু কখনো ভোজন করেন না।

বালক রঘুনন্দন বলিয়া উঠিল, "বাবা, তোমার জন্য প্রসাদ যে আজ কিছু নেই। গোপীনাথজী সবটাই খেয়ে ফেলেছেন।"

সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, সত্যিই তাই। থালায় একবিন্দু প্রসাদও অবশিষ্ট নাই।

মুকুন্দ বড় অনুসন্ধিৎসু হইলেন। পরের দিনও তেমনি ভোগরাগ সাজাইয়া রাখিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুরের ভার রহিল বালকপুত্রের উপর। খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া মুকুন্দ ঠাকুরঘরের পাশে আড়ি পাতিলেন। সহসা দেখা গেল এক অলৌকিক দৃশ্য। বালকের প্রেমাভিমান গোপীনাথজীকে সচল করিয়া তুলিয়াছে। পরমানন্দে নিবেদিত ভোগ তিনি গ্রহণ করিতেছেন।

ভোজন সমাধা করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। মুকুন্দ তো আনন্দে আত্মহারা। পুত্রকে কোলে নিয়া বারবার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরের কথা। রঘুনন্দনের বয়স তখন প্রায় আট বৎসর। শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। প্রভুকে প্রণাম করিতে গিয়াই বালকের মুখ দিয়া স্বতোৎসারিত বন্দনা শ্লোক নির্গত হইতে থাকে :

কনকরুচিগৌরঃ সর্বৈচিত্তৈকচৌরঃ
প্রকৃতি মধুর দেহঃ পুণ্যলাবণ্যগেহঃ।
কলিতললিত রূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ
স্ফুরতুহৃদিনটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ।

অর্থাৎ আমাদের কনকরুচি গোরা হইতেছেন সকলের চিত্তচোর। বড় সহজ মধুর তনু তাঁহার। লাবণ্যের ধারা সে তনু হইতে ঝরিতেছে শতধারায়। এ ললিতরূপ দর্শনে স্বয়ং মদনেরও জ্বলিয়া উঠে ক্ষোভ—হৃদয়ে আমার নটবর নবদ্বীপচন্দ্র স্ফুরিত হইয়া উঠুক।

প্রভুর নীলাচলের কীর্তনসভা। সেদিন নরহরির শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহার প্রেম-মধুর চরিত্রে প্রভাবিত বালকের এই অদ্ভুত গৌরপ্রেম দর্শনে সকলেই চঞ্চল না হইয়া পারেন নাই।

প্রভুর নির্দেশ অনুসারে রঘুনন্দন তাঁহাদের গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ভক্তি-প্রেমের এক মূর্ত বিগ্রহরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনি অপূর্ব মর্যাদা প্রাপ্ত হন।

তাঁহার সংকল্প ছিল, রোজ পূজার সময় গোপীনাথের কর্ণে দুইটি কদম্বপুষ্প তিনি পরাইয়া দিবেন। কথিত আছে, ঠাকুর তাঁহার এ অভিলাষ পূর্ণ করেন। মন্দিরের নিকটে এক কদম্ববৃক্ষে রোজ প্রভুর পুষ্পসজ্জার জন্য দুইটি করিয়া কদম্ব ফুটিয়া থাকিত। কোন ঋতুতেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

অভিরাম গোস্বামী ছিলেন সে সময়কার এক শক্তিধর বৈষ্ণব সাধক। শালগ্রাম শিলা খাঁটি না হইলে তাঁহার প্রণাম সহ্য করিতে পারিত না, ফাটিয়া যাইত। নিত্যানন্দ প্রভুর কতকগুলি সন্তান নাকি তাঁহার প্রণামে বিনষ্ট হন। রঘুনন্দনের অলৌকিক জীবনের কথা, তাঁহার প্রতি প্রভু শ্রীচৈতন্যের অজস্র কৃপার কথা গোস্বামী প্রভু শুনিয়াছেন। এক-দিন কৌতূহলী হইয়া রঘুনন্দনকে তিনি পরীক্ষা করিতে আসিলেন।

অভিরামের আগমনের সংবাদে সকলে তো মহা উদ্বিগ্ন। বালক রঘুনন্দনকে লুকাইয়া রাখা হইল, গোস্বামীজীর দৃষ্টিপথে পড়িয়া তাঁহার যেন কোনো অমঙ্গল না ঘটে।

নিরাশ হইয়া ফিরিবার সময় অভিরাম বড়ডাঙ্গার কাছে চুপচাপ বসিয়া আছেন। এমন সময় নূপুর পরিহিত আনন্দ চঞ্চল বালক রঘুনন্দনের সহিত তাঁহার দেখা। দর্শন মাত্রেই প্রবীণ গোস্বামীর কি এক ভাবের উদয় হইল, বালকের চরণে লুটাইয়া তিনি প্রণাম করিলেন। রঘুনন্দনও পরমানন্দে দুই হাত প্রসারিয়া তাঁহাকে কোলে নিলেন। এবার শুরু হইল উভয়ের নৃত্য ও কীর্তন। কথিত আছে, ঐ নৃত্যোল্লাসের সম-

রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর খসিয়া গিয়া দুই মাইল দূরে পতিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি কুণ্ডের সৃষ্টি হয়। শ্রীখণ্ডের অনতিদূরে আকাইহাট গ্রামের নূপুর কুণ্ড আজিও সকলকে এই অলৌকিক কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহাপ্রভুর পরম প্রিয় রঘুনন্দনকে সমকালীন বৈষ্ণবেরা শ্রীহরির অংশাবতার বলিয়া মনে করিতেন।

প্রসিদ্ধ পদকর্তা কবিশেখর বা রায়শেখর রঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য। তাঁহার রচিত বহু পদে ঠাকুর নরহরি ও রঘুনন্দনের মধুর সাধনার রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর নরহরি শুধু প্রেম সাধনার ও নাগরীভাবের উপাসনারই প্রবর্তক নন, বাংলা কাব্যে গৌররসের যে স্রোতধারা আজিও বহিয়া চলিয়াছে তাহারও তিনি অন্যতম উৎস।

নরহরির অন্তরের অভিলাষ—গৌরসুন্দরের রসরাজ মূর্তিটি বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক, প্রভুর অমৃতনিষ্যন্দী লীলাকথা সর্বত্র প্রচারিত হোক। কিন্তু তখনও যে বাংলা ভাষায় কোনো লীলাপদ রচিত হয় নাই। জনগণের ভাষায় এ রসবস্তু পরিবেশিত না হইলে জনচিত্তে গৌরসুন্দরের মূর্তি কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিল, বাংলা ভাষাতে এই লীলামাহাত্ম্যসূচক সাহিত্য গড়িয়া উঠুক। এজন্য নিজেও কিছু পদ লিখিতে শুরু করিলেন। কিন্তু প্রভুর কথা লিখিতে গিয়া কেবলই বৈষ্ণবীয় দৈন্য আসিয়া পড়ে। দিগ্বিজয়ী লোকানন্দাচার্যের গুরু প্রতিভাধর নরহরিকে তাই আমরা খেদোক্তি করিতে শুনি—'মুই অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি।'

নরহরি প্রভুর রসমধুর লীলাকথা কিছু কিছু লিখিয়া যান। উত্তরকালের সাধক ও পদকর্তাগণ তাঁহার এই রচনার অনুসরণে লীলাবিলাসের পূর্ণতর রূপ ফুটাইয়া তুলিবেন এ বাসনাই তিনি পোষণ করিতেন।

নরহরির আশা অপূর্ণ থাকে নাই। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলার আখ্যান বর্ণনায় প্রতিভাধর কবিগণ উৎসাহিত হইয়া উঠেন। বাসুদেব ঘোষের পদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

> শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে
> পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে।

নরহরির এই আশা সফল করিতে অনেকাংশে সাহায্য করেন তাঁহার শিষ্য লোচনদাস ঠাকুর। গুরু নরহরির গৌরনাগরী ভাবের রসধারা তাঁহার রচিত চৈতন্যমঙ্গল ও অন্যান্য পদ রচনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবননদীর তিনটি প্রধান ধারা উত্তরকালে তাঁহার তিনটি চরিতকারের রচনায় ফুটিতে দেখি। বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্য ভাগবতে অঙ্কিত করেন প্রভুর ভগবত্তা, কবিরাজ গোস্বামীর তুলিকায় জীবন্ত হইয়া উঠে তাঁহার মহা ভাবময়তা আর লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে তাঁহার রসরাজ মূর্তি। নরহরির শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে লোচনের জীবন গড়িয়া উঠে। দীক্ষাও তিনি নরহরির কাছেই গ্রহণ

করেন। প্রেমভক্তির যে বীজ গুরু তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনে রোপণ করেন একদিন তাহাই হইয়া উঠে এক বিরাটকায় মহীরুহ।

আত্মীয়-স্বজনদের চাপে পড়িয়া অল্প বয়সেই লোচনকে বিবাহ করিতে হয় কিন্তু ক্রমে বিষয় বিরক্তি তাঁহার জীবনে তীব্রতর হইয়া উঠে। দাম্পত্য জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া গুরু নরহরির সেবায় নিজেকে তিনি উৎসর্গিত করেন।

সেবার লোচনের শ্বশুরবাড়ি হইতে উপর্যুপরি আহ্বান আসিতে লাগিল। সেই করে তিনি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। সেই বালিকা স্ত্রী এবার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। আর কতকাল সে উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে? লোচনের শ্বশুরবাড়ির লোক আসিয়া শেষটায় নরহরির শরণ নিল। তিনি যেন শিষ্যকে বলিয়া কহিয়া একবার পাঠাইয়া দেন।

ঈশ্বরীয় প্রেমে ভক্ত লোচনের জীবন তখন ভরপুর। কোনোমতেই তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে রাজী নন। স্ত্রীর সহিত যাহাতে দেখা না হয়, দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত না হয় ইহাই তিনি চাহিতেছেন। নরহরি কিন্তু আজ্ঞা দিয়া বলিলেন, "বাবা, ওরা বড় কান্নাকাটি করছে, ধরে বসেছে তুমি একবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখাশুনা করে এসো।"

অগত্যা লোচনকে শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। যাইবার সময় গুরুকে কহিলেন, 'প্রভু, আশীর্বাদ করুন আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।"

"বৎস, বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরসুন্দর তো ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করার জন্যই রয়েছেন।"

যে গ্রামে শ্বশুরবাড়ি সেখানে তিনি আসিয়া উপস্থিত। বিবাহের পর আর কখনো এখানে আসেন নাই, স্ত্রীর সঙ্গেও এযাবৎ আর দেখা হয় নাই। দেখিলেন, পুকুরের ঘাটে এক সুন্দরী তরুণী কলসীতে জল ভরিতেছে।

মেয়েটিকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিলেন, তারপর শ্বশুরের নামটি উল্লেখ করিয়া তাঁহার বাড়ি কোন দিকে জানিতে চাহিলেন। রমণী অঙ্গুলি নির্দেশে উহা দেখাইয়া দিল।

শ্বশুরালয়ে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আবার সেই পুকুর ঘাটে তরুণীর সঙ্গে দেখা। শুনিলেন এ তাহারই বিবাহিতা স্ত্রী।

মন স্থির করিতে লোচনের আর দেরী হয় নাই। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা নয় যে দাম্পত্য জীবনে [illegible]। তিনি প্রবিষ্ট হন অন্দরে [illegible] এমনভাবে মাতৃ সম্বোধন করিয়া বসিলেন কেন? নিজের বৈরাগ্য জীবনের [illegible] সংকল্পের কথা সজল নয়নে পত্নীকে বুঝাইতে লাগিলেন।

[illegible] ভার্যাকে স্বীয় মতে আনিতে তিনি সমর্থ হন। উভয়ের মধ্যে [illegible], দেহের সম্বন্ধ না রাখিয়া স্বামী ও স্ত্রী নিরন্তর গোবিন্দনামে আনন্দে [illegible] কাটাইবেন।

নরহরি এবার প্রিয় শিষ্য লোচনকে চৈতন্যলীলা রচনার আদেশ দেন। নিজ গ্রামে অবস্থান করিয়া লোচন এবার তাঁহার প্রসিদ্ধ লীলাকাহিনী সম্পূর্ণ করেন।

গৌরকথার মাধুর্যরসে স্বামী স্ত্রী উভয়েই এ সময়ে ভরপুর থাকিতেন। গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লোচনের আনন্দ আর ধরে না। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন তাঁহার সফল হইয়াছে। গুরুর আদেশ পালনেও তিনি আজ সফলকাম।

গ্রন্থখানির নাম দিলেন—চৈতন্যমঙ্গল। নরহরির হাতে ইহা দিবা মাত্রই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বৎস, ঠাকুর বৃন্দাবনদাসও যে ইতিমধ্যে এক লীলাগ্রন্থ লিখেছেন। তারও নামকরণ হয়েছে চৈতন্যমঙ্গল। কাজেই তোমার এ গ্রন্থ প্রচারের আগে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। তুমি সে অনুমতি নিয়ে এসো।"

বৃন্দাবনদাস নরহরি শিষ্যের এ গ্রন্থ পাঠে বলিয়াছিলেন, "আমি করেছি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণন, আর লোচনের গ্রন্থে ফুটে উঠেছে প্রভুর মাধুর্যময় মূর্তি। কাজেই সঙ্গত হবে আমার গ্রন্থকে 'চৈতন্য ভাগবত' বলা। লোচনের গ্রন্থ পরিচিত হোক চৈতন্যমঙ্গল' নামে।"

গুরুর প্রেরণায় লোচন দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, রাগলহরী রচনা করেন। এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ এবং রামরায়ের শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের অনুবাদও সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সেবার নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গসহ শ্রীখণ্ডে আসেন। দুই প্রভুর আগমনে নরহরির আনন্দের অবধি রহিল না, তাঁহার শ্রীখণ্ডের গৃহে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভিড় লাগিয়া গেল।

কথিত আছে এ সময় নরহরির মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু এক অভিনয় শুরু করিয়া দেন। মধু পিয়াসী হইয়া বার বার তিনি এ বস্তুটির দাবি করিতে থাকেন। পদকর্তা উদ্ভবদাস ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কহে নিত্যানন্দ রায়
শুনি মধুমতীর নাম
    আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি
নিকটেতে জল হেরি
    সেই জল ভাজনে ভরিয়া।
আনিয়া ধরিল আগে
মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে
    গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে
মধু হয় ততক্ষণে
    পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ।
মধুমতীর মধু দান
সপার্ষদে করি পান
    উনমত অবধূত রায়।

হাসে কাঁদে নাচে গায়
ভূমে গড়াগড়ি যায়
এ উদ্ধবদাস রস গায়।

অতঃপর গোপীনাথজীর ভোগ শেষে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ পরমানন্দে ভোজন সমাধা করিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবদের উল্লাস ধ্বনিতে নরহরির গৃহে সেদিন এক আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

নরহরি প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন, যে মধুর স্মৃতি হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া আনেন, শ্রীখণ্ডে বসিয়া দিনের পর দিন তাহারই রসভুবনে চলিতে থাকে।

প্রভুর গম্ভীরা লীলার প্রত্যক্ষদর্শীরূপে নরহরি যে কয়েকটি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহা অপরূপ। প্রভুর অন্ত্যলীলার পরম মধুর বিরহরস এগুলিতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। এ সব পদের ঐতিহাসিক গুরুত্বও অসাধারণ। একস্থানে নরহরি লিখিতেছেন—

আরে মোর গৌর কিশোর।
পুরুষ প্রেমরসে ভোর॥
স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদ্‌গদ ভাষ।
ঘন বহে দীরঘ নিশ্বাস॥
মরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেন বা এ প্রেম বাড়াইনু।
জীবন্তে পরাণ খোয়াইনু॥
নিঝোরে ঝরায় দুনয়ান।
নরহরি মলিন বয়ান॥

প্রেমসিন্ধু সাধক নরহরির কৃপা পাইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি উত্তরকালের বৈষ্ণব সাধকেরা ধন্য হইয়াছিলেন। নরহরির প্রচারিত গৌরসুন্দরের [illegible] এইরূপ ভক্ত বৈষ্ণবদের এ সময় কম প্রভাবিত করে নাই। নরহরির প্রেমলীলা নাট্যে এবার নিয়তির কালো মেঘ ছাইয়া আসিল, তিনি শুনিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ আর [illegible] নাই।

নরহরির বুক এ আঘাতে ভাঙিয়া গেল। বিরহবিধুর দেহটি আর বেশী দিন প্রভুর বিরহ বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে নাই। শুধু শ্রীখণ্ড নয় সমগ্র বাংলার [illegible] ভক্ত সাধকদের শোকসাগরে ভাসাইয়া নরহরি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আদেশ করিতেছেন, হে ব্রাহ্মণ। তুমি এক্ষণে গৌড়দেশে গমন কর, সত্বরই তোমার এক প্রেমময় পুত্র জন্মিবে, অল্পকালেই সর্বশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার হইবে।

গঙ্গাদাস পুরীতে অবস্থান করিব বলিয়াই বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশে আবার তাঁহাকে স্বীয় নিবাস চাখন্দি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর গর্ভলক্ষণ দেখা দিল। গর্ভকাল পূর্ণ হইল, বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী নক্ষত্রে দিবাভাগে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এই প্রেমময় সন্তানটিকে প্রসব করিলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবেন পুত্র। (ভক্তি রত্নাকর)

শ্রীনিবাস ছিলেন অতি রূপবান। তাঁহার চম্পক গৌরবর্ণ, ঢলঢল আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, অতি সুন্দর নাসিকা এবং মৃদু মধুর বাক্য শুনিয়া সকলেই প্রীত হইতেন। বাল্যকালেই শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার জন্মাইয়াছিল। ব্যাকরণ, কোষ অলঙ্কার ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পণ্ডিত ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস অধ্যয়ন করেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শ্রীনিবাসের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তৎসাময়িক গৌর ভক্তগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ মহাশয় নিরন্তর শ্রীনিবাসের মুখে গৌরগুণ শ্রবণ করিতেন। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাসকে দেখিতে উৎকণ্ঠ হন। যাজি গ্রামে শ্রীনিবাস ও নরহরি ঠাকুরের প্রথম সম্মিলন হয়। এইরূপে ভক্তগণের সহিত শ্রীনিবাসের আলাপ পরিচয় হইতে লাগিল। গঙ্গাদাসের আবাসে প্রেমের প্রবাহ বহিতে লাগিল, সেখানে প্রেমসরোবরে সোনার কমল ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বৃদ্ধ গঙ্গাদাসের আয়ুষ্কাল ক্রমেই শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তিপ্রাণ পুত্রটি যৌবনে পৌঁছিতেই গঙ্গাদাস পরলোকে গমন করিলেন। শ্রীনিবাস মাতামহ বলরামের বিভার অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতাকে লইয়া তিনি মাতামহের আলয়ে গমন করিয়া সেইস্থানেই অবস্থান করা কর্তব্য মনে করেন।

পিতৃবিয়োগের পরও শ্রীনিবাসের গৌরানুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। শ্রীনিবাস যেন শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমূর্তি। তাঁহার এই প্রেম দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শ্রীনিবাস শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া [illegible] এবং [illegible] পুরীধামে গমন করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট হইয়াছেন। ইহাতে যেন তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তিনি [illegible] ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে [illegible] হা গৌরাঙ্গ। তুমি কোথায় গেলে বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাই শ্রীনিবাস [illegible] নবপদ্যে—"গতং শ্রীপুরুষোত্তমং দ্রুতমিতঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুশ্চৈতন্য [illegible] জনমুখাৎ শ্রুত্বা তিরোধানতাম্। [illegible] আশ্বাসিতশ্চ [illegible] স্বপ্নে [illegible]।" [illegible] সময় শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে দর্শনদান করিয়াছিলেন। [illegible]

শ্রীনিবাস বহুবার স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহব্যাকুল শ্রীগদাধরাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন হয় এবং ইনি পুরীর দর্শনীয় স্থান-সকল দর্শন করেন।

এইরূপে শ্রীনিবাস কিছুদিন পুরীধামে অবস্থান করিয়া আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিছুদিন যাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া শ্রীনিবাস নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপ ও শান্তিপুর দর্শন করিয়া তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া ঠাকুর অভিরামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া একচক্রাগ্রামের মধ্য দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশী, অযোধ্যা ও প্রয়াগ হইয়া মথুরায় আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন কাশীশ্বর গোস্বামী ও রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর শোকে অধীর। এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীনিবাসের শোক উথলিয়া উঠিল।

যাহা হউক এই স্থলে শ্রীজীবাদি গোস্বামীগণের সন্দর্শন পাইলেন। কথিত আছে স্বপ্নযোগেও এই সন্দর্শন ব্যাপারে অত্যদ্ভুতরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস অচিরেই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমূর্তিসমূহ দর্শন করিলেন। শ্রীনিবাস দ্বারা যে ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তিপ্রচার হইবে, শ্রীপাদ সনাতন স্বপ্নেই শ্রীজীব গোস্বামীকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বপ্নের মর্ম এইরূপ—বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে শ্রীনিবাস আচার্য নামক একজন ভক্ত এখানে পৌঁছিবেন। সন্ধ্যার কালে শ্রীগোবিন্দদেবের আরতির সময় লোকের ভিড় অল্প হইলে তাঁহার অন্বেষণ করিবে। তাঁহার বর্ণ হলুদের ন্যায় গৌরবর্ণ, কলেবর অতি ক্ষীণ, বয়স অল্প, নয়নযুগল প্রেমাশ্রুপূর্ণ। তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে। শ্রীগোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার দীক্ষা ব্যাপার সম্পন্ন করিবে এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবে। অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহাকে গ্রন্থগুলি সমর্পণ করিয়া গৌড়ে পাঠাইবে। ইহা দ্বারা শ্রীগৌড়মণ্ডলে গ্রন্থ ও ভক্তি প্রচার হইবে।

স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীজীব যথাসময়ে শ্রীনিবাসের অনুসন্ধান করিলেন। স্বপ্নে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ মূর্তি দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আপনার শ্রীমন্দিরে লইয়া আসিলেন।

শ্রীনিবাস দীর্ঘকাল শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করেন, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য পদবী প্রাপ্ত হন। শ্রীনিবাস এই সময়ে অপরকেও শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসের প্রিয় সহচররূপে সতত তাঁহার সহিত বিচরণ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে ভক্তির এই তিন অবতারের সম্মিলন শ্রীভগবানের এক সুন্দর বিধান। এই তিন মহাভাগবত একত্র অবস্থান দ্বারা আপনাদের ভাবী জীবনের কার্যপথে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের তীর্থদর্শন, প্রাচীন প্রবীণ ও ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ। গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সদাচারানুষ্ঠান দ্বারা ইঁহারা বাস্তবিক ভক্তিশাস্ত্রের উপযুক্ত প্রচারক এবং মানবসমাজের প্রকৃত গুরুর উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কেবল শাস্ত্রশিক্ষায় নয়। শ্রীভগবদনুভাবেও ইহাদের বিশিষ্টতা যথেষ্ট পরিলক্ষিত

হইত। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে লইয়া মধ্যে মধ্যে গোবর্ধনে যাইতেন, নির্জনে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেন। একদিন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম গোবর্ধনের এক নিভৃত প্রদেশে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতেছেন, সহসা গোবর্ধন কন্দরে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার নাসিকা দিব্য সৌরভে পরিপূরিত হইল। উভয় মূর্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ইহাদের জ্ঞানসঞ্চার হইল। ইহার সম্মুখে এক গোপকুমারকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপপুত্র, তুমি এখানে কেন, এই নিভৃত বনে তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ? গোপকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কেবল তোমাদিগকে রক্ষা করার জন্যই এখানে আসিয়াছি। এ স্থান সর্বদাই ভয়ের নিলয়, আমরা এ প্রদেশে গোচারণ করি, কোথায় কি আছে না আছে তাহা ভালরূপেই জানি। তোমরা উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, তাই আমি ব্যস্ত হইয়া সঙ্গিগণকে দূরে রাখিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার সঙ্গীরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখন আমি যাই, এই কথা বলিয়া রাখাল তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। সেই মূর্তি সহসা অদৃশ্য হওয়ায় উভয়ে ব্যাকুল হইলেন, ব্যাকুলতাতেই দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রাত্রিকালে স্বপ্নে উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। দয়াময় শ্যামসুন্দর কহিলেন, 'আমিই তোমাদিগকে রাখাল বেশে দর্শন দিয়াছিলাম।" এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া উভয়ে প্রেমে অধীর হইলেন। মধ্যে মধ্যে ইঁহারা এইরূপে শ্রীভগবানের দর্শনলাভ এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা স্থানাদি সন্দর্শন করিতেন। শ্রীরামদাস গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ প্রভৃতি বৈষ্ণব গুরুগণের শ্রীমুখে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাদের ভজন দেখিয়া ইঁহাদের হৃদয়েও ভজনের প্রবল প্রবাহ অহর্নিশ প্রবাহিত হইত। এতাদৃশ ভজননিষ্ঠ ভক্তগণের পক্ষে ভগবান্‌ দর্শন অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীবৃন্দাবনের প্রাচীন ও প্রবীণ গোস্বামীগণের বঙ্গদেশের প্রতি বড়ই লক্ষ্য ছিল। তাহারা মনে করিলেন গৌড়ীয় জনগণের উদ্ধারের উপায় করা এখন আবশ্যক। শ্রীনিবাসকে গৌড়ে প্রেরণ না করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন, অচিরেই শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইতে হইবে।

এই পরামর্শ স্থির হইল যে অগ্রহায়ণের শুক্লপক্ষে শ্রীনিবাসের গৌড় প্রেরণ করা হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিগ্রন্থসকল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্রহায়ণ মাস আসিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবন হইতে গৌড় প্রত্যাবর্তন করিবেন। এই বিরহ চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা ও কর্তব্যের আহবানে নিজে নিজেই কিন্তু [illegible] চিত্ত সান্ত্বনা করিলেন। শ্রীনিবাসের গৌড় গমনের দিন পর্যন্ত স্থির হইল। অগ্রহায়ণ শুক্লা [illegible] শ্রীশ্রীবিগ্রহগণ ও ভক্তগণের নিকট হইতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ [illegible] হইল। শ্রীশ্রীবিগ্রহগণ [illegible] লইলেন। শ্রীপাদজীব গোস্বামী মথুরার একজন ধনী [illegible] দশজন লোক ও গ্রন্থ বহনের গাড়ি সঙ্গে দিলেন [illegible] করিয়া ভক্ত প্রভাবক শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ চিন্তা করিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন [illegible]

বনবিষ্ণুপুরের সীমায় আগমন করিলেন। তখন বীর হাম্বীর বনবিষ্ণুপুরের অধিপতি ছিলেন, ডাকাতি তাঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। পথিকদিগের ধন লুণ্ঠন তাঁহার নিত্য কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গ্রন্থপূর্ণ কাষ্ঠসম্পুট দেখিয়া বীর হাম্বীরের দূতগণের মনে হইল ইহাতে অনেক মূল্যবান পদার্থ আছে। এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণও ছিল। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী অতি যত্নে কাষ্ঠসম্পুট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী প্রহরীও সঙ্গে ছিল।

নিশাভাগে কাষ্ঠসম্পুট অপহৃত হইল, শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখিলেন সর্বনাশ হইয়াছে। তিনজনেই অধীরভাবে কিয়ৎক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু নিষ্ফল। কিছুতেই আর সন্ধান হইল না। বহুক্ষণ পরে একজন লোক শ্রীনিবাসকে বলিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজার বাড়িতে গ্রন্থসম্পুট নীত হইয়াছে, আপনি সেইখানে ইহার অনুসন্ধান পাইবেন। শ্রীনিবাসের ব্যাকুল প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীল নরোত্তমকে আদেশ করিয়া বলিলেন, নরোত্তম, তুমি শ্যামানন্দকে লইয়া খেতরী যাও, ইহাকে সুসঙ্গীত ক্রমে উৎকলে পাঠাইও। গ্রন্থের সন্ধান পাইলেই আমি তোমাদের সংবাদ দিব। ইঁহারা আচার্যের আজ্ঞায় ব্যাকুল মনে খেতরীতে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীনিবাস একাকী বনবিষ্ণুপুরে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বনবিষ্ণুপুরের লোকেরা ভগবদবতার বলিয়া মনে করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন ব্রাহ্মণ পুত্র আচার্যকে দেখিয়াই প্রেমে অধীর হইলেন। ইঁহার নিবাস দেউলী। ইনি শ্রীনিবাসকে দেউলীতে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, রাজা বীর হাম্বীর যদিও ডাকাতি করেন কিন্তু ভাগবত শ্রবণে তাঁহার সবিশেষ অনুরক্তি আছে, সুতরাং আপনি রাজবাড়িতে চলুন। কৃষ্ণবল্লভ এই বলিয়া শ্রীনিবাসকে রাজবাড়িতে লইয়া গেলেন। রাজা আচার্যের তেজঃপ্রভাব দেখিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইলেন এবং স্পষ্টতই বুঝিলেন যে তাঁহার লোকেরা রত্ন লোভে যে কাষ্ঠসম্পুট আনিয়াছিল, ইনিই সেই রত্ননিচয়ের অধিকারী। রাজা দস্যু ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চিত্ত একেবারে ভগবদ্‌রসে হীন ছিল না। শ্রীনিবাসের দর্শনে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইল। তিনি শ্রীনিবাসকে ভ্রমর গীতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীনিবাস এমন অদ্ভুতভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিলেন যে সে ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃ মাত্রেরই বক্ষঃস্থল অশ্রুসিক্ত হইল। ব্যাস চক্রবর্তী নামক রাজার একজন পাঠক ছিলেন। তিনি একেবারেই অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাস আচার্যও প্রেমাবেশে আত্মহারা হইলেন। বীর হাম্বীর ভাবের আবেগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মূর্ছিতের ন্যায় শ্রীনিবাসের চরণতলে পড়িয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা প্রকৃতিস্থ হইলেন, সন্ধ্যার সময়ে তিনি শ্রীনিবাসকে বলিলেন, প্রভো! এখানে আপনার শুভাগমনের কথা আপনার ঐ শ্রীমুখে শুনিতে বাসনা করি। শ্রীনিবাস এই উপলক্ষে ভূমিকা করিয়া বীর হাম্বীরকে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের কথা শুনাইলেন, তৎপরে শ্রীগৌরভক্তগণের কথা বলিলেন। তারপরে গ্রন্থ চুরির কথাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা সন্তপ্তচিত্তে স্বীয় দুষ্কৃতির সকল কথাই শ্রীনিবাসের নিকট সরলভাবে জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সম্পুট খুলিয়াই আমার চিত্তে

ভাবান্তর হইয়াছিল। যাহা হউক, গ্রন্থ এখানেই আছে। তজ্জন্য কোনো চিন্তা নাই, কিন্তু প্রভো! এ নরাধমকে চরণতলে স্থান দিতে হইবে। আমি মহাপাপী, আমায় ঘৃণা করিবেন না। আপনার শ্রীঅঙ্গের প্রভাব দর্শনেই আমি বুঝিয়াছি, আপনি প্রকৃত মানুষ নহেন। কিন্তু এ অধমের গতি করিতে হইবে। শ্রীনিবাসের চরণতলে বসিয়া বীর হাম্বীর সারা নিশি উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন গ্রন্থসম্পুট শ্রীনিবাসের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। শ্রীনিবাসের আনন্দের সীমা রহিল না। বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। রাণী এই মহাপুরুষের পদতলে নিপতিত হইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। রাজাকে লইয়া শ্রীনিবাস বাহিরে আসিলেন। কিন্তু রাজার মনস্তাপ তখনও দূরীভূত হয় নাই, তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের পদে শরণ লইয়া বলিলেন, প্রভো! আমায় নিস্তার করুন। দয়াময় আচার্য বলিলেন, বীর হাম্বীর তোমার আর কোনো ভয় নাই। তোমাকে আমি ভক্ত বৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ে সমর্পণ করিয়াছি। এখন তুমি কিয়দ্দিন গ্রন্থাস্বাদন কর। অতঃপর আমি তোমায় দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিব।

এদিকে শ্রীনিবাস সর্বত্র গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। বীর হাম্বীর স্নেহবাহী শকট নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে ফেরত পাঠাইলেন। শ্রীনিবাস কিয়দ্দিবস থাকিয়া বীর হাম্বীর ও তাহার পত্নীকে কৃপা করিয়া তথা হইতে বহু দ্রব্যাদি লইয়া যাজী গ্রামে গমন করিলেন। তখনও স্নেহময়ী লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন—পুত্র সন্দর্শনার্থ মাতার চিত্ত আনন্দের তরঙ্গ উত্থলিয়া উঠিল। যাজী গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীনিবাসের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। শ্রীনিবাসকে পাইয়া সকলেই আপ্যায়িত হইলেন। শত শত লোকের আগমনে যাজী গ্রামে হরিধ্বনির কল্লোল কোলাহল সমুত্থিত হইয়া ভক্তিকথা ও ভক্তিশাস্ত্রের বন্যা বহিয়া চলিল। এইরূপে শ্রীনিবাসের অদ্ভুত ভক্তিময় ভাব দেখিয়া বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস গৌরপ্রেমে সর্বদাই বিহ্বল থাকিতেন। অনুক্ষণই শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরণ চিন্তা করিতেন। একদিন স্বপ্নযোগে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীনিবাসকে দর্শন দিয়া ভক্তিপ্রচারের আদেশ এবং বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীনিবাসের জননীর বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ড যাইয়া শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সহিত দেখা করেন। নরহরি তাঁহাকে পত্নী গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীনিবাস কণ্টক নগরে যাইয়া প্রাচীন ভক্তদাস গদাধরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বেই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সন্দর্শন সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ তখন অন্ধতামসে নিমজ্জিত হইয়াছে, সুতরাং গভীর শোকে ব্যাকুল হইবেন বলিয়া দাস গদাধর তাঁহাকে কণ্টক নগর হইতেই যাজী গ্রামে প্রেরণ করিলেন। নরোত্তম নবদ্বীপ ও পুরীধামে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যাজী গ্রামে আসিয়া আচার্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীনিবাসের নিকট বহু শিষ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। শ্রীখণ্ডবাসীরা শ্রীনিবাসের বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে রঘুনন্দনই অগ্রগামী। যাজী গ্রামে গোপাল চক্রবর্তী নামক ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়াতে স্বীয় কন্যা দান করেন। পূর্বে ইনি দ্রৌপদী

নামে পরিচিত ছিলেন, বিবাহের সময় হইতে ইনি ঈশ্বরী নামে অভিহিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন গোপাল চক্রবর্তীও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্যামাদাস ও রামচন্দ্র শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে গৌরভক্ত দ্বিজ হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ দাসও আচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কুমারনগর নিবাসী সুবিখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজকেও শ্রীনিবাস দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার যাওয়ার দশদিন পূর্বে হরিদাসাচার্য তিরোধানকরিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী, ভূগর্ভ ও লোকনাথ তখনও প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাসকে পাইয়া সকলেই আনন্দিতহইলেন। এই সময়েশ্যামানন্দও পুনর্বার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের অভাবে গৌড় অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহাকে আনিবার জন্য ভক্তগণ রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র ও আচার্য প্রভু একত্রে আবার গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া আবার তিনি রাজা হাম্বীরকে কৃতার্থ করেন। এইবার আচার্য প্রভু বীর হাম্বীর ও রাণীকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং হরিনাম জপের ক্রম বলিয়া দিলেন। বীর হাম্বীর নামের পরিবর্তে রাজার শ্রীচৈতন্যদাস নাম রাখিলেন। রাজার পুত্র ধাড়ী হাম্বীরও আচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাজা কালাচাঁদ মূর্তি স্থাপন করিলেন। শ্রীনিবাস উহার অভিষেক কার্য সম্পন্ন করেন। দস্যুরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের প্রভাবে পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আচার্য প্রভুর নিকট শত শত লোক মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস যাজীগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক মহামহোৎসব করেন, নানাস্থান হইতে এই মহোৎসবে ভক্তগণের সমাগম হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তনয় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস কাঞ্চনগড়িয়াতেও এক মহামহোৎসব করিয়াছিলেন। সেখানে গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসাচার্য মন্ত্র গ্রহণ করেন।

অতঃপর খেতরীর মহামহোৎসবেও শ্রীনিবাস নিজ ভক্তগণসহ শুভাগমন করিয়াছিলেন। যাজীগ্রামে, শ্রীখণ্ড, তেলিয়াবুধরি, কাঞ্চনগড়িয়া, বাহাদুরপুর, খেতরী প্রভৃতি স্থানে আচার্য শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রভাবে নামকীর্তন মহামহোৎসবে সেই সময়ে ভক্তিরসের বন্যাপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, যশোহর ও রাজসাহীতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের কৃপায় ভক্তিধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছিল। কটক নগরে, খড়দহ ও নবদ্বীপে ইঁহাদের যত্নে বহুবার বহু ভক্ত সম্মিলনী, মহাসংকীর্তনোৎসব সম্পন্ন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবনপাবন নামের জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসই খেতরীতে নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, ব্রজমোহন, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকান্ত ও রাধারমণ মূর্তির অভিষেক করেন।

শ্রীনিবাস রাঢ়দেশে গোপালপুর নিবাসী রাঘব চক্রবর্তী এবং তাহার গৃহিণী মাধবীদেবীর প্রার্থনায় উহাদের কন্যা শ্রীমতী গৌরাঙ্গপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। আচার্য প্রভুর উভয় সহধর্মিণীর মধ্যেই যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য যদিও সুবিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট

ছাত্রবৎ ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিয়া ছিলেন, যদিও শ্রীজীবের লিখিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করাই তাঁহার প্রধান একটা কর্তব্যভার ছিল, কিন্তু ভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায়, শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া পত্র লিখিতেন। ভক্তিরত্নাকরের উপসংহারে শ্রীনিবাসের নামে তিনখানা পত্র প্রকাশিত আছে। দুইখানি শ্রীজীবের লিখিত অপরখানি শ্রীমন্নিত্যা-নন্দাত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীর লিখিত। শ্রীজীব পত্রের স্বস্তি মুখে লিখিয়াছিলেন—

"স্বস্তি মদীয়সুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব শ্রীনিবাসাচার্য্য
চরণেষু।
শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্য সপ্রণামালিঙ্গন
শংসনেয়ম্।"

শ্রীজীব একে ব্রাহ্মণ তাহাতে আকুমার ব্রহ্মচারী, তাহার উপরে আবার দার্শনিক পণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। সর্বোপরি আচার্য প্রভুর শিক্ষা গুরু ও অধ্যাপক, শ্রীজীব বয়সেও আচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ হওয়াই সম্ভবপর, শ্রীজীবের উক্ত পত্রে শ্রীনিবাসের গৌরব ও শ্রীজীবের দীনতা উভয়েই সূচিত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের এই গৌরবের একটি বিশেষ হেতু এই যে, বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে মহাপ্রভুর প্রেমশক্তির অবতার বলিয়া জানিতেন। এদিকে শ্রীমন্নিত্যানন্দাত্মজ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে "ত্বং হি শ্রীশ্রীমহাপ্রভো শক্তি" বলিয়া পত্রে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পরবর্তী সময়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে তদীয় প্রেমশক্তি বলিয়া মনে করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাস দ্বারা বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণের গ্রন্থ বঙ্গে প্রচার করেন, ইহাই পরবর্তী বৈষ্ণবগণের ধারণা। কর্ণামৃতে অতি সংক্ষেপে শ্রীনিবাসচরিত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা অতি মনোহর।

"শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত যত গ্রন্থগণ।
যত গ্রন্থ প্রকাশিত গোস্বামী সনাতন॥
শ্রীভট্ট গোঁসাই যাহা কৈলা প্রকাশ।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥
শ্রীজীব গোস্বামীকৃত যত গ্রন্থ চয়।
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥
এইসব গ্রন্থ লৈয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে।
বিস্তারিলা প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥
শ্রীনিবাস রায়রূপে গ্রন্থ মেঘ লইয়া।
লইয়া আইলা তেহোঁ যতন করিয়া॥
ব্রজাগ্নি মধ্য হইতে গ্রন্থ মেঘ আনি।
গৌড়দেশ বৃক্ষে সিঞ্চে দিয়া প্রেমপাণি।
ফলি যদি তাতে দগ্ধ জীব শস্যগণ।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত রূপে পাইল জীবন॥"

এই গ্রন্থসমূহের রসাস্বাদনের নিমিত্ত প্রত্যহই বাঙ্গালায় ভক্তমণ্ডলী হইত।

দেশ হইতে বৈষ্ণব ছাত্রগণ আসিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিত। শ্রীনিবাস প্রেমভক্তির সার সিদ্ধান্ত সকলকে শুনাইতেন এবং বিশদরূপে বুঝাইতেন। এইরূপে কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাব ভক্তির সুধাসঙ্গীত তরঙ্গপ্রবাহে উপাসকসমাজ হইতে সুদূর প্রস্থিত হইল। তাঁহার নিজের সাধনভজন ও ভাব আরও অদ্ভুত। যথা—

"প্রেমামৃতে ডুবি রহে রাত্রি আর দিনে ॥
সংখ্যা করি হরিনাম লয় প্রহরেক।
গ্রন্থ দরশনে যায় আর প্রহরেক ॥
রাধাকৃষ্ণ গোবিন্দ কীর্তন দুই নাম।
স্মরণ বিলাক প্রেমে ভাসে অবিরাম ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
রায়ের নাটক গ্রন্থ গান পরানন্দ ॥
রজনীতে ভক্ত সঙ্গে পরে রাসবিলাস।
গান শিক্ষা দিল ভক্তি প্রেমের উল্লাস ॥
দিনে শালগ্রামে সেবা তুলসী সেবন।
পরম ভক্তিতে করে জলের সিঞ্চন ॥
রাধাকৃষ্ণ ধ্যানমন্ত্র নাম দোঁহাকার।
এই মত স্মরণ-লীলা স্মৃতি সর্বকাল ॥
গৌরগুণ গান প্রভু নিত্যানন্দ গুণ।
এই মত দিবারাত্র উপজে করণ ॥"

শ্রীনিবাস আচার্যের দুইটি সহধর্মিণী ছিলেন। একের নাম দ্রৌপদী, ইনি বিবাহের সময়ে ঈশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। অপরাপর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া কর্ণানন্দে লিখিত আছে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তিন পুত্র যথা শ্রীবৃন্দাবন আচার্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য ও শ্রীগতিগোবিন্দ এবং তিনটি কন্যা। কন্যাদের নাম হেমলতা, কৃষ্ণপ্রিয়া ও কাঞ্চনলতিকা। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজের সহিত হেমলতাদেবীর এবং অপর শিষ্য কুমুদ চট্টরাজের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়াদেবীর বিবাহ হয়।

শ্রীনিবাসের দুই ঘরনী। কোন ঘরনীর গর্ভে কাহার জন্ম কর্ণানন্দে তাহা লিখিত হয় নাই। কর্ণানন্দ প্রণেতা যদুনন্দন দাস হেমলতা ঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র সুবলচন্দ্র ঠাকুরের শিষ্য। তিনি ১৫২৯ শকে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্য প্রভুর বংশাবলী সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জানা ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা উক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তর দেখিতে পাই না।

এই গ্রন্থখানি শ্রীনিবাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণের সুবিস্তৃত তালিকা। শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র শ্রীগতিগোবিন্দের পুত্র রাধামোহন গোস্বামী। রাধামোহন কর্ণানন্দ-কারের অনেক গীত স্বকৃত পদামৃত সমুদ্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসের জন্মভূমি চাখন্দি গ্রাম বহুদিন হইল গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই গ্রামে বিগ্রহ ছিল। সেই সকল স্থানান্তরে নীত হইয়াছে। বনবিষ্ণুপুর, বুধাইপাড়া ও মালিহাটী গ্রাম আচার্য প্রভুবংশ গোস্বামিগণের বর্তমান বাস। ইহাঁর উপশাখাদি সৈখদাবাদ, বোরাকুলি, ফরিদপুর, মণ্ডলগ্রাম, গোসাঞি গ্রাম, সোনারুন্দি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। চট্টরাজ বংশের এক শাখা আটিয়ার বন্ধ্য হাংরালজানী গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা চক্রবর্তী বলিয়া অভিহিত হইলেও ইঁহারা চট্টরাজবংশীয়। পরম গৌরভক্ত অনন্তরাম চট্টরাজ রাঢ়দেশ হইতে পূর্বাঞ্চলে গমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টরাজ পরম তপস্বী ছিলেন। তাঁহার অসীম প্রভাব দর্শনে মুকুন্দকিশোর চক্রবর্তী তাঁহাকে কন্যা ও বিষয়সম্পত্তি দান করেন। এই চক্রবর্তী বংশধরগণ সমগ্র রাঢ়দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমভক্তিময় ধর্মপ্রচার করেন। শ্রীনিবাস আচার্য সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশাবতংস বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বাবা কালীকমলীওয়ালা

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার কাটনা জালালপুর গ্রামে অভিজাত বৈশ্যকুলে শ্রীবিসাবাসিংহ পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হন। ইনিই উত্তরকালের সুপ্রসিদ্ধ কর্মযোগী কালীকমলীওয়ালা বাবা।

পিতার ছিল ভাল একটি মিঠাইয়ের দোকান। অগ্রজ কিশান সিংহ পাটোয়ারীর কাজ করিতেন। বিসাবা পিতার অনুরোধে মিঠাইয়ের দোকানের দেখাশুনা শুরু করেন।

বাল্যকাল হইতেই বহু সদ্‌গুণের সমাবেশ তাঁহার চরিত্রে ছিল। গ্রামের লোকেরা ডাকিত ভকতজী বলিয়া। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা ছিল বিসাবার অতি প্রিয় দৈনন্দিন কর্ম। মিঠাইর দোকান পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে একাজে প্রায়ই তাহাকে ব্রতী দেখা যাইত।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে নিকটস্থ গ্রামের শাহজীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়।

পর পর তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। সংসারে থাকিয়া তিনি ছিলেন বৈরাগ্যবান, নিরাসক্ত। দোকানের কাজকর্ম শেষে পুরাণ পাঠ ও জপতপ প্রত্যহ করিতেন।

অবশেষে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গৃহ পরিজন সব ছাড়িয়া বাহির হইলেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য।

নানা তীর্থ পর্যটনের পর শিবপুরী কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত।

স্বামী শঙ্করানন্দ—পরমহংস তপোনিধি মহারাজ নামে সুপরিচিত—বাস করিতেন কাশীর নেপালী খপরা নামক মহল্লার। বিসাবা তাঁহার চরণে আশ্রয় মাগিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এক শুভলগ্নে স্বামী শঙ্করানন্দ গঙ্গাতীরে বসিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন। নাম হইল বিশুদ্ধানন্দ।

প্রায় চারি মাস অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিশান এবং বিসাবার স্ত্রী পুত্রেরা সংবাদ পান যে তিনি কাশীতে সন্ন্যাস নিয়াছেন। সকলে আসিয়া গুরু শঙ্করানন্দের চরণে নিপতিত হইলেন।

গুরুর আদেশে কিছুদিনের জন্য বিশুদ্ধানন্দকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হয়। গৃহের পাশে একটি ভজনকুটীর নির্মাণ করিয়া নির্লিপ্ত হইয়া তিন বৎসর তিনি বাস করেন। তারপর পুত্রের উপর সংসারের সব ভার দিয়া, সবার সম্মতি নিয়া আবার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন।

কিছুদিন গুরুর আশ্রমে থাকিয়া সাধনভজন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তারপর চলিলেন তীর্থ পরিক্রমায়। ঘুরিতে ঘুরিতে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ। এই অঞ্চলের নাম ছিল তখন তপোবন। চারিদিকে অরণ্য শ্বাপদ-সঙ্কুল। দুই-এক শত সাধু পর্ণকুটীর ফসকী ঝোপড়িতে বাস করিয়া তপস্যা করেন। কন্দমূল, জংলী ফল ও বেলপাতা আহার করিয়া চলে তাঁহাদের জীবনধারণ।

এখান হইতে বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাখণ্ডের কেদারবদরী, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দর্শন করেন, দুর্গমপথে গৃহস্থ যাত্রী ও তীর্থকামী সন্ন্যাসীদের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিগলিত হয়। সঙ্কল্প স্থির করেন, এই তীর্থকামীদের জন্য সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

উত্তর ভারতের বহু ধনী ব্যক্তির কাছে গিয়া নিজের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করিলেন। সবাই নিরুৎসাহ করেন—স্বামীজী, এ যে কোটি টাকার ব্যাপার। দেশের সরকারও এতবড় কাজের ভার নিতে সাহসী নন। ভিক্ষে করে আপনি কতটা করবেন?

কলিকাতার এক শেঠ কিছু টাকা দিলেন, হৃষীকেশে একটা ছোট ছত্র খোলার জন্য। স্বামীজী ইহা দিয়া কাজ শুরু করিলেন। যাত্রীদের জন্য জল, ছোলাভাজা ও গুড় বিতরণের ব্যবস্থা হইল।

একবার এক প্রাচীন সাধু বিরক্ত হইয়া স্বামীজীকে কহিলেন, "দ্যাখো, যাত্রীদের আশ্রয়ের নাম করে এবং নিজের প্রতিষ্ঠার মোহে এধরনের ভণ্ডামি আর চালিও না, যদি পারো, তাদের জন্য ডাল রুটির ব্যবস্থা করো।"

স্বামীজী করজোড়ে কহিলেন, "আপনি আশীর্বাদ করুন, তাই যেন করতে পারি।"

অতঃপর কলিকাতার কয়েকটি শেঠের আনুকূল্যে অল্পদিনের মধ্যে হৃষীকেশে স্বামীজী অন্নছত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

সিংথানার প্রসিদ্ধ ধনী দেবী সহায় টাঁবড়ে ছিলেন কৃপণাশয়। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি বশীভূত হইলেন। অন্নক্ষেত্রে সাহায্য দিতে লাগিলেন অজস্র অর্থ। এই সময়ে হৃষীকেশের ভরত মন্দিরের মোহান্ত রামরতনদাসজী তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন।

ক্রমে স্বামীজী খুরজা, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের ধনীদিগের নিকট হইতে তাঁহার এই সেবা পরিকল্পনার জন্য প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন।

অন্নক্ষেত্রের উন্নতি নানাভাবে সাধিত হইতে থাকে। কিন্তু স্বামীজীর দিনচর্যা ঠিক একই ধারায় বহিয়া চলে, জীবনের শেষ পর্যায় অবধি তিনি মাধুকরী করিয়া প্রাণধারণ চালাইতেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত অন্নক্ষেত্রে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের মতই গ্রহণ করিতেন ডাল রুটির ভিক্ষা। ইহার পরিবর্তে স্বয়ং তিনি সত্রের কাজের জন্য গঙ্গা হইতে জল বহন করিয়া আনিতেন। কেহ আপত্তি করিলে উত্তর দিতেন বিনা পরিশ্রমে বা ভজন রুটি খেলে তা হয় হারামের তৈরি রুটি। আরো বলিতেন—'প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য অপর মানুষের সেবা করা—কায়িক, আর্থিক বা বাচিক ভাবে। তাহার পরিধানে থাকিত একটি কালো কম্বল, শয্যাও ছিল একটি কম্বল মাত্র। এই কম্বল ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার নাম হয় বাবা কালীকমলীওয়ালা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম হইয়াছে—বাবা কালী কমলীওয়ালা পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্র।

স্বামীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শেঠ সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা লছমনঝোলার প্রসিদ্ধ লৌহ সেতুটি ৫০ হাজার টাকায় নির্মাণ করাইয়া দেন। পূর্বে ছিল এখানে একটি দড়ির পুল। অনেক সময় বৃদ্ধ বৃদ্ধা বা অসতর্ক যাত্রীরা পড়িয়া প্রাণ দিত।

স্বামীজীর আদর্শে ঝুনঝুনওয়ালাজী হরিদ্বারেও একটি বৃহৎ ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বামীজীর বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ধারক ও বাহক হন স্বামী রামনাথজী এবং স্বামী আত্মপ্রকাশজী। এই দুইজন ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হাত স্বরূপ।

স্বামী ভোলানন্দ মহারাজের সহিত স্বামী বিশুদ্ধানন্দের (বাবা কালীকমলীওয়ালার) খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রয়োজনবোধে উভয়ে উভয়কে সংগঠনের কাজে নানাভাবে সহায়তা করিতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় এক সময়ে কালীকমলী বাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে নানা তত্ত্বালোচনা হয়। বিবেকানন্দজী বলিয়াছিলেন, 'সারা ভারতে বাবা কালী কমলীওয়ালার মত এমন কর্মযোগী আর দেখি নাই। দেশের কল্যাণের জন্য এমনি ধরনের কর্মী মহাত্মারই প্রয়োজন সর্বাধিক।'

—বর্তমানে সাধুসমাজে স্বামীজীমহারাজের সম্বন্ধে বাদানুবাদ রহিয়া গিয়াছে। কেহ বলেন, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী, কেহ বলেন, না, তিনি উদাসী। প্রথম পক্ষের যুক্তি, শতবর্ষ পূর্বে উদাসী সম্প্রদায়ের নামের সহিত আনন্দের সংযোগ ছিল না। তাঁহারা দাস, মুনি, ঋষি প্রভৃতি সংযোগ করিতেন, যাহা অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়ত স্বামীজী মহারাজের গুরু শ্রীগুরুমহারাজের নামান্তে ও আনন্দ যোগ রহিয়াছে। তৃতীয় যুক্তি হইল কাশীধামে সন্ন্যাসীপ্রধান, বিশেষ করিয়া তৎকালে তো বটেই। অপর পক্ষে যুক্তি হইল তিনি উদাসী সম্প্রদায়ের পরমহংস শ্রেণীভুক্ত। স্বামীজী মহারাজ কাষায়াম্বর পরিধান করিতেন না—যাহা সন্ন্যাসীর একমাত্র পোশাক। কিন্তু তিনি কালো কম্বল ব্যবহার করিতেন। উদাসী সম্প্রদায়ে চারি প্রকার বর্ণের বস্ত্র গ্রহণের নিয়ম আছে।

"স্যাহ সফেদ জরদ সুরথাই—
জেরা লে পহিরে সো গুরুভাই।"

—অর্থাৎ কৃষ্ণ, শ্বেত, ঘোর লাল এবং গোলাপী (গৈরিক) বর্ণের বস্ত্র যিনি ধারণ করিবেন, তিনিই গুরুভাই অর্থাৎ উদাসীন সম্প্রদায়ের মহাত্মা। দ্বিতীয়ত স্বামীজী মহারাজের স্থানাভিষিক্ত রামনাথজীও ছিলেন উদাসী, মতান্তরে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু আত্মপ্রকাশজী ছিলেন উদাসীন। তৃতীয়ত সন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামনাথজীর তিরোধানান্তে স্বামী মণিরামজী উক্ত আসন অলংকৃত করেন। তিনিও ছিলেন উদাসীন সম্প্রদায়ের মহাত্মা। শিষ্য পরম্পরা না হইলেও একই সম্প্রদায়ের সাধুর দ্বারা সেবকের আসন অলংকৃত।

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ জনসেবায় একান্তভাবে ব্রতী থাকার পর ৬৫ বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী শিবপুরী কাশীধামে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

সহস্র সহস্র নরনারী এই মহাত্মার প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র ও চাঁট হইতে সাহায্য লাভ করিতেছে। তাঁহার পঞ্চায়েৎ ক্ষেত্রের সম্পত্তির পরিমাণ আজ হইবে কোটি টাকার অধিক।

নামসূচী

নামসূচী